ছোটগল্পের অঙ্গনে প্রমথনাথ বিশী

ড. সতী চক্রবর্তী

অর্পিতা প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

'CHHOTO GALPER ANGANE PROMOTHONATH BISHI : BY DR. SATI CHAKROBARTI.
Published by Arpita Prakashani, ● Price : Rs. 250/-

প্রকাশিকা ঃ
শ্রীমতী চন্দ্রিমা মণ্ডল
অর্পিতা প্রকাশনী
১ কে, রাধানাথ মল্লিক লেন,
কলকাতা- ৭০০ ০১২

ব্যবস্থাপনায় ঃ
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল

প্রথম প্রকাশ ঃ
জানুয়ারী, ২০০০

ঃ পরিবেশক ঃ
প্রভা প্রকাশনী
১ কে, রাধানাথ মল্লিক লেন
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ ঃ
নিতাই দাস

মুদ্রণ ঃ
ফাইভ স্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১১এ, গড়পার রোড,
কালকাতা—৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

যাঁদের চিত্তের ঔদার্য ও হৃদয়ের উষ্ণ সান্নিধ্য
আমার চলার পথে ধ্রুবতারার
মতো আলোকবর্তিকরূপে বিরাজিত—
আমার পরম শ্রদ্ধেয়
স্বর্গত : পিতৃদেব অনাথবন্ধু চক্রবর্ত্তী
পরম শ্রদ্ধেয়া মাতৃদেবী আশালতা দেবীর
পুণ্য স্মৃতিতে

মুখবন্ধ

বাংলা কথা সাহিত্যের উর্বর প্রান্তরভূমিতে সৃষ্টির বৈচিত্র্যে, মৌলিক কল্পনার রূপায়ণে, উজ্জ্বল প্রতিফলনে, যুগধর্মের সৌন্দর্যসৃষ্টির অদ্ভুত কৌশলে, গভীর জীবন উপলব্ধিতে, বিষয় ভাবনা ও প্রকাশকলার অভিনবত্বে রবীন্দ্র ও শরৎচন্দ্রোত্তর যুগে যাঁদের অবদানে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁদের মধ্যে প্রমথনাথ বিশী কিংবদন্তী প্রবাদ পুরুষ বহু রশ্মি বিশিষ্ট একট নক্ষত্র। তাঁর সৃষ্টি প্রতিভা বহুরূপী ও বহুমুখী। তাঁর প্রতিটি সাহিত্য শাখা স্ফটিক খণ্ডে প্রতিফলিত সূর্যকিরণের মতো নয়নাভিরাম কিরণমালায় উদ্ভাসিত বলে প্রমথনাথ বিশী একজন সব্যসাচী সাহিত্যিক সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় অবাধ বিচরণ করে প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক কাব্য, সামাজিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, দেশাত্মবোধক ও প্রকৃতি বিষয়ক উপন্যাস, রোম্যান্স ও পরিহাসের যুগল মিলনযুক্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক নাটক মননশীল সমালোচনা সাহিত্য, বিচিত্র চরিত্রের বিশ্লেষণযুক্ত বিচিত্র সংলাপ, জীবনের ব্যাপক অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও অনুভূতিযুক্ত হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গ বিদ্রূপে পূর্ণ, ইতিহাস রসের সঙ্গে মানব জীবনরস যুক্ত ও অতিপ্রাকৃতমূলক ছোটগল্প প্রমথনাথ আমাদের উপহার দিয়েছেন। আবার তিনি শুধু একজন জনপ্রিয় লেখকই নন, একজন সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক, সুরসিক, সুপণ্ডিত, সুবক্তা, সাংবাদিক, পত্রিকা সম্পাদক, রাজনীতিজ্ঞ এবং সমাজসচেতক শিল্পী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কথাসাহিত্যের ইতিহাসে তিনি খ্যাতি ও স্বীকৃতির চরমে পৌঁছেছিলেন। এমনি একজন মহৎ সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব কথাসাহিত্যে খুব কমই আবির্ভূত হয়েছেন।

দুর্ভাগ্যবশত এমন একজন বড় মাপের স্রষ্টা যিনি জগৎ ও জীবনকে অসাধারণ নৈপুণ্যে কথাশিল্পের আধারে তুলে ধরেছেন। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহতি পরে রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনেকটা আড়ালে থেকে গেছেন। এমন একজন মহৎ শিল্পীকে ভুলে যাওয়া নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের ক্ষতির কারণ। টি. এস. এলিয়ট সাহিত্য সমালোচনাকৃত্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে প্রতি একশ বছর অন্তর লেখক বা সাহিত্যিকের রচনার পুনর্মূল্যায়ন করা দরকার। কারণ তার ভিতর দিয়েই একজন লেখকের যথার্থ পরিচয় পাওয়া সম্ভব।

এলিয়টের এই মন্তব্য যে কোন মহৎ লেখক সম্পর্কে প্রযোজ্য এবং তা প্রমথনাথ বিশীর মতো লেখকের ক্ষেত্রেও। সৌভাগ্যবশত, ২০০১ সালে প্রমথনাথ বিশীর জন্মশতবর্ষ উৎসব পালিত হয়েছে। প্রমথনাথ বিশীর সাহিত্যসৃষ্টির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এলিয়টের মূল্যবান নির্দেশ ছাড়াও এই স্মরণীয় লগ্ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রস্নেহধন্য প্রমথনাথ বিশীর জন্ম রাজশাহীর এক ঐতিহ্যশালী পরিবারে। তারপর তিনি ছাত্রজীবনের প্রাথমিক পর্ব কাটিয়েছেন শান্তিনিকেতনে এবং সেই সূত্রে তিনি নিবিড়ভাবে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। সেই ছাত্রাবস্থা থেকে রবীন্দ্রপ্রেরণায় সাহিত্য সৃষ্টিতে মগ্ন হন এবং আমৃত্যু তাতে ব্রত ছিলেন। শান্তিনিকেতন ছেড়ে তিনি

রাজশাহীতে ফিরে আসেন পরবর্তীকালে স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস করেন। সেখানেই তিনি যথাক্রমে পত্রিকা বিভাগে চাকুরীতে যোগ দেন এবং সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বাংলা অধ্যাপক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র অধ্যাপক পদে বৃত থেকে অধ্যাপনা করেন। শান্তিনিকেতন, রাজশাহী ও কলকাতার জনজীবন ও পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে তিনি পরিচিত হন এবং সমকালের বিভিন্ন ঘটনা ও তজ্জনিত অভিজ্ঞতাকে তাঁর কথাসাহিত্যে রূপদান করেন।

একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এমন একজন মহৎ লেখক তাঁর জীবিতাবস্থায় পাঠক সমাজের কাছে খুব প্রিয় ছিলেন। তাঁর উপন্যাস বিশেষত গল্প একদা খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অথচ আরো অনেক লেখকের মতো তাঁর মৃত্যুর পরে প্রমথনাথ বিশী সম্ভবত ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছেন। যদিও তাঁর জন্মশতবর্ষকে ঘিরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়েছে-নিবেদিত হয়েছে শ্রদ্ধার্ঘ তা নিঃসন্দেহে গৌরবের। বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচক তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। তাঁর বাগ্ বৈদগ্ধ্যের ও সাহিত্য কীর্তির সার্থক মূল্যায়ন হয়েছে সন্দেহ নেই। বস্তুত তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ে উপন্যাস ব্যতীত অন্যকোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থ রচিত হয় নি। অথচ শতবর্ষ অতিক্রান্ত হবার পরও তাঁর প্রবন্ধ, কাব্য, নাটক নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণার কাজ এখনও অসম্পূর্ণ। স্বরাজ্যে স্বরাট কথার কারিগর প্রমথনাথ বিশী একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ছোটগল্পকার। ছোটগল্পই যে তাঁর প্রতিভার স্বক্ষেত্র তার মূল্য সম্পর্কে অধ্যাপক ও বিদগ্ধ সাহিত্য সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুণ মুখোপাধ্যায় কিংবা কোন কোন লেখক মূল্যবান আলোচনা করলেও প্রমথনাথের ছোটগল্প নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা হয়নি বলেই আমার ধারণা। জীবনের বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতা ও গভীর সহানুভূতি তাঁর ছোটগল্পকে দিয়েছে বিশিষ্টতা। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো আজও পাঠকদের গভীরভাবে আকর্ষণ করে। জীবনবাদী লেখক প্রমথনাথের ছোটগল্পে আধুনিক গল্পের আত্ম আবিষ্কার ও আত্ম জিজ্ঞাসা জীবনের খণ্ড খণ্ড এবং ক্ষণিক মুহূর্ত প্রতিবিম্বিত হয়েছে। জগৎ ও জীবনের যে কোন ভাসমান উপাদান নিয়ে বিষয়, বর্ণনা, ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে গতানুগতিক পথে না হেঁটে নূতনত্বের সন্ধান করেছেন-জগতের সবকিছু ছোটগল্পের বিষয় হতে পারে তা তিনি বুঝেছেন বলেই তাঁর ছোটগল্পের ব্যপ্তি বিস্ময়কর। প্রমথনাথের প্রতিটি ছোটগল্প যেন সোনার কিরণের মত বিচ্ছুরিত মণি মঞ্জুষা। বলাবাহুল্য একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক লগ্নেও তাঁর সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা তাৎপর্যপূর্ণ। প্রমথনাথ বিশীর মতো এরকম একজন বড়মাপের ছোটগল্পকারের সৃষ্টির মূল্যায়ন করাই আমার প্রকল্পের লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি আমার গ্রন্থের বিষয় হিসাবে প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পকে নির্বাচন করেছি। বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে আমার নির্দেশক প্রমথনাথ বিশীর পরম স্নেহধন্য ডঃ প্রণয়কুমার কুণ্ডু উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান মহাশয়ের নির্দেশে এই গ্রন্থ প্রকল্পের মহান কাজে ব্রতী হয়েছি। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব নিয়ে তিনি নানান

জ্ঞাতব্য জানিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। তিনি আমার কর্ম সম্পাদনের মূল পাথেয়। তাঁর প্রতিটি পরামর্শ এবং ছোটগল্প বিষয়ের গভীর জ্ঞান আমার কাছে দিক নির্দেশকারী।

প্রমথনাথ বিশীর 'ছোটগল্পের অঙ্গনে' গ্রন্থের কাজ করতে গিয়ে আমাকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কর্মসূত্রে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার মহান দায়িত্ব মাথায় নিয়ে ও সাংসারিক দায়িত্ব নির্দ্বিধায় পালন করে আমাকে এই লেখার কাজে অগ্রসর হতে হয়েছে। তাঁর ছাব্বিশটি গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি সংগ্রহ করতে আমাকে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে। বস্তুত নানা সূত্রে তাঁর রচিত গল্পগুলি সংগ্রহ করেছি সেই সঙ্গে কথাসাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন সমালোচনা গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করতে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয়েছে। প্রসঙ্গত একথা উল্লেখ করা যেতে পারে খুব সাম্প্রতিককালে তাঁর ছোটগল্প সম্পর্কে বিশেষ কোন আলোচনা না থাকায় গ্রন্থের কাজ করতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্প গ্রন্থগুলি আমাকে বহুবার পাঠ করে সেখান থেকে গবেষণার উপাদান সংগ্রহ করতে হয়েছে।

গ্রন্থ রচনার সময় আমি প্রচলিত বাংলা বানান অনুসরণ করেছি। সেই সঙ্গে প্রমথনাথের জীবনবোধ কতখানি ছোটগল্পে প্রতিফলিত তার অনুসন্ধান করেছি, এছাড়া গল্পগুলির সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা ও মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। এই গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ করতে গিয়ে যতদূর সম্ভব গ্রন্থকে তথ্য ভারাক্রান্ত ও নীরস না করে যথাসম্ভব সরস ও অনুভববেদ্য করে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আমার গ্রন্থ কম্পিউটারের মাধ্যমে খুব দ্রুত মুদ্রণ করতে হয়েছে। যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও মুদ্রণে হয়তো বা কিছু ত্রুটি থেকে যেতে পারে। বলাবাহুল্য এই ত্রুটি অনিচ্ছাকৃত। আশা করি তা ক্ষমার যোগ্য।

পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে ও গ্রন্থ সংশোধন এই দুরূহ কাজ করতে গিয়ে ব্রততী দাসগুপ্ত এম. এ., শাশ্বতী সেন ও দেবপ্রিয়া চ্যাটার্জী উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমার কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে এজন্য তাদের প্রত্যেককে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। তাদের উত্তরোত্তর কল্যাণ কামনা করি।

গ্রন্থ প্রকাশিকা শ্রীমতী চন্দ্রিমা মণ্ডল মহাশয়ার ঐকান্তিক সহযোগিতায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে আমি তার কাছে ঋণপাশে আবদ্ধ।

বিনয়াবনত

ড. সতী চক্রবর্তী

সূচীপত্র

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর বিশের দশক থেকে সত্তর দশক পর্যন্ত সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর সময়কালে বহু প্রতিভাবান কথাশিল্পী বিচিত্রধর্মী ও রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি সম্ভারে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। মৌলিক প্রতিভাবান ছোটো গল্পকারগণ জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি ও সৃষ্টি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে নবযুগের প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক, পরশুরাম, বনফুল, নরেন্দ্রনাথ ও শরদিন্দুর পাশাপাশি ছোটগল্পকার হিসেবে নির্দ্বিধায় সংযোজিত হতে পারে প্রমথনাথ বিশীর নাম। সত্য ও সুন্দরের পূজারী প্রমথনাথ বিশী ছোটগল্পের অঙ্গনে প্রবেশ করে সমকালীন সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবে গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও নূতন আঙ্গিকের পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করে সাহিত্য জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছেন। বস্তুত তিনি বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের কাল্‌টে বিশ্বাসী হয়েও তাদের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য রক্ষা করেছেন। বলাবাহুল্য, এই দুই প্রতিভাধরদের সাহিত্যাদর্শে শ্রদ্ধাশীল হয়েও তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে নূতনত্বের সন্ধান করেছেন এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য।

সমাজ, প্রকৃতি ও মানব হৃদয় সাহিত্যের এই তিনটি প্রধান উপাদান। আবার সাহিত্যকে প্রধানতঃ ২টি শাখায় বিভক্ত করা হয়। সাহিত্য সমালোচকরা একটির নাম দিয়েছেন শিল্প, অপরটি হল জীবন। যেসব সাহিত্যিক সাহিত্যে শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন মূলতঃ তাঁরা কলাকৈবল্যবাদী বা Art for Arts sake—এই মতবাদে বিশ্বাসী। আবার সাহিত্যিক যখন তার সাহিত্যে জীবন ভাবনাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেন তখন তার সাহিত্যকে জীবনের জন্য কলা বা Art for life sake—বলা হয়। ব্যক্তি ও সমাজ হল জীবনের দুটি শাখা। প্রমথনাথ বিশী ছিলেন Art for life sake বা জীবনের জন্য কলা মতবাদে বিশ্বাসী। স্বাভাবিক কারণে তাঁর সাহিত্যে মানবিক মূল্যবোধের জয় ঘোষিত হয়েছে। তাঁর মধ্যে প্রখর বাস্তবজ্ঞান ও গভীর জীবনবোধের অভাব ছিল না। পরিবর্তমান জগৎ সম্পর্কে ছিল তাঁর সচেতন দৃষ্টি। তাঁর ছোটগল্পের পাতায় পাতায় নির্ভুলভাবে প্রতিবিম্বিত হয়ে আছে এই দৃষ্টিকোণ।

ছোটগল্পকার প্রমথনাথ বিশী জন্মসূত্রে একদিকে তৎকালীন উত্তরবাংলার অন্তর্ভূক্ত রাজশাহীর পারিপার্শ্বিকতা ও জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। অন্যদিকে কলকাতার নাগরিক জীবন ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে জীবনযাপন করে এ যুগের ঘটনাবলীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হয়েছেন। তাঁর আয়ুষ্কালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কয়েকটি ভাব ও বিপ্লবকারী উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তন্মধ্যে প্রথম মহাসমর (১৯১৪-১৯১৮), শ্রেণিবিভক্ত সমাজে মার্কসীয় সাম্যবাদী ভাবনার আত্মপ্রকাশ, নভেম্বর বিপ্লব (১৯১৭), দ্বিতীয় মহাসমর (১৯৩৯-১৯৪২) পাশ্চাত্য কন্টিনেন্টাল সাহিত্য, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব প্রভৃতি আন্তর্জাতিক ভাবনা বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। পাশ্চাত্য আধুনিক যন্ত্রজীবন, বাণিজ্যিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভিঘাতে

বিশ্বসাহিত্যের সমৃদ্ধ রচনাবলী ও ইউরোপের অভিনব সাহিত্য সম্ভারে আকৃষ্ট সাহিত্যিকগণ তাঁদের সাহিত্যে বিষয়বস্তু ও চরিত্রে আধুনিক চেতনাকে গুরুত্ব দিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে সাহিত্যে নায়কের স্থান দখল করল সাধারণ নায়কের দল। সমকালের জাতীয়ভাব ও বিপ্লবকারী উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন, বৃটিশ শাসনের কঠিন আঘাত ও রাজনৈতিক চক্রান্তের ফলস্বরূপ অসহযোগ আন্দোলন, বিপ্লববাদী সংগঠন, দ্বিজাতীতত্ত্ব, ভারতের মন্বন্তর, শ্রমিক আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, ১৯৪২-র আগস্ট বিপ্লব, নেতাজীর আই এন এ গঠন, নৌবিদ্রোহ, স্বাধীনতা লাভের জন্য দেশবাসীর প্রাণ বিসর্জনে প্রতিজ্ঞাগ্রহণ, ১৯৪৬-র হিন্দু ও মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পৈশাচিক আত্মপ্রকাশ, লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের ভারতভাগের পরিকল্পনা, ১৯৪৭-র ক্ষমতালোভী নেতাদের খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা লাভ, দেশভাগের অনিবার্য পরিণতিতে অগণিত হিন্দু নরনারীর পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে আসা, সমাধানহীন উদ্বাস্তু সমস্যা, ভারত-চীন সংঘর্ষ, বাংলায় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক অবক্ষয় ও বামপন্থী দলের উত্থান। দীর্ঘ এই কালপ্রবাহে একে একে নৈতিক মূল্যবোধের বিপর্যয়, নরনারীর দেহ সম্পর্কিত বিকৃত রুচি, মনুষ্যত্ববোধের অবমাননা, সংশয়, হতাশা, নিঃসঙ্গতা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, কালোবাজারী ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটল সাহিত্যে। নাস্তিক্যবাদী ও নৈরাশ্যবাদী জীবনে স্থায়ী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আস্তিক্যবাদী ও প্রবল আশাবাদী সুরের সন্ধান করলেন সাহিত্যিকরা। বলাবাহুল্য, অন্যান্য সাহিত্যিকদের মত প্রমথনাথ বিশীও যুগযন্ত্রণাকে আত্মস্ত করে অমৃত ও গরল দুটোই পান করে সাজালেন তাঁর সৃষ্টিশীল নৈবেদ্য। তার সাক্ষ্য বহন করে প্রমথনাথের লেখা তিনশতর বেশি ছোটগল্পের পাতায় পাতায়।

সে সময় বাংলা সাহিত্যের উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটেছিল বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসমকালীন সাহিত্যিকরা 'হিতবাদী', 'সাধনা', 'ভারতী', 'প্রবাসী' ও 'সবুজপত্র' পত্রিকায় তাঁদের সাহিত্য প্রকাশ করেছেন। শরৎচন্দ্র 'যমুনা', 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'সাহিত্য ভারতী', 'বঙ্গবাণী', 'বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন বঞ্চিত, হতভাগ্য, নির্যাতিত মানুষের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি। এর অব্যবহিত কাল পরেই যে দুটি পত্রিকা গোষ্ঠীর অভ্যুদয় ঘটেছিল তার প্রথমটি কল্লোল পত্রিকা কেন্দ্রিক, অপরটি 'শনিবারের চিঠি', 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী' ও 'বিচিত্রা' পত্রিকা কেন্দ্রিকগোষ্ঠী। কল্লোল গোষ্ঠীর গল্পে আছে যৌবনের স্বপ্ন যন্ত্রণা, বিদ্রোহ, রোমন্টিকতা, বোহেমিয়ান উচ্ছ্বাস ও নীচুতলার মানুষের পরিচয় অন্যদিকে অপর গোষ্ঠীর সাহিত্যে প্রবৃত্তি, নিয়তি, নিসর্গ ও আধ্যাত্মিক চেতনা, কূটৈষণা, জটিলতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে। ভারতী, বিচিত্রা ও শনিবারের চিঠি গোষ্ঠীর পাশাপাশি ভারতবর্ষ, কালিকলম, নারায়ণ, দৈনিক যুগান্তর ও আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় স্বনামধন্য সাহিত্যিকগণ বিষয় ও আঙ্গিকের এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বাংলা ছোটগল্পকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন।

প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পের মূল্যায়ন করতে গিয়ে শুধুমাত্র তাঁর ছোটগল্প নিয়ে মূল্যায়ন করলে সে মূল্যায়ন হবে অসম্পূর্ণ। তাঁর সমগ্র রচনার পটভূমিকার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে মূল্যায়ন করা হলে সেটি হবে সঠিক মূল্যায়ন।

প্রমথনাথ ছিলেন বিচিত্রধর্মী সাহিত্যের স্রষ্টা। তিনি একাধারে সাহিত্য সমালোচক তারপর সমাজসচেতন নাট্যকার, সামাজিক ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ধারার উপন্যাসিক অন্যদিকে তিনি একজন বিশিষ্ট-ছোটগল্পকার আবার কবি হিসাবে তাঁর প্রতিভাকে আমাদের জানাতে হয় অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। প্রমথনাথের কাব্যগ্রন্থগুলি বাংলাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ তাঁর কবিতা আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। প্রকৃতি ও প্রেম তাঁর কাব্যের মূল উপজীব্য বিষয় যার মধ্যে আছে ধ্বনি মাধুর্য, অলঙ্কার বিন্যাস ও বাক্যের ঐন্দ্রজালিক বৈশিষ্ট্য।

তাঁর রোমান্টিক কবি মনের পরিচয় আছে 'দেয়ালি' (১৯২৩), 'বসন্তসেনা' (১৯২৭), 'প্রাচীন আসামী হইতে' (১৯৩৪), 'বিদ্যাসুন্দর' (১৯৩৫), 'প্রাচীন গীতিকা হইতে' (১৯৩৭),'অকুন্তলা' (১৯৪৬), 'যুক্তবেণী' (১৯৪৮), 'হংসমিথুন' (১৯৫১), 'উত্তরমেঘ' (১৯৫৪), 'কিংশুকবহ্নি' (১৯৪৯), 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৬০), 'প্রাচীন পারসিক হইতে' (১৯৬৮) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে অতৃপ্ত মনের আকাঙ্ক্ষা ও সুদূরের পিপাসা কবিতাগুলিতে অভিব্যক্ত হয়েছে। তিনি কখনো দেহ কখনো দেহাতীতের জয়গান করে চিরন্তন সৌন্দর্য্যকে ধরতে চেয়েছেন। বলাবাহুল্য, তাঁর কাব্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় কবিদের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছেন সন্দেহ নেই। তাঁর কাব্যের সঙ্গে ছোটগল্পের যোগসূত্র আমরা লক্ষ্য করি।

প্রমথনাথ ছিলেন একজন সফল নাট্যকার। তাঁর নাট্য প্রতিভার পরিচয় নিহিত আছে তৎকালীন সামাজিক অসঙ্গতির পরিচয় প্রকাশে। স্প্যানিশ ট্রাজেডি ও হরার ট্র্যাজেডি অনুকরণে এবং বানার্ড শ ও মোলিয়েরের নাট্যপ্রভাবকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি, তাঁর নাটকে আছে হাস্যরসের ফল্গুধারা। 'ঋণংকৃত্বা', 'ঘৃতংপিবেৎ' নাটকে অভিজাত শ্রেণির অন্তঃসারশূন্যতা ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির অভিজাত হওয়ার প্রচেষ্টা এই নাটক দুটির মূল প্রতিপাদ্য। গণতন্ত্রের ভালমন্দ এই দুটি দিক প্রকাশিত হয়েছে 'মৌচাকে ঢিল' নামক তক নাটকে। 'পারমিট' নাটকে জালিয়াত ফেরববাজ ও ভণ্ড রাজনৈতিক নেতাদের মুখোশ-নাট্যকার খুলে দিয়েছেন। ইংরেজ পুলিশবাহিনীর চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন গভর্মেন্ট ইন্সপেক্টার নাটকে। 'জাতীয় উন্মাদ আশ্রম' নাটকে রাজনৈতিক নেতাদের ভণ্ডামিকে ব্যাঙ্গের বাণে বিদ্ধ করেছেন। এছাড়া 'বেনিফিট অফ ডাউট', 'ভূত-পূর্বস্বামী', 'স্বর্গ, আফিঙে-এর ফুল ও কে লিখিল মেঘনাদবকাব্য প্রভৃতি প্রহসন প্রমথনাথের অনবদ্য সৃষ্টি। সংলাপ নৈপুণ্যে, চরিত্র নির্মাণে, বিষয় ও আঙ্গিকের অভিনবত্বে তাঁর নাটকগুলো বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই নাটকগুলোর সঙ্গে তাঁর ছোটগল্পের সম্পর্ক ছিল গভীর।

'বিচিত্র সংলাপ' গ্রন্থটি প্রমথনাথের এক অনবদ্য সৃষ্টি। গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে ৪৩টি সার্থক সংলাপধর্মী চূর্ণক নাটক। একালের জনপ্রিয় শ্রুতিনাটক নামে তাঁর নাটকগুলি প্রশংসার সঙ্গে অভিনীত হচ্ছে। ইতিহাসখ্যাত ও পুরাণ প্রসিদ্ধ বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনে সমৃদ্ধ নাটকগুলিতে প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে মধ্য ও আধুনিক পৃথিবীর বিভিন্ন সমস্যাকে তাৎক্ষণিকভাবে তুলে ধরে বর্তমানকালের সমস্যার সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের ব্যাপারে প্রমথনাথের কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর পৌরাণিক চরিত্রের সংলাপে নাট্যরূপ

উপন্যাসে। 'চলনবিল' উপন্যাসে জমিদারতন্ত্রের ইতিবৃত্ত অঙ্কিত হয়েছে। 'অশ্বত্থের অভিশাপ' উপন্যাসে আধুনিক যুগের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। উপন্যাস ত্রয়ীতে নদীমাতৃক উত্তরবঙ্গের নদীসমূহের ভৌগোলিক পরিচয় এবং কবিত্বমণ্ডিতভাষায় বঙ্গদেশের জনজীবনের নিখুঁত ছবি প্রমথনাথের কলমে জীবন্তভাবে ধরা পড়েছে। ইতিহাসের কালপ্রবাহকে ধরতে গিয়ে আদিযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রসারিত মানব সংস্কৃতি ও বাঙালি জীবনবোধ তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগের প্রেক্ষাপটে রচিত 'বিপুল সুদূর তুমি যে' উপন্যাসে কৃষি সভ্যতার উন্মেষের কাহিনী রূপকচ্ছলে বর্ণিত হয়েছে। প্রমথনাথের অমরকীর্তি 'লালকেল্লা' ও 'কেরী সাহেবের মুন্সী' ঐতিহাসিক উপন্যাসদ্বয়। বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা এবং অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা শহরের খুঁটিনাটি বিবরণ এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা, সেই সঙ্গে সতীদাহ প্রথার নারকীয় বীভৎস রূপ সম্বলিত এরূপ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয়টি রচিত হয়নি। ঐতিহাসিক রস ও জীবনরসের অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে সিপাহী বিদ্রোহের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লেখা 'লালকেল্লা' উপন্যাসে। দিল্লির শেষ বাদশা বাহাদুর শাহের পরাজয় এবং ইংরেজ কোম্পানি শক্তির উত্থান কাহিনী অবলম্বনে জীবনলালের সঙ্গে তুলনা ও রুমালীর প্রেমভাবনা সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন উপন্যাসিক প্রমথনাথ বিশী। তিনি আলোচ্য উপন্যাসের দিল্লি ও লক্ষ্ণৌ শহরের যে অনবদ্য বর্ণনা দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। এরূপ সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আর রচিত হয়নি। প্রমথনাথের 'সিন্ধুনদের প্রহরী' উপন্যাসটি যেন দেশ ও জাতির জাগ্রত বিবেক ও অতন্দ্র প্রহরীর মতো। প্রমথনাথের 'বঙ্গভঙ্গ' ও 'পনেরই আগস্ট' রাজনৈতিক উপন্যাসদ্বয়ের বিষয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ৪৭ বছরের এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। দিনাজপুর ও রাজশাহীর শহরের কয়েকটি পরিবার অবলম্বনে রচিত এই উপন্যাসদ্বয় বাংলা সাহিত্যের সার্থক সংযোজন। পুরাণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'পূর্ণাবতার' উপন্যাসে পৌরাণিক রস ও শাশ্বত মানব জীবনরস লেখক উপস্থাপন করেছেন। নতুন জীবন ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে লেখক আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক সমাজ বিশ্লেষণের সমন্বয় সাধন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের নিয়তি লিখিত ছিল জরা নামক ব্যাধের তীরে। শ্রীকৃষ্ণের তীর নিক্ষেপ করে হত্যার ঘটনায়। এই হত্যার পরে জরার মনে জেগেছে অনুশোচনা। হরিণ মনে করে কৃষ্ণ হত্যায় সমুদ্রের তীরে গভীর অরণ্যে জরার নিজস্ব পাপবোধ, আত্মগ্লানি, যন্ত্রণা ও আর্তি। প্রমথনাথ জরা চরিত্রের মধ্যস্থতায় দেখিয়েছেন আমরা প্রতিনিয়ত আদর্শকে জলাঞ্জলি দিচ্ছি এই বিষয়টি। পৌরাণিক উপন্যাসে প্রমথনাথ আধুনিক যুগের চিন্তাধারাকে সংযোজন করে আধুনিক উপন্যাসের স্বাদ এনে দিয়েছেন। এখানেই উপন্যাসিক প্রমথনাথ বিশীর সার্থকতা। তাঁর উপন্যাসগুলির সঙ্গে ছোটগল্পের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

বাংলা ছোটগল্পের জগতে প্রমথনাথ বিশী স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রেখে গেছেন। সারাজীবন তিনি অজস্র ছোটগল্প রচনা করে ছোটগল্প ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিষয়বস্তু, বর্ণনাভঙ্গি

ও নতুন আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন এবং তিনি পরীক্ষায় সফল হয়েছেন। সমাজ সমস্যা, প্রেম, প্রকৃতি, দার্শনিক চেতনা, ইতিহাস চেতনা, পুরাণ চেতনা, কাব্যধর্মিতা ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি বিষয় তাঁর কলমের আঁচড়ে বাংলা ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর স্বদেশ প্রেমমূলক ছোটগল্পে স্বদেশ চেতনার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর অতিপ্রাকৃত গল্পগুলো শিল্প সফল সন্দেহ নেই। একদিকে তিনি গীতিকবিতায় সরলরেখায় গল্প লিখেছেন তাঁর মজলিশী গল্পের সংখ্যাও কম নয়। তিনি মানব জীবনকে দেখেছেন বুদ্ধিবাদের উপর নির্ভর করে এবং আজীবন মানবরস আহরণ করে গেছেন। এইজন্যই মানবতাবাদী শিল্পী হিসাবে তাঁর সার্থক পরিচয়। তাঁর ছোটগল্প যেন এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এইজন্যই ছোটগল্পের জগতে নিপুণ আর্টিস্ট হিসাবে তাঁর পরিচয়। কাহিনী নির্বাচনের দক্ষতা ছিল তাঁর অসাধারণ। সূক্ষ্ম ঘটনা, বর্ণনা ও চরিত্র সৃষ্টির মৌলিকত্বে সেই সঙ্গে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু মণিকাঞ্চন মিলনে তাঁর ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র মাত্রা এনে দিয়েছে। প্রমথনাথের গল্পগ্রন্থগুলি যথাক্রমে শ্রীকান্তের পঞ্চমপর্ব, শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব, গল্পের মতো, গালি ও গল্প, ডাকিনী, ব্রহ্মার হাসি, অশরীরী, ধনেপাতা, চাপাটি ও পদ্ম, নীলবর্ণ শৃগাল, অলৌকিক, এলার্জি, অনেক আগেও অনেক দূরে, যা হলে হতে পারতো, সমুচিত শিক্ষা, প্র.না.বি-র নিকৃষ্ট গল্প, প্র.না.বি.-র নিকৃষ্টতর গল্প, প্রমথনাথ বিশীর স্বনির্বাচিত গল্প, অমনোনীত গল্প, নীরস গল্প সঞ্চয়ন ও গল্প পঞ্চাশৎ প্রভৃতি। তাঁর গল্পগ্রন্থের প্রতিটি গল্পে আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। ছোটগল্পের মাধ্যমে তিনি তাঁর জীবন দর্শনকে সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন। আমরা জানি জীবনের খণ্ডাংশ অবলম্বনে রচিত হয় ছোটগল্প। জীবনের প্রসারতা ছোটগল্পে কম হলেও এর গভীরতা সবচেয়ে বেশি। লেখক জানেন প্রবহমান জীবন বৈচিত্র্যময়, জটিল ও রহস্যে ঘেরা। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের চিত্র প্রমথনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন ছোটগল্পের অঙ্গনে। কোন শিল্পী বা সাহিত্যিকের প্রধান দায়িত্ব হল জীবনকে সার্থকভাবে প্রকাশ করা এবং তাঁর ছবি সার্থকভাবে তুলে ধরা। সাহিত্য যেহেতু বাস্তব ঘটনার প্রতিলিপি নয় একজন সার্থক শিল্পী বাস্তব কাহিনীকে কল্পনার আলোতে রাঙিয়ে তাঁর সম্ভাব্য সত্যকে প্রকাশ করেন। যেহেতু জীবনের গতিপ্রকৃতি বড় বিচিত্র যেখানে আছে শান্তি, সংগ্রাম, শত্রুতা, সখ্য, বাৎসল্য আবার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে আছে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, বিচ্ছেদ, ও শোকের সঙ্গে আনন্দ, উল্লাস, হর্ষ, উত্তেজনা ও রোমান্সের উজ্জ্বল উপস্থিতি। যুগযন্ত্রণার অভিঘাতে অবক্ষয়িত জীবনের চিত্র যেমন লেখককে তুলে ধরতে হয় তেমনি লেখক সুস্থ ও মুক্ত জীবনের মধ্যে খুঁজে পান শান্তির বার্তা। ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে নিজস্ব জীবনাদর্শ প্রতিবিম্বিত হয় সাহিত্যের পাতায়। এই নিজস্ব ধ্যানধারণাই হল লেখকের জীবনদর্শন। বিভিন্ন চরিত্রের বর্ণনা ও সংলাপে লেখক তার মনের কথা সার্থকভাবে তুলে ধরেন। লেখক ঘটনা বিন্যাসে, আখ্যান গঠনে, নরনারীর চরিত্র চিত্রণে, তাদের সংলাপে ও সমাজ প্রতিবেশে জগৎ ও জীবনের রূপ উপলব্ধি করে জীবনের গূঢ় রহস্যকে ছোটগল্পকার গভীর মনীষা সহযোগে প্রকাশ করেন। ব্যক্তি, সমাজ ও সভ্যতাকে একজন সচেতন শিল্পী তাঁর প্রতিটি

ছোটগল্পে তুলে ধরে অন্তর আত্মার প্রতিফলন দেখতে পান এর থেকেই লেখক উৎকৃষ্ট মন নিয়ে উন্নত শিল্পকর্মের জন্ম দেন।

অন্যান্য কৃতী ছোটগল্পকারদের মতো প্রমথনাথ বিশী তাঁর অজস্র ছোটগল্পের জীবনদর্শনকে তুলে ধরেছেন। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁর পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতাকে রূপ দিয়েছেন ও তার ভেতর দিয়ে স্বভাবতই একটি জীবনাদর্শ ফুটে উঠেছে। তিনি অতি দেখা ও অতি চেনা বাঙালি জীবনের সার্থক রূপকার হয়ে বাঙালির হৃদয় রহস্যে ডুব দিয়ে উদ্‌ঘাটন করেছেন জীবনের সারসত্যকে। বাঙালির জীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনের জন্য জীবনের কোনো সমস্যা, মূল্যবোধের অপচয়, সমাজ জীবনের ত্রুটি বিচ্যুতিকে ব্যঙ্গের বাণে জর্জরিত করে বাঙালির জীবনকে নিকষিত হেম রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর জীবন পরিক্রমা কোনোভাবেই খণ্ডিত সীমা পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। সুবিশাল ভারতাত্মার প্রতীক রূপে আমরা খুঁজে পাই প্রমথনাথ বিশীকে। ব্যক্তিজীবনে রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমার জমিদারপুত্র হয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যলালিত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অনিবার্য পরাজয় তিনি মেনে নিতে পারেননি। তবু কালের নিয়মে গভীর বেদনায় জমিদারী ব্যবস্থাকে বিদায় দিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছেন এবং আবাহন জানিয়েছেন নতুন যুগকে। সুদীর্ঘ শিক্ষা জীবনে নিজে বৃত থেকে শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি অনুভব করে তা দূর করবার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। গান্ধীবাদে বিশ্বাসী হয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে তিনি যে রাজনৈতিক আদর্শকে তুলে ধরতে চেয়েছেন তার সাক্ষ্য রয়েছে অসংখ্য-ছোটগল্পে। কি বিশ্বযুদ্ধোত্তর পটভূমিকায় কিংবা প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের এবং স্বাধীনোত্তর সমাজ জীবনের শরিক হয়ে নাগরিক জীবন ও গ্রামীণ জীবন ধারাকে পর্যবেক্ষণ করে সমাজের ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলোকে সংশোধনের জন্য লেখনীর মাধ্যমে নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। অসংখ্য ছোটগল্প তাঁর জ্বলন্ত প্রমাণ দিচ্ছে। সুদীর্ঘ বছর যুগান্তর ও আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদনা কার্যে নিযুক্ত থেকে একাধারে যেমন স্বদেশ চেতনার সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছেন অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ঘটনার সঙ্গে পরিচয় সূত্রে গড়ে উঠেছে তাঁর আন্তর্জাতিকতাবোধ। রাজ্য বিধানসভা ও সাংসদের দায়িত্ব ভার নিয়ে দেশের সার্বিক কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তাঁর প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে বিশেষতঃ তাঁর ছোটগল্পের পাতায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করে তিনি এই দুই আদর্শের মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন। সত্য ও সুন্দরের পূজারী প্রমথনাথ বিশী তাঁর ছোটগল্পে সবকিছুর মধ্য থেকে এক বৃহৎ নীতিবোধ শ্রেয়বোধের আবিষ্কার করেছেন। সামান্যের মধ্যে অসামান্য, সাধারণের মধ্যে অসাধারণত্ব এনে ধ্রুব ও শ্রেয়র সার্থক প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ভীষণের সঙ্গে সুন্দরের, কোমল-এর সঙ্গে কঠিনের, ক্ষুদ্রের সঙ্গে বৃহতের, বহু বিচিত্ররূপ তাঁর ছোটগল্পে সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য আধুনিক যুগের তুচ্ছতা, মালিন্য, সংশয় ও আত্মকেন্দ্রিক ভাবনার ঊর্ধ্বে দেশ কাল নিরপেক্ষ মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ ঘটিয়েছেন। কখনো তিনি পরলোক জিজ্ঞাসা, নাস্তিক্যবাদ, অদৃষ্টবাদ, ধর্ম ও বিজ্ঞানকে নতুনভাবে রূপায়িত করতে চেয়েছেন

অসংখ্য ছোটগল্প তাঁর উজ্জ্বল প্রমাণ। মানবজীবনের কিছু কিছু ঘটনা বা ব্যাখ্যার অতীত তাঁর সঙ্গে তিনি বাস্তবের যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়াসী হয়েছেন। যুগ সচেতন শিল্পী উদার মানব ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদনীতিকে পরিহার করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন জাতীয় সংহতিবোধ। এপার বাংলা ও ওপার বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য-এর জন্য সচেষ্ট হয়েছেন।

প্রমথনাথের ছোটগল্প যেন এক চরিত্র চিত্রশালা। বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধি তাঁর সাহিত্যের পাতায় জীবন্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। গল্প কাহিনীর প্রয়োজনে কিংবা বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর ছোটগল্পে উঠে এসেছে আদর্শবান চরিত্রের পাশাপাশি কুৎসিত চরিত্র। প্রাচীন সাহিত্যের দিকে যদি আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ হই তাহলে আমাদের মানসপটে চিত্রশিল্পীর মতো এসে যায় বিভিন্ন চরিত্র। রামায়ণের রাবণ, মহাভারতের দুর্যোধন ও শকুনি ইত্যাদির চরিত্র যদি না থাকত তাহলে রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির চরিত্র আমাদের কাছে তেমন উজ্জ্বলভাবে দেখা দিত না। আমরা পঙ্ককে চাই না, চাই পঙ্কজকে, চাই সুন্দরকে। তবুও পঙ্কজ ও সুন্দরের কথা বলতে গিয়ে পঙ্কের কথা বা অসুন্দরের কথা স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। পরস্পরবিরোধী এই দুই চরিত্র প্রমথনাথ তাঁর ছোটগল্পে আমদানি করে আমাদের বলতে চেয়েছেন যে সাহিত্যের মধ্যে থেকেই জীবনের প্রশস্ত রাজপথ নির্মিত হয়। সে রাজপথ সত্য ও সুন্দরের রাজপথ—প্রমথনাথের জীবনদর্শন আমাদের এই শিক্ষাই দেয়। বস্তুত কীভাবে ছোটগল্পের প্রাঙ্গনে প্রমথনাথ বিশী আত্মপ্রকাশ করলেন এবং সমকালীন প্রতিষ্ঠিত ছোটগল্পকারদের ভিড়ে হারিয়ে না গিয়ে আপন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল ছোটগল্পের মণিমুক্তা সদৃশ প্রতিনিধি স্থানীয় গল্পগুলিকে বেছে নিয়ে সীমিত পরিসরে আমার এই গ্রন্থে উপস্থাপন করবার চেষ্টা করেছি।

প্রমথনাথ একজন মহৎ লেখক। তাঁর জীবিতাবস্থায় শুধুমাত্র তিনি পাঠক সমাজের কাছে জনপ্রিয়ই হন নি, তাঁর মৃত্যুর পরেও ভাবীকালের পাঠকদের জন্য তিনি রেখে গেছেন মূল্যবান সম্পদ। সেই সম্পদ যেন কালের কষ্টি পাথরে যাচাই করা রত্নাবলীর মণি মঞ্জুষা। কালের পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রমথনাথের ছোটগল্পগুলির কতটা অনুভববেদ্য এবং পাঠক ও প্রমথ অনুরাগীদের মনের মণিকোঠায় কতটা স্থান অধিকার করেছে সেই সঙ্গে গল্পগুলির চিরায়ত মূল্য কতটুকু অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তাঁর যথাযথ মূল্যায়নের চেষ্টা করেছি।

আমার গ্রন্থ ছয়টি অধ্যায় বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে আমি বাংলা ছোটগল্পের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বসূরী ও সমকালীন ছোটগল্পকারদের পাশাপাশি প্রমথনাথের ছোটগল্পকার হিসাবে আবির্ভাবের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছি। সেই সঙ্গে গল্পকারদের সঙ্গে প্রমথনাথের ছোটগল্পের যোগসূত্র নির্ণয়ের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখকের ব্যক্তি জীবনের মুখ্য ঘটনাবলী এবং সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ঘটনাবলী বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমথনাথের ছোটগল্পের পটভূমি ও লেখক স্বভাবের উৎস এবং তাঁর ছোটগল্পের উৎস নির্ণয়ের

যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে শান্তিনিকেতনে শিক্ষার প্রভাবে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার উত্তরোত্তর বিকাশ কিভাবে ঘটেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছি। রাজশাহী, শান্তিনিকেতন, কলকাতা দিল্লি এই চতুষ্কোণ পৃথিবীতে অবস্থান করে প্রমথনাথ কীভাবে ছোটগল্পের উপাদান সংগ্রহ করেছেন তাঁর যথাযথ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। এছাড়া লেখকের জীবনাদর্শ কীভাবে তাঁর সাহিত্যের অঙ্কুরে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তা প্রতিষ্ঠা করবার বিশেষ প্রয়াসী হয়েছি।

তৃতীয় অধ্যায়ের আমার আলোচ্য বিষয় প্রমথনাথের ছোটগল্পের বিবর্তন, শ্রেণিবিভাগ ও বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ।.কি করে একজন রোমান্টিক লেখক রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে সমাজকে পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁর ফলস্বরূপ ছোটগল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে বহুমুখী সেই বিষয়টির প্রতি আমি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছি। প্রমথ প্রতিভার উন্মেষলগ্ন থেকে পরিণতির স্তর পর্যন্ত গল্পগুলোর শ্রেণি নির্ণয় করে করে তাঁর বিষয়বস্তুকে সার্থকভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি।

প্রমথনাথের ছোটগল্পের আঙ্গিক ও প্রকরণ আমার গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। এর মধ্যে কাহিনী চরিত্র, কবিত্ব, তত্ত্ব, নাটকীয়তা এবং সুখপাঠ্য ভাষার আলোচনা করেছি। গল্পের সুগভীর ব্যঞ্জনা এবং শুরু ও সমাপ্তি কতটা শিল্পগুণসম্পন্ন তার যথাযথ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার উদ্যোগ নিয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে সমকালীন নির্বাচিত ছোটগল্পকার—রাজশেখর বসু (পরশুরাম), প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ ও সৈয়দ মুস্তাফা আলীর ছোটগল্পের বিষয়, কাহিনি, ভৌগোলিক পটভূমি, প্রেম, প্রকৃতি, চরিত্র, নাট্যগুণ, ভাষা ও জীবনদর্শনের তুলনামূলক আলোচনা সূত্রে বাংলা ছোটগল্পের গতিপ্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রমথনাথের ছোটগল্প কতটা মৌলিক তার পর্যালোচনা করার লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হয়েছি।

গ্রন্থের সর্বশেষ অধ্যায়ে থাকছে উপসংহার। প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পের মূল্যায়নের শুরুতে প্রতিনিধি স্থানীয় ছোটগল্প গুলির স্থান, সমস্যা, প্রধান অভিঘাত ও কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি এবং প্রমথনাথের গল্পগুলি অন্যান্য গল্পকারদের পাশাপাশি কতটা স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জল তা বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা চালিয়েছি। তিনি বাংলা সাহিত্যে কোনো উত্তরসূরী রেখে যেতে পেরেছেন কিনা কিংবা তিনি তাঁর ছোটগল্পে ভাবীকালের সংকেত কতটা দিতে পেরেছেন এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পে গল্পকার হিসাবে প্রমথনাথ বিশীর স্থান নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছি। প্রমথনাথের ছোটগল্পের মধ্যে যে জীবনবোধ প্রকাশিত হয়েছে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে আমি তাঁর যথাযথ মূল্যায়নে ব্রতী হয়েছি। গল্পের শিল্প সৌন্দর্য ব্যাখ্যা, নির্মাণ কলা কৌশল, ভাবের ঐক্য ও চরিত্রের রূপায়ণ প্রভৃতি বিভিন্ন দিক ছোটগল্পের পাদ প্রদীপে যথাযথভাবে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছি। এটাই আমার গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ও অন্বিষ্ট।

প্রথম অধ্যায়

প্রমথনাথ বিশীর সমকালীন বাংলা ছোটগল্পের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক প্রমথনাথের আবির্ভাবের তাৎপর্য

বাংলা ছোটগল্পের জগতে প্রমথনাথ বিশী এক স্মরণীয় নাম। বাংলা ছোটগল্পের ঐতিহ্যময় সরণি ধরে প্রমথনাথ বিশীর আবির্ভাব। যুগযন্ত্রণার ফসল হিসেবে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভবের সময়কাল থেকে আজ পর্যন্ত বহু ছোটগল্পকার যে ছোটগল্পের নৈবেদ্য সাজিয়েছেন তা বিশ্বসাহিত্যে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রমথনাথ বিশী প্রতিষ্ঠিত ছোটগল্পকারদের মধ্যে অন্যতম। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ছোটগল্পকার হিসেবে তাঁর পরিচয়। সাহিত্যে ঐতিহ্য অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রথমনাথ বিশী রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য হলেও অনেকক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিম কাপ্টে বিশ্বাসী। কিন্তু বাংলা ছোটগল্পের জগতে প্রমথনাথ বিশী এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়ভাবনা ও উপস্থাপন কৌশল প্রবর্তন করে আপন স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে পেরেছেন। প্রমথনাথ বিশীর সমকালীন বাংলা ছোটগল্পের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক প্রমথনাথের আবির্ভাবের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রমথনাথের পূর্ববর্তী ও সমকালীন ছোটগল্পকারদের আলোচনা স্বাভাবিক কারণে এসে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা ছোটগল্পের সৃষ্টি হলেও এক শিল্পসম্মত প্রকৃত ছোটগল্প হিসেবে সেগুলো পরিচিত নয়। প্রথম যথার্থ বাংলা ছোটগল্প ধারার শিল্পী রবীন্দ্রনাথ। তিনি বাংলা ছোটগল্পের জনক, সর্বজনবেদ্য ভগীরথ। সুদীর্ঘ বছর সাধনা করে বাংলা ছোটগল্পকে তিনি শিল্পসম্মতরূপ দিয়ে বিশ্বসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন। হিতবাদী, সাধনা ও সবুজপত্র প্রভৃতি সাময়িকপত্রের আশ্রয়ে বাংলা ছোটগল্পের ঐশ্বর্য নিয়ে তাঁর আবির্ভাব। সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র রবীন্দ্র ছোটগল্পের উৎকর্ষ বিচার করতে গিয়ে একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন যে গীতাঞ্জলির ইংরাজি অনুবাদ করে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কিন্তু সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ ছোটগল্পরচনার জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেতে পারতেন। বাস্তবিক পক্ষে ছোটগল্পের বিষয়বস্তুরূপে তিনি বেছে নিয়েছেন মানবপ্রেম, সমাজ সমস্যা, রাজনীতি, ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব ও অতিপ্রাকৃত উপাদানকে। রবীন্দ্র সমালোচক প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাসের মতে রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন', 'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কথা', 'ইচ্ছাপূরণ', 'নিশীথে', 'সম্পত্তি সমর্পণ', 'জীবিত ও মৃত', 'মহামায়া', প্রভৃতি ছোটগল্পের প্লট ও কাহিনী বিন্যাস অনেকটা বিদেশী প্রভাবজাত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর ও কালিগ্রাম এই চতুঃকোণ পৃথিবীকে ঘিরে একদিকে প্রকৃতি প্রেমের সঙ্গে মানবপ্রেমের সমন্বয়ে বহুবিধ চিন্তার পঞ্চশস্যে সমৃদ্ধ হতে পেরেছে তিনখন্ডে লিখিত গল্পগুচ্ছের গল্পভান্ডার। বলাবাহুল্য ১২৯৮ থেকে ১৩৪০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে ছোটগল্পের নৈবেদ্য সাজিয়েছেন তাঁর মধ্যে গভীর ব্যঞ্জনা ও গীতিকবিতার সুর প্রাধান্য পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' ছোটগল্পে পিতৃহৃদয়ের জয়গান, 'পোষ্টমাস্টার'

ছোটগল্পে নবজাগ্রত নারীত্বের অভিমান, 'দেনাপাওনা'য়' পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, 'দিদি' গল্পে স্নেহ প্রেম, 'স্ত্রীর পত্রে' নারীত্বের অবমাননা, 'শাস্তি' গল্পে প্রতিবাদী চেতনা, 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পে মানবচরিত্রের উপর প্রকৃতির প্রভাব, কিশোর যন্ত্রণার একাকিত্ব নিয়ে লেখা 'ছুটি', ধনাকাঙ্ক্ষার ভয়ঙ্কর পরিণতিমূলক ছোটগল্প 'সম্পত্তি সমর্পণ' ও 'গুপ্তধন', নারীর মর্যাদা মূলক ছোটগল্প 'হৈমন্তী', 'অপরাজিতা', 'শাস্তি' ও 'স্ত্রীর পত্র', প্রকৃতি ও মানবচরিত্রের সম্পর্কমূলক ছোটগল্প 'অতিথি' ও 'সুভা', ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সমাজসত্তার দ্বন্দ্বমূলক ছোটগল্প 'হালদার গোষ্ঠী', ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে লেখা 'দালিয়া', শিক্ষামূলক 'তোতাকাহিনী', রাজনীতিমূলক 'মেঘ ও রৌদ্র' প্রভৃতি ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর উত্তরবঙ্গকেন্দ্রিক ও কলকাতাকেন্দ্রিক ছোটগল্পের বিষয়, ভাষা আঙ্গিক, নিঃসন্দেহে অভিনব। গল্পের নামকরণ, শুরু ও শেষ, আখ্যানগঠন, নাট্যগুণ, সময়বিন্যাস, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রকৃতি প্রেম এবং চিরন্তন মানবিক আবেদনে, ভাষার ব্যঞ্জনায়, উপমা, চিত্রকল্পে, তীক্ষ্ণ এপিগ্রামে রবীন্দ্রনাথ শুধু সমকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি উত্তরসূরীরা রবীন্দ্র প্রদর্শিত পথকে অনুসরণ করে বাংলা ছোটগল্পের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর নির্দেশিত পথ ধরে বাংলা ছোটগল্পের স্রোতধারা একবিংশ শতাব্দীর উন্মেষলগ্ন পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছে সন্দেহ নেই।

বর্ণনার সংক্ষিপ্তি, বস্তুবর্জন ও বস্তুবিন্যাস সংহতি এবং বস্তুত্তর ব্যঞ্জনা রচনার সফলতাই সার্থক ছোটগল্পের প্রাণ। এদিক থেকে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী যথার্থ বলেছেন—

"রবীন্দ্রনাথের ও পরবর্তীদের ছোটগল্পের প্রধান প্রভেদ এই যে পরবর্তীদের ছোটগল্প সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্তসার, তাহাতে অনাবশ্যক তথ্যকে বাদ দেওয়াই প্রধান সমস্যা, আর রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প অপূর্ণ অভিজ্ঞতার আভাস, অজ্ঞাত তথ্যকে সৃষ্টি করাই সেখানে সমস্যা।"[১]

প্রমথনাথ বিশী আরও বলেছেন:

"রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে নামিলে দেখিতে পাইব যে, একই বস্তু বা ভাব কখনো কল্পাকারে কখনো কাব্যাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, আবার কখনো বা কতকটা কবিতায় কতকটা গল্পে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।"[২]

ডঃ সুকুমার সেনের মতে,—

"রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প কিছুতেই কল্পবিলাসের রঙীন ফানুস নয়। প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতির সমবায়ে কবির মানসে যে গভীরতর সত্যসৃষ্টির আয়োজন সঞ্চিত হইয়াছিল তাহারি অভিনব প্রকাশ তাঁহার ছোটগল্পগুলিতে।"[৩]

ডঃ সুকুমার সেন রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প প্রসঙ্গে আরও বলেছেন—

"রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নগর ও নগরবাসী এবং জনপদ ও জনপদবাসী তুল্য স্থান ও মর্যাদা পাইয়াছে। মানুষের মানবত্ব অবশ্য সর্বত্রই এক, কি নগর কি জনপদ এবং রবীন্দ্রনাথ যে মৌলিক ও জটিল মনোবস্তু লইয়া কারবার করিয়াছেন তাহাতেও নাগরিক—জনপদিক বিভাগ চলে না।"[৪]

অলোকরঞ্জন দাসগুপ্তের মন্তব্যটি এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য:

" ছোটগল্পের মানুষগুলির সামাজিক ও সত্য এই দুরকম পরিচয় তিনি সন্ধান করেছেন। সেই কারণে তারা যতদূর পল্লীসমাজের আশ্রিত, ঠিক ততখানিই পল্লীনিসর্গের পটাশ্রিত। সামাজিক ভাবে তাদের সমস্যাগুলি এবং বিচ্যুত ও ব্যক্তিগতভাবে সেই মানুষটি—তার বিশিষ্টতা ও নিঃসঙ্গতা—তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই কারণে একই সঙ্গে তা সমাজচিত্র ও কবিতাপ্রতিম। নাগরিক জীবনভাবনাও এই শিল্পায়নের মধ্যেই অনায়াসে মিশে গিয়েছিল।"[৫]

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"পরিচ্ছেদ বা শূন্য 'স্পেস' প্রয়োগরীতি—সংক্রান্ত এই আলোচনার শেষে বলা চলে যে, শ্রেষ্ঠ গল্পগুলিতে পরিচ্ছদ বা বিবৃতিপর্ব ব্যবহারের ফলে রবীন্দ্রনাথ গল্পকে হয়তো একটানা সময় সীমায় আবদ্ধ রাখতে পারেননি, কিন্তু তা কখনোই পাঠক চিত্তে কোন বিন্যাসগত শিথিলতার প্রতীতি আনে না, বরং ভাববস্তু তথা জীবনবোধের অখন্ডজনিত এক সংহত নান্দনিক আবেদন জাগিয়ে তোলে।"[৬]

ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে—

"গল্পগুচ্ছের শিল্পকৃতিত্বে অবশ্যস্বীকার্য, শিল্পগত সততা ও গভীর জীবনবোধের গভীর মিলনের উপর দাঁড়িয়ে আছে গল্পগুচ্ছের সৌধ। গোটা বঙ্গদেশকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছেন। মানুষের প্রতি গভীর প্রেম, প্রকৃতির প্রতি নিবিড় আকর্ষণ, দুয়ে মিলে গল্পগুচ্ছের প্রথম দুখন্ডের শিল্পমহিমাকে গড়ে তুলেছে। এই দু'খন্ডের গল্প ঘনিষ্ঠভাবে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশের ও স্বকালের পরিচিতি, সেই সঙ্গে সর্বদেশের সর্বকালের মানবমহিমার প্রকাশস্থল। দেশকালের গন্ডিকে গল্পগুলি অতিক্রম করে গিয়েছে জীবনবোধের সততায় ও অনুভূতির গভীরতায়। গল্পগুচ্ছ পড়লে অনুধাবন করা যায় লেখকের শিল্প ও জীবন উপলব্ধি। সার্থক ছোটগল্প ও উপন্যাসের পক্ষে প্রয়োজন, সরল মানবহৃদয়ের অন্তর্নিহিত গভীরতা ও সুখদুঃখপূর্ণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চিরানন্দময় ইতিহাস।"[৭]

রবীন্দ্র পরবর্তী ছোটগল্পকারদের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। জীবন অভিজ্ঞতা নিয়ে জীবনের চলমানতার নিখুঁত ছবি যুক্ত তাঁর ছোটগল্পগুলো অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যদিও তাঁর জনপ্রিয়তার পেছনে হাস্যরসের ঝর্ণাধারা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। অথচ তাঁর হাস্যরস ও স্নিগ্ধ কৌতুক রসে কোনো গভীর বেদনা ও দুঃখ নেই, আছে এক স্নিগ্ধ তৃপ্তিবোধ। প্রভাতকুমার নিজে লিখেছেন:

> "আকাশ পানে হাত বাড়িয়ে চাই নে রে ভাই আশাতীত
> ভাষার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে খুঁজি নে ভাই ভাষাতীত।"[৮]

তাঁর গল্পে কোনো জ্বালা নেই যন্ত্রণা নেই, আছে শুধু প্রাণের বন্যা। মানসী ও মর্ম্ম বাণী পত্রিকার সম্পাদক প্রভাতকুমারের উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলো 'নবকথা' (১৮৯৯), ষোড়শী (১৯০৬), 'দেশী ও বিলাতী' (১৯০৯), 'গল্পাঞ্জলি' (১৯১৩), 'গল্পবীথি' (১৯১৬), 'পত্রপুষ্প' (১৯১৭), 'গহনার বাক্স' (১৯২১), 'হতাশ প্রেমিক' (১৯২৪), 'যুবকের প্রেম' (১৯২৮), 'নূতন বৌ' (১৯২৯) প্রভৃতি পাঠক সমাজে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছিল।

কোনো কোনো সমালোচক প্রভাতকুমারের সঙ্গে মোঁপাসার আঙ্গিকগত সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমারকে এক চিঠিতে লিখেছেন:

"তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়ায় কল্পনার ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও যে কিছু মাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই।"[৯]

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন:

"প্রভাতকুমার উপন্যাস ও ছোটগল্প এই দুই রকমই লিখিয়াছেন। কিন্তু মোটের উপর তাঁহার কৃতিত্ব উপন্যাস অপেক্ষা ছোটগল্পেই বেশী। তাঁহার অধিকাংশ গল্পই হাস্যরসপ্রধান। এই হাস্যরস কেবলমাত্র ঘটনামূলক অসংগতির সহিত নহে চরিত্র বৈশিষ্ট্যের সহিতও সম্পর্কিত।"[১০]

ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমারের ছোটগল্প প্রসঙ্গে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন:

"প্রভাত গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—এর চিরনবীনতা। স্বতঃস্ফূর্ততা, পরিমিতিবোধ ও গ্রন্থনৈপুণ্য। কোন কৃত্রিমতা নেই। মনে হয় আমাদের পরিচিত জীবনের একটি পাতা ছিঁড়ে নিয়ে প্রভাতকুমার তাঁর গ্রন্থে যুক্ত করে দিয়েছেন।"[১১]

নির্মল হাস্যরসের স্রষ্টা হিসেবে প্রভাতকুমার স্মরণীয় হয়ে আছেন ছোটগল্প পাঠকের কাছে। মাস্টারমহাশয়, রসময়ী রসিকতা. নিষিদ্ধ ফল, চুরি, প্রণয়পরিণাম, আদরিণী, কাশীবাসিনী, দেবী প্রভৃতি গল্প প্রভাতকুমারের অপূর্ব সৃষ্টি। রবীন্দ্র অনুরাগী হয়েও মানস ভঙ্গিতে ও রচনাশৈলীতে ছোটগল্পকার হিসেবে স্বতন্ত্র চিহ্নিত হয়ে আছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

'আমরা', 'কি ওকে', 'কবুলতি', 'পাথেয়', 'দুঃখের দেওয়ালী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ রচয়িতা কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছোটগল্পে হাস্যরস সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত যদিও তার মধ্যে কারুণ্য ও সমবেদনার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্র পরবর্তীর ছোটগল্পকার হিসেবে একান্তভাবে স্বতন্ত্র ছোটগল্পকার হলেন প্রমথ চৌধুরী। বিশেষ করে তিনি সবুজপত্র পত্রিকায় মজলিশের মেজাজে নাগরিক ও বিদগ্ধজনের আড্ডায়, তর্কে, ব্যঙ্গে, মার্জিত রুচিতে ও কথার খেলায় সেই সঙ্গে বিশ্লেষণ বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগে একজন প্রথম শ্রেণির ছোটগল্পকার হিসেবে পরিচিত হয়ে আছেন। প্রমথ চৌধুরী বীরবল ছদ্মনামে 'চার ইয়ারী কথা', 'আহুতি', 'ট্রাজেডির সূত্রপাত', 'নীললোহিত', 'বীণাবাঈ', 'ঘোষালের চিত্রকথা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনার, ব্যঙ্গধর্মিতায়, শাণিত ও চলিত গদ্যরীতিতে যুক্তিবাদ প্রয়োগে আঙ্গিক প্রধান ছোটগল্পের পথ প্রদর্শক সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি বিদগ্ধ হৃদয়ে স্থান পেলেও সর্বসাধারণের কাছে সমাদৃত হতে পারেননি। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পূজারী প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্পে যে নিজ ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট যা অন্যান্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে তুলনা করলে স্বাতন্ত্র্যের সুর ধরা পড়ে।

ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—

"বীরবলী গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনো কিছুর প্রতিদানে নয়, কোনো নীতি প্রচার নয়,

ঘটনাবিবৃতি নয়, প্লটপ্রাধান্য নয়, বিশুদ্ধ গল্পরস-ই লেখকের অন্বিষ্ট। বাহুল্যবর্জিত, অনিবার্যগতি, বিশুদ্ধ গল্পরস ও মানবরস সমৃদ্ধ গল্প লেখায় প্রমথ চৌধুরীর তর্কাতীত সাফল্য অবশ্যস্বীকার্য।"[১২]

বাংলা ছোটগল্পের জগতে ছোটগল্পকার হিসেবে শরৎচন্দ্রের দান বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং সুগভীর মমত্ববোধ নিয়ে বাঙালি জীবনের বাস্তব ছবি তাঁর ছোটগল্পে আমরা দেখতে পাই। চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে। 'অভাগীর স্বর্গ', 'নববিধান', 'একাদশী বৈরাগী', 'মেজদিদি', 'নিষ্কৃতি', 'অনুপমার প্রেম', 'স্বামী, বিন্দুর ছেলে', 'বিলাসী', 'রামের সুমতি', 'মামলার ফল' প্রভৃতি গল্পায়তনে বড় হলেও ছোটগল্পের লক্ষণ বর্তমান। শরৎচন্দ্রের বহু বিখ্যাত মহেশ ছোটগল্পে গফুরের জীবন যন্ত্রণা মর্মস্পর্শী সন্দেহ নেই। তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিঃসঙ্কোচে গুরু পদে মেনে নিয়েছেন।

'মহেশ' গল্পটি পড়ে শ্রী অরবিন্দ বলেছিলেন "A wonderful style and a great perfect creative artist with a profound emotional power."[১৩]

অমলশঙ্কর রায় শরৎচন্দ্রের ছোটগল্প প্রসঙ্গে বলেছেন:

"শরৎচন্দ্রের গল্প ও উপন্যাসগুলি পড়লে মনে ধারণা জন্মায়, তিনি সহজাত প্রবৃত্তি ও পরিবেশ উভয়ের প্রতিই প্রাধান্য আরোপ করেন। এস্থলে পরিবেশ বলতে প্রধানত: সমাজব্যবস্থাজনিত পরিবেশকেই বুঝায়। তিনি এরূপ সমাজ কামনা করেন যাহা মানুষের নানা প্রকার চাহিদা (need) মেটাতে পারে। এদিকে থেকে বিচার করলে এরিক ফ্রেমের সঙ্গে তাঁর চিন্তার মিল লক্ষ্য করা যায়।"[১৪]

সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরী মন্তব্য করেছেন:

"শরৎচন্দ্রের গল্পে বাস্তবতার সুরটি তীক্ষ্ণ ও অসন্দিগ্ধভাবে আত্মপ্রকাশ করে; কবিত্বপূর্ণ বিশ্লেষণের অন্তরালে চাপা পড়ে না। ভাবপ্রকাশের গভীরতাতেও তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব। তাঁহার গল্পগুলিতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র সংঘাতগুলি অন্তর্বিপ্লবের বিদ্যুৎ-চমকে দীপ্ত হইয়া উঠে। তিনি কোথায়ও কেবল ঘটনা বৈচিত্র্য বা কাব্যসৌন্দর্যের জন্য কোন দৃশ্যের অবতারণা করেন না—প্রত্যেক দৃশ্যই চরিত্রের উপর আলোকপাত করে।"[১৫]

বাংলা ছোটগল্পের জগতে পরশুরাম হাস্যরসিক শিল্পী হিসেবে সুপরিচিত। পরশুরাম ওরফে রাজশেখর বসু হাসির গল্প লেখক হিসেবে বাঙালির পাঠক মনে স্থায়ী আসন অধিকার করেছেন। তাঁর গল্পগুলি উদ্দেশ্যমূলক ও সাটায়ারধর্মী হলেও গল্পগুলি পাঠক মনে নির্মল আনন্দ দেয়। 'গড্ডালিকা' (১৯২৪), 'কজ্জলী' (১৯২৮), 'হনুমানের স্বপ্ন' (১৯৩৭), 'গল্প-কল্প' (১৯৫০), 'ধুস্তরী মায়া' (১৯৫২), 'কৃষ্ণকলি' (১৯৫৩), 'নীলতারা' (১৯৫৬), 'আনন্দীবাঈ' (১৯৫৭), 'চমৎকুমারী' (১৯৫৮) ইত্যাদি গল্পে কৌতুক রস ও ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা সুস্পষ্ট। গল্প উপস্থাপন কৌশল, নাট্যরস সৃষ্টি ও সরস সংলাপে তাঁর

গল্পগুলো পাঠকদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। পরশুরাম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বহু ছোটগল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন। তবে একথা বলা যেতে পারে পরশুরামের ছোটগল্প বুদ্ধিজীবী মহলে যতটি সাড়া জাগিয়েছে সাধারণ পাঠকের কাছে ততটা সাড়া জাগাতে পারেনি। পরশুরামের গড্ডালিকা পড়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন "বইখানি চরিত্র চিত্রশালা।...তিনি মূর্তির পর মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন, এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি।"[১৬]

প্রমথনাথ বিশী পরশুরামের হাস্যরস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"তাঁর হাসির একটি প্রধান লক্ষণ এই যে ব্যক্তিবিশেষের বা গোষ্ঠীবিশেষের গায়ে এসে পড়ে সচকিত সতর্ক করে দেয়, গায়ে লেগে ব্যথা দেয় না। অর্থাৎ হাসির উদ্দেশ্য সাধিত হয় অথচ উদ্দিষ্ট ব্যক্তি পীড়িত হয় না। ...পরশুরামের দর্পণ খানা কিছু বাঁকা দর্শক নিজের বিকৃত ছায়া দেখে বুঝতে না পেরে ভাবে অপরের ছায়া, পেটভরে হেসে নেয়। সামান্য অতিরঞ্জনের আমদানি করে পরশুরাম এই কাজটি সুসিদ্ধ করেছেন।"[১৭]

ডঃ বীরেন্দ্র দত্ত পরশুরামের ছোটগল্প প্রসঙ্গে বলেছেন:

"পরশুরামের কৌতুক-ব্যঙ্গরসের গল্প প্রসঙ্গ উঠলেই পূর্বসূরী ত্রৈলোক্যনাথের কথা মনে আসে বাংলা হাসির গল্পের ধারায় যেখানে ত্রৈলোক্যনাথ, সেখানেই পরশুরামের আবির্ভাব শিষ্য একলব্যের মত পরোক্ষ গুরুমন্ত্রের লাভ ঘটে ত্রৈলোক্যনাথের কাছেই। ত্রৈলোক্যনাথ গুরু, পরশুরাম শিষ্য। ত্রৈলোক্যনাথ থেকে পরশুরাম সরে এসে সেখানে দাঁড়িয়েছেন সেখানে পরশুরামের নিজের গড়া সাম্রাজ্য, সেখানে পরশুরাম স্বরাজ্যে স্বরাট।"[১৮]

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রাজশেখর বসুর পরশুরাম ছদ্মনামে লেখা হাস্যরস প্রধান ছোটগল্পের মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন—

"চরিত্রের আচার-ব্যবহার, সংলাপ, পরিবেশ প্রভৃতি কৌতুকের সন্নিবেশে তাঁর গল্পগুলো শুধু রসিকতাপ্রিয় পাঠকের সাময়িক চিত্তবিনোদন করেই মুছে যায়নি। হাস্যকৌতুককে ক্লাসিক পর্যায়ে তুলে ধরার সমস্ত গৌরব তাঁর প্রাপ্য।"[১৯]

বাংলার ছোটগল্পের ইতিহাসে বেশ কিছু ছোট গল্পকারের আবির্ভাব ঘটেছিল কল্লোল, কালিকলম ও প্রগতি পত্রিকাকে ঘিরে। প্রচলিত বিশ্বাস ও আস্তিক্য বোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন কল্লোলের তরুণ ছোটগল্পকারগণ। বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টি হল ব্যাপক আলোড়ন। একাধারে বাস্তববাদ, ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান অবলম্বন ও নৈরাশ্যবাদের আশ্রয়ে তরুণ লেখকগোষ্ঠী পাশ্চাত্য প্রভাবকে বাংলা সাহিত্যে আমদানি করলেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র কল্লোলের লেখক হলেও একদিন কল্লোল ছেড়ে 'কালিকলম' পত্রিকায় যুক্ত থেকেছেন। তিনি তৎকালীন যুগযন্ত্রণার ছবি সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্পগুলি যথাক্রমে 'শুধু কেরানী', 'লাল তারিখ', 'ভবিষ্যতের ধার ও চুরি', 'সুখ, সংসার সীমান্ত', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'মহানগর', 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', 'রবীনসন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন', 'ময়ূরাক্ষী', 'জ্বর, ভূমিকম্প', 'স্টোভ', 'পুন্নাম', 'সাগরসঙ্গমে',

'সহস্রাধিক দুই' প্রভৃতি ছোটগল্প প্রথম শ্রেণির পর্যায়ভুক্ত। প্রেমেন্দ্র মিত্র একটি চিঠিতে লিখেছেন—

"দুঃখও দেখেছি বটে দেখেছি প্রগলভতা। মার চোখের জল দেখেছি, গলিত ও কুষ্ঠ দেখেছি, দেখেছি লোকের নিষ্ঠুরতা, অপমানিতের ভীরুতা, লালসার জঘন্য বীভৎসতা, নারীর ব্যভিচার, মানুষের হিংসা, কদাকার অহংকার, উন্মাদ বিকলাঙ্গ রুগ্ন গলিত শব। বাংলা ছোটগল্পে এই সামগ্রিক চিত্র যতটা বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে তা হয়তো অন্যান্য লেখকদের রচনায় তেমন খুঁজে পাওয়া দুস্কর। গল্পলেখার গল্প গ্রন্থে তিনি জানিয়েছেন কিছু যাদের নেই—যারা কেউ নয়, তাদের সেই শূন্য একরঙা ফ্যাকাশে জীবনের কোনো গল্প কি হতে পারে না? হোক বা না হোক, তাদের কথা লিখব বলে কাগজ কলম নিয়ে বসলাম।"[২০]

অলোকরঞ্জন দাসগুপ্তের মতে:

"প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা মুখ্যত তাঁর গল্প—তাঁর সতীর্থদের মধ্যে সবচেয়ে প্রত্যক্ষতাময়, সরল সংহত, স্বাভাবিক সঙ্গতি সচেতন।"[২১]

ডঃ রামরঞ্জন রায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প প্রসঙ্গে বলেছেন:

"বাংলা গল্পের ধারায় রবীন্দ্রনাথের পরই সার্থক ছোটগল্পকার হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রই উল্লেখের দাবি রাখেন। তাঁর গল্পের বিভিন্ন রূপ যেমন বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি নির্মাণ শিল্পও। কবি যখন গল্প লেখেন তখন গল্পের পরতে কাব্য সুষমা ধরা পড়ে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে সেই কাব্য সুষমা অটুট আছে। আবার তাঁর গল্পে যেমন সমসাময়িক কালের চিত্র আছে, তেমনি আছে চিরন্তনতা।"[২২]

কল্লোল গোষ্ঠীর আর এক পুরোধা অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্প ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল। নাগরিক সভ্যতার দিনলিপি থেকে শুরু করে হাড়ি, মুচি, জেলে, ডোম, গরিব চাষা, অর্থাৎ সমাজে উপেক্ষিত জনজীবনের চিত্র তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে। বিশেষভাবে যুদ্ধ, দাঙ্গা, বন্যা ও মন্বন্তর কবলিত জীবনের কথা তাঁর ছোটগল্পের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'যতন বিবি', 'হাড়ি মুচি ডোম', 'ওষুধ', 'কেরামত', 'ডাকাত', 'কেরোসিন', 'কালো রক্ত', 'দস্তখৎ', 'নূরবানু', 'সারেঙ', 'চিতা', 'কাক', 'বস্ত্র', 'তাল' প্রভৃতি গল্পে মানুষের হৃদয়ের টুকরো টুকরো মুহূর্তকে নিয়ে বানিয়েছেন ছোটগল্পের রাজপ্রাসাদ। অসংখ্য বৈচিত্র্য নিয়ে অচিন্ত্যকুমার ছোটগল্পের আসর জমিয়েছেন। সমাজজীবনের চিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর গল্পে কাব্যধর্মিতা ও অন্তর্মুখী মনের পরিচয় আছে।

কল্লোল গোষ্ঠীর আর এক দিক্‌পাল বুদ্ধদেব বসুর নাম বিশেষভাবে স্মরণ যোগ্য। মূলত তাঁর ছোটগল্পে আমরা খুঁজে পাই রোম্যান্টিকতার সুর। নরনারীর আশা ভালোবাসা তাদের সৌন্দর্যবোধ কাব্যিক চেতনা স্মৃতির সুরভি নিয়ে কিংবা মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে ভরপুর। বুদ্ধদেবের গল্পে নাগরিক সভ্যতার জীবনছন্দ ধ্বনিত হয়েছে। বিশেষ করে তাঁর প্রিয় শহর ঢাকা নগরী ও কলকাতা নগরীর স্মৃতিকথা বাল্য কৈশোর ও যৌবনের মধুমাখা স্মৃতি নিয়ে বারবার দেখা দিয়েছে এবং দুটি কল্লোলিনী শহরের প্রকৃতিপ্রেম নরনারীর প্রেমের অনুষঙ্গে

স্থাপিত হয়েছে। একদিকে ঢাকার সূর্যোদয় কলকাতার মেঘ ও রৌদ্রের খেলায় গাছগাছালির বর্ণনায় গল্পগুলি অন্যমাত্রা এনে দিতে পেরেছে। প্রেমের জন্য নারী পুরুষের সংকীর্ণতা ব্যর্থতা, ঈর্ষা, ক্ষতি, প্রতারণা ও পরশ্রীকাতরতাও তাঁর কলমে উঠে এসেছে। তাঁর বিখ্যাত গল্পসংকলনগুলি যথাক্রমে 'এরা আর ওরা', 'শনিবারের বিকেল', 'একটি কি দুটি পাখি', 'একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু', 'হৃদয়ের জাগরণ', 'খাতার শেষ পাতা', 'রেখাচিত্র', 'অভিনয় অভিনয় নয়', 'রঙিন কাঁচ', 'অদৃশ্য শত্রু', 'ঘুমপাড়ানি', 'প্রেমের বিচিত্র গতি', 'অসামান্য মেয়ে', 'নতুন নেশা', 'প্রথম ও শেষ', 'তুমি কেমন আছ', 'আদর্শ', 'আবছা', 'একটি লাল গোলাপ' প্রভৃতি গল্পসংকলনে একদিকে কবিত্বময় বর্ণনা, নাটকীয়তা ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিক সার্থক ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

বাংলা ছোটগল্পের আধুনিকতার সুর নিয়ে উপস্থিত হলেন জগদীশ গুপ্ত। ছোটগল্পে তিনি ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারা ও বিকৃত মনস্তত্ত্বকে স্থান দিয়েছেন। তিনি মূলত ন্যাচারালিজমের শিল্পী। জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তৎকালীন সামাজিক পরিমন্ডল ও বৈষম্য মূলক অর্থনীতির প্রভাবে কি করে মানুষের মূল্যবোধ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় তার পরিচয় আছে জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্পে। তাঁর মতে মানুষের জীবনের ব্যর্থতার পিছনে এক অদৃশ্য হাত প্রতিনিয়ত কাজ করছে। তাঁর ছোটগল্পে ভাগ্যহীন মানুষের ব্যর্থতা, হতাশা, বেদনা ও অসহায়ত্ব প্রাধান্য পেয়েছে। জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্পে অদৃশ্য নিয়তি চালিত ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের পুরোনো কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মানবজীবনের আলো আঁধার, সুন্দর ও কুৎসিত রূপের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টিবলে অন্ধকার ও কুৎসিতরূপকেই তিনি বড় করে দেখেছেন। তিনি তাঁর ছোটগল্পে নৈরাশ্যপীড়িত মানুষের জীবনে কোনো আলোকবর্তিকার পথ নির্দেশ দিয়ে যাননি। তাঁর গল্পগুলোতে নেই প্রেমের স্নিগ্ধ-মধুর রূপ, নেই সমাজ জীবনের উত্তরণের পথ নির্দেশ, আছে কামনা বাসনা যুক্ত যৌন জীবনের ইতিকথা। নিম্ন মধ্যবিত্ত, গরিব ও নীচুতলার মানুষদের নিয়ে ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের আলোকে যে গল্পগুলো লিখেছেন তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে কল্লোলযুগের লেখকদের আবির্ভাব। জগদীশ গুপ্তের উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলো হল 'বিনোদিনী' (১৩৩৪), 'রূপের বাহিরে' (১৩৩৬), 'শ্রীমতী' (১৩৩৭) 'উদয় লেখা' (১৩৩৯), 'রতি ও বিরতি' (১৩৪১), 'উপায়ন' (১৩৪১), 'মেঘবৃত অশনি' (১৩৫৪) ইত্যাদি। তাঁর ছোটগল্পে নরনারীর যৌন আকর্ষণ অপরাধবোধ, লোভ লালসা ঘৃণা ঈর্ষা মিশ্রিত চরিত্রগুলো সজীবতা দান করেছে। নারী মনস্তত্ত্ব নিয়ে তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। জগদীশ গুপ্ত নিজেই এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন মানুষের প্রেমের ট্র্যাজেডি মৃত্যুতে নয়, বিরহে নয়, অবসাদে ও ক্ষুদ্রতার পরিচয়ে, আর উদাসীনতায়।

জগদীশ গুপ্তের পরিণত বয়সের ছোট গল্পগুলোতে কামতত্ত্বের অনুবর্তন ঘটেনি। তাঁর ছোটগল্পের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ জগদীশ গুপ্তকে এক চিঠিতে লিখেছেন "ছোটগল্পের বিশেষ রূপ ও রস তোমার লেখায় পরিস্ফুট দেখিয়া সুখী হইলাম।"২৩

সমকালের পাঠক সমাজে তাঁর ছোটগল্প মদের জ্বালাকর নেশার মত পান করলেও জনপ্রিয় ছোটগল্পকার হিসেবে তিনি পরিচিত হতে পারেননি। তীব্র জীবানানুভবে ভয়ঙ্করকে সংবেদনশীল করে তোলার শিল্পী সুলভ মানসিকতার অভাব তাঁর ছিল। তবুও কুটৈষণা ও অন্তর্গূঢ় জটিল পথ পরিক্রমায় তিনি যেভাবে মানব জীবনের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন ও রূপদান করেছেন তাঁর সাহিত্যমূল্য উপেক্ষণীয় নয়।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পকার হিসেবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একটি স্মরণীয় নাম। কল্লোলযুগের ধর্ম থেকে সরে এসে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন স্রোতের সাহিত্য স্রষ্টা হিসেবে তাঁর পরিচয়। রাঢ় বঙ্গের রূপকার তারাশঙ্কর তাঁর ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যে জীবন রস তাঁর ছোটগল্পে আমদানি করেছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনবত্বের দাবি রাখে। দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল জীবনে তিনি বৈচিত্র্যময় পঁয়ত্রিশটি গল্পগ্রন্থ আমাদের উপহার দিয়েছেন। মূলত তাঁর ছোটগল্পে রাঢ়বঙ্গের মাটি ও মানুষের কথা সেই সঙ্গে নিয়তির অমোঘ লীলা ও মানব প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দিয়ে সেখান থেকে সত্য সুন্দরকে তিনি বেছে নিয়েছেন। 'ছলনাময়ী', 'পাষাণপুরী', 'নীলকণ্ঠ', 'জলসাঘর', 'রসকলি', 'তিন শূন্য', 'প্রতিধ্বনি', 'বেদেনী', 'দিল্লী কা লাড্ডু', 'মাটি' ও 'রামধনু' প্রভৃতি তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি সাহিত্য রস সমৃদ্ধ।

তাঁর বৈষ্ণব রসাশ্রিত ' মালাচন্দন', 'স্থলপদ্ম', 'হারানো সুর' ও 'রসকলি' ছোটগল্পে জীবনাশক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সন্ধ্যামণি ছোটগল্পে তিনি পিতৃহৃদয়ে বেদনা প্রাধান্য দিয়েছেন।

প্রাচীন ও আধুনিক যুগের দ্বন্দ্বকে তিনি তুলে ধরেছেন 'রাজা, রাণী ও প্রজা', 'সমুদ্র মন্থন', 'জলসাঘর' ও 'রায় বাড়ী' ছোট গল্পগুলিতে, বিলীয়মান জমিদারি প্রথার পরাজয়কে নিপুণ বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে ও নাট্যগুণ সৃষ্টি করে অখন্ড শিল্পরূপের পরিচয় দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ্য সমাজের অন্তঃসারশূন্যতাকে তুলে ধরেছেন নিপুণ লেখনীর মাধ্যমে। 'অগ্রদানী', 'কুলীনের মেয়ে', 'পুরোহিত', 'পুত্রেষ্টি', 'রঙীন চশমা', 'মধু মাস্টার' প্রভৃতি ছোটগল্প এই ধারার শ্রেষ্ঠ ফসল। 'তারিণী মাঝি' গল্পটি তারাশঙ্করের অনবদ্য সৃষ্টি। নারী ও নাগিনী, বেদিনী ছোটগল্পে আদিম জীবনের কথা স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়কাল থেকে মন্বন্তর ও আগস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লিখিত তাঁর ছোটগল্প 'মরামাটি', 'আখেরী', 'বোবাকান্না', 'পৌষলক্ষ্মী', 'শর্বরী' গল্পগুলো উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর বিখ্যাত 'ডাইনী' গল্পে গ্রাম্য কুসংস্কার কিভাবে ব্যক্তি জীবনের মর্মান্তিক পরিণতি বহন করে সেই ঘটনা প্রাধান্য পেয়েছে। পাশবিকতার সঙ্গে মানবিক প্রকৃতির জয় ঘোষিত হয়েছে তার 'তিনশূন্য', 'সন্তান', 'তমসা' ছোটগল্পে। তারাশঙ্করের মানবেতর চরিত্র নিয়ে সার্থক ছোটগল্প 'কামধেনু', 'কালাপাহাড়', ' গোবিন্দ সিং এর ঘোড়া' বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এছাড়া প্রেমের গল্প ও অতিলৌকিক গল্প রচনাতেও তারাশঙ্কর শিল্পসিদ্ধির স্তরে পৌঁছেছেন। তাঁর বিখ্যাত প্রেমের গল্প 'দীপার প্রেম' বিশেষ রসসমৃদ্ধ।

বিষয় বৈচিত্র্যে, প্লট নির্মাণে, গল্পের পরিণতি ও চরম মুহূর্ত সৃষ্টিতে ও সেই সঙ্গে

নাট্যগুণ, প্রকৃতি চিত্রণ, চরিত্র চিত্রণ ও সংলাপ নৈপুণ্যে ও মানবিক আবেদনে তারাশঙ্করের ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ।

প্রমথনাথ বিশীর সমকালীন ছোটগল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে একজন শক্তিমান লেখক। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁকে 'কল্লোলের কুলবর্ধন' আখ্যা দিয়েছেন। কল্লোল কালের আদর্শ তাঁর ছোটগল্পে প্রতিফলিত হলেও মূলত তিনি আপন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। অভিজ্ঞতার শিল্পী মানিক বন্দোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তর জীবন কথা বাস্তব সচেতন ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। মূলত তিনি আপন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মতো জীবন অন্বেষণ করেছেন। কল্লোলের ভাবোচ্ছ্বাস, আবেগ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেনি। তাঁর ছোটগল্পে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে ও যৌনতার চিত্র আছে। মার্কসবাদে বিশ্বাসী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। তাঁর প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর ছোটগল্পগুলি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা প্রধান ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত সমাজের ভন্ডামি, হিংস্রতা, ছলনা, স্বার্থপরতা ছোটগল্পে বিশ্লেষিত হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রধান 'ভূমিকম্প', 'টিকটিকি', 'ফাঁসি', 'বিপত্নীক', 'মহাকালের জটারজট' ছোটগল্পে। মানবমনের জটিল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির ছদ্মবেশী রূপকে তিনি নির্মমভাবে আঘাতে করে তাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন, 'সিঁড়ি', 'বৃহত্তর ও মহত্তর', 'সরীসৃপ', 'আততায়ী, সমুদ্রের স্বাদ' প্রভৃতি ছোটগল্পে তাঁর পরিচয় মেলে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের পালাবদলের ইঙ্গিত আছে। 'তাকে ঘুষ দিতে হয়', 'নমুনা', 'দুঃশাসনীয়', 'আপদ', 'রাসের মেলা', 'ছিনিয়ে খায়নি কেন', 'সাড়ে সাতশের চাল' প্রভৃতি ছোটগল্পে দাঙ্গা, মন্বন্তর ও বন্টন ব্যবস্থার বৈষম্য উপস্থাপিত হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ সচেতন ও বস্তুবাদ নির্ভর সার্থক ছোটগল্প হারানের 'নাত জামাই', 'ছেলেমানুষী', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', 'ফেরিওয়ালা', 'একটি বখাটে ছেলের কাহিনী' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

নির্মোহ আসক্তিহীন বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল বিশেষ আস্থা, নীচুতলার মানুষদের নিয়ে তিনি অসংখ্য গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্পে চরিত্র, কাহিনি, উপস্থাপন কৌশল, বর্ণনাভঙ্গি, সংলাপ, ভাষা, গল্পের পরিণাম ও লেখকের জীবন দর্শন সার্থক ভাবে উপস্থাপন করেছেন যা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প প্রসঙ্গে লিখেছেন:

"বস্তুত, তাঁর গল্পের সুদীর্ঘ বহমান ধারায় চিরদিনই বিভিন্ন প্রবণতার মেলবন্ধন ঘটেছে। তাই দেখি তাঁর প্রথম পর্বের গল্পে, যখন নরনারীর অবচেতনার জটিল মনস্তত্ত্বের ছবিই মুখ্য, সেই পর্বের বিভিন্ন গল্পেও অর্থনৈতিক দুর্গতি ও প্রতিবাদী মনোভাবের ছবি পাশাপাশি ফুটেছে। অন্যদিকে; শেষ পর্যায়ের অর্থাৎ যুদ্ধোত্তর কালের গল্পে লেখকের অর্থনৈতিক ও শ্রেণিসংগ্রামমূলক চেতনার প্রকাশ মুখ্য হলেও; নরনারীর মনস্তত্ত্বের জটিল রূপও সেখানে কোথাও কোথাও তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। লেখকের সুদীর্ঘ গল্পপ্রবাহে

জীবন দৃষ্টির এই মিশ্র প্রতিফলন সত্ত্বেও তাঁর সমগ্র গল্পসম্ভারকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া প্রয়োজন আমাদের সমীক্ষার সুবিধার জন্য। এই বিভাজন একান্তভাবে কালক্রমিক নয়, এটি মুখ্যত লেখকের বক্তব্য বা প্রবণতার মাপকাঠি অনুসারে। মানিকের গল্পধারায় যতই বিভিন্ন প্রবণতার মিশ্রণ বা পাশাপাশি অবস্থান ঘটুক, আপেক্ষিক প্রাধান্য বা গুরুত্বের বিচারে তাঁর গল্পসাহিত্যের নানান ধারাকে কয়েকটি প্রধান ভাগে বিন্যস্ত করা চলে। আমাদের বিশ্বাস, মানিকের জীবন দৃষ্টির রূপান্তরের, তাঁর অন্তর্লোকের বিবর্তনের ছবিটিও ক্রমে উন্মোচিত হবে—

১) 'মধ্যবিত্ত নরনারীর জটিল মনস্তত্ত্ব'

২) 'নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী নরনারীর অর্থনৈতিক দুঃখ, দুর্গতি ও এর বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ প্রয়াস।'

৩) 'মধ্যবিত্ত নরনারীর আর্থিক সংকট ও শ্রমজীবী মানুষের স্তরে তাদের ক্রম অবতরণ।'[২৪]

খ) আশিসকুমার-দের মতেঃ

"চল্লিশ দশকেব বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনা করতে গেলে তীক্ষ্ণ সংহত গল্পগুলিকে কোনভাবে বর্জন করা যায় না, বক্তব্যের কর্কশতা ছাড়িয়ে তারা নতুন কালের মহাকাব্য রচনা করেছে। বাংলা ছোটগল্পের গোত্রান্তর, মানিকের শিল্পসৃষ্টির নবজন্ম সূচিত হয়েছে।"[২৫]

রবীন্দ্র ও শরৎ উত্তর বাংলা ছোটগল্পের কৃতী শিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়— জীবনরসিক শিল্পী ও পল্লী গার্হস্থ্য জীবনের রূপকার। মানবতাবাদী এই লেখককে রোমান্টিক ও নিসর্গরসিক শিল্পী বলে সমালোচকগণ আখ্যা দিলেও তিনি যে আধুনিক ও সমগ্র জীবন শিল্পী একথা আমাদের স্বীকার করতে বাধা নেই। জীতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র' গ্রন্থের ভূকিায় লিখেছেন ঃ

"তিনি বিশ্বাস করতেন যে আধ্যাত্মিক জীবন, মানবজীবন ও প্রকৃতিজীবন এই ত্রিবিধ জীবনের সমন্বয়ের ফলেই জীবনের সমগ্রতা রূপ রস সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ঈশ্বর, মানুষ ও প্রকৃতি ওই ত্রিতত্ত্ব সমন্বিত চেতনাকেই তিনি পূর্ণাঙ্গ জীবন চেতনা বলে মনে করতেন।"[২৬]

"বিভূতিভূষণ ২২৪ টি ছোটগল্পের স্রষ্টা। তন্মধ্যে তাঁর দেড়শ'র বেশী সার্থক রসোত্তীর্ণ ছোটগল্প। ১৯ টি গল্পগ্রন্থে স্থান পেয়েছে তাঁর গল্পসম্ভার। তাঁর প্রথম লেখা 'উপেক্ষিত' ছোটগল্পটি প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশের পর পাঠকমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন ঃ "বিভূতিভূষণের ছোটগল্পগুলি এমন শান্ত সহজ সুরে বাঁধা যে তাদের শ্রেণীবিন্যাস করবার কোন বিশেষ প্রয়োজন ঘটে না।"[২৭]

তবুও তাঁর গল্পগুলি খুঁটিয়ে পড়লে পাওয়া যায় প্রকৃতি বিষয়ক, অতিপ্রাকৃত, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, আধ্যাত্মিক, স্নেহ মমতা আশ্রিত, মৃত্যু চেতনা ও হাসির গল্প ও স্বপ্ন কল্পনা শ্রেণির ছোটগল্প। 'কুশলপাহাড়ী', 'আচার্য কৃপালিনী কলোনী' ও 'অসাধারণ' গল্পত্রয়ে

প্রকৃতি চেতনার সঙ্গে দার্শনিক চেতনা যুক্ত হয়েছে। তাঁর 'কনে দেখা' গল্পটিও প্রকৃতি প্রেমের অনবদ্য নিদর্শন।

মমতাময় পৃথিবীকে ভালবেসে তিনি মমতার স্পর্শ অনুভব করেছেন 'মেঘমল্লার', 'দ্রবময়ীর কাশীবাস', 'বিপদ', 'পুঁইমাচা', 'মৌরীফুল' প্রভৃতি ছোটগল্পে।

বিভূতিভূষণের 'তারকনাথ তান্ত্রিকের গল্প', 'নুটি মাস্তার', 'অভিশপ্ত', 'নাস্তিক', 'বউচন্ডীর মাঠ', 'আরক', 'হাসি', 'খুঁটি দেবতা', 'পেয়ালা', 'মেডেল', 'মশলাভূত', 'গঙ্গাধরের বিপদ', 'পৈত্রিক ভিটা' ও 'অভিশাপ' প্রভৃতি অতিপ্রাকৃতের আবহসমৃদ্ধ রসোত্তীর্ণ ছোটগল্প।

তাঁর সকৌতুক শ্রেণির গল্পে প্রসন্ন তৃপ্তি খুঁজে পাওয়া যায়। 'উইলের খেয়াল', 'বৈদ্যনাথ, লেখক', 'জনসভা', 'পাঁচুমামার বিয়ে', 'ঠাকুরদার গল্প', 'একটি ভ্রমণ কাহিনী', 'আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা', 'বাক্সবদল', 'হারুন অল রসিদের বিপদ', 'জহরলাল ও গড' প্রভৃতি কৌতুকের প্রসন্নধারার অন্তর্ভূক্ত রসোত্তীর্ণ ছোটগল্প।

কাহিনী ভিত্তিক ও চরিত্র নির্ভর অজস্র গল্প তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। কাহিনীর পরিবেশন নৈপুণ্যে ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য উপস্থাপনে তাঁর মুন্সিয়ানার পরিচয় আছে। বৃহৎ বিশ্বের ছবি অঙ্কিত হয়ে আছে তাঁর 'খুকীর কান্ড', 'ঠেলাগাড়ী', 'উমারাণী', 'মৌরীফুল', 'রোমান্স', 'দাতার স্বর্গ', 'মরীচিকা', 'ভন্ডুলমামার বাড়ী', 'বাইশ বছর', 'যাত্রাবদল', 'জন্ম ও মৃত্যু', 'সই', 'বড়বাবুর বাহাদুরি', 'মণি ডাক্তার', 'পুরানো কথা', 'ডাইনী', 'বিধু মাস্টার', 'মাস্টার মশায়', 'বাঁশি', 'শান্তিরাম', 'কৃষ্ণলাল', 'সুহাসিনী মাসিমা' প্রভৃতি ছোটগল্পে। মানুষের মর্মবেদনা তিনি সার্থক ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এই গল্পগুলোতে।

শুকদেব চট্টোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন:

"বিভূতিভূষণের বহু গল্পের কাহিনী কাঠামো আলাদা আলাদা হলেও গল্পের সূচনা, মধ্য অংশ এবং পরিণতি বা সমাপ্তির মধ্যে একটি প্রকৃতিগত মিল বা সাদৃশ্য নজরে পড়ে। তিনি কাহিনীটি শুনেছেন এবং নিজে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন—এই আটপৌরে আঙ্গিকটি ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়। গল্পে ব্যক্তির বিশেষ উপলব্ধি বা অভিজ্ঞতা—যা হয়ত ঘটেছিল কোনো অতীতে, মধ্যজীবনের কোনো এক মুহূর্তে। তারপর ঘটনাস্থলে পরিণত বয়সে পৌঁছে জীবন অভিজ্ঞতায় তাঁর চেতনা সহসা উদ্ভাসিত হয়েছে নতুন এক তাৎপর্য ও সত্যের উপলব্ধিতে।"[২৮]

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী'র মতে বিভূতিভূষণের প্রসাধনহীন ভাষা শিল্প সমৃদ্ধির পরিচায়ক। সংবেদনশীল শিল্পসৃষ্টির পরিচয়ে বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

পরিশেষে বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

"বিভূতিভূষণের সমকক্ষ অথবা তাঁর চেয়েও নিপুণতর গদ্যশিল্পী হয়তো বাংলা সাহিত্যে আরও দুই একজন ইতিমধ্যেই আবির্ভূত হয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও হবেন, কিন্তু তাঁর পরিণত বয়সে রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়ের গল্পগুলিতে তিনি যে জাতীয় রসসমৃদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন ঠিক

সেই শ্রেণীর রসসৃষ্টি আর কেউ কখনও করেছেন বলে আমার জানা নেই এবং অদূর ভবিষ্যতে করতে পারবেন এমন আশাও পোষণ করি না। —অর্থাৎ গঠন পারিপাট্য, ঘটনা বিন্যাস কৌশল, রচনা নৈপুণ্যে, বর্ণনার বর্ণাঢ্যতা প্রভৃতি বহিরঙ্গঘটিত উৎকর্ষ তাঁর গল্পে যতখানি আছে অন্যান্য গল্পকারের রচনাতেও ততখানি আছে, তার চেয়েও বেশী থাকাও অসম্ভব নয়; কিন্তু রূপ সৃষ্টিতে এবং জীবন রস পরিবেশনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীহীন, অনন্য। Draftsman হিসাবে, এমনকি বিশুদ্ধ artist হিসাবে অনেক বেশী বড়—রসের রাজ্যের অধিকর্তা হিসাবে তিনি অতুলনীয়, Unique."[২৯]

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী বাংলা ছোটগল্পের অদ্বিতীয় হাস্যরস স্রষ্টা হিসেবে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের পরিচয়। সাহিত্যের হাটে ছোটগল্পের পসরা নিয়ে তার আবির্ভাব। তাঁর প্রথম গল্প 'অবিচার' প্রবাসী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে। বিচিত্রা ও প্রবাসী পত্রিকাতেও তিনি লিখেছেন হাস্যরসপ্রধান ছোটগল্প।

বিভূতিভূষণের প্রথম দিকের রচিত ছোটগল্পগুলিতে স্বল্প শিক্ষিত কিশোরী বধূ, দাম্পত্য প্রেম, বিবাহ বাসনা, অসম প্রেম, শিশু মনস্তত্ত্ব, অতিলৌকিক ও বিচিত্র চরিত্র প্রধান উপজীব্য বিষয়। 'রাণুর প্রথম ভাগ', 'শ্যামল বরণী', 'জালিয়াত' গল্পে কিশোরী বধূর রমণীয় কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। তাঁর দাম্পত্য প্রেমের গল্প 'গজভুক্ত', 'হারজিত', 'বিপন্ন', 'নবোঢ়ার পত্র', 'কলতলার কাব্য', 'অকালবোধন', 'পৃথ্বীরাজ', 'খাঁটির মর্যাদা', বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। বিবাহ বাসনা তাঁর যেসব গল্পে উপজীব্য হয়েছে সেগুলি যথাক্রমে বিয়ের ফুল, নোংরা, বরযাত্রী, স্বয়ংবরা প্রভৃতি। তাঁর অসম প্রেমের গল্প আশা, প্রশ্ন, তাপস ও বর্ষা প্রভৃতি। তাঁর বাদল, ননীচোরা ও দাঁতের আলো প্রভৃতি গল্প শিশু সাহিত্যের উপযোগী অলৌকিক জগৎ নিয়ে লেখা। মানুষের নানা চরিত্রগত অসঙ্গতিমূলক ছোটগল্প রংলাল, ভূমিকম্প, একরাত্রি, নির্বাসিত, শোকসংবাদ, দ্রব্যগুণ প্রভৃতি ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—

"গল্পগুলি প্রধানত হাস্যরসমূলক হলেও হাস্যরসিকের লঘু দৃষ্টিভঙ্গির অন্তরালে যে কবি সুলভ সৌন্দর্য্যবোধ ও দার্শনিকের সূক্ষ্মদর্শিতা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। কাজেই বিভূতিভূষণের স্থান কেবল হাস্যরসিকদের মধ্যে নহে। তাঁহার রচনার কাব্যধর্মের উৎকর্ষ ও তীক্ষ্ণ চিন্তাশীলতা ছোটগল্পের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে তাঁহার স্থান নির্দেশ করিয়াছে।"[৩০]

হিউমার, উইট ও স্যাটায়ার থাকলেও বিভূতিভূষণ ছিলেন রোমান্টিক হৃদয়বৃত্তির অনুসারী। তাঁর সিরিয়াস গল্প হৈমন্তী রসোত্তীর্ণ সন্দেহ নেই। তাঁর হাসির গল্প সংকলনের সংখ্যা ৩৮ টি।

অলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন:—

"সরসতার মাধুর্যময় প্রকাশ ঘটেছে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের লেখায়।"[৩১]

মঞ্জুলী ঘোষের মতে:

"নির্মল হাস্যরস রচনায় তিনি অদ্বিতীয় সন্দেহ নেই কিন্তু লেখক হিসেবে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় আরও অনেক বড়। তিনি একজন অসাধারণ ভাষাশিল্পী। এমন সাহিত্য গুণান্বিত ভাষা তাঁর সমসাময়িক অনেকের ছিল না। হাসির গল্প ও রোমান্টিক গল্প অনেক লিখেছেন। বিহার প্রবাসী বেশ কয়েকজন লেখকই বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সম্ভবত তাঁদের মধ্যে শেষ লেখক। গত শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি সর্বদাই সমসাময়িক লেখক ছিলেন। নব্বই বছর পার হয়েও তিনি আধুনিক থাকতে পেরেছিলেন।"[৩২]

ভূদেব চৌধুরীর মতে:

"বিশ শতকের ক্লান্ত পথে বিভূতিভূষণ হলেন হারিয়ে যাওয়া পুরাতন কালের পরিবারে রসস্নিগ্ধতার শিল্পী। তাঁর সকল গল্পের মধ্যে যেমন ব্যক্তিক স্পর্শের অনুভব রয়েছে, তেমনি মনে হয় প্রতিটি গল্পের নায়ক-নায়িকা স্রষ্টার অভিভাবকসুলভ স্নিগ্ধ অবধানের তলায় এক ঘরোয়া মধুর পরিবেশে পরিক্রমা করে ফিরছে—যেখানে বিশ্বসমুদ্রের কল্লোল, বিশ্ব হাটের কোলাহল স্নিগ্ধ রোমান্টিকতার স্বপ্নভাবনাকে বারে বারে ছিন্নভিন্ন করে দেয় না। সেই রোমান্টিকতার মধ্যেও আছে বিশ শতকের মধ্যভূমিতে বসে উনিশ শতকের স্নিগ্ধ প্রচ্ছায়াতলে বেড়িয়ে আসতে পারার এক তৃপ্তি সুরভিত অনুভব।"[৩৩]

বাংলার ছোটগল্পের জগতে বিচিত্র স্বাদের গল্প লিখলেন কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুলের ব্যথার দান, রিক্তের বেদন গল্প গ্রন্থের গল্পগুলোতে শৈলী বিন্যাস ও বিষয় বিন্যাসের দিক থেকে অভিনবত্বের দাবি না করলেও এক অদ্ভুত অভিব্যক্তির পরিচয় ফুটে উঠেছে। ব্যথার দান গল্পগ্রন্থে রবীন্দ্রপ্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে দুঃখ দহন মিশ্রিত অভিজ্ঞতাকে নিয়ে যে শতদল তিনি তুলে এনেছেন তা দিয়ে গেঁথেছেন পুষ্পমাল্য। তাই তো তাঁর লেখনীতে উদ্ভাসিত হয়েছে রক্ত বৃন্তের মাঝে আনন্দের শ্বেতকমল। পদ্ম ক্ষণকালের জন্য প্রস্ফুটিত হয় ঠিকই কিন্তু তাঁর রক্তিম আভা মানব মনে স্থান পরিগ্রহ করে চিরদিনের জন্য। দুঃখ যন্ত্রণার মাঝখানে আনন্দ এক চিরন্তন সম্পদ হিসেবে গণ্য। নিরানন্দময় জীবনে যখন আনন্দধ্বনী ভরিয়ে দেয় তার এক শুভ প্রয়াস ব্যথার দান গল্পগ্রন্থের মূল উপজীব্য হয়ে উঠেছে। রাজবন্দীর চিঠি গল্পটি জেলখানার রাজবন্দীদের জীবন শূন্যতাকে স্থান দিয়েছেন। চরিত্র চিত্রণে, সৌন্দর্যায়নে, প্রেমের শুভ্রতায় ও কাহিনী বিন্যাসে নজরুলের ছোটগল্পগুলো পাঠক মনে বিশেষ স্থান পেয়েছে। নজরুলের লেখা গল্পে আছে ন্যারেটিভ ছাঁচে ধরা কবি স্বপ্নের প্রতিফলন।

জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্পে ঘটেছে কবি চেতনার বহিঃপ্রকাশ। জীবনানন্দের ছোটগল্পে মিথুন সমীক্ষণের সন্ধান মেলে। চেতনা প্রবাহ তাঁর গল্পের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। জীবন অভিজ্ঞতার চাপে ব্যক্তি জীবনের বিবর্তন তাঁর ছোটগল্পের চরিত্রে পরিস্ফুট। দু'চোখ ভরে সমকালীন জীবনের প্রতিবিম্ব তাঁর ছোটগল্পের মূল আধার। তাঁর গল্পের ভাষা এবং বিন্যাসরীতি সাংকেতিকতাযুক্ত। 'ছায়ানট' জীবনানন্দের প্রথম গল্প। একজন কবি যখন ছোটগল্প লেখেন তখন তাঁর লেখায় গীতিকবিতার সুর প্রতিধ্বনিত হয়। তাঁর গল্পের

আবেদন ইন্দ্রিয় গোচর জীবন বোধ নিয়ে। অতিবাস্তব চেতনায় অনুভবের বৃন্তে দোলায়িত হয় অসীম অনন্ত নীলাকাশে উজ্জ্বল আলোক বিন্দু। আত্মকথার ভঙ্গিতে লেখা দু'চারটি চরিত্র নিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন আলোচ্য গল্পটি। তাঁর গল্পের শেষে প্রতীকি ব্যঞ্জনা ঝংকৃত হয়েছে। গ্রাম ও শহরের ছোট গল্পটি জীবনানন্দের অনবদ্য সৃষ্টি যে গল্পে ব্যক্তির সীমানা থেকে সমাজ পরিধিতে উন্নীত হয়েছে। গল্পটিতে প্রাকৃতিক পরিবেশ ল্যান্ডস্কেপের মতো উঠে এসেছে। জীবনানন্দের বিলাস গল্পটিতে বিষয়বস্তু, নামকরণ ও শব্দ বিন্যাসে কবিতার মতো প্রতীকধর্মী। গল্পের আঙ্গিকে কবিতার খন্ডিত রূপ স্থান পেয়েছে। মূলত জীবনানন্দের ছোটগল্পে মন্ময়ভাব কল্পনার প্রতিফলন ঘটেছে। সেদিক থেকে স্বতন্ত্র ছোটগল্পকার হিসেবে তাঁর অন্যতম পরিচয়।

সুব্রত রুদ্র জীবনানন্দের ছোটগল্প প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"জীবনানন্দের সব গল্পেই দাম্পত্য জীবনের নিষ্ফল ব্যর্থতা কোথাও উগ্রভাবে, আবার কোথাও উদাসীন ও নির্মমভাবে বর্ণনা করতে হয়েছে এবং প্রায় প্রতিটি গল্পেই নারী চরিত্রগুলি জেদী-অহঙ্কারী-অনমনীয় এবং সামাজিক সম্পর্কে বিচিত্রভাবে উদাসীন ও আত্মকেন্দ্রিক। গল্পগুলির মধ্যে পরিবেশ রচনায় কোথাও কোথাও কবিত্বের ছোঁয়া আছে, বিশেষ করে প্রকৃতির খুঁটিনাটি বিবরণের চিত্র—মনোযোগী পাঠককে বিভূতিভূষণের কথা মনে পড়াবে।"[৩৪]

শ্রীভূদেব চৌধুরীর মতে:

"জীবনানন্দের গল্পগুচ্ছ কবির লেখা গল্প হয়েও গল্প-কলার স্বতন্ত্র দাবিতে বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এক অনন্য সংযোজন।"[৩৫]

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের ছোটগল্প অস্বাভাবিক মনোবিকারের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, যা ফ্রয়েডীয় যৌন তত্ত্বের প্রতিফলন। যৌন চেতনার অশ্লীল দিকটি তাঁর গল্পে উপস্থিত। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের ছোটগল্পে নরনারীর এক দুর্নিবার যৌনকামনা এমন নগ্নভাবে চিত্রিত হয়েছে যা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। নিষিদ্ধ কামনার এক বিকৃত দিক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যে উপস্থিত হয়েছে। ঠানদিদি ছোটগল্পটি উগ্র যৌনচেতনা যুক্ত গল্পের পর্যায়ভুক্ত। ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারার আলোকে আর একজন ছোটগল্পকারের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে তিনি হলেন যুবনাশ্ব। মূলত তিনি অশ্লীল বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁর গল্পগুলো সাজিয়েছেন। চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিক বিশ্লেষণে তিনি সিদ্ধহস্ত। বিশেষ করে সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবনচিত্র তিনি অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী' গ্রন্থের বিষয়বস্তু নিষিদ্ধ প্রেম, কামনা বাসনা তাড়িত মানুষের ইতিকথা অসঙ্কোচে লিখে তিনি তাঁর গল্পের ভান্ডারকে ভরিয়ে তুলেছেন।

গল্প ও উপন্যাস দুটি শাখাতে বনফুল ছিলেন সার্থক শিল্পী। তাঁর ছোটগল্পের সৃষ্টিসম্ভার ছিল বিপুল। বনফুলের ছোটগল্পগুলি বিষয় বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক প্রকরণগত অভিনবত্বের জন্য পাঠক সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। প্রখর অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে তিনি জীবনের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ ও জীবনসত্যের উপলব্ধি করেছেন ছোটগল্পের মাধ্যমে।

'বনফুলের ছোটগল্প' নামে প্রথম সংকলিত গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে, সুদীর্ঘ জীবনে তিনি ২৮ টি গল্পগ্রন্থ লিখে বাংলা সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। বনফুলের গল্প (১৩৩৬), বনফুলের আরো গল্প (১৩৩৮), বাহুল্য (১৩৪৩), বিন্দু বিসর্গ (১৩৫১), অদৃশ্য লোকে (১৯৪৭), অনুগামিনী (১৩৫৪), তন্বী (১৩৫৯), নবমঞ্জরী (১৩৫১), উর্মিমালা (১৩৬২), সপ্তমী (১৩৬৭), দূরবীন (১৩৬৮), বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৫৫), বনফুলের গল্পসংগ্রহ প্রথম ভাগ (১৩৬২), বনফুলের গল্পসংগ্রহ দ্বিতীয় ভাগ (১৩৬৪). প্রভৃতি গল্পগ্রন্থের ছোটগল্পে ফুটে উঠেছে ছোট গল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে বৃহতের ব্যঞ্জনা। তাঁর পশুপ্রীতিমূলক, রূপক ও প্রতীক ধর্মী, ভৌতিক ও অলৌকিক এবং শিশুসাহিত্য বিষয়ক ছোটগল্পগুলো শুধুমাত্র বাংলাসাহিত্যে নয় বিশ্বসাহিত্য দরবারে প্রতিষ্ঠা লাভের যোগ্য। চুনোপুটি, ঋণশোধ, চম্পা, মিশিক, যোগেন পন্ডিত, যুগল যাত্রা, টিয়া চন্দনা ইত্যাদি তাঁর প্রথম শ্রেণির ছোটগল্প। বিষয় বিন্যাস ও চরিত্র চিত্রণে বনফুলের সঙ্গে ওহেনরির তুলনা করেছেন বিভিন্ন সমালোচক।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বনফুলের সাহিত্য বিচার করতে গিয়ে লিখেছেন—

"বনফুলের রচনায় পরিকল্পনার মৌলিকতা, আখ্যান বস্তু সমাবেশে বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তি, তীক্ষ্ণ মননশীলতা ও নানারূপ পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে মানব চরিত্রের যাচাই পাঠকের বিস্ময় উৎপাদন করে।"[৩৬]

ক) বনফুলের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে সাহিত্যিক বন্ধু পরিমল গোস্বামী মন্তব্য করেছেন, "তোমার কল্পনা বহুবিস্তারী। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ঘুরে আসা তোমার পক্ষে এক নিঃশ্বাসের ব্যাপার। তুমি যা দেখেছ, যা শুনেছ, তার যেখানেই চিত্রধর্মিতা আছে তাকেই তুমি বেঁধে ফেলেছ গল্পের চেহারায়। যেন ফোটোগ্রাফের প্লেটের উপর তড়িৎগতিতে তার ছাপ পড়ে গেছে। বাক্যের বৃথা ব্যয় নেই, সহজ সরল ছবি।"[৩৭]

খ) ডঃ নিশীথ মুখোপাধ্যায় বনফুলের গল্পপ্রসঙ্গে বলেছেন:

"যাঁদের সাহিত্য সাধনায় বাঙলা ছোটগল্প আজ বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বনফুল তাঁদের অন্যতম, তাঁর ছোটগল্পে মানব জীবনের বহু বিচিত্ররূপ ফুটে উঠেছে, তাঁর গল্পে কখনো মানব জীবনের প্রবহমান স্রোতধারার উপরিভাগের তরল হাল্কারূপ, কখনো হৃদয়সত্তার গভীরে প্রবেশ করে মানব মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের প্রকাশ, কখনো মনের চরিত্রের অকস্মাৎ স্ববিরোধিতার প্রকাশ, কখনো বা আত্মানুসন্ধান লক্ষ্য করি। লিরিকের মূর্চ্ছনা বনফুলের ছোটগল্পে বহু স্থানে দেখা যায়। তবে বনফুলের ছোটগল্পের উল্লেখযোগ্য দিক হল রূপরীতি (Form) ও প্রকাশভঙ্গি। এই রূপরীতি ও প্রকাশভঙ্গির জন্য বনফুল পাঠকের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করতে পেরেছেন।"[৩৮]

গ) ডঃ সুকুমার সেনের মতে:

"বনফুলের গল্পে জীবনের ছবি ফুটেছে—ফটোগ্রাফ ওঠে নি। এও তাঁর গল্পের এক বিশিষ্টতা। বহুদিন পূর্বে প্রভাতকুমারের গল্পে এই রকম আস্বাদ কিছু পাওয়া গিয়েছিল। তবে প্রভাত বাবুর গল্পের ছবিতে খুশির উজ্জ্বল আলো পড়েছে, বনফুলের গল্পে খুশি—অখুশির আলোছায়ার আলপনা আঁকা হয়েছে।"[৩৯]

কল্লোলের পাশাপাশি বসুমতী, ভারতবর্ষ, প্রবাসী ও শনিবারের চিঠির লেখক হিসেবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। দেশ ও আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁর সাহিত্য চর্চার মিলনক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে গুরু হিসেবে মেনে নিয়ে যাদুময়ী ভাষার সাহায্যে গল্পগ্রন্থন কৌশলে কল্পনা ও বাস্তবের মেলবন্ধনে ও চরিত্র চিত্রণে নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য শরদিন্দু যথার্থই বঙ্কিম শিষ্য।

ব্যোমকেশ সিরিজের গল্প, মানবজীবনের রহস্য উন্মোচক গল্প, অলৌকিক গল্প, হাস্য ও কৌতুকরসের গল্প, ঐতিহাসিক গল্প সামাজিক গল্প তিনি লিখেছেন। তাঁর গল্প 'পথের কাঁদি', শিশুপাল বধ গল্প ও ব্যোমকেশ বক্সী চরিত্রে লেখকের জীবনদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। মানবজীবন রহস্য উন্মোচক শ্রেণিভুক্ত গল্পের মধ্যে চিড়িয়াখানা, দুর্গরহস্য, চিত্র চোর, চোরাবালি, অর্থমনর্থ, বহ্নি পতন, রক্তের রাগ, শৈল রহস্য, মগ্নমৈনাক, বেণী সংহার, আদিম রিপু, অদৃশ্য ত্রিকোণ, কহেন কবি কালিদাস প্রভৃতি সার্থক ছোটগল্প। অতিলৌকিক শ্রেণীভুক্ত গল্পের মধ্যে রক্ত খাদক, অশরীরী, প্রেতপুরী, সবুজ চশমা, দেহান্তর, মালকোষ, টিকটিকির ডিম, অন্ধকার, মরণ ভোমরা, বহুরূপী, প্রতিধ্বনি, ভূত ভবিষ্যৎ, দেখা হবে, শুন্য শুধু শুন্য নয়, মধু-মালতী, নীলকর, কালো সোনার গল্প, প্রত্নকেতকী প্রভৃতি ছোটগল্পে ভৌতিক রস ও গল্পরস পরিবেশন গুণে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। তাঁর হাস্যরসাত্মক গল্পে হালকা হাসি ও বিশুদ্ধ কৌতুক রস পরিবেশিত হয়েছে এরূপ ছোটগল্পগুলোর মধ্যে কর্তার কীর্তি, তিমিঙ্গিল, ভেন্‌ডেটা, জটিল ব্যাপার, বহু-বিঘ্নানি, মনে মনে, আদিম নৃত্য, তন্দ্রাহরণ, কুতুবশীর্ষে, নাইট ক্লাব, আরব-সাগরের রসিকতা, ঝি, অসমাপ্ত, ভূতের চন্দ্রবিন্দু, সেকালিনী, আদায় কাঁচকলায় প্রভৃতি গল্প গভীর মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ। ঐতিহাসিক গল্পগ্রন্থ জাতিস্মর, চুয়া চন্দন, বিষকন্যা, সাদা পৃথিবী, এমন দিনে, শঙ্খ কঙ্কণ প্রভৃতি ছোটগল্পে ঐতিহাসিক কাহিনী জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রেমের গল্পে অসামাজিক প্রেমকে যথার্থভাবে তিনি প্রেমের মর্যাদা দিয়েছেন। হাসি কান্না, রোমান্স, মেঘদূত, গোপন কথা, অপরিচিতা ভাগ্যবন্ত, যুধিষ্ঠিরের স্বর্গ, অষ্টমে মঙ্গল, কানু কহে রাই, ঘড়িদাসের গুপ্তকথা, এমন দিনে, সতমিত রমণী, পতিতার পত্র, গোদাবরী, কালস্রোত, বুড়ো বুড়ি দুজনাতে, রমণীর মন, প্রেম প্রভৃতি গল্পগুলো নরনারীর প্রেম ও মনস্তত্ত্বের সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে যা পাঠক মানসে বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

ছোটগল্পকার মনোজ বসুর নিপুণ লেখনী বাংলা ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। মূলত তাঁর ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গল্পের পরিণতিতে মনস্তাত্ত্বিক দিকের আলোকপাতে। তাঁর গল্পের ভৌগোলিক পটভূমি বাংলাদেশের যশোহর জেলার গ্রাম্য প্রকৃতি এবং কলকাতার রূঢ় বাস্তব জীবন। তাঁর গল্পে বঙ্গঋতুর চিত্রময় রূপ পরিস্ফুট হয়েছে সবুজ সজল স্নিগ্ধ বঙ্গের বর্ষা দিগন্ত প্রসারিত ধানক্ষেত চাষির খোলা মনের গান ও বিল প্রান্তবর্তী মানুষের সুখ দুঃখ হাসি গান যেমন উপজীব্য হয়ে উঠেছে অন্যদিকে নাগরিক নিঃসঙ্গতা তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর গল্পগুলো বঙ্গ সরস্বতীর ভান্ডারকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। মূলত তাঁর

প্রকৃতি প্রধান ছোটগল্পগুলিতে মানবজীবনের আলেখ্য উপজীব্য হয়েছে।

"প্রাকৃতিক পরিবেশ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছেন মনোজ বসু বার বার, বার বার মানবিক জগতে ফিরে আসতে; যে মানুষ মাটির মানুষ, মনোজ বসুর তাদেরই কাছাকাছি লেখক।"[৪০]

জন্মসূত্রে মনোজ বসু দক্ষিণ পূর্ববঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের সন্তান হয়েও প্রকৃতিকে দেখেছেন মন কাড়ানিয়া প্রিয় বান্ধবী রূপে, কখনও মাতৃরূপে আবার কখনও ভয়ঙ্করী রূপে। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের সাহিত্য চর্চায় মনোজ বসু আমাদের উপহার দিয়েছেন বিচিত্র স্বাদের দেড়শো ছোটগল্প। প্রেমের গল্প, ঐতিহাসিক, রোমান্টিক গল্প, রাজনৈতিক গল্প ও গরীব শ্রেণির আনন্দ-বেদনার গল্প লিখে তিনি ছোটগল্পকার হিসেবে পাঠক মানসে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। বন-মর্মর (১৯৩২), নরবাঁধ (১৯৩৩), দেবী কিশোরী (১৯৩৪), পৃথিবী কাঁদে (১৯৪০), একদা নিশীথ কালে (১৯৪২), দুঃখ নিশার নিশি (১৯৪৪), কুলু (১৯৪৮), খাদ্যোত (১৯৫০), কাঁচের আকাশ (১৯৫১), দিল্লী অনেক দূর (১৯৫১), কুমকুম (১৯৫২), কিংশুক (১৯৫৭), মায়াকন্যা (১৯৬১), গল্প পঞ্চাশৎ (১৯৬২), কনক লতা (১৯৬৬), ওনারা (১৯৭০) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ মনোজ বসুর অন্যতম সৃষ্টি।

বন-মর্মর ও রায়রায়ানের দেউল ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্টিক গল্পে ঐতিহ্য প্রীতি ও সামন্ত যুগের রোমান্টিকতার প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই। ভালোবাসার গল্প 'একদা নিশীথে' 'কালের হাসি', 'হাসি মুখ', 'রাতে', রোমান্সরস আছে যার শিল্পমূল্য অসাধারণ। তাঁর রাজনীতি প্রধান ছোটগল্পে রাজনীতি চেতনার বলিষ্ঠ দিক এবং সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। মনোজ বসুর প্রথম লেখা 'বাঘ' গল্পে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের ছবি আছে। গল্পটি পরিচিত পাঠক মানসে নাড়া দিয়েছে। অতিপ্রাকৃতের প্রতি অখন্ড বিশ্বাসমূলক ছোট গল্প হিসেবে 'প্রেতিনী', 'ছায়াময়ী' প্রভৃতি অতিলৌকিক গল্প রচনায় মনোজ বসুর সাফল্য নিঃসন্দেহে অনন্যতা দান করেছে। কোনো কোনো গল্পে সমালোচক তাকে গাল গল্প রসিক, কথা কলাবিদ্ আখ্যা দিলেও তাঁর প্রতিভার অবমূল্যায়ন হয় না। কি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, কি চরিত্র নির্মাণে, কি কাহিনি গ্রন্থনায়, কি ভাষা বিন্যাসে, কিংবা বর্ণনা গুণে মনোজ বসুর ছোটগল্পগুলো সমৃদ্ধির শীর্ষচূড়ে অবস্থান করতে পেরেছে।

মনোজ বসুর প্রকৃতি চেতনা ছিল স্বতন্ত্র, প্রকৃতিকে প্রদীপ করে সে প্রদীপের আলোয় ঘটনা কাহিনী, চরিত্রকে অনবদ্য ভাবে ছোটগল্পে উপস্থাপন করেছেন। 'তাঁর' ছোটগল্পের প্রকৃতি চেতনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ডঃ বীরেন্দ্র দত্ত মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছেন:

"মনোজ বসুর প্রকৃতি ভাবনায় নিশ্চিতভাবে রোমান্টিকতার নিবিড় মিশ্রণ ছিল। ছিল প্রকৃতি কেন্দ্রিক উচ্ছ্বাস ও আবেগময়তা। প্রকৃতিকে মানুষের প্রয়োজনে এনে তার মধ্যেই একস্ট্রা গভীর অর্থের ব্যঞ্জনা দেওয়ার প্রয়াস। প্রকৃতি মুখ্য আধেয় মানুষ তার উপযুক্ত আধার।"[৪১]

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনোজ বসুর ছোটগল্প প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—

"মনোজ বসুর রচনার মধ্যে তাঁহার 'বন-মর্মর-এ আরণ্য প্রকৃতির মর্মস্থানে যে অতি প্রাকৃতের ব্যঞ্জনা গুপ্ত থাকে, তাহা তিনি অতি নিপুণতার সহিত ও মনস্তত্ত্বানুমোদিত উপায়ে ব্যক্ত করিয়াছেন। 'বন-মর্মরই' তাঁহার সর্বপ্রধান গল্প। গঠন কৌশল, ব্যঞ্জনা সমাবেশ, সম্ভাবনীয়তার সীমার মধ্যে

কল্পনাসংকোচ—এই সমস্ত গুণে ইহা অতিপ্রাকৃত জাতীয় গল্পের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে।”[৪২]

সতীনাথ ভাদুড়ী বাংলা ছোটগল্পের ঐতিহ্যকে মেনে না নিয়ে নিজস্ব ভাবধারায় যে গল্পগুলো রচনা করে গেছেন সেগুলোর কাল পরিধি পাত্রপাত্রী ও ভৌগোলিক অবস্থান বিহারের শুষ্কমাটি। অথচ সেই অনুর্বর মাটিতে তিনি যেভাবে ছোটগল্পে সজীব প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। মূলতঃ বিহারের সুদক্ষ চিত্রকর রূপে তিনি অসাধারণ ছোটগল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন যা বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তাঁর ছোটগল্পে আছে বৈচিত্র্য, আছে নতুনত্বের স্বাদ। সতীনাথের গল্পকে ড্রয়িংরুমের আশ্রিত গল্প বলে অনেক সমালোচক উপেক্ষা করলেও তাঁর প্রবাসী জীবনের গল্পগুলোতে নিঃসন্দেহে সমাজজীবনের দলিল, রাজনীতি ভাবনা ও সরকারি শাসনের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোকে তিনি তাঁর গল্পে যথার্থভাবে প্রকাশ করেছেন। অতি তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যেও তাঁর লেখনীর জাদু স্পর্শে অসাধারণত্ব সৃষ্টি করেছে। তাঁকে মূলতঃ বাস্তববাদী বলে চিহ্নিত করলেও তিনি যে কল্পরাজ্যে অবাধ বিচরণ করেছেন একথা পাঠক মাত্রের অজানা নয়। যদিও তাঁর অনেক গল্পে কৌতুকরস ও রঙ্গব্যঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে যার মধ্যে তাঁর কল্পনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন রূপ রীতির তথা আঙ্গিক বিশ্লেষণে একজন সার্থক ছোটগল্পকার হিসেবে সতীনাথ ভাদুড়ীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। তাঁর শিল্পী সুলভ মানসিকতার পরিচয় বহন করে সতীনাথের ৭ খানি গল্পগ্রন্থের মোট ৫৯ টি ছোটগল্প। গণনায়ক (১৯৪৮), চিত্রগুপ্তের ফাইল (১৯৪৯), অপরিচিতা (১৯৫৪), চকাচকী (১৯৫৬), পত্রলেখার বাবা (১৯৬১), জল ভূমি (১৯৬২), অলোক দৃষ্টি (১৯৬৪) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ সতীনাথের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। বাঙালি পাঠক সমাজ সতীনাথকে জাতীয় ছোটগল্পকারের মর্যাদা দিতে ভুলে যায়নি। তাঁর ‘গণনায়ক’, ‘বন্যা’, ‘আন্টাবাংলা’ প্রভৃতি ছোটগল্প পরাধীন ভারতের অত্যাচারী শোষক ইংরেজদের মুখোশ খুলে দিয়েছে। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর অনবদ্য ‘ভুত’, ‘পরিচিতা’ গল্পে আঞ্চলিকতার রস উৎসারিত রয়েছে। ‘ফেরার পথ’ সতীনাথের উল্লেখযোগ্য ছোট গল্প। ভ্রমণ কাহিনীর রীতিতে অলোচ্য ‘ফেরার পথ’ গল্পটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ‘ষড়যন্ত্র মামলার রায়’ ছোটগল্পে আইনজীবী রূপে পূর্ণিয়া কোর্টে ওকালতির অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হয়েছে। ‘অমাবস্যা’ গল্পটি আত্মকথন কৌশলে লিখিত। সতীনাথের ঈর্ষা, চকাচকী, বৈয়াকরণ, ডাকাতের মা, বিবেকের বন্দী, মুষ্ঠিযোগ, রাজকবি, কলঙ্ক তিলক, রক্তের স্বাদ, মুনাফা ঠাকরুণ, কম্যান্ডার-ইন-চিফ, কণ্ঠ কন্দুতি, একটি কিংবদন্তীর জন্ম, পুতিগন্ধ, ধস, মহিলা-ইন-চার্জ, চরণ দাস - এম.এল.এ, দুই অপরাধী, পদাঙ্ক, হিসাব নিকাশ, অলোকদৃষ্টি, জাদুগন্ডি, ব্যর্থতপস্যা, পরকীয় সন-ইন-ল, তিলোত্তমা, সংস্কৃতি সংঘ, ভীষণা, জোড়কলম, গোঁজ প্রভৃতি গল্প সতীনাথের রসোত্তীর্ণ গল্প হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত।

ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে:

"এই প্রবাসী বাঙালী লেখক সতীনাথ ভাদুড়ী সম্পর্কে সৈয়দ মুজতবা আলির মন্তব্য 'তিনি লেখকের লেখক।' কথাটি বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনন্য ভূমিকা রচনা করে। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির কাল স্বল্প (১৯৪৮ - ১৯৬৫ খ্রী:), গল্প উপন্যাসের সংখ্যা নামমাত্র। অথচ বিষয় সম্পর্কে তাঁর বিদগ্ধ মানসিকতা, সমাজদর্শন প্রসঙ্গে গভীরতর চিন্তা ভাবনা, আঙ্গিক নিয়ে নিত্যনব পরীক্ষা প্রমাণ করে সতীনাথ স্বল্পতম সৃষ্টি করেও বিরলতম শিল্পী।"[৪৩]

সাহিত্য সমালোচক স্বস্তি মন্ডল "সতত সন্ধানী ছোটগল্পকার সতীনাথঃ কয়েকটি ছোটগল্প" প্রবন্ধে সতীনাথের ছোটগল্পের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন—

"সতীনাথ ঔপন্যাসিক না ছোটগল্পকার, এ তর্ক বৃথা। কারণ; উপন্যাসের মতই ছোটগল্পেও তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। সতত সন্ধানী লেখক জনমনে জীবনকে ধরে রেখেছেন ছোটগল্পের বিচিত্র আধারে। বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর গর্জন শুনেছেন; খন্ডের মধ্যে অখন্ডের উদ্ভাস দেখেছেন। তাঁর প্রতিটি ছোটগল্পের মধ্যে নতুনত্বের সন্ধান সচেতনতার স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে। তিনি মানুষকে সমাজকে দেখেছেন দ্বন্দ্বমুখর ও পরিবর্তনশীল রূপে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতা নির্ভর জীবন ও ঘটনা হয়ে উঠেছে তাঁর ছোটগল্পের বিষয়। চারপাশের চেনা - শোনা সহজ সরল সাধারণ নির্বোধ অশিক্ষিত চরিত্র নিয়ে তিনি গল্প লিখেছেন। এইসব মানুষের আচার - আচরণের মধ্যে থেকেই সামাজিক ইতিহাসের বহমান স্রোতটিকে ধরতে চেয়েছেন।"[৪৪]

সবুজ পত্র পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য লেখক হিসাবে পরিচিত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসের ভূমিকা অংশে তিনি নিজেকে প্রমথ চৌধুরীর শিষ্য বলে বারবার স্বীকার করেছেন। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেও ধূর্জটিপ্রসাদ কিন্তু গুরুর প্রদর্শিত পথকে আক্ষরিক ভাবে মেনে নেননি। সবুজপত্র গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদ 'নতুন ও পুরাতন - বক্তব্য' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন 'বুদ্ধিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য - এই দুটি প্রধান উপাদান থাকায়' তাঁর ছোটগল্পের প্লটে বুদ্ধিবাদের মুক্তি ঘটেছে কিন্তু প্লট সেখানে প্রাধান্য পায়নি। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার গ্রন্থের লেখক ভূদেব চৌধুরী উল্লেখ করেছেন "ধূর্জটিপ্রসাদের লেখনীতে প্লটের ভূমিকা বুদ্ধির আলোক প্রতিফলনের মাধ্যম হিসাবে ... প্লট কেবল তার উপলক্ষ্য। আর তার এই সচেতনতার কাছে সে প্লটের মূল্য কেবল গল্প দেহ সৃষ্টির একটি আবশ্যিক আঙ্গিক হিসেবে, তার চেয়ে বেশী জীবনমূল্য তার নেই।"[৪৫]

ধূর্জটিপ্রসাদের 'একদা তুমি প্রিয়ে' ছোটগল্পটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আলোচ্য গল্পে ধূর্জটিপ্রসাদের স্টাইলে প্রকাশিত হয়েছে বুদ্ধির খেলা, বিশ্লেষণভঙ্গি অনেকটা শিথিল এবং আঙ্গিকে রয়েছে পরীক্ষামূলক মিশ্র পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ। রিয়ালিস্ট গল্পটিতে রয়েছে বুদ্ধিবাদের প্রাধান্য। তিনি আলোচ্য গল্পে যে প্রেম কাহিনীর বিবরণ দিয়েছেন তা রস সৃষ্টির অন্তরায় হয়েছে সন্দেহ নেই। মূলত তিনি চরিত্র সৃষ্টিতে বিশেষ আগ্রহী। গল্পের পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং বাস্তব প্রসঙ্গ অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিকের স্তরে পৌঁছতে পারেনি।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ধূর্জটিপ্রসাদের ছোটগল্পের মূল্যায়ন করেছেন নিম্নলিখিত ভাবে:

"ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর গল্প রূপায়ণের অজস্র সন্ধানী একস্‌পেরিমেন্ট, গল্পের এক দেহে অনেক আঙ্গিকের বিমিশ্রিতা, চরিত্র বিস্তারের উপলক্ষ্যে গল্পের পরিবেশ ও বাস্তব প্রসঙ্গরহিত বিতর্কের অবতাবণা, প্লট এর নামমাত্র আধারে তর্ক - বিশ্লেষণ প্রধান প্রবন্ধ - শৈলীর প্রয়োগ। এক কথায় তাঁর গল্প রচনা আসলে গল্প লেখার শিল্প খেলা।"[৪৬]

রবীন্দ্র পরিমন্ডলে আবর্তিত হয়ে যিনি কথাসাহিত্যে দ্বিতীয় ভুবন সৃষ্টির ক্ষেত্রে পারদর্শীতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি হলেন সৈয়দ মুজতবা আলী। বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ শহর তাঁর জন্মভূমি হলেও অধ্যাপনা সূত্রে দেশে বিদেশে পরিভ্রমণ করে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তা তাঁর সাহিত্যের উপাদান হিসেবে উঠে এসেছে। বহুভাষাবিদ মুজতবা বিশিষ্ট ছোটগল্পকার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে ফরাসি, জার্মান, ইতালীয়, আরবি, ফার্সি, বৌদ্ধ, হিন্দি, সংস্কৃত, মারাঠি ও গুজরাটি সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক। সত্যপীর ও টেঁকচাদ ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সৃষ্টি সম্ভার। ফারসী গদ্য সাহিত্যের প্রাঞ্জলতা, বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্নতা ও স্বচ্ছতা বাংলা সাহিত্যে তিনি আমদানি করেছেন। মূলত মাত্র দুটি গল্পগ্রন্থের জন্য গল্পপাঠকদের কাছে তিনি পরিচিত হয়ে আছেন। 'চাচাকাহিনী', ও 'দ্বন্দ্বমধুর' এ দুটি গল্পগ্রন্থ ছাড়াও তাঁর একাধিক গ্রন্থে কিছু কিছু গল্পের প্রকাশ ঘটেছে। তার মধ্যে পঞ্চতন্ত্র প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্বের উল্লেখযোগ্য গল্প 'কাইরো', 'সাবিত্রী', 'আধুনিকা', ধুপছায়া গ্রন্থের 'রসগোল্লা', চতুরঙ্গ গ্রন্থের ত্রিমূর্তি, গাঁজা এবং দোহরা গ্রন্থের দোহারা গল্পটি উল্লেখের দাবি রাখে। চাচা কাহিনী গ্রন্থটি সমৃদ্ধ হয়েছে ১১ টি গল্প নিয়ে। গল্পগুলি যথাক্রমে 'স্বয়ম্বরা', 'কর্নেল', 'মা জননী', 'তীর্থহীনা', 'বেলতলাতে দুবার', 'কাফে-দে-জেনি', 'বিধবা বিবাহ', 'পুনশ্চ', 'পাদটীকা', 'রাক্ষসী', 'বেঁচে থাকো সর্দিকাশি' প্রভৃতি। দ্বন্দ্বমুখর গল্পটিতে স্থান পেয়েছে পাঁচটি উল্লেখ্যযোগ্য গল্প—নোনা জল, নোনামিঠা, ননী, চাচা কাহিনী ও বাঁশি। বিদেশী সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটেছে তাঁর অসংখ্য ছোটগল্পে। স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশে-র ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বার্লিনের ভৌগোলিক পটভূমি স্থান পেয়েছে তাঁর ছোটগল্পে। ক্লাইমেক্স ও অ্যান্টিক্লাইমেক্স উপস্থাপনে তাঁর ছোটগল্পগুলোর শিল্পমূল্য অসাধারণ সন্দেহ নেই। চরিত্র প্রধান গল্পগুলিতে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে তিনি নারীকেই দেখেছেন। মুজতবার কলমে নারীকে প্রেমময়ী রমণী রূপে কিংবা জননী রূপে আমরা খুঁজে পেয়েছি। একদিকে নারী চরিত্রের প্রতি তিনি জানিয়েছেন অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অন্যদিকে তাঁর লেখনীতে অবলুণ্ঠিত নারীকেও দেখা গেছে। সমকালীন ঘটনাকে তিনি তাঁর ছোটগল্পে উপজীব্য বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন। অন্যদিকে প্রেমভাবনার দ্বৈতরূপ উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর ছোটগল্পে। কোনো কোনো গল্পে পরিবেশিত হয়েছে কৌতুকরস। মুজতবার ছোটগল্পে আলংকারিক বৈচিত্র্য সাহিত্য রস সৃষ্টির অন্তরায় হয়ে ওঠেনি। তাঁর গল্পের শুরু ও পরিসমাপ্তি অংশ শিল্পগুণের পরিচায়ক। তাঁর লক্ষ্য ছিল গল্পরস পরিবেশন। অর্জুন রায় সম্পাদিত 'ভাঙা কাঁচের শিল্প-বাংলা ছোটগল্পের শিল্পীদল প্রথম পর্ব' গ্রন্থে মনীষা রায়ের চাচার কাহিনী প্রবন্ধে সৈয়দ মুজতবা আলীর ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য নিম্নলিখিত

ভাবে তুলে ধরেছেন। "গল্পের গোড়ার অংশের বিস্তৃতি, আসলে পিরামিড সদৃশ গঠন, তুঙ্গ মুহূর্তের বৈচিত্র্য সব মিলিয়ে আলোচিত গল্পগুলিকে নিঃসন্দেহে সার্থক ছোটগল্প বলে অভিহিত করা চলে। বর্ণনা বিন্যাসে আপাত অগোছালো, দীর্ঘায়িত ভঙ্গিটি ছোটগল্পে বর্তমানে বিসদৃশ হলেও, তা বহু কথকতা শিল্পের দ্যুতির ভাস্বর। এ পথে মুজতবার পূর্বসূরী অনেক, উত্তরসূরী কম।"[৪৭]

বাংলার ছোটগল্পকারদের মধ্যে পারিবারিক জীবনের নিপুণ রূপকার হিসেবে পরিচিত হয়ে আছেন প্রমথনাথ বিশীর সমসাময়িক লেখক গজেন্দ্রকুমার মিত্র। ঋত্বিক, আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর ছোটগল্পগুলো পাঠক মানসে বিশেষ সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। পাঁচশোর অধিক ছোটগল্প তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। কথা সাহিত্য পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে গজেন্দ্রকুমারের অসংখ্য ছোটগল্প। তাঁর ছোটগল্পের জগৎ ছিল প্রসারিত। নানা রীতিতে লেখা তাঁর গল্পের আসর জমজমাট হয়ে উঠেছিল। গজেন্দ্রকুমারের গল্পের বিষয়বস্তুতে নিম্নবিত্ত গ্রামীণ ও নাগরিক জীবন, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারত ইতিহাস, অতিপ্রাকৃত কাহিনী ও প্রাচীন মিথকে স্থান দিয়েছেন। অন্যদিকে তাঁর মনস্তাত্ত্বিক কাহিনী নির্ভর প্রেমের গল্প, হাসির গল্প, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত গল্প, প্রথাবিরোধী ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। তাঁর উল্লেখযোগ্য মনস্তাত্ত্বিক গল্পগুলি যথাক্রমে সর্পিল, আকৃতি ও প্রকৃতি, বিন্দু পিসি, বিগত যৌবন, বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। সাতটি পয়সার মূল্য, ফাউল, কাটলেটের ইতিহাস, অন্ধকারের ভয়ঙ্কর প্রভৃতি তাঁর রসোত্তীর্ণ ছোটগল্প। তাঁর ভৌতিক গল্পগুলিও শিল্পোৎকর্ষের নিদর্শন। অলৌকিক ছোটগল্প রচনায় গজেন্দ্রকুমার মিত্র শ্রেষ্ঠ শিল্পোৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন। ব্যাক্তিজীবনে বহু সন্ন্যাসী মহাত্মা ও সাধু চরিত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে। তাঁদের কাছ থেকে যে অতিলৌকিক কার্যকলাপ তিনি শুনেছেন ও দেখেছেন তার ফলশ্রুতি 'সাধু ও সাধক', 'নিশির ডাক', 'সময়ের বৃন্ত হতে খসা' প্রভৃতি ছোটগল্প। অসংখ্য প্রেমের গল্প তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। প্রেমের ঘাত প্রতিঘাত বর্ণনায় তাঁর দক্ষতার পরিচয় পরিস্ফুট। অতি সহজে তাঁর ছোটগল্পে প্রেমের আবির্ভাব ঘটেনি, ঘটেছে অন্ধকারের পথ বেয়ে। তাই তাঁর গল্পে প্রেম অনেকটা কুটিল। এরূপ ছোটগল্পের নিদর্শন হল 'প্রাণের মূল্য', 'কমা ও সেমিকোলন', 'প্রারব্ধ', 'রহস্য', 'নূতন ও পুরাতন' প্রভৃতি ছোটগল্প। জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা 'সাহিত্যিকের মৃত্যু', 'গ্র্যান্ড হোটেল', 'বনবাতার কাছেই', 'দুরাশা', 'বন্দিনী', 'দ্বিতীয় পক্ষ' গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রথাবিরুদ্ধ দুঃসাহসী গল্প পাঠক মনে জাগায় আতঙ্ক। এরূপ ছোটগল্পের উদাহরণ হিসেবে আমরা উল্লেখ করতে পারি 'আদিম', 'জরা ও বাসুদেব', 'বন্ধুমেধ', 'স্বর্ণমৃগ' প্রভৃতি গল্প। হাসির গল্প রচনাতে গজেন্দ্রকুমারের সাফল্য প্রশংসাতীত সন্দেহ নেই। 'রাস্তা খরচ', 'হাসির গান', 'জামাই চাই', 'চাকর', 'দুর্ঘটনা', 'ঘেরাও' প্রভৃতি ছোটগল্পে হাসির ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়েছে। বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে গজেন্দ্রকুমার মিত্র আধুনিকতার আমদানি করেছেন। এই আধুনিকত্ব প্রমাণিত হয়েছে বিষয়বস্তু নির্বাচনে, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, গল্পের কাহিনি বিন্যাসে, চরিত্র চিত্রণে ও ভাষার

সাবলীলতায়। বাংলা ছোটগল্পের জগতে গজেন্দ্রকুমার মিত্র যে একজন শক্তিমান ছোটগল্পকার এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় গজেন্দ্রকুমারের ছোটগল্প প্রসঙ্গে বলেছেন:

"গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ছোটগল্পের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—প্লটের বৈচিত্র্য ও শিল্পোৎকর্ষ, আর গল্প—কল্পনার অসাধারণ ব্যাপ্তি। তাঁর প্রত্যেকটি ছোটগল্পে কিছু না কিছু ঘটে থাকে (Something happens), চিন্তা, অনুভূতি বা স্থূল ঘটনা ঘটেছে—তার প্রবহমান গতিধারা একটি শিল্প—সঙ্গত সমাপ্তির দিকে এগোচ্ছে। আর সেই প্লটের পরিকল্পনার মৌলিকতা ও পরিবেশন-নৈপুণ্যও তুলনাবিহীন। তার মানে এই নয় যে, তিনি প্লট সর্বস্ব গল্প-ই লেখেন। নানা ধরনের ও রীতির গল্প তিনি লিখেছেন। তাঁর গল্পের জগৎ বহুব্যাপ্ত। নিম্নমধ্যবিত্ত নাগরিক জীবন ও গ্রামীণ জীবন, অতীত ইতিহাসাশ্রয়ী চড়াসুরে—বাঁধা জীবন, সুদূর মহাভারতীয় যুগের জীবন, অলৌকিক অভিজ্ঞতার বিরল মুহূর্ত, বহির্জীবনের সংঘাত— প্রতিক্রিয়ায় মথিত অন্তর্জীবনের জটিল মুহূর্তে তাঁর গল্পে পেয়েছে শিল্পরূপ।"[৪৮]

মনস্তত্ত্ব প্রধান ছোটগল্পকার হিসেবে পরিচিত সুমথনাথ ঘোষ বাংলা ছোটগল্পে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। সুমথনাথ ছিলেন বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের অন্যতম রূপকার। গজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রমথনাথ বিশী ও সুমথনাথ ঘোষ এরা ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। জগবন্ধু ইনস্টিটিউশনে অধ্যয়ন কালে নিজস্ব গল্প রীতিতে তাঁর গল্পের শুভারম্ভ ঘটে। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যায়, মানুষের অবচেতন মনের রহস্য উদ্‌ঘাটনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন সুমথনাথ। ১৯৩৫ সালে 'স্বচিত্র শিশির' নামে তাঁর প্রথম গল্পটি প্রকাশিত হয়। পরিণত বয়সে এই গল্পের বিষয়বস্তু নিয়ে 'জায়া ও জননী' নামে একটি উপন্যাস লেখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলন গ্রন্থের 'জটিলতা' (১৯৪১) নামের গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল যমুনা পত্রিকায়। এছাড়া 'রূপ থেকে রূপে', 'যখন পলাশ ফোটে', 'মরণের পরে' (১৩৮৩), 'ওখানে পদ্মা এখানে গঙ্গা' (১৩৮০) তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ।

সুমথনাথ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প 'এর ভূমিকায়' প্রমথনাথ বিশী সুমথনাথের গল্পের মূলধন যে দুঃখ বেদনা ও নৈরাশ্য এরূপ জোরাল মন্তব্য করেছেন—

"এই সংকলনের সব গল্পগুলি অথবা প্রায় সব গল্পগুলি জীবনের দুঃখের উপাদানে গঠিত। 'ছায়া সঙ্গিনী', ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনী, 'এই যুদ্ধ', দারিদ্র্যের কাহিনী, 'বাড়ির কর্তা' বৃদ্ধ কর্তার অসহায় বার্ধক্যের বর্ণনা। 'রঙ খেলা' মুমূর্ষুর রোমান্স, 'প্রতিবেশী' হৃদয়হীনতার গল্প, 'আড় চুড়ি', সদ্য বিধবার মোহ ভঙ্গের বিবরণ। 'কলহ' গল্পটি সাধ্বী পত্নী কিভাবে স্বামীকে জানিয়া শুনিয়া অধঃপাতের পথে ঠেলিয়া দিতেছে তার বর্ণনা। 'চেঞ্জার' গল্পটিতে পাই দারিদ্র্যের একটি রূপ—কিন্তু মাঝখানে আয়রনি আসিয়া পড়িয়া দুঃখকে আরো উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। 'কুহু', 'বৃষ্টি এলো' গল্প দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জীর্ণ বালির মধ্যে কুহুধ্বনি প্রবেশ করিয়া দীর্ঘ অনাবৃষ্টির পরে শহরে বৃষ্টি না নামিয়া দারিদ্র্যজীর্ণ নরনারীর জীবনে অভাবিত রসের সঞ্চার করিয়াছে। মুহূর্ত পূর্বে তাহারাও রাখিত না মনের এ সংবাদ। লেখক চোখে কলম দিয়া দেখাইয়া না দিলে পাঠকও কল্পনা করিতে পারিত না।"[৪৯]

লেডিজ সীট গল্পটি রূপ থেকে রূপে গল্প সংকলনের উল্লেখযোগ্য গল্প। গল্পটিতে

নারী ও পুরুষের অহংকারকে চূর্ণবিচূর্ণ হতে দেখা যায়। 'যখন পলাশ ফোটে' গল্পগ্রন্থের 'দুয়ে' গল্পে সুমথনাথ মনোগহনের দ্বৈতরূপ আলোকপাত করেছেন। সমালোচক সুমথনাথ ঘোষকে দুঃখ বেদনার রূপকার বললেও প্রকৃত পক্ষে তিনি ছিলেন মনোগহনের আলো আঁধারি পরিবেশের অন্যতম রূপকার। জীবনের অন্তগূঢ় জটিলতা, কুটৈষণা সম্ভোগ উল্লাসকে তিনি সহজ ভাবে তাঁর ছোট গল্পে তুলে ধরেছেন। জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী সুমথনাথের 'মরণের পরে' গল্পগ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় জীবিত ও মৃতের সম্পর্ক স্থাপন, সেই সঙ্গে বন্ধন ও আসক্তির এক রোমান্টিক কাহিনি। 'ওখানে পদ্মা এখানে গঙ্গা' গল্পগ্রন্থটির প্রতিটি গল্প বেশ চমকপ্রদ। অসংখ্য ঘটনাপুঞ্জ-কে তিনি সার্থক ও সুন্দরভাবে মালার মতন সাজিয়ে তুলেছেন। বাংলাদেশের রক্তাক্ত গণ অভ্যুত্থান আলোচ্য গল্পগ্রন্থের মূল উপজীব্য বিষয়। সুমথের জীবনদর্শন ও রচনারীতি প্রশংসনীয় এতে কোনো সন্দেহ নেই। গ্রন্থন নৈপুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে চিত্রণ সামর্থ্যের পরিচয় দিতে পেরেছেন সেদিক থেকে ছোটগল্পকার হিসেবে তিনি সার্থক।

অন্নদাশঙ্কর রায় কল্লোল তট দিগন্তে একজন অনন্য শিল্পী। সুদূরের পিয়াসী রূপে বাংলার ছোটগল্প জগতে তাঁর আবির্ভাব ''আমাদের সৃষ্টিকে অতি দূর ভবিষ্যতের সেখানে যত মানুষ আছে সকলের হাতে দেবার মত করে যেতে হবে। তারাও জিনিস ভাঙবে বটে, কিন্তু ওর ভেতরে যে টুকু খাঁটি সোনা থাকবে, সে টুকু ফেলে দেবে না।''[৫০]

এই সুদূর আকাঙ্ক্ষার স্রষ্টা অন্নদাশঙ্কর। 'আমার কথা অন্নদাশঙ্কর রায়ের সাক্ষাৎকার' থেকে আমরা জানতে পারি অন্নদাশঙ্কর জীবনে ৫ জন দেশী-বিদেশী সাধক মনস্বী ও শিল্পীর কাছে ঋণী তাঁরা হলেন টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধিজী, রম্যারলা ও প্রমথ চৌধুরী। টলস্টয়ের গল্পের অনুবাদ গ্রন্থ 'তিনটি প্রশ্ন' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে প্রবাসী পত্রিকায়। তাঁর এরপর তাঁর দুজনায় (১৯২৮) ও বালিকা বঁধূ (১৯৩০) মৌলিক গল্পদুটি প্রকাশিত হয়। মোট ৭টি গল্পগ্রন্থ অন্নদাশঙ্কর আমাদের উপহার দিয়েছেন। গল্পগ্রন্থগুলি যথাক্রমে প্রকৃতির পরিহাস (১৯৩৪), দু কান কাটা (১৯৪৪), হাসন সখী (১৯৪৫), মন পবন (১৯৪৬), যৌবন জ্বালা (১৯৫০), কামিনী কাঞ্চন (১৯৫৪), রূপের দায় (১৯৫৮), সংকলিত গল্প (১৯৬০) সেখানে প্রথম তিনটি গল্পগ্রন্থে নির্বাচিত গল্পগুলি স্থান পেয়েছে। কথা গল্পসংকলনে শেষ দুটি গল্পগ্রন্থ এবং জীবনের অন্তিম পর্বের রচিত গল্পগুলি স্থান পেয়েছে। তিনি মূলত তাঁর গল্পে সত্য জিজ্ঞাসা, রূপ জিজ্ঞাসা ও জীবন জিজ্ঞাসার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর লেখা শতাধিক গল্পে এই ধ্যান ধারণা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'রাণী পসন্দ', 'পিয়াসী', 'বারুণী' অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। খন্ড থেকে অখন্ডে সীমা থেকে অসীমের ব্যঞ্জনা অন্নদাশঙ্করের ছোটগল্পের বক্তব্যে ভাবে ভাষায় উৎসারিত হয়ে আছে, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে তিনি জটিল বিষয়কে সহজ সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন।

একমাত্র হাস্যরসিক গল্পকার রূপে পরিমল গোস্বামী বাংলা ছোটগল্পের জগতে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি 'শনিবারের চিঠি' সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে সাহিত্যজগতে পরিচিত

হয়ে আছেন। তাঁর ব্যঙ্গ গল্পে ব্যক্তি জীবনের অসংগতিগুলোকে স্থান দিয়েছেন।

'মারকে লেঙ্গে' গল্পগ্রন্থে লেখক বলেছেন "স্থায়ী সাহিত্য কর্মে যুগের সত্য চিরন্তনতা লাভ করে, - কিন্তু তার হাসির গল্পে নাকি ক্ষণকালীন হুজুগের অতিশয্যই উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয়েছে।"[৫১]

আবার 'ম্যাজিক লণ্ঠন' গ্রন্থের 'হাসির উপকরণ' প্রবন্ধে পরিমল গোস্বামী বলেছেন—

"আমাদের জীবনে হাসির উপকরণ নানাবিধ,—প্রভাবিত মানুষের জীবনে অসংগতির যে এত দিক আছে, সেইটিকে একটু বাড়িয়ে দেখলেই আমরা সাধারণত হাসি। তার ব্যঙ্গ রসের জ্বালা আর উত্তাপ নেই আছে শুধু হাস্যরসের মধ্যে নতুন চমক।"[৫২]

প্রমথনাথ বিশী 'পরিমল গোস্বামী-র শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্পগ্রন্থের মুখবন্ধে পরিমল গোস্বামীর ব্যঙ্গ গল্প প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"সে ব্যঙ্গ ইস্পাতের ছোরার ন্যায় অত্যন্ত হ্রস্বকায় বলিয়া ধার কম নয় এবং উজ্জ্বলতাও যথেষ্ট। ইস্পাতের ছোরাখানা লেখকের পুনর্বন্ধে কোথায় যে লুকাইত সবসময় দেখিতে পাওয়া যায় না, হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া আঘাত করে, আবার বিদ্যুতের চমকের মত মেঘান্তরালে মিলাইয়া যায়। এই জন্য তাহা ব্যঙ্গের তলোয়ারের চেয়ে বেশী মারাত্মক।"[৫৩]

ব্যঙ্গ গল্পের আকস্মিক চমক, অনাবিল তথ্য বর্ণনা কৌশল, বিবৃতিমূলক ভাষা গল্পের প্লট বিন্যাসে তাঁর ছোটগল্পগুলো গাঢ় ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিজীবনে সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক হওয়ায় জীবনের অসংগতিকে কটাক্ষ দীপ্ত হাসির ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করতে পেরেছেন বলেই পরিমল গোস্বামী সাহিত্য জগতে পরিচিত হয়ে আছেন। কবিশেখর কালিদাস রায় পরিমল গোস্বামীর ছোটগল্পে বাকশৈলী প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন— "গল্পগুলি পড়িতে মুখ কসে সামান্য, মন কসিতে থাকে বহুক্ষণ এবং হাসির দাগও থাকিয়া যায়।"[৫৪]

"তিনি আবার তাঁর গল্পের ব্যঙ্গশৈলীর তীব্রতা, আকস্মিকতা, গল্পের শেষ লাইনের ব্যঞ্জনা ও আবেদন প্রসঙ্গে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন "পরিমল গোস্বামী তাঁহার হাসির গল্পে সিনেমার টিকিট দেওয়ার মত পাঠক চিত্তে কৌতূহলী করিয়া বাখিয়া নির্বিকার ভাবে কথকতা করিয়াছেন।"[৫৫] ছোটগল্পের প্রকরণে এনেছেন অভিনবত্ব। চলিত ভাষা বিন্যাসে, নাটকীয় সংলাপ পরিবেশনে, প্রকৃতি চেতনার আবহ সৃষ্টিতে, উইট স্যাটায়ার সৃষ্টি করে তিনি ছোটগল্পের পসরা সাজিয়েছেন সার্থকভাবে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলো যথাক্রমে 'বুদ্বুদ' (১৯৩৬), 'ক্লাসের সেই লোকটি' (১৯৪৪), 'ব্ল্যাকমার্কেট' (১৩৫২), 'ইস্কুলের মেয়েরা' (১৯৫০), 'মারকে লেঙ্গে' (১৯৫০), 'শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্প' (১৯৫৪), 'ম্যাজিক লণ্ঠন' (১৯৫৫) প্রসংশার দাবি রাখে। প্রতিটি গল্পই পরিমল গোস্বামীর সফল সৃষ্টি। তাঁর 'সাধু হীরালাল', 'অনেষ্ট অটল' গল্পগুলি পাঠক মনে স্থায়ী আসন অধিকার করে নিয়েছে।

হাসির গল্পের শিল্পী হিসেবে শিবরাম চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় নাম। প্রথমনাথ বিশীর সমসাময়িক গল্পকার শিবরামের ছোটগল্পগুলি বহুজন সমাদৃত হতে পেরেছে। কল্লোল, কালি-কলম পত্রিকাকে ঘিরে আমরা শিবরামকে সাহিত্যিক আসরে অবতীর্ণ হতে দেখি। কল্লোল কালের লেখক হলেও মূলত তিনি কল্লোলপন্থী নন। ভূদেব

চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন "শিশু ভগ্নার মুক্তি জাতিগোত্রের বন্ধনহীন অবাধ কল্পনার উড়ন্ত আকাশে। সেই আকাশে ওড়ার ডানা মেলেছিলেন গল্প-শিল্পী শিবরাম হাসির জগতে প্রথম। তাই তাঁর হাসির গল্প একেবারে জন্মসূত্রেই জাতিগোত্রহীন।"[৫৬] কল্লোল পত্রিকায় তিনি যে গল্পটি ১৯৩১ সালে লিখেছিলেন যার নাম 'আর এক ফাল্গুনে' সেখানে একটুকরো হাসিও ছিল না। সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'মৌচাকের আহ্বান' প্রসঙ্গ তাঁর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এখান থেকেই তাঁর জীবনের বাঁক পরিবর্তিত করে পরিবেশন করলেন ছোটগল্পের মাধ্যমে অসংখ্য শিশু সাহিত্য কেন্দ্রিক ছোটগল্প, সেই সঙ্গে বড়দের জন্য তিনি লিখেছেন অজস্র হাসির ছোটগল্প। তিনি নিজেই বলেছেন— "আমাকে বড়দের হাতে তোলার যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, ছোটদের পাতেই আমি থাকতে চাই।"[৫৭] বাস্তবিক পক্ষে ছোটদের পাতে থাকবার অদম্য আগ্রহ ছিল তাঁর। শিশু সাহিত্যের বিষয়বস্তুকে সহজ সরল হাসির ও হালকা খুশির মেজাজে লিখিত ছোটগল্পগুলি শিশুমনের একটি লোভনীয় উপকরণ। শিশু মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ রূপকার হিসেবে ধ্বনিবিন্যাস ও কথার খেলায় শিশুদের ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে স্মিত হাসি সঞ্চার করাই ছিল শিবরামের ছোটগল্পের অন্যতম লক্ষ্য। কৌতুক শিবরামের ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ছোট ও বড় প্রত্যেকের জন্য তিনি কৌতুক রসের আমদানি করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলন গ্রন্থ হল: 'আমার কথা', 'শিবরামের সেরা গল্প', 'বড়দের হাসিখুশি', বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। 'শিবরামের 'ঐ অজগর আসছে তেড়ে' গল্পটি শিশু মনে নির্মল আনন্দ এনে দেয়। প্রমথ চৌধুরী শিবরামকে বড় ভাষা শিল্পী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরী তাঁর ছোটগল্পের উচ্চ প্রশংসা করে বলেছেন "সহৃদয় কৌতুক রসে মনটি সব সময় ভরা। কৌতুক বড় একটা সার্থকতা বহন করে গোলাপ ফুল রূপে। গোলাপ ফুলের পেটে যাঁরা কাঁটালেব কোয়ার সন্ধান করে, তারা নিজেরাই নিজেদের শাস্তি দেয়।"[৫৮]

ডঃ অলোক রায় শিবরাম চক্রবর্তীর ছোটগল্প প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন:

"শিবরাম রচনাবলী'র (সাক্ষরতা প্রকাশন) প্রচ্ছদপটে কয়েক লাইনে লেখকের যে আত্মপরিচয় মুদ্রিত হয়েছে, তার মধ্যেই কি শিবরাম চক্রবর্তী-কে খুঁজে পাওয়া সম্ভব? বলে গেছেন উপনিষদ আরাম নাহি অল্পে। বাড়িশুদ্ধ সবার আমোদ শিবরামের গল্পে।"[৫৯]

বাংলা কথা সাহিত্যের ইতিহাসে সুবোধ ঘোষ একটি জনপ্রিয় নাম। ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি ছোটগল্প রচনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বিহারের ছোটনাগপুর, হাজারীবাগ জেলায় মোটর কোম্পানির কন্ডাক্টর ও পৌরসভার কুলি বস্তিতে ইনজেকশন দেবার চাকুরি নিয়ে তাঁকে বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে হয়েছে বহুবার। নিম্নবিত্ত শ্রেণিকে তিনি খুব কাছে থেকে দেখেছেন। সে সময় আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে দেখা দিয়েছিল সঙ্কটকাল। ইউরোপে ফ্যাসিবাদ ও গণতন্ত্রের লড়াই, ভারতে আগস্ট আন্দোলন, ১৯৪৩ এর বাংলার দুর্ভিক্ষ, ৪৬ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ৪৭ এ ভারত বিভাজনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে সাহিত্য রচনার উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন সুবোধ ঘোষ। বন্ধুদের সঙ্গে

সাহিত্য আড্ডার আসরে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম ছোটগল্প সংকলন 'পরশুরামের কুঠার' ও 'গ্রাম যমুনায়' তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। 'ফসিল' গল্প অনেকটা যেন ছঁকে বাধা এবং তাঁর মৌলিক সৃষ্টি। সুবোধ ঘোষ তাঁর কম্যুনিস্ট বন্ধুদের উৎসাহে 'ফসিল' গল্পটি লিখেছেন। যে গ্রন্থটি তাঁর বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও জীবন দর্শনের দলিল হিসেবে চিহ্নিত। বাংলা ছোটগল্পে কুটৈষণা জীবনজটিলতা আর্থসামাজিক দ্বন্দ্বকে তিনি নূতন ভাবে মূল্যায়ন করেছেন। একসময় তাঁর ফসিল গল্পটি ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সুবোধ ঘোষ যে নূতন আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন তাঁর 'কালপুরুষ', 'শক থেরাপি', 'গোত্রান্তর', 'জতুগৃহ', 'সুন্দরম', 'থিরবিজুরী', 'বার বঁধূ' ছোটগল্প সে ধারণার ফলশ্রুতি। তাঁর অন্যান্য গল্পগ্রন্থগুলি 'কুসুমেষু' (১৯৫০), 'ভোরের মালতী' (১৯৫০), 'জতুগৃহ' (১৯৫০), 'থির বিজুরী' (১৯৫৫), 'অর্কিড' (১৯৫৮), 'নিকষিত হেম' (১৯৫৮), 'দিগম্বনা' (১৯৬০), 'মন ভোমরা' (১৯৬০), 'চিত্ত চকর', 'সায়ন্তনী', 'মনবাসিতা', 'পলাশের নেশা' প্রভৃতি। শ্রেষ্ঠ গল্প ও গল্প মণিঘর গ্রন্থের গল্পগুলি ছাড়া ৫ টি খন্ডে সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়েছে। সুবোধ ঘোষের 'ভাটতিলকায়', 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ', 'তিন অধ্যায়' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। আত্মপ্রতারক মধ্যবিত্তের দোলাচল চিত্তকে সমালোচনা করেছেন ছোটগল্পকার। মোটকথা মধ্যবিত্তের মুখোশ তিনি খুলে দিয়েছেন। তিনি প্রশ্রয় দেননি ভন্ডামি, আত্মাভিমান, সংকীর্ণতা ও সুবিধাবাদী নীতিকে। তাঁর বিদ্রূপাত্মক উক্তি বলাবাহুল্য গালে প্রচন্ড চপেটাঘাতের মতো। 'নির্বন্ধ কাঞ্চন', 'সংসর্গাৎ', 'তমসাবৃত' গল্পগুলি তার উজ্জ্বল নিদর্শন। 'কালাগুরু', ও 'শিবালয়' ছোটগল্পদুটি আগস্ট আন্দোলনে-র পটভূমিকায় লেখা উল্লেখ্যযোগ্য ছোটগল্প। এছাড়া 'স্বর্গ হতে বিদায়', 'তিন অধ্যায়', 'গ্লানি হর', 'স্নানযাত্রা', 'গরল অমিয় ভেল', 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ', 'স্বমহিমচ্ছায়া', 'হৃদ ঘনশ্যাম' প্রভৃতি বিদ্রূপাত্মক ছোটগল্পে সুবোধ ঘোষের মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। 'শুক্লাভিসার', 'ফগিনী', 'রিতা', 'জতুগৃহ' প্রভৃতি প্রেমের গল্পে প্রেমের সনাতনী আদর্শের পেছনে যে অন্ধকারময় বিকৃত রূপ আছে তা তিনি অকপটে তুলে ধরেছেন। যাই হোক তিনি বাংলা ছোটগল্পে এক অবিস্মরণীয় শিল্পী। কালের পুত্তলিকা গ্রন্থে ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সুবোধ ঘোষ সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন, "আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের ও অচেনা আদিবাসী সমাজের নিপুণ রূপকার সুবোধ ঘোষ।"[৬০]

অলোক রায় সুবোধ ঘোষ সম্পর্কে বলেছেন—

"জীবনে বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে সুবোধ ঘোষের আর্বিভাব। কিন্তু যেটা বিস্ময়কর তা হল প্রথম থেকেই তাঁর ভাষা পরিশীলিত ও সংকেতময়, প্রয়োজনে আবেগ-বর্জিত তীক্ষ্ণতা অর্জনে সক্ষম; আর ছোটগল্পের নিখুঁত শিল্পরূপটি তাঁর করায়ত্ত, সামান্য চমকের মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ কাহিনী একমাত্র পরিণামের দিকে এগিয়ে যায়।"[৬১]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সুবোধ ঘোষ সম্পর্কে বলেছেন—

"সুবোধ ঘোষের প্রত্যেক গল্পে অসাধারণত্বের ছাপ লক্ষিত হয়—ভূগর্ভে প্রোথিত খনিজ সম্পদের ন্যায় তিনি মানবমনের অনেক গোপন, রহস্যাবৃত স্তর, জীবন সংঘটনের অনেক

বিচিত্র, অভিনব রেখাচিত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। জীবনের বিরল—পথিক সীমান্ত প্রদেশ হইতে তিনি কত না মৃদু সৌরভপূর্ণ বন্যফুল চয়ন করিয়াছেন।"[৬২]

বাংলা সাহিত্যে যুগন্ধর শিল্পী স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন ছোটগল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ৪০ এর দশকের নতুন ভাবধারার শিল্পী হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থের ভূমিকা অংশে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে গোর্কি গোত্রের শিল্পী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। 'নিশীথের মায়া' তাঁর প্রথম ছোট গল্প এবং পাঠক সমাজে তাঁর প্রথম সাড়া জাগানো ছোটগল্প 'বিদংস'। মার্কসবাদে বিশ্বাসী লেখকের বহু ছোটগল্পে মার্কসীয় জীবনদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। যুগান্তর, আনন্দবাজার, দেশ-এর লেখক ও প্রগতি লেখক সংঘের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে তিনি কাছ থেকে দেখেছেন এবং লক্ষ্য করেছেন সোনার বাংলার নগ্ন মূর্তিকে। শোষণ, বঞ্চনা, ভীরুতা, গণশক্তির অসহায়তাকে তীক্ষ্ণ সমালোচনায় তিনি বিদ্ধ করেছেন। তৎকালীন রাজনীতি অর্থনীতির বিপর্যয়ের আলেখ্য তিনি তুলে ধরছেন বিভিন্ন ছোটগল্পে। 'বিদংস', 'নক্রচরিত্র', 'কালাবাদর', 'দুঃশাসন', 'ভাঙ্গা বন্দর' গল্পগ্রন্থে এই মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। 'একটি শত্রুর কাহিনী', 'সৈনিক' ছোটগল্পে তাঁর প্রতিবাদী চেতনা উচ্চারিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় মধ্যবিত্ত জীবনের হতাশা বেদনা সেই সঙ্গে ভারত ভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিধ্বস্ত রাজনৈতিক আবর্ত প্রকাশিত হয়েছে 'পুষ্করা', 'মধুবন্তী', 'রাঙা মাসি' ছোটগল্পে। অধ্যাপক জীবনে বৃত থেকে রোমান্টিক মন নিয়ে শৈশব ও কৈশোরের অজস্র স্মৃতি সম্বল করে তিনি লিখেছেন 'ভাঙ্গা চশমা', 'দাম', 'মর্যাদা', প্রভৃতি গল্প। গল্প তিনটি কৈশোর কালের শিক্ষকদের স্মৃতি অবলম্বনে লেখা। ছাত্রজীবনের দুঃখ বেদনার কাহিনী অনুসরণে লিখেছেন 'বাইশে শ্রাবণ', 'শ্বেতকমল', 'মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু' গল্পগুলি যা তাঁর গল্প সম্ভারের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে পরিচিত। লেখকের ব্যথা বেদনার স্মৃতি বিজড়িত ছোটগল্প 'মধুবন্তী', 'দোলন চাঁপার বৃন্ত', 'সুখ', 'ক্যারিকেচার', 'মুকুন্দর পাত্রী' বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টোপ' গল্পটিতে বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি উচ্চারিত হয়েছে। সামন্ততন্ত্রের অনিবার্য পরাজয়ের কাহিনী অবলম্বনে 'রাণীর গল্প', ও 'রাজপুত্র' বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গল্প লিখেছেন, 'ইতিহাস' গল্পটি তার সাক্ষ্য বহন করে। উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পটভূমিকায় চরিত্র ও কাহিনী নিয়ে বিচিত্র রসের ছোটগল্প 'বন জ্যোৎস্না', 'বন তুলসী', 'কালাবাদর' প্রভৃতি গল্প লেখক আমাদের উপহার দিয়েছে। তাঁর মনস্তাত্ত্বিক গল্পের মধ্যে 'দুর্ঘটনা', 'ধ্বংস', 'কান্ডারী', 'সেই পাখিটি', বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর 'হাতি', 'তমস্বিনী', 'হরিণের রঙ', 'ছায়া সঙ্গিনী', 'কালপুরুষ' গল্পে রস, রূপ ও রীতির দিক থেকে পাঠক মানসে বিশেষ সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। নারী মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একজন সচেতন শিল্পী। নারী চরিত্রের বিশ্বাসঘাতকতা তাদের বিচ্ছেদ বেদনা এবং তা থেকে উত্তরণের চমকপ্রদ কাহিনী অবলম্বনে 'ঘাসবন', 'যান্ত্রিক', 'গলি' প্রভৃতি গল্পগুলিতে মধুময় প্রেমের

স্পর্শ বর্ণিত হয়েছে। কিশোরদের হৃদয় হরণের লক্ষ্য নিয়ে অ্যাড্‌ভেঞ্চার ও রোমাঞ্চ কাহিনী লিখেছেন। তাঁর অবিস্মরণীয় হাস্যরসের আকর হিসেবে 'টেনিদার গল্প' একটি অবিস্মরণীয় ছোটগল্প যা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বিচিত্র স্বাদের ছোটগল্প রচয়িতা, একাধারে তিনি ছোটগল্পের অধ্যাপক তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল ছোটগল্প, অন্যদিকে তিনি একজন বিখ্যাত ছোটগল্পকার। একদিকে সমালোচক অন্যদিকে ছোটগল্পকার হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ। রের্কড গল্পটি তাঁর সফল সৃষ্টি। যার মধ্যে চিরন্তন মুক্তির ব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়েছে। এই রেকর্ড কেউ কোনদিনও নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেনি এবং ভবিষ্যৎ কালেও কেউ পারবে না। সঙ্গীতের সর্বজনীনতার সুর রেকর্ড গল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থাপিত করেছেন।

সামগ্রিক বিচারে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একজন শক্তিমান ছোটগল্পকার। সঙ্গত কারণেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ও সাহিত্য সমালোচক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার মন্তব্য করেছেন—"তারাশঙ্করের পৌরুষ ও দীপ্তি অচিন্ত্যকুমারের মাটি আর মানুষের বলিষ্ঠ মিলন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়র নির্মম জীবনীশক্তি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের জটিল মন গহনে প্রবেশের সতর্ক পদক্ষেপ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনাশক্তিতে নতুন পথ দেখিয়েছে।"[৬৩]

ছোটগল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে বীরেন্দ্র দত্ত বলেছেন—

"যুদ্ধ, মন্বন্তর, গণবিক্ষোভে—এসবের যুদ্ধ—সমকালীন প্রেক্ষাপটে এই লেখক বিশুদ্ধ সময়-সচেনতা, জীবন-প্রেম, মানুষকে ভালোবাসা—যা, বলা যায় তিরিশের দশকের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। গল্পে চরিত্র সৃষ্টিতেই তিনি আরও সুদক্ষ।"[৬৪]

রবীন্দ্রোত্তর ছোটগল্পধারায় আশাপূর্ণা দেবী একটি স্মরণীয় নাম। 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি', পত্রিকার যুগের সাহিত্য আসরে অবতীর্ণ হয়ে মধ্যবিত্তের সুখ-দুঃখ আনন্দ বেদনা থেকে সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করে অন্তহীন কাহিনি সৃষ্টি করে অভিজ্ঞতার তপ্তবালিরাশিতে যিনি স্বচ্ছন্দে পদচারণা করেছেন এবং অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতা নিয়ে পৌঁছে গেছেন সাফল্যের তীর্থভূমিতে তিনি হলেন আশাপূর্ণা দেবী। বাংলা কথা শিল্পের আশার মঞ্জরী আশাপূর্ণা দেবী (গুপ্ত) সাহিত্যের প্রথম নান্দীপাঠ করেছিলেন ছোটগল্পের নৈবেদ্য সাজিয়ে। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর সাহিত্য জীবন সম্বন্ধে লিখেছেন—

"ছেলেবেলা থেকে প্রথম লিখতে শুরু করি কবিতা। লিখেছি অনেক, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝেছি কিছু হল না। সে চেষ্টা ছেড়ে শুরু করলাম গল্প। ছোটগল্প ছোটদের জন্য। শুরুতে অনেকদিন ধরে শিশু সাহিত্য নিয়ে ছিলাম। শিশুদের খানিকটা খুশী করতে পেরেছি এই আমার সাহিত্যিক জীবনের বিশেষ পুরস্কার। অতঃপর বড়দের জন্য। কিছুকাল গেছে নিছক কৌতুক সৃষ্টির কাজে। রঙ্গ রচনাতে ছিল আনন্দ। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে জীবনের অভিজ্ঞতা, নিতে চেয়েছি তার স্ন্যাপ শর্ট। কি জানি তার কতটুকু পেয়েছি।"[৬৫]

সাহিত্য জীবনের ৪০ বছরে আশাপূর্ণা দেবী মোট ৩০০ টি ছোটগল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন। যে গল্পগুলিতে একাধারে রয়েছে বিষয় বৈচিত্র্য অন্যদিকে গভীর ভাব

ব্যঞ্জনার সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর ছোটগল্পে আমাদের দিয়েছেন আশার সুর। আশাপূর্ণা ছিলেন মধ্যবিত্ত বাঙালির পারিবারিক জীবনের নিপুণ চিত্রকর। তাঁর প্রথম মুদ্রিত বয়স্কদের জন্য লিখিত ছোটগল্প 'পত্নী ও প্রেয়সী' ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় অন্তর্লোকের নিপুণ রূপকার হিসেবে। বলাবহুল্যে এই রূপ কল্প চিত্রিত হয়েছে গত ৪০ বছরে মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনকে ঘিরে। গল্প লিখতে গিয়ে তিনি কখনো পাঠক মনকে জয় করবার জন্য কোনো চমকপ্রদ বিষয়ের আমদানি করেননি। তাঁর ছোটগল্পের জীবন চেনা সংসারের চেনা মানুষদের কথা। এরূপ ছোটগল্প লেখার ক্ষেত্রে ছোটগল্পকারের যে শক্তিমত্তার পরিচয় থাকা উচিৎ আশাপূর্ণা দেবী শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। জীবনের অন্তর্গূঢ় জটিলতা কূটৈষণা মনোগহনের আলো আঁধারি পরিবেশ রূপায়িত হয়েছে তাঁর ছোটগল্পে। 'কালের পুত্তলিকা ছোটগল্পের একশ বছর' গ্রন্থে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন— "১৯৩৯ থেকে ৪৭-এর লেখক গোষ্ঠী পরিবর্তমান সমাজ ভাঙ্গন ও বিপর্যয় সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁরা হয়ত বারুদের গন্ধ পাননি কামানের গর্জন শোনেননি কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত বিক্ষোভের জগতে পা ফেলেছেন দূরে দেখেছেন বহ্নি বলয় বেষ্টিত দিগন্ত। তাঁদের গল্পে যুগের দাবি স্বীকৃত হয়েছে। সেই দাবি? ....সাহিত্যিক আঁজ শূন্যচারী স্বপ্ন বিহঙ্গম হয়ে থাকবেন না, মাটির পৃথিবীতে মাটির মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি সৈনিক ব্রত গ্রহণ করবেন নিঃসন্দেহে এই দাবি মেনে নিয়েছিলেন আশাপূর্ণা দেবী।"[৬৬]

আশাপূর্ণাদেবীর ছোটগল্প সংকলন গ্রন্থ 'জল আর আগুন', 'সাগর শুকায়ে যায়', ' শ্রেষ্ঠ গল্প', 'আর এক দিন', 'সরস গল্প', 'পূর্ণ পাত্র', 'স্বপ্ন শর্বরী', 'গল্প পঞ্চাশৎ', 'পঞ্চীমহল', 'নব নীড়', 'কেশবতী কন্যা', 'মনোনয়ন', 'ছায়াসূর্য', 'অতলান্তিক', 'সোনালী সন্ধ্যা', 'সাজবদল', 'আকাশ মাটি', 'কাঁচ পুতি হীরে', 'ভোরের মল্লিকা', 'এক আকাশের অনেক তারা', 'বাছাই গল্প', 'নক্ষত্রের আকাশে', 'গল্পগুচ্ছ' প্রভৃতি আলোচ্য গল্পগ্রন্থের বেশির ভাগ গল্পে আমরা লক্ষ্য করি নারী চরিত্রের প্রাধান্য। গল্পগুলিতে লেখক ব্যক্তিত্বের ছাপ বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পে আশাপূর্ণাদেবীর লেখনীতে পুরুষ শাসিত সমাজের নারী জাতির সামাজিক দৈহিক নিপীড়নের কাহিনিগুলো সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। এই ছোটগল্পগুলোতে দেখানো হয়েছে যোগ্য ব্যক্তি যোগ্যতার সমাদর পায়নি। অযোগ্য ব্যক্তি সমাজের উচ্চস্থানে বসে কিভাবে স্বেচ্ছাচারিতা চালায় তার বাস্তব ছবি। তাঁর ছোটগল্পে যেমন পুরুষের দ্বারা নারী নির্যাতিত হয় তেমনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীদের চরম উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্র দেখানো হয়েছে। জীবনের বহু বিচিত্র রূপই তাঁর ছোটগল্পে বিভিন্ন ভাবের উপজীব্য হয়ে উঠেছে। ছোটগল্পে তাঁর সমস্ত সৃষ্ট চরিত্রগুলো প্রতি লেখিকার সমান সহানুভূতি ছিল যা তাঁর সাহিত্যকে এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের রূপদান করে। মানুষের নিত্য দিনের আশা আকাঙ্ক্ষা ছোট ছোট সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনা ছোট ছোট হীরক খন্ডের ন্যায় তাঁর গল্পকে করেছে সমৃদ্ধ। তাঁর লিখিত গল্পগুলি হল বড় আকারে গল্প—'স্বপ্ন

সৌধ', 'ভয়ঙ্কর অচেনা', 'ফালতু', 'মাকড়সার সেই জালটি', 'বাঁচলো কি' এবং ছোট আকারে গল্পগুলি হল 'ঐশ্বর্য', 'আত্মহত্যা', পদ্মলতার স্বপ্ন, বন্দিনী, নিরাশ্রয়, যা নয় তাই, লোকসান, সম্ভ্রম, পাতাল প্রবেশ, পদাতিক, পত্রাবরণ, যা হয় তাই, ব্রহ্মাস্ত্র, কসাই, দেশলাই বাক্স, কাঠামো, শোক, .পল্লীমহল, ছায়াসূর্য, আকাশ মাটি, পৌরুষ, এই পৃথিবী, যান্ত্রিক, মুরুব্বি, দত্তাপহারক, লজ্জাশরম, পারা না পারা, উদ্‌ঘাটন, স্থির চিত্র, বেকসুর, স্বর্গের বারান্দায় উঠে, বেশী জরুরী, মৃত্যুবাণ, প্রথম ও শেষ, দুঃসাহসিক, আমি একটা মানুষ নই, একজন শ্রদ্ধেয় কাপুরুষের হাতে, রিফিল ফুরিয়ে যাওয়া ডট পেন, কুয়াশা, তোমার মুখে আয়নার ছায়া, আদর্শবাদ, ধুলির প্রাপ্য, ধুলিরে না দিলে, স্মৃতির অতলে, নিয়মের চাকায়, ভয়, ওরা কথা বলেনা, মাটির নীচে, ফাঁস, ছুরির ধার, পরিবর্তন, তুচ্ছ নয়, বাড়ি, কমলি, রেহাই, যা ছিল সেখানে প্রভৃতি। আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ সন্দেহ নেই।

ডঃ ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

"আশাপূর্ণাদেবীর গল্পের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে ১) তিনি সরাসরি গল্পের মাঝখানে পাঠককে দাঁড় করিয়ে দেন বর্ণনার গুণে। আবার গল্পগুলি যেহেতু বেশিরভাগই আমাদের পরিচিত, মধ্যবিত্ত পরিবারের পটভূমিতে রচিত, সেহেতু পাঠক প্রতিমুহূর্তে চমৎকৃত হন তাঁর অতি পরিচিত পরিবেশের নিপুণ বর্ণনা ও তার অন্তর্নিহিত গুরুভার সত্যের উদ্‌ঘাটনে। ২) নারী বলেই বোধহয় নারী চরিত্রের মহত্ব, ক্ষুদ্রত্ব বা ভয়ঙ্করতা অনায়াসে চিত্রিত করেন। ৩) সংসার থেকে উঠে আসে তাঁর গল্পের জীবন্ত সংলাপসমূহ। ৪) জীবনের অতি ভয়ঙ্কর সত্য কথাগুলি অতি সহজ সুরে বলেন বলেই ভয়ঙ্কর সত্যগুলি পাঠকের চৈতন্যে শেলের মতো বিঁধে যায়।"[৬৭]

বিংশ শতাব্দীর ৪০-এর দশকের এক উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। তিনি সেই সমস্ত মধ্যবিত্ত ধনী ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধি ও আবেগ থেকে হৃদসর্বস্ব নিম্ন শ্রেণির নাগরিক সম্প্রাদায়ের জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত তাঁর প্রথম পর্যায়ের ছোটগল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে অপেক্ষাকৃত যারা নগর জীবনের দরিদ্র শ্রেণিতে রূপান্তরিত হয়েছে এই সর্বহারা শ্রেণির প্রতি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। নাগরিক জীবনের কথাকার হিসেবে তিনি বিষ ও অমৃত দুটোকেই পান করে বিষয়বস্তু ও প্রকরণে সূক্ষ্ম কবিত্বের উপযোগী করে তুলেছেন। সমন্বয়বাদে বিশ্বাসী হয়ে তিনি সমকালীন বিষয় ও প্রতীকী ব্যঞ্জনার মেলবন্ধন রচনা করেছেন। জীবনের মেকি মূল্যবোধকে এক নিরন্ধ্র অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে জীবন আর্তিকে শিল্পকুশলতার সঙ্গে পরিচিত করেছেন। তাঁর ছোটগল্পে সেক্স আছে কিন্তু তার মধ্যে নেই কোনো বিকৃতি, সেখানে আমরা খুঁজে পাই সৌন্দর্যকে ও আধ্যাত্মিক চেতনাকে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ইটের পর ইট গেঁথে ছোটগল্পের ইমারত গড়ে তুলেছেন। তাঁর ১৪, ১৫ বছর বয়সে লেখা 'নদী ও নারী' গল্পটি তাঁকে এনে দিয়েছে খ্যাতির জগতে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলন গ্রন্থগুলি যথাক্রমে 'খেলনা', 'পালিশ', 'খেলোয়াড়', 'চামচ', 'চার ইয়ার' বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর কিছু কিছু গল্পে এমিল জোলার প্রভাব

বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। 'শ্বাপদ', 'ঘরনী', 'জৈব চেতন', 'শালিক কি চড়ুই', 'ভাত', 'খাদক', 'রূপালি মাছ', 'পতঙ্গ', 'শয়তান', 'ফুলফোঁটার দিন', প্রভৃতি ছোটগল্পে যৌনতা মিশে থাকলেও তাঁর সূক্ষ্ম সংবেদনশীল দৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ সন্দেহ নেই। বর্ণনা গুণে, সংলাপে, উপমা প্রয়োগে ও চরিত্র সৃষ্টিতে গল্পগুলি শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাছাই গল্পগ্রন্থে সম্পাদক সুব্রত রাহা ও অজয় দাশগুপ্ত 'কালপুরুষ' পত্রিকা থেকে একটি সাক্ষাৎকারে লেখক জানিয়েছেন মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়ের চিত্র আঁকতে গিয়ে সবচেয়ে সৃষ্টিশীল কিংবা অবক্ষয়ের সার্থক কথাশিল্পী হিসেবে তাঁকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

নিসর্গপ্রকৃতি ও জৈবপ্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে পরিচিত হয়ে আছে তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প 'বৃষ্টির পরে' ও 'চন্দ্র মল্লিকা' গল্পদুটি। পুরী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর 'সমুদ্র' গল্পটি বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। নারী ও নিসর্গকে জ্যোতিরিন্দ্র দেখেছেন দু'চোখ ভরে 'সুখী মানুষ', 'তাকে নিয়ে গল্প' এই শ্রেণির নিদর্শন। অমর কবিতা ও সুখ গল্পদুটিতে করুণ সুর ধ্বনিত হয়েছে। রাজনৈতিক গল্পে তিনি ব্যঙ্গের সংযোজন ঘটিয়েছেন- 'বিকাশের খেলা', 'হিমির সাইকেল শেখা' ছোটগল্পে গরিবি হটাও শ্লোগান নিঃসন্দেহে ব্যঙ্গের নামান্তর। 'ইস্টিকুটুম' গল্পে তিনি যে একজন চিত্রশিল্পী ছিলেন তার পরিচয় বহন করে তাঁর প্রকৃতি প্রেম ও সৌন্দর্যবোধ সমৃদ্ধ 'বনের রাজা' ছোট গল্পে। গল্পটিতে সবুজ মানুষ জন্মগ্রহণ করল। যে সবুজ মানুষরা যুগ যন্ত্রণার কৃত্রিমতা থেকে সুদূর অতীতে ফিরে যাওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সমাজ ও সমস্যামূলক ছোটগল্প হিসেবে 'চোর' গল্পটি অনবদ্য সৃষ্টি। তিনি যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মননধর্মী গল্পকার আলোচ্য ছোটগল্পে তার প্রমাণ মেলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের অন্যতম কথাকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত নাগরিক চেতনার লেখক। বলা বাহুল্য তাঁর ছোটগল্পে জন্মভূমি ফরিদপুর জেলার খন্ডচিত্রের প্রভাব নেই। তাঁর গ্রামীণ সৌরভপূর্ণ ছোটগল্পগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ১৩৪৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর প্রথম গল্পসংকলন 'অসমতল'। তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত গল্পগ্রন্থগুলি যথাক্রমে 'হলদে বাড়ি' (১৯৪৫), 'উল্টে রথ' (১৯৫৩), 'পতাকা' (১৩৫৪), 'চড়াই উৎরাই' (১৩৫৬), 'পাটরাণী' (১৩৫৭), 'শ্রেষ্ঠগল্প' (১৩৫৯), 'কাঠ গোলাপ' (১৩৬০), 'অসবর্ণস্ব' (১৩৬১), 'ধূপকাঠি' (১৩৬১), 'মলাটের রঙ' (১৩৬২), 'রূপালী রেখা' (১৩৬৩), 'দীপান্বিতা' (১৩৬৩), 'ওপাশের দরজা' (১৩৬৩), 'একূল ওকূল' (১৩৬৩), 'বসন্ত পঞ্চম' (১৩৬৪), 'মিশ্ররূপ' (১৩৬৪), 'উত্তরণ' (১৩৬৫), 'পূর্বতনী' (১৩৬৬), 'অঙ্গীকার' (১৩৬৬), 'দেবযানী' (১৩৬৬), 'রূপ সজ্জা' (১৩৬৬), 'সভাপর্ব' (১৩৬৬), 'স্বরসন্ধি' (১৩৬৭), 'ময়ূরী' (১৩৬৮), 'বিদ্যুৎ লতা' (১৩৬৮), 'পত্রবিলাস' (১৩৬৮), 'মিসেস গিন' (১৩৬৮), 'বিন্দু বিন্দু' (১৩৬৮), 'একটি ফুলকে নিয়ে' (১৩৬৯), 'বিনি সুতার মালা' (১৩৬৯), 'যাত্রাপথ' (১৩৬৯), 'সুধা হালদার ও সম্প্রদায়' (১৩৬৯), 'অনধিকারিণী' (১৩৬৯), 'রূপলাগি' (১৩৭০), 'চিলে কোঠা' (১৩৭১), 'প্রজাপতির রঙ' (১৩৭২), 'অন্য নয়ন' (১৩৭২), 'বিবাহ বাসর' (১৩৭৩), 'চন্দ্রমল্লিকা' (১৩৭৪)

, 'সন্ধ্যারাগ' (১৩৭৫), 'সেই পথটুকু' (১৩৭৬), 'অনাগত' (১৩৮২), 'পালঙ্ক' (১৩৮২), 'উদ্যোগ পর্ব' (১৩৮২), 'বর্ণবহ্নি' (১৩৮৪), 'বিকালের আলো' (১৯৮৩), 'নাগরিক প্রেমের উপাখ্যান' (১৩৯০), 'গল্পমালা-১' (১৯৮৬), 'কিশোর গল্পসমগ্র' (১৩৯৫), 'গল্পমালা-২' (১৯৮৬), 'স্রোতস্বতী' (১৯৮৯), 'সাধ সুখ স্বপ্ন' (১৯৯০), 'এইটুকু বাসা' (১৯৯০), 'গল্পমালা-৩' (১৯৯২) প্রভৃতি। নরেন্দ্রনাথ মনস্তত্ত্বের রূপকার হিসেবে পরিচিত। চেনা মানুষের জীবন নিয়ে তাঁর গল্পের কাঠামো সাজিয়েছেন। চাকুরিজীবী, শিল্পী, গৃহস্থ যাদের পরিচয় ভদ্রলোক হিসেবে তিনি তাদের মুখ আর মুখোশ খুলে দিয়ে আমাদের উপহার দিয়েছেন অসংখ্য ছোটগল্প। নরেন্দ্রনাথ মিত্র এক সাক্ষাৎকারে নিজের লেখা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

"সমাজে শঠতা আছে, ক্রুরতা আছে, তা আমি জানি। হিংসা বিদ্বেষেরও অভাব নেই। কিন্তু সমাজজীবনের এই অন্ধকার দিকের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় কম। ....শান্ত মধুর ভাবই আমার রচনায় বেশি। ....জীবনের পঙ্কিল অথবা ক্লেদাক্ত দিকে আমার নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতা তেমন কিছু নেই। আমার মেজাজ রোমান্টিক সৌন্দর্যপ্রিয়। তাই মহত্ত্বই আমায় আকর্ষণ করে বেশি।"[৬৮]

লেখক হিসেবে তিনি ছিলেন রোমান্টিক সৌন্দর্য প্রিয় ও শান্ত মধুর ভাবপ্রকাশের দিক দিয়ে অদ্বিতীয়। তাঁর সমকালীন লেখক ও সমালোচক অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে— "মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক ঘাত-প্রতিঘাতে বাইরের পরিবেশ হয়তো বদলায় কিন্তু তার চাইতে বেশী বদলায় মানুষের মন—মনের এই রঙ ফেরতার কাহিনীই তিনি বিশেষভাবে ফুটিয়েছেন তার গল্পগুলিতে।"[৬৯] ১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত ৪০০ গল্প লিখে তিনি চেনা পৃথিবীর অচেনা গন্ধের আমদানি করেছেন। তাঁর কুমার সম্ভব গল্পটি ফরিদপুরের স্মৃতি বিজড়িত, তাঁর বিখ্যাত রস গল্পটি মানবিক অনুভবের গল্প। 'আবরণ' গল্পে বস্ত্র সমস্যা ও মন্বন্তর, 'টর্চ' মনস্তাত্ত্বিক গল্প, 'সুহাসিনী তরল আলতা' গল্পে মানব মনের নিগূঢ় রহস্য উদঘাটিত হয়েছে। 'বিলম্বিত লয়', 'ছবি', 'অঙ্গীকার', 'শ্বেতকমল', 'আকিঞ্চন', 'যবনিকা', 'ভূষণ ডাক্তার', 'অনুচ্চ', 'দাম্পত্য', 'লালবানু', 'নাকুটমণি', 'কোন দেবতাকে' প্রভৃতি গল্পে প্রেম মনস্তত্ত্ব সুকৌশলে বর্ণনা করে তিনি শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। 'টিকিট', 'সেতার', 'পুনশ্চ', 'সহযাত্রিণী', 'চোরাবালি' গল্পে ভদ্রবেশী ব্যক্তিদের মুখোশ তিনি খুলে দিয়েছেন। বাংলা ছোটগল্পের জগতে নরেন্দ্রনাথ মিত্র এক সার্থক শিল্পী সন্দেহ নেই।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেনঃ

"মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার, যুদ্ধোত্তর জীবনের সাক্ষী হয়েও হৃদয়বান, বিবেকবান ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র। উপন্যাস ও ছোটগল্পের বিষয় চয়নে ও আঙ্গিক বয়নে তাঁর নৈপুণ্য কালের স্বীকৃতি লাভের পক্ষে উপযুক্ত। তাই বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর অবদান অনিঃশেষ।"[৭০]

ডঃ বিজিত ঘোষের মতে—

" নরেন্দ্রনাথ মিত্রের পতাকা রাজনৈতিক মতাদর্শ ও সংঘাতের গল্প। দেশকালের চিহ্ন গল্পটির সর্বাঙ্গে স্বাধীনতা দিবসে পতাকা তোলা নিয়ে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত বেধে যায়।"[৭১]

ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন:

"নরেন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্পেরই শুরু খুবই সামান্য বা ছোটখাট ঘটনা দিয়ে, কিন্তু পরিণতিতে তা বিশাল সমস্যার আকার ধারণ করে, এবং শুধু সমস্যার বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ না থেকে তার কারণ সূত্রের নির্ভুল উন্মোচন নরেন্দ্রনাথ সমস্যাকে গল্পে গভীরতা দান করেন।"[৭২]

সমকালীন বাংলা ছোটগল্পকারদের পাশাপাশি প্রমথনাথ বিশীর কথা সাহিত্য সৃষ্টি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি ছিলেন বৈচিত্র্যপিয়াসী ছোটগল্পকার। তাই তিনি মানবজীবনের বহু বিচিত্ররূপ ফুটিয়ে তুলেছেন ছোটগল্পের অঙ্গনে। বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে গতানুগতিকতার স্রোতে না ভাসিয়ে তিনি এক অভিনব শিল্পকলার পরিচয় দিয়েছেন। প্রথমনাথ বিচিত্রধর্মী, সব্যসাচী ছোটগল্পকার রূপে বাংলা ছোটগল্পকে অপরূপ ভাবে তুলে ধরেছেন। ব্যঙ্গধর্মী ছোটগল্পকার হিসেবে তিনি অসামান্য সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। বলা বাহুল্য নাট্যকার বার্ণাড শ'র অনুসারী ছিলেন তিনি। রঙ্গব্যঙ্গমূলক ছোটগল্পগুলিতে তিনি শুধুমাত্র অপরের অসঙ্গতিকে নিয়ে লেখেননি। সেই সঙ্গে নিজেকে নিয়ে রসিকতা করেও আনন্দ পেয়েছেন।

সত্য ও সুন্দরের পূজারী প্রমথনাথ ছিলেন মানব প্রেমিক। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর ছোটগল্পের মূল উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। সমাজ সচেতন শিল্পী প্রমথনাথ সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বিষয়ের ত্রুটিগুলোকে হাস্যরসের প্রবাহে ভাসিয়ে নিয়েছেন। তাঁর অজস্র ছোটগল্পে এরূপ প্রমাণের অভাব নেই। অনেকক্ষেত্রে তিনি ব্যঙ্গের স্থূল নির্মমভাবে বিদ্ধ করেছেন। বলা বাহুল্য প্রথমনাথের সাহসিকতা, সততা, নিষ্ঠা ও স্পষ্টবাদিতার জন্য অনেকের কাছে তিনি জনপ্রিয় হতে পারেননি একথা জেনেও তিনি তাঁর আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেননি।

প্রমথনাথের বহু ছোটগল্প আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত লেখনীতে পরিচিত জগৎকে তিনি নূতনভাবে দেখাতে পেরেছেন। অন্যদিকে তাঁর অতীতচারিতার পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে বিভিন্ন ছোটগল্পে। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ছোটগল্পের উপস্থাপনায় কিংবা রাজনীতি, শিক্ষা ও অতিপ্রাকৃত ছোটগল্পগুলি প্রমথ প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তিনি কেবলমাত্র পরশুরামের মত ব্যঙ্গধর্মী ছোটগল্পকারই নন, কিংবা কৌতুকরসযুক্ত ও গভীর জীবনবোধ তাঁর ছোটগল্পের মূল আলোচ্য বিষয় নয়, তাঁর লেখনীর স্পর্শ যেখানে যেখানে পড়েছে সেখানেই সার্থক ছোটগল্পের সৃষ্টি হয়েছে। জীবনের খন্ডাংশ অবলম্বনে সংযত বাক্‌বিন্যাসে, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায়, আখ্যান গঠনে, কাব্য ব্যঞ্জনায়, নাট্যধর্মীতা ও প্রকৃতি চিত্রণে এবং চিরন্তন মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ তাঁর ছোটগল্পগুলি নূতনত্বের সন্ধান এনে দিয়েছে।

প্রমথনাথ বিশীর সমকালীন ছোটগল্পকারগণ প্রত্যেকেই এক একটা নিজস্ব জগৎ বেছে নিয়েছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে তারাশঙ্কর বেছে নিয়েছিলেন রাঢ় এর জীবনধারা,

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন করেছিলেন প্রকৃতিকেন্দ্রিক জীবন, অন্যদিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রহণ করেছিলেন নাগরিকজীবনকে, যেখানে মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও জৈবিক সমস্যার বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে। এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পগুলিতে বিশেষ কোন একটি সমাজ বা আঞ্চলিকতার রূপ নেই। মূলত সমকালীন জীবনধারার উপর দাঁড়িয়ে তাঁর ছোটগল্পগুলি আমাদের সমাজ জীবনের প্রচলিত নানা সমস্যা ও অসংগতিকে ব্যঙ্গের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই হচ্ছে প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পের মূল লক্ষণ এবং এখানে ছোটগল্পকার হিসেবে তাঁর স্বাতন্ত্র্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে তিনি ব্যঙ্গচ্ছলে তাঁর ছোটগল্পগুলিকে 'নিকৃষ্ট' ও 'নিকৃষ্টতর' বলে অভিহিত করলেও গল্পগুলির শিল্পমূল্য হিসেবে মোটেই 'নিকৃষ্ট' বা 'নিকৃষ্টতর' ছিল না। বরং হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গধর্মী গল্পের যে ধারা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় হাত ধরে এগিয়ে এসেছে সেই ধারাটি পরিপুষ্ট হয়েছে যে দু'জন লেখকের হাতে তাঁর মধ্যে প্রমথনাথ অন্যতম। অপরজন হলেন পরশুরাম বা রাজশেখর বসু। পরশুরাম ও প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পগুলিতে আমাদের জীবনের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে, যা অত্যন্ত মূল্যবান ও অনন্যসাধারণ সৃষ্টি। কারণ তার ভিতর দিয়ে আমরা আমাদের সময়ের অথবা একালের জীবনধারার নানান ত্রুটি বিচ্যুতি, অসংগতি, বিকৃত ঘটনা ও মানসিকতার স্পষ্ট ছবি খুঁজে পাই। প্রমথনাথ বিশী এভাবে হয়ে উঠেছেন সমাজ সচেতন জীবন শিল্পী। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পকে তিনি এভাবেই সমৃদ্ধ এবং পরিপুষ্ট করে গেছেন। সেই সঙ্গে প্রেম, প্রকৃতি, ইতিহাস, অলৌকিক জগৎ, পুরাণাশ্রিত বিষয় নিয়ে লেখা তাঁর ছোটগল্পগুলি বাংলাসাহিত্যের চিরকালীন সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

উল্লেখপঞ্জী

(১) রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প প্রমথনাথ বিশীর পাদটীকা—পৃঃ ১০৪

(২) তদেব—পৃঃ ৩৯

(৩) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—সুকুমার সেন—পৃঃ ২৩৮

(৪) তদেব—পৃঃ ২৫৬

(৫) বাংলা সাহিত্যের রেখালেখ্য—অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ৪১৬

(৬) রবীন্দ্রনাথ : ছোটগল্পের প্রকরণ শিল্পী—গোপিকানাথ রায় চৌধুরী—পৃঃ ২০

(৭) কালের পুত্তলিকা—বাংলা ছোটগল্পের একশ বছর (১৮৯১-১৯৯০)—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—পৃঃ ৩০৪

(৮) প্রভাতকুমারের জীবন ও সাহিত্য (১৯৭৩)—ডঃ শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায়—পৃঃ ২৬২-৬৩

(৯) প্রভাতকুমারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র—

(১০) বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ২১৮

(১১) কালের পুত্তলিকা—বাংলা ছোটগল্পের একশ বছর (১৮৯১-১৯৯০)—ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—পৃঃ ১৩৮

(১২) তদেব—পৃঃ ১৬০

(১৩) শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার— ডঃ অজিত ঘোষ—পৃঃ ৩৮৯

(১৪) মনীষা ও মনঃসমীক্ষণ—অমলশঙ্কর রায়—পৃঃ ৮৬

(১৫) তদেব— পৃঃ ৯১

(১৬) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খন্ড)— অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ১৯২

(১৭) পরশুরামের গল্পগসমগ্র— প্রমথনাথ বিশী ভূমিকা সমগ্র — ভূমিকা অংশ—পৃঃ ৩

(১৮) বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ— ডঃ বীরেন্দ্র দত্ত—পৃঃ ৩২

(১৯) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত— অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ৫৩৬

(২০) গল্প লেখার গল্প— প্রেমেন্দ্র মিত্র—পৃঃ ৮৫

(২১) বাংলা সাহিত্যের রেখালেখ্য— অলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ৪৫২

(২২) প্রসঙ্গঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র— ডঃ রামরঞ্জন রায়—পৃঃ ৮৫

(২৩) জগদীশ গুপ্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি

(২৪) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন দৃষ্টি ও শিল্পরীতি— গোপিকানাথ রায়চৌধুরী—পৃঃ ১০৪-১০৫

(২৫) মানিকের ছোটগল্পঃ শিল্পীর নবজন্ম—আশিষকুমার দে—পৃঃ ৩৩

(২৬) বিভূতিভূষণের গল্প সমগ্র ভূমিকা— জীতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—পৃঃ ২

(২৭) বাংলা গল্প বিচিত্রা— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—পৃঃ ১৭৬

(২৮) শিল্পীর দায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়— সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরী—পৃঃ ৮৩
(২৯) বিভূতিভূষণ গল্প সমগ্র - ভূমিকা অংশ— জীতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পৃঃ ৩-৪
(৩০) বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা— ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৪২৩
(৩১) বাংলা সাহিত্যের রেখালেখ্য— আলোকরঞ্জন ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ৩৭১
(৩২) অপ্রবাসী বিভূতিভূষণ মুখোপধ্যায়— মঞ্জুলা ঘোষ—পৃঃ ২০৪
(৩৩) বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার— ভূদেব চৌধুরী—পৃঃ ৫৮২
(৩৪) জীবনানন্দঃ জীবন আর সৃষ্টি— সুব্রত রুদ্র—পৃঃ ৮০৮
(৩৫) বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার— ভূদেব চৌধুরী—পৃঃ ৮৫২
(৩৬) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা— ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ৪৭৮
(৩৭) বনফুল ঃ জীবন, মন ও সাহিত্য— ডঃ উর্মি নন্দী—পৃঃ ৭৪
(৩৮) কথাকোবিদ বনফুল— ডঃ নিশীথ মুখোপাধ্যায়—পৃঃ ১৪০-১৪১
(৩৯) বনফুলের ফুলবন— ডঃ সুকুমার সেন—পৃঃ ৬৮
(৪০) বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার— ভূদেব চৌধুরী—পৃঃ ৫৮২
(৪১) বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ— বীরেন্দ্র দত্ত—পৃঃ ৪৪৪
(৪২) বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা— শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ৬০৪
(৪৩) বাংলা সাহিত্যের পরিচয়— ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়—পৃঃ ৪৫৩
(৪৪) ভাঙা কাঁচের শিল্প—বাংলা ছোটগল্পের শিল্পীদল—পৃঃ ৭২
(৪৫) ধূর্জটিপ্রসাদের 'নতুন ও পুরাতন বক্তব্য' প্রবন্ধ—পৃঃ ৭৫
(৪৬) বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসেব ধারা ৪র্থ সংস্করণের দ্রষ্টব্য ভূমিকা-অন্তঃশীলা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ১০
(৪৭) ভাঙ্গা কাঁচের শিল্প - বাংলা ছোটগল্পের শিল্পীদল প্রথম পর্ব—মনীষা রায়ের চাচাকাহিনী প্রবন্ধ—পৃঃ ১৭১
(৪৮) কালের পুত্তলিকা, বাংলা ছোটগল্পের একশ বছর (১৮৯১-১৯৯০)—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—পৃঃ ৩১৮
(৪৯) সুমথনাথ ঘোষের গল্পসমগ্র ভূমিকা অংশ— প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২
(৫০) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত— অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ৫৯১
(৫১) হাসির উপকরণ ঃ ম্যাজিক লণ্ঠন গ্রন্থ— পরিমল গোস্বামী—পৃঃ ২৯৭
(৫২) তদেব—পৃঃ ১১৮
(৫৩) বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক— প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২৫০
(৫৪) বঙ্কিমচন্দ্র ও উত্তরকাল— প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২৭৬
(৫৫) তদেব—পৃঃ ১৯০

(৫৬) বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার— ভূদেব চৌধুরী—পৃঃ ৬৭২

(৫৭) আমার কথা— শিবরাম চক্রবর্তী—পৃঃ ৮১

(৫৮) শিবরামকে লেখা প্রমথ চৌধুরীর চিঠি

(৫৯) কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা— অলোক রায়—পৃঃ ৮২

(৬০) কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের একশ বছর - (১৮৯১-১৯৯০)—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—পৃঃ ৪৩১

(৬১) তদেব—পৃঃ ১৮০

(৬২) বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা— শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ-৫০২

(৬৩) সাহিত্যের রূপ ও রীতি— উজ্জ্বলকুমার মজুমদার—পৃঃ ১৮২

(৬৪) বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ— বীরেন্দ্র দত্ত—পৃঃ ৫১০

(৬৫) আশাপূর্ণাদেবীর রচনা সমগ্র ২য় খন্ড—পৃঃ ১২

(৬৬) কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের একশ বছর (১৮৯১-১৯৯০)— অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—পৃঃ ৪০৭

(৬৭) বাংলা ছোটগল্প রীতি প্রকরণ ও নিবিড় পাঠ— ডঃ ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী—পৃঃ ১৯৩

(৬৮) তদেব—পৃঃ ২৮২

(৬৯) বাংলা গল্প বিচিত্রা— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—পৃঃ ২৩০

(৭০) বাংলা সাহিত্যের পরিচয়— ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়—পৃঃ ৪৫৩

(৭১) বাংলা ছোটগল্পে প্রতিবাদী চেতনা— ডঃ বিশ্বজিত ঘোষ— পৃঃ ৩৩৭

(৭২) কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের একশ বছর (১৮৯১—১৯৯০)—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় —পৃঃ ৪০৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রমথনাথের ছোটগল্পের পটভূমি ও তাঁর লেখক স্বভাবের উৎস ঃ সমকালীন মুখ্য ঘটনাপুঞ্জ

যে কোনো সাহিত্য স্রষ্টার সাহিত্য সৃষ্টির নেপথ্যে থাকে বিভিন্ন প্রভাব। স্রষ্টার ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতা সাহিত্য সৃষ্টির গতিপ্রকৃতির নির্ণায়ক। কাজেই লেখকের ব্যক্তি জীবনের প্রবণতাকে না জানলে তাঁর সাহিত্যের মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বাংলা সাহিত্যে প্রমথনাথ বিশীর আবির্ভাব কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির উন্মেষলগ্ন থেকে সাহিত্য রচনার শেষ দিন পর্যন্ত বৃহৎকাল পর্বে একে একে পারিবারিক ঐতিহ্য, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পরিমন্ডল এবং তৎকালীন যুগ জীবনের অসংখ্য বৈচিত্র্যময় ঘটনাপুঞ্জ সেই সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিদগ্ধ সাহিত্যিকদের প্রভাব, সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক তথা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রভৃতি বিষয় লেখককে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং এর থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে গড়ে ওঠে লেখকের জীবন দর্শন ও শিল্পী মানসের যথার্থ পরিচয়। প্রমথনাথের ছোটগল্পের পটভূমি আলোচনা করতে গেলে তাঁর ব্যক্তিজীবনের বহু ঘটনা যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই।

প্রমথনাথ বিশীর জন্ম অবিভক্ত উত্তরবঙ্গের রাজশাহী জেলায়। এই জেলার নাটোর মহকুমার অন্তগর্ত জোয়াড়ী গ্রামে ১৯০১ খ্রিঃ ১১জুন, বঙ্গাব্দ ২৮ শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮ তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম নলিনীনাথ বিশী। পিতা নলিনীনাথ বিশী ছিলেন বৃহৎ রাজশাহী জেলার প্রথম গ্র্যাজুয়েট ও প্রভাবশালী জমিদার কেদারনাথ বিশীর দত্তক পুত্র। তাঁর মাতার নাম সরোজবাসিনী দেবী। প্রমথনাথের বাল্য জীবন কেটেছে অপার শান্তি ও সমৃদ্ধির লীলা নিকেতন সুজলা সুফলা নদী মাতৃক উত্তরবঙ্গের একটি ছোট্ট গ্রামে। মাত্র নয় বছর বয়সে পল্লীর এক স্নিগ্ধ সৌন্দর্য থেকে আর এক খন্ড সৌন্দর্যে ঘেরা শান্তিনিকেতনে শিক্ষাসূত্রে তাঁকে আসতে হয়েছিল। জীবনের সতেরো বছর শান্তিনিকেতনের মা মাটি ও মানুষের সঙ্গে তাঁর ঘটেছে আত্মিক পরিচয়। এরপর আবার জন্মভূমি রাজশাহীতে প্রত্যাবর্তন। কলেজ শিক্ষা অন্তে সংসার জীবনের তাঁর অনুপ্রবেশ ঘটেছে এরপর কর্মসূত্রে তিনি রাজশাহী ছেড়ে চলে এসেছেন কলকাতার লেকগার্ডেন্সে। বলতে গেলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এখানেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন। মাঝে মাঝে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে তিনি গিয়েছেন, রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। স্বদেশ ও আন্তর্জাতিক ঘটনাধারার সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি অধ্যাপনা জীবন ও পত্র-পত্রিকার দায়িত্বভার নিয়ে বিচিত্র জন জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। ব্যক্তি জীবনের মুখ্য ঘটনাপুঞ্জ ও সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বিভিন্ন ঘটনাবলী তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। প্রমথনাথের সাহিত্য সৃষ্টির নেপথ্যে তিনটি পর্বকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। পর্ব তিনটি যথাক্রমে শান্তিনিকেতন পর্ব, রাজশাহী

পর্ব ও কলকাতা পর্ব। এই ত্রিকোণ পৃথিবী প্রমথনাথের সাহিত্য সৃষ্টির ভৌগোলিক পরিমন্ডল বলা যেতে পারে।

পিতা, মাতা, আত্মীয় পরিজন ও জোয়াড়ী গ্রামের প্রতিবেশী বন্ধুদের নিয়ে প্রমথনাথের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে। তাঁর বাল্য নাম ছিল 'ননী'। উদার উন্মুক্ত গ্রাম বাংলার লাবণ্যময় প্রকৃতি তাঁর কিশোর জীবনে এনে দিয়েছিল মুক্তির আস্বাদ। নয় বছর বয়স পর্যন্ত তিনি যেমন জোয়াড়ী গ্রামে থেকেছেন আবার মাঝে মাঝে পিতা মাতার সঙ্গে বিহারের দেওঘরে থেকেছেন। মা সরোজবাসিনীদেবী ছিলেন ভক্তিশীলা রমণী। মায়ের কাছ থেকে রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী শুনে রামায়ণ মহাভারতের প্রতি তাঁর একান্ত অনুরাগ জাগ্রত হয়েছিল। একান্ত অনুরাগবশত তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণের শ্লোক এবং পয়ার ছন্দে লেখা কাশীদাসী মহাভারতের শ্লোক সুর করে পড়তেন। প্রমথনাথের সাহিত্যে রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থের প্রচুর দৃষ্টান্ত স্থান পেয়েছে। স্নেহপরায়ণা, ব্যক্তিত্বশালিনী ও রুচিশীলা জননীর প্রভাব তাঁর ব্যক্তি জীবনে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। কেশব বিশীর দত্তক পুত্র নলিনীনাথ বিশী ছিলেন একজন জমিদার অন্যদিকে তিনি ছিলেন সাহিত্য, শিক্ষা অনুরাগী, উদার, স্নেহপ্রবণ ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর জেদ ছিল ভয়ংকর এবং তিনি ছিলেন একান্ত মামলাবাজ। স্বদেশপ্রেম তাঁর ছিল মজ্জাগত। খাঁটি স্বদেশীয়ানা ছিল স্বভাববৈশিষ্ট্য। বিদেশী প্রভাবকে তিনি বরাবরই উপেক্ষা করতেন। পিতার স্বদেশানুরাগ প্রমথনাথের জীবনকে প্রভাবিত করেছে সন্দেহ নেই। পরাধীন ভারতে ইংরেজ অপশাসনের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর পিতার সোচ্চার প্রতিবাদ। তিনি দেশ মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তিনবার কারাবরণ করেছিলেন। বংশগত স্বদেশ চেতনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রমথনাথ জীবনের অনেকটা সময় স্বদেশ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন।

পিতা নলিনীনাথ বিশী ছিলেন একান্ত সন্তান বৎসল। সাত ছেলে ও পাঁচ মেয়ের প্রতি তাঁর অপত্য স্নেহের অভাব ছিল না। প্রমথনাথ ছিলেন তাঁর প্রথম পুত্র ও দ্বিতীয় সন্তান। প্রত্যেককে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন। বস্তুত স্বদেশী ভাবধারায় তিনি তাঁর সন্তানদের শিক্ষিত করে তুলবেন এই ব্যাপারে তাঁর চেষ্টার ক্রটি ছিল না। স্বদেশ প্রেমিক ও স্বাধীনচেতা নলিনীনাথ বিদেশী শিক্ষার প্রতি ছিলেন বীতশ্রদ্ধ। তাঁর মতে ইংরেজ পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ ও একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট। এইজন্য তাঁর দুই পুত্র প্রমথনাথ ও প্রফুল্লকে নিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের অভিমুখে যাত্রা কবলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত শান্তিনিকেতনের শিক্ষা মৌলিক চিন্তাধারার সাক্ষ্যবহ। তাঁর দুই পুত্রকে ঘিরে আশার আলো তিনি দেখতেন। ১৯১০ সালে আষাঢ় মাসে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গোধূলি বেলায় এসে উপস্থিত হলেন। প্রমথনাথের বয়স তখন নয় বছর। "একদিন আষাঢ় মাসের সন্ধ্যাবেলায় শান্তিনিকেতনে গিয়া উপস্থিত হইলাম।"[১] তাঁরা রবীন্দ্রনাথের বীথিকা গৃহে আশ্রয় নিলেন। শান্তিনিকেতনকে তাঁর মনে হয়েছিল যেন প্রাচীন ঋষির শান্ত সমায়িত তপোবন সম। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের প্রতি বিন্দুমাত্র

সমাদরের অভাব দেখাননি। প্রমথনাথ ও প্রফুল্ল গুরুদেবের চরণে প্রণাম জানালেন, রবীন্দ্র আশীর্বাদধন্য এই দুই বিদ্যার্থী ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বিদ্যাশিক্ষা লাভের জন্য উদ্যোগী হলেন। প্রমথনাথ প্রথম দর্শনে গুরুদেবের স্নিগ্ধ হাস্য উজ্জ্বল মুখ ও শিষ্যপ্রেমী মূর্তিখানা দেখে মুগ্ধ হলেন। অল্পদিনের মধ্যেই শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক পরিবেশ প্রমথনাথকে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করল। ছোটবেলার মধুমাখা স্মৃতি বিজড়িত জোয়াড়ী গ্রাম তাঁকে পিছু ডাকেনি। কিংবা মাতৃস্নেহ ও বন্ধুপ্রীতি তাঁকে একটি বারের জন্য বিচলিত করতে পারেনি। কিন্তু তাঁর ছোট ভাই প্রফুল্ল মাতৃস্নেহ অঞ্চল থেকে মুক্ত হতে প্লারেনি বলেই সে কয়েকদিন বাদে ফিরে এসেছে বাল্যের লীলাভূমি জোয়াড়ী গ্রামে।

প্রমথনাথ শান্তিনিকেতনে থেকে তাঁর সতীর্থদের সঙ্গে শিক্ষা জীবনের যাত্রা শুরু করলেন। "আমার যতদূর মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যগ্রন্থ দিয়া আমাদের পাঠ আরম্ভ হয়। সেটা বোধহয় নিম্নতম শ্রেণি ছিল, অর্থাৎ অক্ষর পরিচয়ের ঠিক উপরের ধাপ। শিশুর 'কাগজের নৌকা' আমার প্রথম পঠিত রবীন্দ্র-কবিতা-প্রথম শব্দটার উপরে খুব জোর দিতে চাই না, কারণ তার আগে বোধহয় আর কারো কবিতা পড়ি নাই— কৃত্তিবাস কাশীরাম দাস ছাড়া।"[২] রবীন্দ্রস্নেহধন্য প্রমথনাথ বিশী ছিলেন রবীন্দ্রভক্ত। রবীন্দ্রনাথকে তিনি অভিভাবক, শিক্ষক ও প্রেরণাদাতা রূপে পেয়েছেন। শান্তিনিকেতন গড়ে তুলতে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগ শ্রম ও অদম্য অধ্যবসায় কতটা ছিল প্রমথনাথ ছাত্র হয়ে অনেক কাছে থেকে তা দেখেছেন। সেই সঙ্গে রবীন্দ্র প্রতিভার সঙ্গে ঘটেছিল প্রমথনাথের আত্মিক পরিচয়। শান্তিনিকেতনের উদার উন্মুক্ত প্রকৃতি সেখানকার শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন প্রণালী, নিয়মানুবর্তিতা, কেতাবি বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ছিল সহপাঠক্রমিক বিষয়ে পাঠদান, পাঠ্য তালিকার বাইরে বিভিন্ন সাহিত্য, প্রবন্ধ চর্চা, শিল্পকলা, সঙ্গীত সাধনা, নৃত্য ও অভিনয়ের অনুশীলন প্রমথনাথের মনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। শান্তিনিকেতনের গৃহে সুদীর্ঘ ১৭ বছর থেকে শান্তিনিকেতনের পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে তিনি সচেতন হয়েছেন। এখানে থেকেই তাঁর সাহিত্য রচনার হাতেখড়ি হয়েছে। বস্তুত শান্তিনিকেতন—"সেদিন ছাতিমতলাটি ছিল তাঁর হৃদয়ের গভীর উপলব্ধির স্থল, এখানকার সমস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশটির কটি মাত্র বাস্তব সংজ্ঞা ছিল ঐ 'শান্তিনিকেতন'। গৃহটির নামের থেকেই জায়গাটির নামকরণ হয়। ছাতিমতলায় খোদাই করা ছিল 'তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।' আর শান্তিনিকেতনের গৃহটির মাথায় লিখিত হয়েছিল—"সত্যার্থ প্রাণারামং মন আনন্দং।"[৩] প্রমথনাথ শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক পরিবেশ থেকে আদর্শ শিক্ষকদের উষ্ণ ও সস্নেহ সান্নিধ্য এবং উপযুক্ত শিক্ষা পেয়েছেন। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন উদার ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়ে প্রমথ মানসের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটেছিল। "বড় লেখকের সাহচর্যে বাস করলে লেখক হওয়া যায় না, শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্রাবাসের রান্নার লোক, ভৃত্য, ধোপা, নাপিত, চিকিৎসক, সেবিকা প্রভৃতি ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রমথনাথের পরিচয় ঘটেছিল। তাদের কথা প্রমথনাথের সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। এখানকার বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারসুলভ একাত্মতা আশ্রমবাসীগণের

মনকে সংকীর্ণতা, নীচতা, স্বার্থপরতা, হীনতা, হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি কলুষিত দিক থেকে প্রমথনাথ নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন। শান্তিনিকেতনে বিদ্যার্থীরা সরল অনাড়ম্বর জীবন কাটাত। বেশভূষা ও জীবন প্রণালী অতি সাধারণ হলেও চিন্তা চেতনায় তাঁরা ছিল উচ্চ মানসিকতা সম্পন্ন। গান্ধিজির প্রবর্তিত আফ্রিকার ফিনিক্স আশ্রমের শিক্ষার্থীরা গুরুদেব প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে শিক্ষা লাভের জন্য এসেছিল। তখন থেকে গান্ধিজির আদর্শে অনুপ্রাণিত শিষ্যদের সরল জীবনযাত্রা আশ্রমের ছাত্রদের আরোও সরল করেছিল। এক সময় রান্নাবান্না চলত আশ্রমের রান্নার লোক দিয়ে এরপর ১৯১৫ খ্রিঃ থেকে শিক্ষার্থীরাই স্বাবলম্বী হয়ে উঠল এবং রান্নাবান্নার দায়িত্ব ভার নিজেরাই নিয়েছিল। অতঃপর শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে গান্ধিজির সারগর্ভ বক্তৃতায় তারা অভিভূত হয়ে প্রত্যেকেই স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। কবিতীর্থ শান্তিনিকেতনে যে সব শিক্ষক ও বহু বিখ্যাত মানুষের সংস্পর্শে প্রমথনাথ এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন তাঁরা হলেন শরৎকুমার রায়, তেজেশচন্দ্র সেন, জগদানন্দ রায়, ক্ষিতিমোহন সেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন আইচ, বিধুশেখর শাস্ত্রী, নেপালচন্দ্র রায়, নন্দলাল বসু, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি গাঙ্গুলী, কালিদাস নাগ, অমল হোম, সুনীতি চাটুজ্জে, প্রশান্ত মহলানবীশ, জগদীশচন্দ্র বসু, যদুনাথ সরকার, সতীশচন্দ্র রায়, সন্তোষবাবু, ডঃ উইন্টরনিজ, ডঃ লেজ্‌নি, দীনবন্ধু, অ্যান্ড্রুজ, পিয়ার্সন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এইচ. পি. মরিস, গুরুদয়াল মল্লিক, জাহাঙ্গীর ভকিল, ভীমরাজ শাস্ত্রী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কালীমোহন ঘোষ, অনিলকুমার মিত্র, সুধাময়ী দেবী, ভারতচন্দ্র মজুমদার, ইন্দ্রকুমার চৌধুরী, ফণীন্দ্রনাথ বসু, অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী, কালাচাঁদ দালাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, লক্ষ্মীশ্বর সিংহ, যদুকৃষ্ণ চক্রবর্তী, অক্ষয়বাবু ও অজিতবাবু প্রমুখ গুণী ব্যক্তিদের সান্নিধ্য ছিল প্রমথনাথের বড় পাওনা। তাঁদের সংস্পর্শে প্রমথনাথের মনোভূমি উদার হয়েছিল এবং তাঁর সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল। শান্তিনিকেতনের ছাত্র হিসাবে প্রমথনাথ সবচেয়ে বেশি দুর্বল ছিলেন গণিত বিষয়ে। শরৎবাবু ও নগেন আইচ প্রমথনাথকে অংকের ফল ভালো করার জন্য প্রায় বছর খানেক ধরে চেষ্টা চালিয়েও তাঁকে অংক বিষয়ে পাকা করে তুলতে পারেননি। শান্তিনিকেতনের ছাত্রাবস্থায় তিনি খুব মনোযোগী ছাত্র হিসাবে পরিচিত হতে পারেনি। যখন তাঁর বয়স ১২ বছর সে সময় অংকে দুর্বল প্রমথনাথ অংক পরীক্ষার দিনে উত্তরপত্রে সবকটি অংক ভুল করে খাতার শেষ পাতায় একটি কবিতা লিখে পরীক্ষকের বিরক্তির কারণ ঘটিয়েছিলেন। কবিতাটি হল—

'হে হরি, হে দয়াময়,
কিছু মার্ক দিয়ো আমায়,
তোমার শরণাগত,
নহি সতত,
শুধু এই পরীক্ষার সময়।'[৫]

ঘটনাক্রমে প্রমথনাথের এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রমথনাথকে কবি হবার প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কবিতার শেষ শব্দের মিল করবাব কৌশল শেখাতেন। রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির একটি ছত্র লিখতেন তাঁর সঙ্গে অর্থের সংগতি রেখে প্রমথনাথ অতি সহজে ও সুন্দরভাবে দ্বিতীয় লাইনটি লিখে দিতেন। এভাবে প্রমথনাথের ছোটবেলা থেকেই কবিতা চর্চা শুরু হয়েছিল।

প্রমথনাথের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি তাঁর নিজস্ব ভাবনা চিন্তাকে জোর করে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন। বিশেষ কোন পাঠ্য বিষয়ের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় না। বিশেষ করে বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত কোনো বিষয়ই তাঁর পছন্দের ছিল না।

শিশু কাব্যের কাগজের নৌকাকে অনুসরণ করে প্রমথনাথ রহস্যের সন্ধান পেতেন, নিম্নে তাঁর কবিতার কয়েক লাইন তুলে ধরছি—

'চোখ বুজে ভাবি—এমন আঁধার,
কালি দিয়ে ঢালা নদীর দু'ধার,
তারি মাঝখানে কোথায় কে জানে
নৌকা চলেছে রাতে!
আকশের তারা মিটি মিটি করে,
শিয়াল ডাকিছে প্রহরে প্রহরে,
তরীখানি বুঝি ঘর খুঁজি খুঁজি
তীরে তীরে ফিরে ভাসি।'[৬]

এই কবিতা পড়ে বিছানায় শুয়ে থেকে প্রমথনাথের মনে হত তাঁর জন্মভূমি জোয়াড়ী গ্রামের কথা। প্রবাসী জীবনে ফেলে আসা অতীত স্মৃতি তাঁর মনকে বিশেষ ভাবে আলোড়িত করত।

এছাড়া উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 'ছেলেদের মহাভারত' তাঁর স্কুল পাঠ্য গ্রন্থ এবং রবীন্দ্রকাব্য ছিল স্কুলপাঠ্য তালিকার অন্তর্ভূক্ত। তেজেশবাবু ছিলেন বাংলার শিক্ষক। গোলক চাঁপাগাছের তলে তিনি ছাত্রদের নিয়ে বাংলা পড়াতেন।

জগদানন্দবাবু অংকের শিক্ষক, পাঠ্য ঘরের সন্নিকটে ফটকের উপর মাধবীলতা ও মালতীলতায় ঘেরা স্থানের নীচে তিনি গণিতশাস্ত্র সরস ভাবে শেখাতেন। তিনি বলতেন যে একবার গণিতশাস্ত্রে প্রবেশ করলে দেখা যাবে এই শাস্ত্রের মতো সরস বিষয় আর কিছু নেই, স্নেহ ভালোবাসা পূর্ণ মন নিয়ে তিনি ছাত্রদের প্রেরণা যোগাতেন। তিনি ছিলেন উদার মানসিকতা সম্পন্ন। তাঁর সান্নিধ্যে প্রমথনাথের উদার মানসিকতা গড়ে উঠেছিল। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মাচর্যাশ্রমের সর্বাধ্যক্ষ পদ অলংকৃত করেছিলেন ক্ষিতিমোহন বাবু। তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও পান্ডিত্যের অধিকারী এবং মজলিসী রসিক। প্রমথনাথ তাঁর কাছ থেকে কথার মাধ্যমে রস বের করার কৌশল দেখে মুগ্ধ হতেন। শরৎবাবুর সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্ক ছিল মধুর। পরিণত বয়সে প্রমথনাথ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে

যুক্ত থেকেছেন কিন্তু শান্তিনিকেতনের মতো ছাত্র শিক্ষকের স্নেহের সম্বন্ধ কোথাও দেখেননি। আশ্রমিক জীবনে তিনি শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে উপাসনায় অংশগ্রহণ করতেন। প্রতিটি শিক্ষার্থীর উপাসনায় অংশগ্রহণ ছিল বাধ্যতামূলক। প্রাতঃকালীন, বৈকালিক ও সান্ধ্যকালীন উপাসনার প্রারম্ভে ধর্মগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন উপদেশ পাঠ করা হত। খ্রিষ্ট, বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য, কবীর, নানক, মহম্মদ ইত্যাদি ধর্মগুরুদের অমৃতবাণী ও প্রাচীন মুনি ঋষিদের হিতোপদেশের মধ্যে সর্বধর্মের মূল সুর ব্যাখ্যা হত। উপাসনার প্রভাবে প্রমথনাথ ধর্ম সমন্বয়ের সুর, উদার মানবধর্ম ও বৃহত্তর চেতনা সম্পন্ন হয়ে উঠেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত আশ্রমে ভারতের বিভিন্নপ্রান্তের ছাত্ররা বিদ্যালাভের জন্য আসত। এছাড়া প্রতিবেশী দেশ থেকেও ছাত্ররা এসে বিশ্বভারতীতে এসে ভর্তি হত। ঢাকা, ত্রিপুরা, রাজশাহী, অন্ধ্র, সিন্ধুপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মালয়, ব্রহ্মদেশ, চীন প্রভৃতি প্রদেশ ও প্রতিবেশী দেশের ছাত্রদের নিয়ে একেকটি ব্যাচ তৈরি হত। এর ফলে চীন দেশীয় সংস্কৃতি, মালয়ের সংস্কৃতি, ব্রহ্মদেশের সংস্কৃতি এর সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির মেল বন্ধন রচিত হত। পরস্পরের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সহবস্থানে ছাত্রদের মধ্যে বিশ্ববোধ জাগ্রত হত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনতীর্থ রূপে বিশ্বভারতী আজও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে অবস্থান করছে।

শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষ মহর্ষির দীক্ষা এবং আশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবস। এই পৌষের উৎসব ছিল আড়ম্বরপূর্ণ। অতিথি সজ্জনের সমাগমে উৎসব পূর্ণ হত। আশ্রমের উপাসনা মন্দিরটি সাজানো হত নতুন ভাবে। এই উপলক্ষে মেলা বসত। আতসবাজি, হাউই, তুবড়ির আলোতে মুখরিত হত পৌষ মেলা। মন্দিরের আলোকসজ্জার জন্য মেঝেতে অসংখ্য মোমবাতি জ্বালানো হত। আমের ডালে ডালে বাতি জ্বালানো হত। রোশনাই আলোতে সুসজ্জিত হত মেলা প্রাঙ্গণ। সবাই পীত রঙের ধুতি ও শাড়ি পরে আসত এই অনুষ্ঠানে।

পৌষ উৎসবের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল যাত্রাপালা। নীলকণ্ঠ অধিকারীর কৃষ্ণ বিষয়ক যাত্রা বিশেষ সমাদৃত ছিল। এছাড়া বাজিওয়ালার ডুগ ডুগি, ফেরিওয়ালার বাঁশি, বাউলের একতারা, সাঁওতাল নাচের মাদলে মুখরিত হত উৎসব প্রাঙ্গণ। শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা সমগ্র ভারতের মিলনমেলায় পরিণত হত।

৮ই পৌষ শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে প্রাক্তন ছাত্রদের সমাবেশ ঘটত। প্রবীন ও নবীনদের মিলন ক্ষেত্র রচিত হত। প্রাক্তন ছাত্ররা যখন সভায় প্রবেশ করত তখন সর্বাগ্রে থাকতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সন্তোষকুমার মজুমদার। রবীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন আমন্ত্রিত অতিথিরা এই মিলন উৎসবে অংশগ্রহণ করতেন এবং মূল্যবান বক্তৃতা দিতেন এবং কৃতী ছাত্রদের পুরস্কৃত করতেন।

প্রয়াত ছাত্র, অধ্যাপক ও আশ্রম কর্মীদের ৯ই পৌষ জানানো হত শ্রদ্ধা। স্মৃতি তর্পণ করা হত তাঁদের উল্লেখযোগ্য এই স্মরণ উৎসবে, যেখানে বহু ছাত্রদের সমাগম হত।

বসন্ত উৎসবে বৈকালিক গানের সুর ভেসে আসত, সারি সারি শাল বীথিকায় শুভ্র ফুলের সমারোহ দেখা যেত। জ্যোৎস্না আলোকিত রাত্রিতে শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক পরিবেশের সমবেত সঙ্গীত তালে তালে গাওয়া হত। একটি গানের কলি—

“আনন্দেরই ছবি দোলে
দিগন্তেরই কোলে কোলো
গান দুলিছে নীলাকাশের
হৃদয়-উতলা!”

এই উৎসবে পরস্পরের মধ্যে আবীর বিনিময় হত এবং হোলিতে হত রং খেলা। অন্যান্য উৎসবের মধ্যে বর্ষারম্ভ, বর্ষামঙ্গল, বর্ষাশেষ, শেষবর্ষণ, শারদোৎসব, নবান্ন, শ্রীপঞ্চমী, বৃক্ষরোপন উৎসব, রাখিবন্ধন উৎসব, হল চালানো প্রভৃতি উৎসব বিশেষ সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত। শান্তিনিকেতনের ঋতু উৎসব ও বিভিন্ন উৎসবে প্রমথনাথ সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করতেন।

গুরুদেবের জন্ম উৎসব অনুষ্ঠিত হত ২৫ শে বৈশাখ। জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করে উপহার বিনিময় ও স্বজন ব্যক্তিদের সমাগমে মুখর হত। ২৫ শে বৈশাখে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাটক অনুষ্ঠিত হত। ‘রাজা’, ‘অচলায়তন’ প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ে প্রমথনাথ অংশগ্রহণ করেছেন।

শীতকালীন ভ্রমণে অংশগ্রহণ করত ছাত্ররা, প্রমথনাথ সহ আশ্রমের ছেলেমেয়েরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে জয়দেবের পীঠস্থান কেন্দুবিল্ব গ্রামে, চণ্ডীদাসের পীঠস্থান নান্নুর গ্রামে, কোপাই নদীর ধারে কিংবা অন্য কোনো প্রসিদ্ধ স্থানে হেঁটে কিংবা রেলে চেপে যাত্রা করত। শীতকালীন ভ্রমণে তাঁরা অংশগ্রহণ করতেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে আশ্রমের ছাত্ররা ফিরে যেত নিজ গৃহে। কিন্তু এসময়ে প্রমথনাথ শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যেতেন না তাঁর জন্মভূমি জোয়াড়ী গ্রামে। পূজোর ছুটিতে অভিভাবক, কবির ভক্ত ও অতিথিরা আসতেন। এই সময় সম্মানিত অতিথিবর্গ রবীন্দ্রনাথের নাট্য অভিনয় দেখতে আসতেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি গাঙ্গুলী, সুনীতি চাটুজ্জে, প্রশান্ত মহলানবিশ, বৈজ্ঞানিক জগদীশ বসু ও ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার আসতেন। এই সব অতিথিবর্গের সান্নিধ্যে এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের আন্তরিকতার স্পর্শে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটত।

প্রত্যহ সান্ধ্য উপাসনার পর শুরু হত বিনোদন পর্ব। এই সময় ছোট খাটো অভিনয়, গল্প গুজব চলত। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে সভাসমিতি বসত। ক্ষিতিমোহনবাবু ও জগদানন্দ বাবু দুই জন গল্প বলতেন। মজলিসী রসিক জগদানন্দ বাবু ডিটেক্‌টিভ গল্প বলা পছন্দ করতেন। ক্ষিতিমোহনবাবু হাস্যরসাত্মক গল্প শোনাতেন। দুইজনেরই গল্প বলার অসামান্য ক্ষমতা ছিল। এছাড়া নেপালবাবু ও নগেনবাবুর গল্প বেশ জমে উঠত। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি প্রাপ্ত শশধর সিংহ ছিলেন ক্যাপ্টেন। তাঁর কঠোর অনুশাসনে ছাত্ররা মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে উঠত।

রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে ছাত্র স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের উপর আশ্রমের শৃঙ্খলা রাখার দায়িত্ব ভার অর্পণ করতেন। আশ্রম সম্মিলনী নামে ছাত্রদের কার্য পরিচালনার জন্য মাসে দুটি অধিবেশন হত। মাসের প্রথম অধিবেশনে নিয়ম রক্ষার

প্রসঙ্গ এবং গুরুতর অপরাধের জন্য বিচার সভা বসত। এই সভার সভাপতিত্ব করতেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। প্রথম অধিবেশনটি অমাবস্যার রাতে অনুষ্ঠিত হত এবং দ্বিতীয় অধিবেশন বসত পূর্ণিমা তিথিতে। আবৃত্তি, অভিনয়, গান বাজনা প্রভৃতি আনন্দ উৎসবে আশ্রমবাসীরা প্রত্যেকেই অংশগ্রহণ করত। এই আনন্দ উৎসবে আগত অতিথিদের পরিচর্যার সুব্যবস্থা ছিল।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্রদের বাংলা ও ইংরাজি বিষয়টি পড়াতেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, তিনি যখন পড়াতেন তখন ছোট ও বড় ছাত্ররা উপস্থিত থাকত। রবীন্দ্রনাথ কীটসের অটাম্ কিংবা শেলীর ইনটেলেকচ্যুয়াল বিউটি প্রভৃতি ইংরাজি সাহিত্য ছাত্রদের সহজ সরল ভাবে বোঝাতেন। ছাত্ররা রবীন্দ্রনাথের পাঠে মুগ্ধ হত। প্রমথনাথ বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যার দানপত্র অজস্রধারে ঝরিয়া পড়িয়া বালক ও বয়স্ক - সকলের মন পূর্ণ করিয়া দিত। সকলেই প্রয়োজনের বেশি পাইত। এই উদ্বৃত্ত অংশটাই মানুষের ঐশ্বর্য।"[৮] ইংরেজি পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল—Silas Marner, Marious the Epicurean, Representative Men, Merchant of Venice, Areopagitica প্রভৃতি বিষয়। এছাড়া উত্তরায়ণে রসায়ন বিষয়ে স্থূল কথা ও আবহবিদ্যা পড়ানো হত।

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাকালে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে প্রমথনাথ ও চলমায় নামে এক দক্ষিণ ভারতীয় ছাত্র এই দুজনকে নিয়ে পঠনপাঠন শুরু হয়েছিল। প্রমথনাথ ১৯১৯ সালে প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। রবীন্দ্রনাথ একদিন প্রমথনাথকে কলেজে পড়ার বিষয়ে তামাশা করে বলেছিলেন,

"কলেজে পড়ে কি করবি! যে কলে পড়লে মানুষের লেজ গজায় তাকেই কলেজ বলে।"[৯]

বিশ্বভারতীতে ছাত্রদের ভারততত্ত্বে শিক্ষিত করার জন্য দ্বারভাঙ্গা থেকে কপিলেশ্বর মিশ্রকে আমন্ত্রণ করে আনা হল। বিধুশেখর শাস্ত্রী ও কপিলেশ্বর মিশ্র সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষা শেখাতেন। বিভিন্ন ভাষা ও শাস্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে প্রমথনাথের প্রতিভার বিশেষ পরিচয় মেলে।

"একদিন শিক্ষক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ Dying শব্দের বাংলা মুমূর্ষু বললেন, প্রমথনাথ রবীন্দ্রনাথের ভুল ধরে বললেন ওটা ম্রিয়মাণ হবে। ইচ্ছার্থে 'সন' প্রত্যয় হয়; লোকটার তো মরবার ইচ্ছা ছিল না, তাই মুমূর্ষু না হয়ে হবে ম্রিয়মাণ।"[১০]

তখন থেকে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে প্রমথনাথের পাণিনি পাঠ বন্ধ হল। প্রমথনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তর্ক মাঝে মাঝে জমে উঠত, পাণিনি পাঠ্য তালিকা থেকে নির্বাসিত হলে সংস্কৃত কাব্য, নাটক, গদ্য সাহিত্য প্রচুর পড়ান হত, রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের বলতেন যে মানুষ নিজেই নিজের শিক্ষক এবং শিক্ষার সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হল গ্রন্থাগার, প্রমথনাথ শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরীর নিয়মিত পাঠক হলেন। সেই সময় শান্তিনিকেতনের গ্রন্থের সংখ্যা ১০ হাজারের বেশি ছিল, তিনি বৈদেশিক ক্লাসিক্স্ গ্রন্থের অনুরাগী পাঠক ছিলেন। গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রমথনাথকে

যে বই পড়ার নির্দেশ দিতেন প্রমথনাথ সেই বইগুলো না পড়ে পড়তেন থিয়ক্রিটস। এরূপ একগুঁয়ে স্বভাব প্রমথনাথের ছাত্রাবস্থায় বিশেষ লক্ষণীয়।

শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের সুপ্তপ্রতিভা জাগিয়ে তুলবার জন্য খেলাধূলা, সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, অভিনয়, সেবাশুশ্রূষা এবং চিত্র সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় যুক্ত ছিল। প্রমথনাথ খেলাধূলায় উৎসাহী না হলেও সাহিত্য রচনায় ও অভিনয়ের ব্যাপারে ছিলেন উৎসাহী। শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া প্রমথনাথকে সাহিত্যের দিকে টেনে নিতে পেরেছে। শান্তিনিকেতন জীবনে সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক সাহিত্য সভা সাজাবার দায়িত্ব অর্পণ করা হত প্রমথনাথের উপর। প্রমথনাথ ও সহপাঠীরা লতা, পাতা, ফুল দিয়ে সাহিত্য সভা সাজাত। ছাত্রদের স্বরচিত লেখা পাঠ ও নতুন গান পরিবেশিত হত সাহিত্য সভার আসরে।

"রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্য পাঠ্য ছিল, সেই কাব্যমালঞ্চে ডাকাতি করিয়া কবিতা লিখিত হইল। তিনটি ছত্র চতুর্থ ছত্রটি কবি - যশোলিপ্সুর! ধরিবার কেহ ছিল না, কারণ শ্রোতা ও লেখক প্রায় সকলেই কবি কবিযশ প্রার্থী। পরিণত বয়সে আজও সেই কাজ করিতেছি; রবীন্দ্রনাথের কাব্যমালঞ্চের চোরকবি সাজিয়া সুরঙ্গ কাটিয়া চলিয়াছি কিন্তু হায়, সেদিনের বালক - শ্রোতাদের পরিবর্তে আজ চারিদিকে সতর্ক কোটাল সমালোচনার দন্ড হাতে পাহারায় নিযুক্ত।"[১১]

সুধাকান্ত চৌধুরী ছাত্রাবস্থায় প্রমথনাথ বিশী সম্পর্কে প্রশংসিত হয়ে লিখেছেন:

"প্রমথনাথ সপ্রতিভ, মুখর ও বাক্যবাগীশ নিপুণতার সঙ্গে পরিহাসমূলক বাক্য বলায় সে সত্যই ছিল ওস্তাদ।"[১২]

সাহিত্য রসসিক্ত শান্তিনিকেতনের আবহাওয়ায় প্রমথনাথের মানস বীজ অত্যন্ত সহজে অঙ্কুরিত হয়েছিল। "সাহিত্যে সম্বন্ধে আমার মনে কোনো পূর্ব সংস্কার ছিল না, কাজেই প্রথম অঙ্কুরোদ্গম যে এখানেই ঘটিয়াছিল সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।"[১৩]

প্রমথনাথের সাহিত্য জীবনের উন্মেষ লগ্ন বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে নিম্নলিখিত ভাবে—

"এইভাবে আশ্রমের ফুলে ডালে সাজানো প্রাকৃতিক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ভাষা ও ভাবের সঙ্গে বালক মনের কাঁচা সোনার মত বাসনা মিশিয়ে প্রমথনাথের সাহিত্য জীবনের উষালগ্ন।"[১৪]

শান্তিনিকেতনের শিক্ষক কালিদাস বাবুর পরিচয় কবি হিসাবে, প্রমথনাথ তাঁর সমীপে উপস্থিত হতেন মাঝে মাঝে। তিনি প্রমথনাথের কবিতা সংশোধন করে দিতেন—

"কোনক্রমে গোটা তিন চার লাইন লিখিয়া লইয়া যাইতে পারিলেই তিনি একটা নাতিদীর্ঘ কবিতা লিখিয়া দিতেন। সেটা যে আমার কবিতা নয়, কখনো সে সন্দেহ তিলমাত্র মনে উদিত হইত না।"[১৫]

একদিন রবীন্দ্রনাথ জানতে পেলেন প্রমথনাথ কবিতা লিখতে পারে। প্রমথনাথের কবিতা দেখবার ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করলেন। সংবাদ পেয়ে শিষ্য গুরুর দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন। নিজহাতে 'রবীন্দ্র বন্দনা' নামক কবিতা লিখলেন কবিতার প্রথম দুটি ছত্র

নিম্নরূপ—

"সেই মহাগীতছন্দে সেই মহাতালে
তুমি গাহিয়াছ গান ঊষাসন্ধ্যাকালে—
শেষের ছত্রটা
শুনো গুরুদেব, তব শিশুদের গীতি।"[১৬]

রবীন্দ্রনাথের স্নেহস্পর্শ তিনি পেলেন, সেই সঙ্গে একপ্লেট আনারস ও পুডিং পেলেন।

প্রাদেশিক ও নিখিল ভারতীয় খ্যাতির অধিকারী শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের মধ্যে প্রথমেই অজিতকুমার চক্রবর্তীর নাম স্মরণে আসে। রবীন্দ্রভক্ত শ্রী চক্রবর্তী ছিলেন সুগায়ক সুঅভিনেতা ও রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচক। একাধারে তিনি ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের বিশিষ্ট অধ্যাপক, অন্যদিকে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের তিনি সাহিত্য চর্চায় বিশেষ ভাবে অনুপ্রেরণা জাগাতেন, প্রমথনাথ তাঁর সংস্পর্শে বহুবার এসেছেন এবং সাহিত্য রচনার দিক থেকে বহুবার বহুভাবে উপকৃত হয়েছেন। প্রমথনাথ লিখেছেন—

"তখন কিন্তু কলেজ হয়নি—বড় ছেলে ছিল না—ম্যাট্রিকের মধ্যে সীমিত ছিল সবকিছু। সেই ছেলেদের মধ্যে সাহিত্যচর্চার আনন্দটুকু উদ্বোধিত করতেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। প্রমথ তাঁর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল।"[১৭]

ইতিহাস ও অঙ্কের শিক্ষক শরৎকুমার রায়ের বাংলা সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। বহু গ্রন্থ রচনা করে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছেন। তিনি একাগ্র চিত্তে ও স্পষ্ট ভাবে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। শরৎবাবুর ব্যক্তিত্ব প্রমথনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। শ্রীনিকেতন পল্লী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের শিশু বিভাগের অধ্যক্ষপদ অলংকৃত করেছেন কালীমোহন ঘোষ। তিনি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের নিরলস কর্মী। আপন প্রতিভা গুণে তিনি গ্রামের নিরক্ষর ও নিঃসহায় মানুষদের কাছে টেনে নিতেন। এছাড়া তিনি ছিলেন সুবক্তা। সহজ সরল ভাষায় পল্লীগ্রামের জনগণকে পল্লী উন্নয়নের জন্য উৎসাহিত করতেন। শিশুর মতো সরল প্রাণ কালীমোহনবাবুর প্রভাব প্রমথনাথের ব্যক্ত জীবনে বিশেষ, স্থান অধিকার করেছে।

বিজ্ঞান বিষয়ক প্রাবন্ধিক হিসাবে জগদানন্দবাবুর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাঁর স্নেহময় ব্যবহার শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা স্মরণীয় করে রেখেছে। বিদ্যালয় সর্বাধ্যক্ষ পদ অলংকৃত করে বেশ কীর্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তাঁর কার্য পরিচালনা করেছেন। কঠিন বিষয়কে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করবার বিশেষ গুণ প্রমথনাথকে আকৃষ্ট করেছিল।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সংস্কৃত ও বাংলা বিষয়ের শিক্ষক। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' নামক বাংলা অভিধান গ্রন্থ রচনা তাঁর প্রধান কীর্তি। তিনি একাধারে জ্ঞানী এবং তাঁর বিশেষ গুণ ছিল একনিষ্ঠতা। প্রমথনাথ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী।

ভারতীয় চিত্রকলার অন্যতম সাধক শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর নাম বিশেষ ভাবে স্মরণ

যোগ্য। সত্যিকারের মাটির মানুষ ছিলেন তিনি। স্মিত মুখ, স্নেহপ্রবণ, স্বল্পবাক ও ছাত্রবৎসল জ্ঞানী পুরুষ নন্দলাল বসু ব্যক্তি হিসাবে ছিলেন একান্ত সামাজিক। তাঁর অসামান্য প্রভাব প্রমথনাথের ব্যক্তি জীবনে বিশেষ স্থান পরিগ্রহ করেছে।

শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের কাছে ঠাকুরদা নামে পরিচিত ক্ষিতিমোহন সেন নানা কারণে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সকলের শ্রদ্ধা প্রীতি ও আদরের পাত্র হয়েছিলেন। বাণী সংগ্রাহক শ্রীসেন বাংলা, রাজপুতনা ও গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের শিক্ষিতজনের কাছে ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র। পান্ডিত্য, অনন্যসাধারণ সরল ভাষণ, নতুন তথ্যপূর্ণ বাচনের ফলে কথকতার শিল্প শক্তি তাঁর মধ্যে ছিল। তাঁর বিভিন্নজনের সঙ্গে মিশে যাবার একটি বিশেষ গুণ ছিল। সামাজিকতা গুণে সমৃদ্ধ ছিলেন তিনি। শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা তাঁর অধ্যাপনার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হয়েছে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের চায়ের আসরে ও সান্ধ্য বৈঠকে যারা অংশগ্রহণ করেছেন প্রমথনাথ থেকে শুরু করে সকলে তাঁর পান্ডিত্য ও সরলতায় মুগ্ধ হয়েছেন।

বহু ভাষাবিদ বিধুশেখর শাস্ত্রী শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের মধ্যে এক প্রতিভাধারী ব্যক্তিত্ব। ইংরাজি, ইউরোপীয় একাধিক ভাষা, ভারতীয় ভাষা, চিনা ও তিব্বতি ভাষায় পন্ডিত ছিলেন তিনি। পালি ও প্রাকৃত ভাষা থেকে শুরু করে বৌদ্ধ দর্শন প্রভৃতি ভারত তত্ত্ব তিনি ছাত্রদের শেখাতেন। বিশ্বভারতীর উচ্চতর বিভাগের অধ্যক্ষ পদ তিনি অলংকৃত করেছেন। তাঁর মধ্যে প্রমথনাথ খুঁজে পেয়েছেন ধর্ম সমন্বয় ও মানবতাবাদের সুর। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিষ্টান ও পারসিক প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের প্রতি সমদৃষ্টি এবং সকলের সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠতা তাঁর ছিল। তাঁর প্রাণখোলা ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। প্রমথনাথের কাছে শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন একান্ত নমস্য ব্যক্তি। তাঁর প্রভাব প্রমথনাথের ব্যক্তি জীবনকে সংকীর্ণতা থেকে উদার মানসিকতা এনে দিয়েছিল।

অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়ের মধ্যে ছিল উৎসাহ ও উদ্দীপনা শিশুসুলভ সরলতা। সেই সঙ্গে বাগ্মিতা ও আদর্শবাদ তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি আশ্রমের ছাত্রদের খেলাধুলা, রাস্তা তৈরি ও দেশ ভ্রমণে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। ১৯২১ সালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশ নেন। সুরুলে জনসেবা কেন্দ্র স্থাপন করে তিনি জনসেবার মহান ব্রত পালন করেছেন। প্রমথনাথ তাঁর কাছ থেকে স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা পেয়েছেন।

শান্তিনিকেতনের আত্মভোলা আদর্শ লাভের পর অধ্যাপক গুরুদাস মল্লিক-এর সান্নিধ্যে প্রমথনাথ এসেছেন। ছোট বড় ছাত্র অধ্যাপক প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীমল্লিকের গৃহে লোভনীয় আড্ডার আসরে প্রমথনাথ অংশ নিতেন।

ইংরাজি ও বাংলা ভাষায় কবিতা লিখে প্রমথনাথের সঙ্গে যে অধ্যাপকের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তিনি হলেন ইংরাজি ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক জাহাঙ্গীর ভকিল। তাঁর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মজ্ঞানের সঙ্গে বিদ্যা ও বুদ্ধির সমন্বয়। সাহিত্য জীবনে প্রমথনাথ তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।

আশ্রমে সঙ্গীত ও সংস্কৃত শিক্ষক হিসাবে পরিচিত ভীমরাও শাস্ত্রীর শিক্ষায় ও উৎসাহে প্রমথনাথ সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। বলতে গেলে তাঁর কাছ থেকে প্রমথনাথের সংস্কৃত নাটকে অভিনয়ের হাতেখড়ি হয়েছিল।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংলাপের সরলতা, সুরমাধুর্য, অভিনয় নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। তিনি ছিলেন উৎসবের প্রতীক। তাঁর মধ্যে সামাজিকতা গুণের অভাব ছিল না। দেহলী ভবনে দীনুবাবু, নন্দলালবাবু, অসিতবাবু, অক্ষয়বাবু, তেজেশবাবু, সন্তোষবাবু, ক্ষিতিমোহনবাবু ও শাস্ত্রীবাবুদের চায়ের আড্ডার আসরে প্রমথনাথ উপস্থিত থাকতেন। এই সময় এক অদৃশ্য রসের পরিমন্ডল গড়ে উঠত। তখন স্থানটি আনন্দ আশ্রমে পরিণত হত। দীনুবাবুর কাছ থেকে প্রমথনাথের অভিনয় কলার শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সৌজন্যবোধ ও সামাজিকতা গুণের শিক্ষা পেয়েছেন। দেখা হলে দুটি মিষ্টি কথা বলা এই বিশেষ গুণ দীনুবাবুর সান্নিধ্যে প্রমথনাথ লাভ করেছেন এবং আজীবন তিনি এরূপ সৌজন্যমূলক আচরণ অনুসরণ করেছেন।

রবীন্দ্র স্নেহধন্য শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ছিলেন এক বিরল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ। সৌজন্য ও ভদ্রতা জ্ঞানের জন্য সন্তোষবাবু প্রত্যেকের মন কেড়ে নিতেন। তাঁর আচরণে মুগ্ধ হয়ে প্রমথনাথ লিখেছেন—

"দেখা হইবা মাত্র দুটো মিষ্টি কথা, দুটো কুশল প্রশ্ন, কিছুনা হোক হাসিয়া দুটা কথা বলা তাঁহার পক্ষে একান্ত অনায়াস ছিল; সেইজন্য তিনি ছোট বড় সকলের হৃদয়কে অবিলম্বে নিজের দিকে টানিতে পারিতেন।"[১৮]

সন্তোষবাবু ও তাঁর পরিবারের সকলের সঙ্গে প্রমথনাথের ছিল একান্ত ঘনিষ্ঠতা, এই পরিবারের বিবাহ উৎসব থেকে শুরু করে শ্মশানবন্ধু হিসাবে সর্বপ্রথম প্রমথনাথ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর মতো বিশ্বস্ত ব্যক্তি প্রমথনাথের শ্রদ্ধার পাত্র ছিল।

বিলেত থেকে আগত মিঃ অ্যান্ড্রুজ ও পিয়র্সন, দুই জনই আদর্শপরায়ণ ব্যক্তি। মিঃ অ্যান্ড্রুজের মতো মানব প্রেমিককে প্রমথনাথ খুব কম দেখেছেন। তিনি ছিলেন রাজনীতিজ্ঞ। অতি সহজে কূটনৈতিক, জটিল জাল মোচন করবার দক্ষতা তাঁর ছিল। প্রমথনাথ অধ্যাপক মিঃ অ্যান্ড্রুজের দ্বারা বিভিন্ন ভাবে উপকৃত হয়েছেন।

মিঃ পিয়র্সন ছিলেন শান্ত সমাহিত প্রকৃতির। তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতাল পল্লীতে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষা দিতেন। স্বদেশপ্রাণ মিঃ পিয়র্সনকে ব্রিটিশ সরকার গ্রেপ্তার করেন। তাঁর শ্রেষ্ট কীর্তি হল ভারতের স্বাধীনতা লাভের দাবি সমর্থনে 'ফর ইন্ডিয়া' গ্রন্থ রচনা। প্রমথনাথ গ্রন্থটি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে পাঠ করেছেন। প্রমথনাথের স্বদেশ প্রেম জাগ্রত হওয়ার পেছনে মিস্টার পিয়র্সনের প্রভাব ছিল সন্দেহ নেই।

দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করেছেন প্রমথনাথ। প্রমথনাথ সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে কোল্‌রিজের তুলনা করেছেন। তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের ছন্দ ও

টেকনিক প্রমথনাথকে অভিভূত করে। তাঁর গদ্যরীতি প্রমথনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন কবি। গুরুসদয় দত্ত তাঁর কবিতা পাঠে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পদক ও সার্টিফিকেট দিয়ে সম্মানিত করেছেন। ঠাকুর পরিবারের মহিমা প্রচারক তাঁর একটি কবিতা প্রত্যেকের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল—

"রবীন্দ্র কবীন্দ্রের খ্যাতি বিশ্বময়।
দ্বিজেন্দ্র দ্বিপেন্দ্র দিনেন্দ্রর জয়।"[১৯]

প্রমথনাথ তাঁর কবিত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

প্রমথনাথের সাহিত্য প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে যাঁর অবদান সর্বাধিক তিনি হলেন বিরাট ব্যক্তিত্বের জ্যোতি সম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের নাম আজও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে প্রবেশ থেকে প্রমথনাথের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রবীন্দ্র প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারেননি। বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা ও শান্তিনিকেতনের প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের কাছে প্রমথনাথ ঋণ পাশে আবদ্ধ। বিশেষ করে রবীন্দ্র জীবন দর্শনের, জগৎ, ভগবান, মানুষ ও প্রকৃতির সম্মিলিত ধ্যান ধারণা প্রমথনাথকে প্রভাবিত করেছিল। বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে বৃহৎ জগতের শরিক হওয়ার পেছনে এই তিন সত্তার প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী এতে কোনো সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে শান্তিনিকেতনের ধর্মশিক্ষা, সর্বধর্মগ্রাহ্য বিষয় দ্বারা প্রমথনাথ প্রভাবিত হয়েছেন। রবীন্দ্র প্রতিভার বহুমুখিতা প্রমথনাথ ছোটবেলা থেকে লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মুখের প্রসন্ন স্নেহস্মিত ভাব প্রমথনাথ কোনোদিন ভুলে যেতে পারেননি। কবিতা রচনার ক্ষেত্রে প্রমথনাথের উপর রবীন্দ্রনাথের ভরসা ছিল অনেকটা। যেমন কোজাগরী পূর্ণিমার বিকেলে রবীন্দ্রনাথ প্রমথনাথকে জানালেন—

"আজ রাতে কোজাগরী উৎসব হবে একটা কবিতা লিখে আন।"[২০]

শুধুমাত্র কবিতা রচনার প্রেরণা দাতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না, নাটক রচনার প্রধান উৎসাহ দাতা ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রসন্ন হাসির দৃষ্টান্তের হীরক উজ্জ্বল খন্ডাংশ নিম্নে প্রদত্ত হল—

"যার লিখিবার শক্তি নেই সে যখন ক্ষমতার অপব্যবহার করে তখন দুঃখ হয় না, কিন্তু যার ক্ষমতা আছে তাঁর শক্তির অপব্যবহার দেখলে দুঃখ না হয়ে যায় না। মুখ তুলিয়া যখন আমার দিকে চাইলেন, তখন আমার মুখে হাসি। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কী হল হাসছিস যে?" সেই সময় আমার দুঃসাহসের অন্ত ছিল না। আমি বলিলাম, "আজ্ঞে, এটুকু অন্তত জানালাম যে আমার লিখবার শক্তি আছে। দেখিতে দেখিতে তাহার মুখ প্রসন্ন হাস্যে ভরিয়া উঠিল।"[২১]

রবীন্দ্রনাথ যে তাকে তিরস্কার করেননি একথা বলা সঙ্গত নয়। উদার ব্যক্তিত্বের অধিকারী রবীন্দ্রনাথ প্রমথনাথের প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল। প্রমথনাথ রবীন্দ্রনাথের এই সহানুভূতির দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন:

"আসল কথা কী জানিস, মাঝে মাঝে আমি বিরক্ত হই, কিন্তু অপরাধী যখন সশরীরে সম্মুখে এসে দাঁড়ায় তখন তিরস্কার করতে কষ্ট হয়। নিতান্তই যখন না বললে নয় তখন এদিক ওদিক তাকিয়ে কোনো রকমে বলে ফেলি। আর খুব রাগ হলে কথাই বলি না, পাছে অপরাধের চেয়ে বেশি ওজনের কিছু বলে ফেলি!"[২২]

মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ নাটকের বিষয় প্রমথনাথকে বলে দিতেন, প্রমথনাথ সেই বিষয় অবলম্বনে নাটক রচনা করে গুরুদেবকে দেখাতেন গুরুদেব নাটকটি পড়ে সংশোধন করে দিতেন।

" ছাত্রজীবনে তাঁর লেখা যাত্রাপালা রবীন্দ্রনাথের হাতে যখন 'রথের রশি' 'কালের যাত্রা'র রূপ পেল তখন প্রমথনাথ সেই নূতন সৃষ্টিকে নিজ নামে চিহ্নিত করতে চাননি, গুরুপ্রণামী হিসেবেই নিবেদন করেছেন। প্রমথনাথ রসিকতা করে বলতেন—গুরুদেব যখন যাত্রাপালা লিখবেন বলে মনস্থ করেন, তখন তিনি নাকি বলেছিলেন—সাহিত্যের এই শাখাটুকু অন্তত আমাদের জন্য খালি রাখুন।"[২৩]

যাত্রাপ্রিয় প্রমথনাথ যাত্রা শুনবার সুযোগ পেলেই অদম্য কৌতূহল নিয়ে যাত্রার আসরে বসতেন। ১৯২১ খ্রিঃ বিভূতি গুপ্ত ও প্রমথনাথের যৌথ প্রচেষ্টায় 'বীরভূমেশ্বর পরাজয়' নামে একটি যাত্রাপালা রচিত হয়। শান্তিনিকেতনের যাত্রা মঞ্চে অভিনীত হয়ে এই নাটকটি যাত্রামোদীদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। "শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত ও প্রমথনাথ বিশী 'বীরভূমেশ্বর পরাজয়' নামে একটি যাত্রাপালা লিখিয়াছিলেন, ইহার অভিনয় সুসম্পন্ন হয়। পূজনীয় গুরুদেব এবং দেশীয় অতিথি, অধ্যাপক, নিকটবর্তী অধিবাসী প্রভৃতি উপস্থিত দর্শকগণ এই অভিনয় দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন।"[২৪]

একে একে প্রমথনাথ ও বিভূতিভূষণ গুপ্ত 'ঘোষযাত্রা' (১৯২২), 'কর্ণমর্দন' ও 'বিরাট রাজার গোগৃহ' নামক নাটক লেখেন। নাটকগুলিতে ব্যঙ্গের সুর ধ্বনিত হয়েছে। এই সময় প্রমথনাথ রচিত গান আশ্রমের ছাত্রদের মুখে মুখে উচ্চারিত হত।

প্রমথনাথ বিশী সম্পর্কে সজনীকান্ত দাস বলেছেন—

"দেখিতে বালকের মত, বেঁটেখাটো কিন্তু তখনই খ্যাতিমান, অন্তত আমার প্রভূত হিংসার উদ্রেক করিবার মত তাঁহার খ্যাতি। কাব্যে, গল্পে, প্রবন্ধে, ভ্রমণকাহিনীতে, বিশ্বসাহিত্য সমালোচনায় তখনই সার্থক সাহিত্যিক, তদুপরি রবীন্দ্রনাট্য ও যাত্রাগান অভিনয়েও যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলেন। বয়স তখন তাঁহার কতই হইবে? উনিশ-কুড়ি। রবীন্দ্রনাথের পরে তিনিই বাংলাদেশের দ্বিতীয় নাম করা সাহিত্যিক যাহার সাথে পাঠ্যাবস্থাতেই আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটে।"[২৫]

নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে ছাত্রদের শক্তির উদ্বোধন ঘটে। ছুটির পূর্বে, বিভিন্ন উৎসবে ও সভায় অভিনয় একটি প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠেছিল শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে। প্রমথনাথের অভিনয়শিক্ষার হাতেখড়ি হয়েছিল সন্তোষবাবুর উপযুক্ত নির্দেশে। প্রমথনাথ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করবার পূর্ব থেকেই বাংলা ও সংস্কৃত নাটকের অভিনয় বহুবার করেছেন। 'মুকুট'

নাটকে ঈশা খাঁ চরিত্রের অভিনয় করে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছেন। অধ্যাপক নেপালবাবু তাঁর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েছেন। নাট্যমঞ্চ সাজানো হত ঘাসের চাপড়া বসিয়ে ও আস্ত বটের ডাল পুতে। সন্ধ্যাবেলায় নাট্যঘরের স্টেজ আলো ঝলমল হয়ে উঠত, বাজনায় আড়ম্বরে জমে উঠত রঙ্গমঞ্চ। দর্শকদের হাততালি বেজে উঠত অভিনয় চলা কালে, অভিনেতাদের অভিনয় নৈপুণ্যের জন্য।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রমথনাথের অভিনয় করবার সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল 'শারদোৎসব' ও 'অচলায়তন' নাটক অভিনয়ের দ্বারা। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকে প্রথমবার জয়সিংহের অভিনয় করে এবং দ্বিতীয়বার রঘুপতির অভিনয় করে প্রমথনাথ নাট্য রমামোদীদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকে তিনকড়ি চরিত্রের অভিনয় করে দর্শক মহলের উচ্চ প্রশংসা পেয়েছেন, আবার বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন সংস্কৃত 'বেণী সংহার' নাটকের অশ্বত্থমা চরিত্রের অভিনয় করে। 'চন্ডকৌশিক' নাটকের হরিশ্চন্দ্র চরিত্রের অভিনয় করে তিনি পাঠক মহলে অজস্র হাততালি পেয়েছেন। ইংরেজি নাটকে অভিনয় করবার অভিজ্ঞতা তাঁর ঘটেছিল। বিশেষ সুনামের সঙ্গে প্রমথনাথ 'The king and the rabel' নাটকে Minister চরিত্রের অভিনয় করেছেন।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের গান শুনে প্রমথনাথের হৃদয়ে সঙ্গীতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হত। গীতিকবিতাধর্মী গানগুলি ঝর্ণার টানে নুড়ির মতো সুরমূর্ছনা জাগিয়ে তুলত। তাঁর বিরহ মিলন পূর্ণ খন্ড ক্ষুদ্র বিষয় অবলম্বনে প্রথম বয়সের আবেগপ্রধান গান এবং মধ্য বয়সের গান গিরিমালার ওয়াটার শেড্ এবং শেষ জীবনে অখন্ড সৌন্দর্যলোকের দিকে সৌন্দর্য প্রধান গানগুলি প্রমথনাথের মনকে আপ্লুত করে তুলেছিল। প্রমথনাথ লিখেছেন—

"শান্তিনিকেতনকে চিত্র ও সঙ্গীতের দানসত্র বলিলেও চলে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ইহা ঝর্ণাতলা। সকাল হইতে নিদ্রার পূর্ব পর্যন্ত এখানে নানা উপলক্ষে গানের ঝর্ণা ঝরিতেছে—তাহারই শিকড়ে সকলের মন অভিষিক্ত হইয়া যায়, গানে, ছবিতে মিলিয়া চিত্তপটে আশ্চর্য ইন্দ্রধনু অঙ্কিত হইতে থাকে।"[২৬]

রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাবার সংবাদ শান্তিনিকেতনে বিজয় বার্তা বহন করে এনেছিল। এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা নোবেল প্রাইজের জন্য রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সংবর্ধিত হয়েছেন বহুবার। কলকাতা থেকে পাঁচ থেকে সাতশত রবীন্দ্র সাহিত্যানুরাগী শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জানিয়েছে। সংবর্ধনা সভায় সভাপতি জগদীশচন্দ্র বসু রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে দেশের আনন্দ সংবাদ জানালেন। হোমস সাহেব বললেন—

"যদিচ কিপলিং বলিয়াছেন পূর্ব-পশ্চিমের মিলন কখনো সম্ভব নয়, তবু আজ এখানে কবির মধ্যে পূর্ব-পশ্চিম সম্মিলিত হইয়াছে।"[২৭]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জ্ঞানীগুণী রসজ্ঞমন্ডলের যে আড্ডার আসর বসত প্রমথনাথ সেখানে

অংশগ্রহণ করতেন। দীনুবাবুর আড্ডার আসরে দীনুবাবুর কণ্ঠ সঙ্গীত প্রমথনাথ স্মরণ রেখেছেন—

"শিউলি-ফোটা ফুরোলো যেই ফুরোলো,
আমার শীতের বনে এলে যে।"[২৮]

নৃত্যে নাট্যে সুসজ্জিত বালিকারা নাচের তরঙ্গ তুলে নৃত্য গীতে অংশ নিত—

"নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি
আমার মন কয় চিনি চিনি।"[২৯]

প্রমথনাথকে স্মরণীয় করে রেখেছে আশ্রমের বালিকাদের লতায়িত দেহভঙ্গীতে ফুল তোলার নৃত্য গীতিটি—

"কামিনী ফুলকুল বরষিছে,
পবন এলো-চুল পরশিছে,
আঁধারে তারাগুলি হরষিছে
ঝিল্লি ঝনকিছে ঝিনিঝিনি।"[৩০]

আর একটি নৃত্যগীতি—

"আর যাব না মোরা গোচারণে
প্রাণের কানাই আর হেথা নাই
কি সুখ বলো বৃন্দাবনে।
পিয়ালে ডাকবে না পিক
ভ্রমরে আর দশ দিক
উতলা করবে কি আর গুঞ্জরণে।"[৩১]

কবিতীর্থ শান্তিনিকেতনে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করে তুলবার পেছনে পত্রপত্রিকার ভূমিকা ছিল সর্বাধিক। আশ্রমের ছোট, মাঝারি ও বড়োদের জন্য পত্রিকা প্রকাশিত হত। সেই সঙ্গে আশ্রমের দৈনন্দিন খবর প্রকাশ করবার প্রথা প্রচলিত ছিল। পত্রিকাগুলোর বেশিরভাগ হাতে লিখে প্রকাশ করা হত। লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক ও প্রচ্ছদপট যারা লিখত তাদের নাম ও পরিচয় প্রকাশিত হত। প্রথমে সেইগুলি প্রকাশের পর ঘরে ঘরে পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল এবং পরিশেষে পত্রিকাগুলোকে লাইব্রেরিতে টাঙিয়ে দেওয়া হত। একাধারে সাহিত্য ও সাংবাদিক এই দ্বৈত প্রকাশে সমৃদ্ধ হত আশ্রমের পত্র পত্রিকাগুলি। পত্রিকাগুলি দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হত। ছোটদের জন্য 'শিশু' পত্রিকা, মাঝারি ছাত্রদের জন্য 'প্রভাত' ও 'বাগান' নামে দুটি পত্রিকা বের হত। বড় ছেলেদের জন্য 'শান্তি' ও 'বীথিকা' পত্রিকা প্রকাশিত হত। প্রধানত 'বীথিকা' গৃহের ছাত্রদের প্রচেষ্টায় 'বীথিকা' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

বাল্যকালে প্রমথনাথ ছোট ছোট কবিতা লিখতেন, তাঁর কবি প্রতিভার উন্মেষ হয়েছে 'শিশু' পত্রিকায় 'বসন্ত' কবিতায়। প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন—

"ওগো ঋতুরাজ
দিনে কত সাজ
সাজাইল ধরা,
কত ফুলে ভরা
কোকিল কুহরে
মোর মন হরে।
তুমি হে বসন্ত।
গুণে নাই অন্ত।"[৩২]

প্রমথনাথের কবিতাটি কবিগুরু ও মূলগুরু রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে রচিত।

শান্তিনিকেতনে ছাপাখানা স্থাপিত হয় ১৯২২খ্রিঃ সেই সুবাদে প্রমথনাথ ও বিভূতিভূষণ গুপ্ত 'বুধবার' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই সময় স্বর্গের সিঁড়ি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল ছাপাখানাকে কেন্দ্র করে। বুধবার ছিল আশ্রমের ছুটির দিন। এই দিনে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়—

"শ্রীমান বিভূতিভূষণ গুপ্ত ও শ্রীমান প্রমথনাথ বিশী 'বুধবার' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা শান্তিনিকেতন হইতে প্রকাশিত করিতেছেন।"[৩৩]

এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কিছু নতুন গান প্রকাশিত হয়। মূলত পৌষমেলা উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যায় বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীদের লেখনীতে সমৃদ্ধ হয় 'বুধবার' পত্রিকাটি। পত্রিকাটি দীর্ঘদিন প্রকাশিত হতে পারেনি। এর আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র এক বছর।

শান্তিনিকেতন পত্রিকার প্রকাশিত হয়েছিল তিন বছর। পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছিল প্রমথনাথের উপর। এরপর হাতে লেখা 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার সম্পাদনার ভার প্রমথনাথ বিশী নিয়েছিলেন। ১৩২৮ থেকে ১৩৩২ এই পাঁচ বছর পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় এবং পরে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

"শ্রীপ্রমথনাথ বিশী অনেক কাগজের সম্পাদক ছিলেন। —বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হবার পরে বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩২৮ সালে বের হয়। সম্পাদক সংঘে ছিলেন ফণীন্দ্রনাথ বসু, অসিতকুমার হালদার, বিভূতিভূষণ গুপ্ত এবং প্রমথনাথ বিশী।"[৩৪]

প্রমথনাথের বহু প্রেমের কবিতা শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। অতসী নামে এক সপ্তদশী মেয়ের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য প্রমথনাথের এই প্রেমোচ্ছ্বাস পূর্ণ কবিতার সৃষ্টি করেছে। এই কবিতাগুলি তৎকালীন সময়ে আশ্রমের প্রবীণ মহলে বেশ আলোড়ন ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই ব্যাপারটা জানতেন। এই কবিতাগুলি ১৯৩৪ খ্রিঃ "প্রাচীন আসামী হইতে" কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়। প্রমথনাথ

সুকৌশলে এই কবিতাগুলি তাঁর নতুন সৃষ্টি না বলে 'প্রাচীন আসামী' হইতে অনুবাদ কবিতা বলে নিজেকে অপবাদ থেকে মুক্ত রাখবার প্রয়াসী হয়েছেন কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথকে ফাঁকি দিতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে তিরস্কার না করে সস্নেহ প্রশ্রয়ের আভাস দিয়েছেন।

বলা বাহুল্য এই অতসী ছিল কবি মানসী শান্তিনিকেতন প্রবাসী ও ব্রহ্মপুত্র নিবাসী কবিতাটি উৎসর্গ পত্রে এই কথাটি লেখা ছিল।

পূর্ণিমার রাতে শান্তিনিকেতনের সাহিত্য আসরে রবীন্দ্রনাথের ফরমাইস মতো প্রমথনাথ পূর্ণিমা কবিতাটি লিখে পাঠ করেন। কবিতার শেষ স্তবক নিম্নে প্রদত্ত হল—

"কে জানেরে আজ কোজাগরী নিশি,
ঘুমায় না নীড়ে পক্ষী।
আঁখি মেলে দেখি এক মনোরম,
কামনা-নদীর সঙ্গম সম
কল্পসাগর - সেথা শতদল
শরৎ মাধুরী লক্ষ্মী।"[৩৫]

হে ধানশ্রী তীরবাসিনী, ব্রহ্মপুত্র তীর নিবাসী কবির এই দীন অঞ্জলি গ্রহণ করো। মিলন পিয়াসী ও রোমান্টিক কবি নিম্নোক্ত কবিতায় অকৃত্রিম প্রেমের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন—

"এস এইখানে বসি, আজ শেষবার
ওই হাত হাতে দাও, ওই দুটি আঁখি
রাখো মোর মুখ পরে, গাঢ় কেশভার
খুলে যাক, এই মতো কিছুক্ষণ থাকি।
তারপর চিরদিন এ হিমাদ্রি প্রায়
নিষ্ফলে মেলিয়া বাহু চাহিব তোমায়।[৩৬]

শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ প্রমথনাথের সাহিত্যরচনাকে অনেকটা প্রভাবিত করেছিল। প্রমথনাথ লিখেছেন— "বরেন্দ্রভূমে আমার জন্ম; সে লাল মাটির দেশ; আবার রাঢ়ের লাল মাটির দেশে আমার দ্বিতীয় জন্ম। আমার দুই জীবনের দুই উদয়দিগন্তে লাল মাটির আভায় চিররক্তিম।"[৩৭]

এখানকার প্রকৃতির দ্বৈতলীলা ক্ষেত্র—

"পশ্চিমে রুক্ষ, অনুর্বর, দগ্ধ, কঠিন, নিঃস্ব, বিবাগী ভূখন্ড সন্ন্যাসীর শুষ্ক উদার ললাটের মতো; আর পূর্ব দিকে শ্যামল, কোমল, সমতল, শষ্যায়িত, স্নিগ্ধ, তরুবহুল প্রান্তর সন্ন্যাসীর কৃপাস্নিগ্ধ করুণ ওষ্ঠাধর : বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ যেন ভেদ ভুলিয়া পাশাপাশি তপোমগ্ন। এই বিচিত্র ভূখন্ডের মধ্যে অর্ধনারীশ্বর হরগৌরীর অলৌকিক সমাধি।"[৩৮]

শান্তিনিকেতনের একদিকে আচ্ছাদিত বনভূমি, অন্যদিকে প্রান্তরের নগ্নতা। পশ্চিমে মহুয়া, শাল, পেয়ালের সারি। উত্তরে দেবদারু গাছের সারি। সেই সঙ্গে আমলকি, বকুল, কাঞ্চন, শিমুল, সেগুন, পলাশ, আম্রকুঞ্জ, মন্দার, বনপুলক, বাসন্তী, ছাতিম প্রভৃতি গাছের

সমারোহ। ঋতুতে ঋতুতে ফুলের সুবাস ছড়িয়ে পরে শান্তিনিকেতনের আকাশে বাতাসে। কৃষ্ণচূড়া, কেতকী, কদম্ব, চামেলি, শিউলি, মাধবী, রক্তকরবী, হেনা, রজনীগন্ধা প্রভৃতি ফুলের সুগন্ধ প্রমথনাথের মনকে ব্যাকুল করে তুলেছে।

বালক প্রমথনাথ শান্তিনিকেতনের ঋতু বৈচিত্র্যে প্রভাত প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের মধ্যে গন্ধের আকর্ষণই বোধ করি, আমার উপর সবচেয়ে প্রবল। শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন ঋতুর গন্ধ অনুসরণ করিয়া আমি একখানি সম্পূর্ণ চিত্র আঁকতে পারি।"[৩৯]

প্রমথনাথের প্রকৃতি প্রেমে কোনো খাদ ছিল না। একবার শান্তিনিকেতনে বৈদ্যুতিক খুঁটি পোতার জন্য রাস্তার ধারে কিছু গাছের ডাল কাটা হয়। প্রমথনাথ বনলক্ষ্মীকে অঙ্গ হীন করবার জন্য দারুণ আঘাত পেয়ে এক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধে তিনি পরোক্ষভাবে রবীন্দ্র সমালোচনা মুখরিত হয়েছেন, তাঁর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ হলেন প্রকৃতির কবি, অথচ প্রকৃতির প্রতি তাঁর অবমাননায় তিনি মর্মাহত হয়েছেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের 'বলাই' ছোটগল্পের কথা আমাদের স্মরণ করে দেয়, লেখক উদ্ভিদের সঙ্গে সঙ্গে পাখিকে ভালোবেসেছেন গভীরভাবে—

"গাছের ফুলকে আমরা যেমন সহজে ভালোবাসি, আকাশের পাখির প্রতি ভালোবাসা তেমনি সহজাত।"[৪০]

পাখির ডাক শুনে প্রমথনাথের মনে কৌতূহল জাগ্রত হত। এই ডাক শুনে তাঁর মনে এক প্রশ্ন জেগেছিল ঃ

"গাছপালা ভরা শান্তিনিকেতনে ভোররাত থেকে নানারকম পাখির গান উঠতে থাকে। প্রথমে দেবদারু গাছগুলোর মধ্যে কিচিরমিচির করে মিশ্র গান ওঠে যেন সুরের রং-মশাল। তারপর ফিঙে, দোয়েল, শালিব প্রভৃতির রব, অবশেষে একসময় কোকিল গান শুরু করে দেয়—তবে জ্যোৎস্না রাত হলে সারারাত ধরে ডাকে, কেন গলা ভেঙ্গে যায় না সে এক বিস্ময়।"[৪১]

পাখির ডাক, কোকিলের কু-উ-উ, মৌমাছির গুঞ্জন, কাকের কা-কা রব প্রমথনাথ কান পেতে শুনেছেন। তাঁর সাহিত্যে রাজহাঁস, বক, চামচিকা, চন্দনা, বুলবুল, ময়না, মোরগ, ঘুঘু প্রভৃতি পাখির প্রসঙ্গ আছে।

কবিতীর্থ শান্তিনিকেতনে সতেরো বছর থেকে এখানকার নদনদীর সঙ্গে প্রমথনাথের ঘটেছে আত্মিক পরিচয়। কোপাই, কাসাই, ব্রাহ্মণী, ময়ূরাক্ষী, বক্রেশ্বর, অজয় প্রভৃতি নদী প্রকৃতির বিচিত্র রূপ তিনি দেখেছেন। তাঁর সাহিত্যে নদী একটি প্রধান উপাদান হয়ে দেখা দিয়েছে। বীরভূমের মাটি মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর ঘটেছে অন্তরঙ্গ পরিচয়। কত বাউলের একতারা বাজিয়ে মনের মানুষ খোঁজার গান শুনেছেন। জয়দেব, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলীর কণ্ঠ তাঁর হৃদয়ে আকুল আবেগ সৃষ্টি করেছে।

সেই সঙ্গে বীরভূমের সাঁওতাল পল্লীর সাঁওতালদের জীবনযাত্রা, তাঁদের মুখের ভাষা নাচ ও গানে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক পরিচয় ঘটেছে বারবার।

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের বাড়িগুলো উত্তরায়ণ, কোণার্ক, উদীচী, উদয়ন ও শ্যামলী প্রভৃতি নামে চিহ্নিত। এখানকার নিয়মিত ক্লাস বসে শাল বৃক্ষের নীচে কখনও আম্র বৃক্ষের তলায় ও আমলকী গাছের নীচে। অতি সাধারণ পোশাক পরিচ্ছদ ছাত্রদের, মেয়েদের লাল পাড়ের সাদা শাড়ি, ছেলেদের পরনে পাজামা ও পাঞ্জাবী এবং কোন পদাভরণ নেই।

বৈতালিক গাওয়া হয় প্রতিদিন সকালে। বৈতালিক গানের সুর—

"নতুন যুগের ভোরে—
দিসনে সময় কাটিয়ে বৃথা
সময় বিচার করে"—

এবং — "মোরা ভয় করবো না ভয় করবো না।"[৪২]

কত দেশী ও বিদেশী দেশপ্রেমিক, দার্শনিক, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকদের বক্তৃতা, উপদেশ, কথামৃত প্রমথনাথের মনরূপ ডালাকে পাকা ফসলে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। তিনি দেখেছেন মহাত্মা গান্ধি, জহরলাল নেহেরু, এ. কে. ফজলুল হক, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রতিভা বসু, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী, কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুত্রবধূ প্রতিমা ঠাকুর, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মণীশ ঘটক, মুজতবা আলী, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কবি জসীমউদ্দীন, সাগরময় ঘোষ, ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী, কাজী আবদুল ওদুদ, অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, সজনীকান্ত দাস, অজিত দত্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, হেমলতাদেবী, ফিরোজা বারি, সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, আব্বাসউদ্দীন, নন্দলাল বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, মৈত্রেয়ী দেবী প্রমুখ গুণী ব্যক্তির প্রভাব প্রমথনাথকে সাহিত্য রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল।

প্রমথনাথ ভুলে যেতে পারেননি শান্তিনিকেতনের সেই চিরপরিচিত আশ্রম সঙ্গীতের সুর—

"আমাদের শান্তিনিকেতন
আমাদের সব হ'তে আপন
সব হ'তে আপন।"[৪৩]

শান্তিনিকেতনের শিক্ষাধারায় ছাত্র - শিক্ষক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠানের একাত্মতা, পবিত্রতা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, সেই সঙ্গে আন্তবিক ভালোবাসা, মহত্ত্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মানসিকতা ও মানবতার রসোলোকে উত্তরণ প্রমথনাথের মনোভূমিকে সমৃদ্ধ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় শান্তিনিকেতনের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন—

"আমার ভাগ্যক্রমে আমি পৃথিবীতে প্রশস্ত আসন পেতেছি, সেই আসন আমি পেতেছি

শান্তিনিকেতনে। আর শান্তিনিকেতন হবে মানব-হৃদয়ের একটি মিলনকেন্দ্র। তিনি বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীদের আহ্বান করে বলেছেন, "এসো সব কর্মী, সাধক, গুরু, সকলে মিলিত হয়ে এটিকে সার্থক করো।"[৪৪]

ছায়া - সুনিবিড় শান্তির নীড় শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছাত্রী প্রত্যেকেই ছিল সংস্কারমুক্ত খোলা মনের অধিকারী। নামী দামী অধ্যাপকদের সাহচর্য প্রমথনাথের মনোভূমিকে উর্বর করতে পেরেছে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন শান্তিনিকেতনের এমন ঋতুর লীলারঙ্গ তিনি অন্য কোথাও দেখেননি। ঋতু সঙ্গীত রচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

"যখন রবনা আমি মর্ত্য কায়ায়,
তখন স্মরিতে যদি হয় মন,
তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।"[৪৫]

তাইতো বৈশাখে এখানে বসেই লেখা সম্ভব—

"ডাকো বৈশাখ, কাল বৈশাখী,
করো তারে লীলা সঙ্গিনী,"
আষাঢ়ে —
'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে
পাগল আমার মন জেগে উঠে,'
শরতে —
'শরৎ ডাকে ঘর ছাড়ানো ডাক,
কাজ ভোলানো সুরে,'
শীতে —
'শীতের হাওয়ায় লাগলো নাচন
আমলকীর ঐ ডালে ডালে;
অথবা বসন্তে —
"বসন্তে ফুল গাঁথলো তোমার জয়ের মালা।
ইত্যাদি কত না গানের দীপালি।"[৪৬]

প্রমথনাথ রবীন্দ্রসঙ্গীতের ঐন্দ্রজালিক রোমান্স উপলব্ধি করেছেন।

প্রমথনাথ রবীন্দ্র পরিকল্পিত বৃক্ষরোপন উৎসবে অংশ নিতেন। এইরূপ রবীন্দ্রনাথে মানস তীর্থ শান্তিনিকেতনের অনেক স্মৃতি প্রমথনাথের মনকে উর্বর করে তুলেছিল।

ডঃ আশরফ সিদ্দিকী 'রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন—

"শান্তিনিকেতনের শ্যামলিম পরিবেশ—আন্তর্জাতিকতা—শিক্ষক— শুভানুধ্যায়ী ও বন্ধুবর্গের সহমর্মিতা আর সহধর্মিতার মধ্য দিয়ে আমার যে সাহিত্য—সাধনা—প্রীতির বৃক্ষে ফুল ধরেছিল—

তা পরিপূর্ণ ফলবান হয়েছে সে কথা বলার অধিকার তো আপনাদের; মহাকালের। তবে চেষ্টা করেছি। চেষ্টা থেমে যায়নি। শুকিয়ে যায়নি। আন্তর্জাতিকতা ও মানবতার যে পথে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা আজ বিশ্বপ্রসারী হয়েছে। দেশে দেশে ঘরে ঘরে খুঁজেছি ঘর—আছে দুঃখ—আছে লড়াই—ক্ষমতার বড়াই, হয়তো ভবিষ্যতেও থাকবে। প্রশংসায়ও বিগলিত হই নি—নিন্দাতেও পড়িনি ভেঙে—মন করেছি সমুদ্রগামী—বিশ্বমুখী—যা আছে আমার কাব্য—কবিতায়—প্রবন্ধে, গ্রন্থে। তাই তো মধ্যে মধ্যেই তোমাদের ডাকি—উদাত্ত কণ্ঠে ডাকি—তোমরা কি সে আহ্বান শুনতে পাও? শুনতে পান কি রবীন্দ্রনাথ?"[৪৭]

প্রমথনাথ বিশী ছিলেন কথার কারিগর। 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' (১৩৫১) গ্রন্থটি তাঁর স্মৃতির এ্যালবাম, মধু গন্ধে ভরা অতীত স্মৃতির টুকরো টুকরো ছবিগুলি পাঠকের মুগ্ধ না করে পারে না। গ্রন্থে মুক্তোর মত শব্দগুচ্ছ সাজিয়ে বাক্য ও ছন্দে লেখক সমৃদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর তিন বছর পর প্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থটি প্রমথনাথ শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনতম রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেছেন। প্রমথনাথের বিয়াল্লিশ বছর বয়সে লেখা গ্রন্থটিতে আগাগোড়া তির্যক লঘু কটাক্ষ মন্তব্য গদ্যের রম্যতা ও নিরুচ্ছ্বাস ঋজুতা ভিন্ন স্বাদ এনে দিয়েছে। তিনি যেন বিশ্লেষক না হয়ে সংশ্লেষক হয়ে উঠেছেন। বিবৃতিকারের তুলনায় সূত্রকার হিসাবে তাঁকে দেখা গেছে। অরুণকুমার বসু 'রবীন্দ্রচর্চায় প্রমথনাথ বিশী' প্রবন্ধ লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন গ্রন্থ সম্পর্কে—

"সরস গল্পের টানে, ছবির সঙ্গ টীকায় স্মিতহাস্য অট্টহাস্য প্রভৃতি হাস্যরসের অফুরন্ত জোগানে এই আয়োজন সাহিত্যের দুর্মূল্য সম্পদ হয়ে উঠেছে।"[৪৮]

প্রবোধচন্দ্র সেন "আশ্চর্য জীবন, আশ্চর্য পৃথিবী" প্রবন্ধে বলেছেন "রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন", এক অর্থে আরও জটিল রচনা। এখানে মূল জীবনী তিনটি—দুটি ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠান। প্রমথনাথের আত্মজীবনী তাঁর বহু রচনার মধ্যেই ছড়িয়ে আছে কিন্তু এখানেই দেখি সবচেয়ে সফল প্রকাশ, এ যেন মালা—গাঁথা—রবীন্দ্রচরিত্র এবং শান্তিনিকেতনের অনেক চিত্রকুসুমে যে মাল্যের গ্রন্থন হয়েছে তারই সূত্র হল প্রমথনাথের জীবন। সূত্রটি সাধারণ নয়, গ্রন্থনও অসামান্য। সাহিত্য—সমালোচনার আলোয় রবীন্দ্রনাথকে প্রমথনাথ দেখেছেন বহু রচনায়; আর দেখেছেন চারটি সংলাপে কালিদাস, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও গান্ধির ব্যক্তিত্বের অন্বয়ে, সাহিত্য-সমাজ-জীবনদর্শনের পটভূমিতে। 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' অন্য সরণী অবলম্বন করেছে-অন্তরঙ্গ অভিব্যক্তি ও দর্শন। রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন ও প্রমথনাথ পারস্পরিক পরিপূরণের পন্থায় ত্রিসংজ্ঞার জীবনী। আত্মজীবনী এখানে সংযোগ-সাহিত্য। আত্মজীবনীর প্রয়োগে একটি মহামানব ও একটি মহাপ্রতিষ্ঠানের জীবনীরচনার কৌশলে 'রবীন্দ্রনাথ ও 'শান্তিনিকেতন' একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি।"[৪৯]

এই গ্রন্থে কতগুলি মূল্যবান ছবি স্থান পেয়েছে। ছবি গুলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গৌরগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণ লাল ঘোষ, সুহৃদকুমার মুখোপাধ্যায়, পিনাকী ত্রিবেদী কর্তৃক

অঙ্কিত। শান্তিনিকেতনে শাল, বীথিকার ছবিতে শান্ত সৌম্য মূর্তিতে দন্ডায়মান রবীন্দ্রনাথ, ছাতিম তলায় ধ্যানের আসন, উপাসনা মন্দির, ঘন্টাবাদনরত কর্মচারী, ছোট, বড় সভায় রবীন্দ্রনাথ সহ উপস্থিত ছাত্রছাত্রী, গাছের তলায় কক্ষের চিত্র, শান্তিনিকেতনের বীথিকা গৃহ যেখানে প্রমথনাথের জীবনে সতেরো বছর—কাল অতিক্রান্ত। সুরুল কুঠিতে অধ্যয়নরত রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতনের আদিম দোতলা বাড়ি, রবীন্দ্রনাথ ও জগদানন্দ বাবুর ক্লাসের ছবি, ছেলেদের হাতে লেখা পত্রিকার ছবি, অকাল সূর্যের মত ঝক্‌ঝক্ করা, রুপার প্রকান্ড শীল্ডের ছবি। এই চিত্রগুলি রবীন্দ্রসদনের সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত।

"১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনে থাকাকালে প্রথম বিভাগে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রমথনাথ বিশী উত্তীর্ণ হন। এই সংবাদ শ্রাবণ সংখ্যা ১৩২৬ প্রথমবর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় শান্তিনিকেতনে পত্রিকার আশ্রম সংবাদ শিরোনামে প্রকাশিত হয়।"[৫০]

সেই সময় বিদ্যালয়ে একটা নিয়ম প্রচলিত ছিল কোন ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ হবার পর তিন বছর অবিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত থাকেন, সেই ছাত্র যদি আই.এ. পরীক্ষা দিতে আগ্রহী হয় তাহলে তাঁর উক্ত পরীক্ষা দেবার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। প্রমথনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবার সুযোগ পান। তিনি ১৯২৩ থেকে ১৯২৬ খ্রীঃ পর্যন্ত একটানা তিনবছর শিক্ষকতা করবার সুবাদে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। ১৩২৭ সালে বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

একান্ত শিক্ষানুরাগী প্রমথনাথের অদম্য জ্ঞান পিপাসা তাঁকে উচ্চশিক্ষার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সেই সময় শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীতে স্নাতকস্তরের পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়নি। এই সময় প্রমথনাথ বি. এ. পড়বার উদ্যোগী হন। এইজন্য শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক পরিবেশের মায়া ত্যাগ করে তাকে চলে আসতে হয়েছিল তাঁর জন্মভূমি রাজশাহী জেলায়। বলাবাহুল্য প্রমথনাথের শান্তিনিকেতন ছাড়বার পেছনে আরেকটি কারণ ছিল বলে সমালোচকগণ মনে করেন। ইতিমধ্যে ব্যঙ্গরসিক শিল্পী হিসেবে প্রমথনাথের পরিচয় ঘটেছে। শান্তিনিকেতন কর্তৃপক্ষকে কেন্দ্র করে প্রমথনাথের ব্যঙ্গধর্মী নাটক রচনার ফলে তিনি অনেকের কাছে অসন্তোষের পাত্র হয়ে ওঠেন।

পরিশেষে শান্তিনিকেতনের পিছুটান প্রমথনাথকে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। প্রমথনাথ পাড়ি জমালেন নতুন এক যাত্রা পথে, পেছনে ফেলে আসা বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের লীলাভূমি শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি, পারিপার্শ্বিকতা ও রবীন্দ্রনাথের হিমালয়িক ধৈর্য এবং উদার স্নেহস্পর্শ ছেড়ে এক বৃহত্তর জগত থেকে আরেক বৃহত্তর জগতের দিকে যাত্রা করলেন। খুব সম্ভবত ১৯২৭ এর পুণ্য প্রভাতে প্রমথনাথের জীবননাট্যের একটি দৃশ্যের পরিসমাপ্তি ঘটল।

তাঁর জীবননাট্যের দ্বিতীয় দৃশ্যে শুরু হল জন্মভূমি রাজশাহী কলেজে ভর্তির মধ্যে দিয়ে। এক শিক্ষায়তন থেকে অন্য শিক্ষায়তনে আসবার পর প্রমথনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধুর

অভাব হয়নি। ১৯২৭ খ্রিঃ রাজশাহী কলেজে প্রথম বর্ষ বি. এ. শ্রেণিতে ভর্তি হন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে অধ্যয়ন করেন। রাজশাহী কলেজের সন্নিকটে নিউহস্টেলে থাকতেন তিনি। প্রমথনাথের কনিষ্ঠ ভাই পরেশ বিশী তখন বিজ্ঞান বিভাগে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। প্রমথনাথকে অভিজ্ঞতা, পান্ডিত্য এবং বয়সের দিক দিয়ে রাজশাহী কলেজের অধ্যাপকদের সমতুল্য বলা যেতে পারে। সাহিত্যিক দেবেশচন্দ্র রায় ছিলেন রাজশাহী কলেজের আই. এস. সি. পরীক্ষায় প্রথম বর্ষের ছাত্র। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে যিনি প্রমথনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের একজন। দেবেশচন্দ্র রায়ের সঙ্গে প্রমথনাথের বন্ধুত্ব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল। "রাজশাহীতে দুবছর" প্রবন্ধটি লিখেছেন দেবেশচন্দ্র রায়। যে প্রবন্ধে প্রমথনাথের কলেজ জীবনের বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপস্থিত হয়েছে। দেবেশচন্দ্র রায়ের স্মৃতিচারণ থেকে আমরা জানতে পারি—

"তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী, মিতাহারী, পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে উদাসীন। ঘনিষ্ঠ পরিধির ভিতর আড্ডা দেওয়া, গল্প করা—বড় একটা করতেন না, অবসর সময়ে খালি পায়ে বারান্দায় পায়চারি করতেন অথবা বিছানায় শুয়ে পা দোলাতেন আর সবসময়ই থাকত হাতে বই। তার বেশীর ভাগই ছিল ইংরেজী সাহিত্যের সমালোচনা—বিশেষ করে সেক্সপীয়রের।"[৫১]

"এত অল্প সময়ের মধ্যে কলেজে এত সুপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে খুব জনপ্রিয় ছিলেন সে কথা বলা যায় না। কারণ তিনি Poular Sentiment-এর বিরোধিতা করতেন হুজুগের বন্যায় ভেসে যাওয়ার লোক তিনি ছিলেন না। এ অভ্যাস তিনি পরবর্তী জীবনেও সযত্নে লালন করে চলেছেন।"[৫২]

দেবেশচন্দ্র রায়ের স্মৃতিচারণ থেকে প্রমথনাথের জীবনধারার উজ্জ্বল চিত্র আমাদের দৃষ্টি প্রদীপে উদ্ভাসিত হয়। প্রমথনাথ ও দেবেশ রায় দুই বন্ধুর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পর প্রমথনাথ তাঁর রচিত তিনটি বই দেবেশ রায়কে পড়তে বললেন। তাঁর মধ্যে 'দেয়ালী' ও 'বসন্তসেনা' নামে দুটি কাব্যগ্রন্থ ও 'দেশের শত্রু' নামে একটি উপন্যাস। দেবেশচন্দ্র রায় উপন্যাসটি পড়লেন।

সেই সময় পরাধীন ভারতে এক উত্তাল তরঙ্গ প্রবাহিত হয়েছিল। স্বদেশ প্রেমের জোয়ারে তরুণ সমাজ দেশের প্রতি কর্তব্য সচেতন হয়ে উঠেছিল। এমনকি স্বদেশ সেবায় নিয়োজিত হয়ে জীবন উৎসর্গ করবার মহান ব্রত তাঁরা নিয়েছিল। স্বদেশী আদর্শকে সামনে রেখে যুব সমাজ বিদেশী জিনিস বর্জন, ইংরেজি Statesman পত্রিকা বর্জন ও দেশনেতাদের বক্তৃতা শুনে স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। দেবেশচন্দ্র রায় একাগ্রচিত্তে 'দেশের শত্রু' উপন্যাসটি পড়ে মর্মাহত হলেন। উপন্যাসের মূল বিষয় ছিল গান্ধিজির ডাকে ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে যাবা পরিচিত ছিলেন প্রমথনাথ সেই সব প্রথম সারির নেতাদের প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন এবং স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ কবিদের প্রতি শাণিত ব্যঙ্গের বাণে বিদ্ধ করেছেন। দেবেশচন্দ্র রায়ের মনে একটা প্রশ্নের উত্তর প্রমথনাথ দিলেন—

"প্রথমটা কথা বলতে পারি না তবে কবিতাতো আমিও লিখি আমার দেশের কবিতা আসে না আর দেশাত্মবোধক কবিতা কেবল রবিবাবুই লিখেছেন বাকীগুলো কবিতাই নয়।"[৫৩]

প্রমথনাথ দু'জন কবিকে সার্থক কবি হিসেবে বেছে নিয়েছেন, তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। বন্ধু দেবেশচন্দ্র রায় 'দেশের শত্রু' উপন্যাসের নামকরণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন উপন্যাসটির যথার্থ নামকরণ হওয়া উচিত ছিল 'দেশের বন্ধু'। 'দেশের বন্ধু' নামকরণ করা হলে বইটি পাঠক মহলে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হত এবং বাজারে বইটির চাহিদা অনেকটা বেড়ে যেত, ফলে লেখকের অর্থাগম ঘটত সন্দেহ নেই। অর্থাগমের দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থ রচনায় দেবেশচন্দ্র রায় প্রমথনাথকে উৎসাহিত করলেন। প্রমথনাথ প্রত্যুত্তরে জানিয়েছেন—

"টাকা রোজগারই যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হত তাহলে আমি কবিতা না লিখে পাটের ব্যবসা করতাম।"[৫৪]

প্রমথনাথ স্বদেশীদের ডাকা সভায় ব্যক্তিগতভাবে অনুপস্থিত থাকতেন। এমনকি কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের সভায় যেতে বারণ করতেন। তবে মাঝে মধ্যে দেবেশচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দুই একটি সভায় উপস্থিত হয়েছেন। সভা চলাকালে বক্তাদের উচ্ছ্বাসময় বক্তৃতা শুনে শ্রোতারা যখন হাততালি দিতেন প্রমথনাথ সেজন্য বিরক্তি প্রকাশ করতেন। বস্তুত তিনি কোনো উচ্ছ্বাসকে সমর্থন করেননি।

প্রমথনাথের বাগবৈদগ্ধের পরিচয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাত্ররা উপলব্ধি করতেন। মূলত তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি যে তর্ক বিতর্কে অংশ নিতেন সেই যুক্তিকে খন্ডন করবার মতন কোনো বোদ্ধা ছিল না। সকলেই প্রমথনাথের যুক্তিগ্রাহ্য মতকে মেনে নিতে বাধ্য হত।

প্রমথনাথ উচ্ছ্বাসপ্রবণ মেকি স্বদেশ প্রেমিকদের মেনে নেননি। এমনকি তাঁদের সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তি ও কটূক্তি করতে দ্বিধা করতেন না। একদিন এক বিপ্লবীর সঙ্গে দেবেশ রায়ের গোপন রাজনৈতিক আলোচনা চলছিল, এই সময় কথা প্রসঙ্গে বিপ্লবীর মুখ থেকে দেবেশ রায় জানতে পেলেন বিপ্লবীরা প্রমথনাথের প্রতি আস্থাশীল নয় এবং তাঁর গতিবিধি আন্দোলনকারীদের গ্রহণযোগ্য নয়। অকারণ ব্যঙ্গোক্তির অভিযোগে এক বিপ্লবী দেবেশচন্দ্র রায়কে জানিয়েছে—

"প্রথমবাবু যেভাবে চলছেন তাতে যে কোনদিন আমাদের ওকে সরিয়ে ফেলতে হবে।"[৫৫]

প্রমথনাথ যখন তাঁর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেলেন তাতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি।

কলেজ জীবনে প্রমথনাথ পলিটিক্স এড়িয়ে যেতেন। তবে বিশেষ সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে তিনি পিছিয়ে থাকতেন না। তাঁর চিত্ত ছিল নির্ভীক। যুক্তিবাদী প্রমথনাথ তাঁর সারগর্ভ যুক্তি দিয়ে নিজ বক্তব্যকে উপস্থাপিত করতেন। কিন্তু সেই যুক্তি অনেক সময় Popular Sentiment -এর বিরুদ্ধে দেখা যেত। তিনি কাউকে তোয়াক্কা না করে উচ্চস্বরে নিজ মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন। শুধুমাত্র রাজনীতি ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ধর্মনীতি সব আলোচনার ক্ষেত্রেই জোরের সঙ্গে নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করতেন বলে তিনি সকলের প্রিয় পাত্র না হয়ে বিরাগভাজন হতেন। জনমতের

বিরুদ্ধে নির্ভীকতার পরিচয় কলেজ জীবনে প্রমথনাথ বহুবার দেখিয়েছেন। ১৩২৯ সালে স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বয়কট আন্দোলন যখন জোরদার হয়ে উঠেছিল তখন রাজশাহী ছাত্রাবাসে সুরেন দাসগুপ্ত নামে এক ছাত্র বিলিতি সিগারেট মুখে দিয়ে ছাত্রাবাসের ছাত্রদের রোদে শুকোতে দেওয়া বিদেশী কাপড়গুলো পোড়াচ্ছিল এই দৃশ্য দেখে অসহায় ছাত্রদের পক্ষ প্রমথনাথ অবলম্বন করলেন। ছাত্রদের বাহবা দেওয়া দেখে প্রমথনাথ গর্জে ওঠেন—

"বিলিতি সিগারেট মুখে দিয়ে অন্যের কাপড় পোড়াতে লজ্জা করছে না?"[৫৬]

দোতলা থেকে এভাবে প্রমথনাথের চিৎকার করে কথা বলায় তখনকার মতো বন্ধ হল কাপড় পোড়ানো। পরদিন থেকে ছাত্রনেতা সিগারেট বর্জন করে তার পরিবর্তে চুরুট ধরলেন।

প্রমথনাথ জনমতের বিরুদ্ধে অকুতোভয়তার আরেকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। একদিন রাজশাহী কলেজের হস্টেলের ছাত্রদের একাংশ এক উঁচু শ্রেণির ছাত্রকে বৃটিশ সরকারের স্পাই মনে করে রাতের অন্ধকারে প্রহার করায় তার মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। এরূপ ঘটনার প্রকৃত কারণ কি তা খোঁজ করতে গিয়ে জানা গেল—

"ওই লোকটা ইংরেজের স্পাই, ওকে মারাই উচিত" দেবেশচন্দ্র রায়ের উপস্থিতে ছাত্রবাসের অন্যান্য ছাত্ররা মিলে যখন উঁচু শ্রেণির ছাত্রটির মার খাওয়া সঙ্গত বলে সাব্যস্ত করছিল এবং তারা মাথা কামিয়ে ঘোল ঢেলে গাধার পিঠে চড়িয়ে রাজশাহী শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘোরান হবে। উঁচু শ্রেণির ছাত্রটির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে প্রমথনাথ হস্টেলের ছাত্রদের এই সিদ্ধান্তকে অযৌক্তিক বলে বিবেচনা করলেন। প্রমথনাথ গর্জে উঠলেন এবং যুক্তিবাদী দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন—

"এই লোকটা যে স্পাই সেটা কোনও কোনও লোকের সন্দেহ মাত্র, এর কোনো প্রমাণ নেই, শুধু একটা অমূলক সন্দেহের উপর একটা লোককে যন্ত্রণা দেওয়া অন্যায়। ব্যাপারটা সেখানেই চাপা পড়ল, কিন্তু এ নিয়ে হস্টেলে তিন চারদিন খুব গোলমাল।"[৫৭]

চারিত্রিক দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্বে প্রমথনাথ সহপাঠি কলেজের অধ্যাপকদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিল। দেবেশচন্দ্র রায়ের স্মৃতিচারণ থেকে প্রমথনাথের চরিত্রের আরও কিছু নতুন তথ্য আমরা জানতে পারি—

"এখন পুরনো দিনের কথা মনে করতে গেলে আশ্চর্য লাগে কী করে এরকম একজন কটুভাষী বুদ্ধিপ্রবণ অথচ শান্তিনিকেতনী লোকের সঙ্গে আমার মত সংসারানভিজ্ঞ আবেগপ্রবণ, গেঁয়ো নেহাতই সাধারণ ছেলের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, আর কি করেই বা এত বছরের ধোপ সয়ে তা টিকে রইল। স্বভাবে আমাদের প্রচুর তফাৎ ছিল, আমি তখন সবে সংসার চিনতে শুরু করেছি—উনি তখন সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন। মাঝে মাঝে উনি সন্ধ্যাবেলায় কোথায় যেতেন জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—'উকিলের বাড়ি যাচ্ছি'। মামলার মারপ্যাঁচ তখনই তিনি সব জানতেন। আমি বিজ্ঞান পড়তুম, উনি ছিলেন সাহিত্যের ছাত্র। আমি Mazzini, Garibaldi-

র লেখার অনুবাদ পড়তাম। উনি বলতেন, Shakespeare, Shelly, Keats, Byron পড়। সাহিত্য শিখবে। যে কোন ছোটখাটো দেশ-নেতাকেই আমি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম, ওর কাছে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন একমাত্র পুরুষ। বিকেলে আমি ব্যায়াম করতে যেতাম, উনি তখন শুয়ে শুয়ে বই পড়তেন—কোনো issue-তেই আমাদের মতে মিলত না।"[৫৮]

তবে এর বোধহয় একটা ব্যাখ্যা হয়, "উনি তখন বলতেন আমি নর্থ পোল আর তুই সাউথ পোল। তোদের বিজ্ঞানে আছে বিপরীত চুম্বক পরস্পরকে আকর্ষণ করে—তাই বোধহয় তোর সঙ্গে আমার এত ভাব। এত বছরেও বোধহয় আমাদের চৌম্বকত্ব কমেনি আর এই চৌম্বকীয় আকর্ষণই বোধহয় আমাদের এখনও একসঙ্গে রেখেছে।"[৫৯]

রাজশাহী কলেজে অনুষ্ঠিত হত বিভিন্ন সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা চক্র। এই আলোচনা চক্রে প্রমথনাথ সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি স্বরচিত কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করতেন। সেই সঙ্গে সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে প্রমথনাথের মূল্যবান ভাষণ শ্রোতাদের মনোগ্রাহী করে তুলত, রাজশাহী কলেজে অধ্যয়নকালে কবিতা ও প্রবন্ধের পাশাপাশি ছোটগল্প ও নাটক রচনা করেন, তাঁর লেখা 'প্রজাপতির পক্ষপাত' ও 'আফিমের ফুল' নামে দুটি নাটক ছাত্রাবাসে মঞ্চস্থ হয়েছিল। এছাড়া 'দেনাপাওনা' নাটকটি প্রমথনাথের অনবদ্য সৃষ্টি। শান্তিনিকেতনে অধ্যয়নকালে প্রমথনাথের অভিনয় নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। সেই অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি রাজশাহী কলেজে নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণ। 'দেনাপাওনা' নাটকে জীবানন্দের চরিত্র অভিনয় করে প্রমথনাথ ছাত্রমহলে সুঅভিনেতা বলে পরিচিত হয়েছিলেন। 'প্রজাপতির পক্ষপাত' নাটকের অভিনয়ে প্রমথনাথের সাফল্য প্রশংসাতীত।

রাজশাহী কলেজে অধ্যয়নকালে প্রমথনাথ তাঁর বন্ধুদের নিয়ে ভ্রমণে বের হতেন। বন্ধুদের নিয়ে নৌকাযোগে পদ্মাবক্ষে ভ্রমণ করতেন। মাঝে মাঝে পদ্মা তীরে পায়ে হেঁটে পর্যটনে যেতেন। প্রমথনাথের সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে পদ্মার প্রভাব ছিল অপরিসীম; ১৩৫১ খ্রিঃ প্রমথনাথের পদ্মানদী কেন্দ্রিক 'হংসমিথুন' কাব্য গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এই কাব্যে পদ্মাকে তিনি দেখেছেন দেবীরূপে কিংবা নারীরূপে। বিভিন্ন ঋতুতে পদ্মার রূপ ও সৌন্দর্য বর্ণনায় প্রমথনাথের কবি কল্পনা রোমান্টিক বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। তিনি দেখেছেন পদ্মাতীরে সূর্যাস্তের ম্লানরশ্মি, জ্যোৎস্না আলোকিত রাতে পদ্মার রূপালি আভা, দেখেছেন হিন্দু মুসলমান অধ্যুষিত চরের বিচিত্র সৌন্দর্য, তাদের সঙ্গে প্রমথনাথের ঘটেছে অন্তরঙ্গ পরিচয়, প্রকৃতির প্রতি প্রমথনাথের সহজাত আকর্ষণ ও নিগূঢ় সৌন্দর্যানুভূতি মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'বর্ষার পদ্মা', 'শীতের পদ্মা', 'মধ্যাহ্নের পদ্মা', 'সূর্যাস্তের পদ্মা', 'অপরাহ্নের পদ্মা', 'সন্ধ্যার পদ্মা' ও 'পদ্মার চর' কবিতায় প্রমথনাথের প্রকৃতি প্রেম জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

'বর্ষার পদ্মা' কবিতায়—কবি পদ্মার উতরোল শ্রাবণ সন্ধ্যায় ও বন্যায়, পদ্মার ডাক কান পেতে শুনেছেন এবং দেখেছেন পদ্মার উত্তাল ঢেউয়ে ক্ষুদ্র ডিঙিখানির টল্‌মল্ অবস্থা আর দেখেছেন—

"আউশের ক্ষেত্র মাঝে কৃষাণ বালক
তৃপ্ত নিজ গানে,
বুভুক্ষু তরঙ্গদল লক্ষ শির হানে

তটিনীর পায়
বৃষ্টিলুপ্ত নদীচরে পাপিয়ার স্বর
একান্ত নিশিত,
ম্লান ঝাউশাখা হতে অজস্র সংগীত
বেদনার প্রায়।"[৬০]

'শীতের পদ্মায়' কবি লক্ষ্য করেছেন পুরানো দিনের চরণচিহ্ন, দিগন্তের অন্তসীমায় শেষ আলোকরশ্মি এবং মেঘ ও কুয়াশার মিলিয়ে যাওয়ার দৃশ্য। কবি তাই বলেন—

"পীতাভ বালুর তীরেতে শয়ান
পদ্মায় আজি স্বপ্ন-প্রয়াণ,
ধ্যানে নেহারিছে তারকাটি ম্লান
ধরিল কি রূপ হৃদয়াকাশে
পল্লীর শিরে বেণু-বন-ছায়
ধূমকুন্ডলী শয্যা বিছায়,
শেষ গাড়ি ধান গৃহমুখে যায়
আর্ত করুণ শব্দ আসে।"[৬১]

'নির্জন পদ্মা' কবিতায় প্রমথনাথ পদ্মার প্রেমে পড়ে পদ্মার রূপের ছবি এঁকেছেন নিম্নোক্তভাবে—

"নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার তারা,
দ্বিতীয়ার চাঁদ,
নীলাভ পদ্মার ধারা, শূণ্যতা অগাধ।
স্তিমিত হাঁসের দল,
পশ্চিম বনাস্তল
ম্লান কাঁদ - কাঁদ
শূণ্যতা অগাধ।"[৬২]

কবির লেখনীতে আবেগ অনুভূতি সার্থক ভাবে ধরা দিয়েছে। কবি বলতে চেয়েছেন পশ্চিম দিগন্তে আকাশে এক ফালি দ্বিতীয়ার চাঁদ, মাথার উপর সন্ধ্যা তারার নিঃসঙ্গতা। তাঁর নিচে বয়ে চলেছে নীলাভ পদ্মার ধারা যা কবিকে এনে দিয়েছে এক অগাধ শূণ্যতার জগতে। কবি প্রশ্ন করেছেন 'স্বপন নির্জন' পদ্মা ছায়ার মত অসীম রাতের অন্ধকার কিভাবে অতিক্রম করতে যাচ্ছে।

'মধ্যাহ্নের পদ্মা' কবিতায় কবি শীতের মধ্যাহ্নকালীন পরিবেশে এক নিদালি স্বপ্নময় জগতে আমাদের নিয়ে যান। কবি লক্ষ্য করেছেন এক চিত্রশিল্পী সূক্ষ্ম তুলিকা দিয়ে অঙ্কন করছেন এক রিক্ত মাঠের করুণ চিত্র। কবি কবিতায় বলেন—

"ওপারের ভাঙা তটে ছায়াখানি নীল,
চাক্র বেঁধে ওড়ে আর ডাকে শঙ্খচিল
কেন বারে বার।

পীতাভ বালুর রেখা, নীলাভ স্রোতের,
স্বর্ণাভ ঘুমের ঘোর পউষ রোদের
দু'পারে বিথার।"৬৩

বিশুদ্ধ রোমান্টিক কবিমনের পরিচয় বিবৃত হয়ে আছে 'অপরাহ্নের পদ্মা' কবিতায়, কবিতায় পদ্মাকে তিনি এক জীবন্ত নারী রূপে কল্পনা করেছেন। শীতের অপরাহ্নে কবি মানসীর দুটি চরণ চিহ্ন যেন ছাপ রেখে স্মৃতি চিহ্ন এঁকে এগিয়ে চলেছে নিরুদ্দেশের পথে কবি এই অধরা নারীর রূপ ও চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে একটি অনবদ্য নিসর্গ চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন নিম্নোক্ত ভাবে—

"একদিন এই পথে তুমি আর আমি।
এপারের গৃহরাজি, ওপারের বন
আসন্ন কুহেলি তলে হল নিমগন,
পশ্চিম সীমান্তশেষে বিন্দুমাত্রসার
ডুবে গেল নিঃস্ব রবি ম্লান কুয়াশার
রাঙাইয়া পাড়খানি, রাত্রি এলো নামি
তুমি আর আমি।"৬৪

'সূর্যাস্তের পদ্মা' কবিতায় শান্ত রবি ডুবে যায় পদ্মার জলে কবি পদ্মাকে দেখেছেন নৃত্যশীল ভঙ্গিতে ওড়ানো বিদ্যুৎপর্ণাকে—

"নদীতে শেহলা শ্যাম, রোদে - পোড়া ঘাস,
দগ্ধ মাঠে উঠিতেছে উদ্ভিজ্জ সুবাস
শিশিরের স্পর্শ লভি, বিমূঢ় বাতাস
গন্ধে আপনার,
হে পদ্মা তোমার।"৬৫

এখানে শেওলা, পোড়াঘাস, উদ্ভিদের সুঘ্রাণ কবিকে আমোদিত করেছে। তাই দগ্ধ মাঠের সুগন্ধে কবি আত্মহারা।

রাজশাহী শহরের কাছে পদ্মানদীর সান্ধ্যকালীন পরিবেশের দৃশ্য কবি কলমে আবেগ মিশ্রিত সুরের ঝরণা ধারা এনে দিয়েছে। কবি লক্ষ্য করেছেন শশীকলা সন্ধ্যা তারার গাথে কপোতপান্ডুর ছায়া নেমে আসা পদ্মাকে। তাই আলো আঁধারি পদ্মাকে বন্ধু বলে সম্বোধন করে কবি লিখেছেন—

"দুইটি বক্ষের মাঝে স্তব্ধতা অগাধ,
অনন্ত ধ্যানের মত দুইটি অন্তরে
ব্যগ্র ব্যাকুলতা—
তুমি বন্ধু কোথা।
আভাসে উজ্জ্বল হল চাঁদের গোলক,
মুমূর্ষু আলোর প্রান্তে রহিয়া রহিয়া
সন্ধ্যা তারা কাঁপে।

তোমার পরশ বন্ধু অম্বর ব্যাপিয়া,
বিরহী ভুবন রচে বেদনার শ্লোক,
বিচ্ছেদের তাপে
সন্ধ্যাতারা কাঁপে।”[৬৬]

‘পদ্মার চর’-এর প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের পৌঁছে দেয় এক অবর্ণনীয় অনুভূতির জগতে, এক আনন্দ ও রোমান্সকে অতি সূক্ষ্মভাবে ভাষা ও ভাষাতীত ব্যঞ্জনা দিয়ে প্রমথনাথ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। নিম্নোক্ত অংশে প্রমথনাথের রোমান্টিকতার সুর উৎসারিত হয়েছে—

“পদ্মার নতুন চরে কচি কাঁচা ধান,
প্রভাত অম্লান,
হায় ভগবান।
নধর ঘাসের বুকে কৃষ্ণচূড়াটির
ছায়াটি গভীর,

বৈশাখী আমের বনে মসৃণ পল্লব;
সুপ্তিমৃদু রব,
স্বপন দুর্লভ।
ওপারের চর হতে কোকিলের গান,
শিশিরের ঘ্রাণ,
হায়, হায় ভগবান।”[৬৭]

“শিলাইদহের ঝাউগাছ” কবিতায় চামর চূড়ার মতো সারি সারি ঝাউ গাছ যেন কবিকে হাত ছানি দিয়ে ডাকছে। পদ্মার তীরে মন্ত্রসম পদ্মার কলধ্বনি কবিকে দিয়েছে প্রশান্তি। সুদীর্ঘ কবিতায় কবি পদ্মা প্রকৃতির অনুপম রেখালেখ্য অঙ্কন করেছেন নিম্নোক্ত অংশে, রূপসী পদ্মাকে ভালোবেসে পদ্মা ও পদ্মাতীরভূমির একটি নিখুঁত চিত্র অংকন করেছেন—

“একূলে ওকূলে পদ্মা গড়ায় নিয়ত,
রূপসীর মত
বালুকার আস্তরণে রেখে রেখে যায়
দেহের রেখায়,
শ্রাবণের নিঃশব্দ কেকায়
তরঙ্গ কলাপ দল দেয় বিস্তারিয়া,
যায় সে বহিয়া
ভাঙ্গন ভঙ্গুর ভূমি লোহিয়া লোহিয়া
দুর্মদ অবুঝ,

শরতে সবুজ,
স্তব্দ নীলিমায়
হাঁস উড়ে যায়
শব্দের তোরণ রচি সন্ধ্যার আঁধারে,
দক্ষিণে বাঁধারে
শূন্য জুড়ি শিবাধ্বনি ছেঁড়ে বেড়াজাল,
ফুলাইয়া পাল
নৌকা ভেসে যায় কত,
ইতস্ততঃ
জীর্ণ হাল, দীর্ণ কাঠ, ছিন্ন দড়াদড়ি
যায় গড়াগড়ি,
মাস্তুলবিদীর্ণশূন্যে তারকা দু'চারি
আর ঝাউ সারি।"[৬৮]

'কবির পদ্মা' কবিতায় প্রমথনাথ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পদ্মার খণ্ড সৌন্দর্যের এক লাবণ্যময় বর্ণনা দিয়েছেন—

"তোমার দৃষ্টি দিয়ে ওকে গড়ে গিয়েছে,
তোমার কল্পনায় ওর নব জন্মলাভ,
তোমার প্রেমে ওর গঙ্গোত্রী।
এ পদ্মা তোমারি।
তাই ওকে বুঝি,
তাকে ওকে দেখি,
তাই তো অনায়াসে হ'ল মুক্তবেণী
আমার হৃদয়ের সঙ্গমে।"[৬৯]

রাজশাহী কলেজে অধ্যয়ন কালে প্রমথনাথ শুধুমাত্র রাজশাহীর জনজীবন ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সঙ্গেই পরিচিত হননি, উত্তরবঙ্গে পারিপার্শ্বিক পরিমন্ডলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে। পাবনা ও দিনাজপুরের মা, মাটি ও মানুষের সঙ্গে তাঁর আত্মিক পরিচয় ঘটেছে। উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, অঞ্চল প্রকৃতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভাষা, ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি, পালাপার্বণ, লোকাচার, কাহিনী কিংবদন্তির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। জমিদার বংশের সন্তান হয়ে দেখেছেন বিভিন্ন জমিদারের লাঠিয়ালে লাঠিয়ালে লড়াই, কান পেতে শুনেছেন মাঝিমাল্লাদের গানের সুর, শুনেছেন বাউল বৈষ্ণবীদের দেহতত্ত্বের গানও ভক্তিগীতি, দেখেছেন কলসি কাঁখে পল্লী রমণীর জল ভরতে যাওয়ার দৃশ্য। তিনি গ্রাম্য দলাদলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, দেখেছেন লালটুপি পরা ইংরেজদের পোষা পুলিশদের স্বদেশীদের উপর নির্মম অত্যাচার, ইংরেজ বিরোধী শ্লোগান শুনেছেন স্বাধীনতাকামী মানুষদের, উত্তরবঙ্গে সামাজিকতার বিবাহ, অন্নপ্রাশন, নামকরণ, নবান্ন উৎসবের দৃশ্য, চন্ডীমন্ডপের আলপনা আঁকা গৃহশিল্প, লাঠিখেলা, নৌকা, বাইচ, ঢাকি ঢুলিদের নাচ,

যাত্রাপালা, বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে নারকেল কাড়াকাড়ি খেলা, জমিদারদের দুর্গোৎসবের আড়ম্বর প্রভৃতি।

তিনি সেখানকার বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। কৃষক, শিক্ষক, পোস্টমাস্টার, সুদখোর মহাজন, পরনিন্দুক, পুরোহিত, লাঠিয়াল, ব্যবসায়ী, বিধবা, কিশোর, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি চরিত্রের সঙ্গে প্রমথনাথের পরিচয় ঘটেছে। প্রমথনাথের বহু ছোটগল্পে এই চরিত্রগুলি স্থান পেয়েছে।

এই সময় তাঁর পিতা নলিনীনাথের জমিদারির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পরে। জমিদারির অবক্ষয়ের পিছনে নলিনীনাথের ভূমিকা ছিল প্রধান। জমিদারির দেখাশোনার ব্যাপারে তাঁর উদাসীনতা এবং তাঁর অমিতব্যয়িতা অনেকটা দায়ি। শত্রুরা তাঁর জমিদারির অধিকারের বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার লাভ করে, নিতান্ত বাধ্য হয়ে নলিনীনাথ জোয়াড়ী গ্রামে জমিদারির রক্ষার্থে রাজশাহীর প্রতিষ্ঠিত উকিলের দ্বারস্ত হন। সুদীর্ঘকাল মামলা মোকদ্দমা চালাতে তাঁর বিপুল অর্থব্যয় হয়। প্রমথনাথ তখন রাজশাহী কলেজে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পড়বার ফাঁকে ফাঁকে জমিদারির কার্য তদারক করতেন এবং উকিলদের সাথে পরামর্শ করতেন। তাঁর রাজশাহী ও দিনাজপুর জেলার বাস্তব কাহিনী অবলম্বনে উল্লেখযোগ্য নাটক রচনা করেছেন। নাটকগুলি যদিও পরবর্তীকালের সৃষ্টি। তিনি নাটকের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছেন বেশিরভাগ রাজশাহী থেকে। তাঁর জমিদারি পরিচালনাকালীন যে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছিল তাঁর প্রতিফলন ঘটেছে নাটকে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে ও ছোটগল্পে।

প্রমথনাথের কলেজ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯২৯ খ্রিঃ, এই সালে তিনি ইংরেজিতে অনার্সসহ বি. এ. পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন এবং এম. এ. পডবার জন্য সংকল্প গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে পিতা নলিনীনাথ প্রমথনাথের বিবাহের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, রাজশাহীর এক বরেণ্য উকিল শ্রীযুক্ত সুদর্শন চক্রবর্তীর সুদর্শনা কন্যা সুরুচিদেবীর সঙ্গে ১৩৩৬ সালের ১লা আষাঢ় প্রমথনাথের বিবাহ হয়। তাঁর বিবাহিত জীবন ছিল মধুর, দুজনের দাম্পত্য জীবন ছিল সুখকর এবং সুরুচিদেবী ছিলেন একান্ত শিক্ষানুরাগী। প্রমথনাথের সাহিত্যচর্চা ও জ্ঞান পিপাসাকে উজ্জীবিত করবার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অনেকটাই।

প্রমথনাথ বিয়ের কিছুদিন পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু জমিদারির অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে তাঁর ইংরেজিতে এম.এ. পড়া সম্ভব হল না।

পিতা নলিনীনাথ বিশী স্বদেশ সেবায় যুক্ত থেকে স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন। তাঁর এই নেতৃত্বকে ইংরেজ সমর্থিত কর্মচারীরা মেনে নিতে পারেনি। রাজশাহীর বহু স্বদেশীদের গ্রেপ্তার বরণ করতে হয়েছে। নলিনীনাথের উপর ইংরেজ কর্তৃপক্ষের প্রবল রোষের ফলে নলিনীনাথকে স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে জেলে যেতে হয়। ১৯৩০-৩২ সাল যখন গান্ধিজির পরিচালিত দ্বিতীয় পর্যায়ের আইন অমান্য আন্দোলন সারা ভারত ব্যাপী ছড়িয়ে পরেছিল এই সময় নলিনীনাথকে তিনবার কারারুদ্ধ করা হল। একদিকে ঘনঘন কারাবরণ অন্যদিকে জমিদারির অধিকার নিয়ে শরিকি বিরোধ এবং খাজনা আদায়ের অনিশ্চয়তা প্রমথনাথের পারিবারিক জীবনকে সংকটময় করে তুলেছিল।

অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রতিরোধকল্পে প্রমথনাথকে ইংরেজিতে এম.এ. পড়া ছেড়ে জন্মভূমি জোয়াড়ীতে ফিরে আসতে হয়। প্রমথনাথ অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে জমিদারি তদারকি দায়িত্বভার গ্রহণ করে রাজশাহীতে শ্বশুরালয়ে থেকে মামলা মোকদ্দমা চালিয়ে যেতে থাকেন। প্রমথনাথের বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় এই সময় তাঁর চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে বিবেচিত হয়। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের স্মৃতিচারণ থেকে আমরা নিম্নলিখিত তথ্য জানতে পারি—

"বয়সে তরুণ, স্বভাবে কবি, (তায় রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ছায়ায় লালিত) সদ্য বিবাহিত— বিষয় সম্পত্তির জটিল ও দুরূহ তত্ত্ব বোঝবার কথা নয় একেবারেই.....হার মানবার মানুষ নন উনি— হাল যখন ধরলেন তখন আর সহজে ছাড়লেন না, প্রায় এক বৎসর ধরে সমানে মামলা-মোকদ্দমা চালাতে হয়েছে, ঘরে বাইরে অসংখ্য বিশিষ্ট লোকের আক্রমণ ঠেকাতে হয়েছে। কিন্তু তাতে উনি একটুও দমেননি—সকলের সব অস্ত্রই ওঁর প্রখর বুদ্ধির বর্মে প্রতিহত হয়ে ফিরে গেছে।"[৭০]

বস্তুত প্রমথনাথের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জমিদারি সম্পত্তি পুনরুদ্ধার হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিপুল অর্থব্যায়র কারণে সাংসারিক জীবনে নেমে আসে অর্থাভাব। এর ফলে প্রমথনাথের এম.এ. পড়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় দেখা দেয়।

বিদ্যোৎসাহী সুরুচি বিশী এই দুঃসময়ে স্বামী প্রমথনাথের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর সঞ্চিত অর্থ দিয়ে প্রমথনাথকে আবার এম.এ. পড়াবার উদ্যোগ নিলেন। ওই উদ্যোগের পিছনে নিকট আত্মীয় শ্রী শশাঙ্কশেখর বাগচীর নাম বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য। শ্রী বাগচীর আগ্রহ ও পরামর্শ এবং শ্রীমতি বিশীর অর্থানুকূল্যে প্রমথনাথ কলকাতা থেকে এম.এ. পড়বার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্যের প্রতি ছিল প্রমথনাথের সুগভীর অনুরাগ। শ্রীমতি বিশী প্রমথনাথের সেই অনুরাগকে বাস্তবায়িত করবার পথকে ত্বরান্বিত করে দিলেন। প্রমথনাথ কল্লোলিনী শহর কলকাতায় পৌঁছে ছাত্র পড়িয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রাইভেটে এম.এ. পড়বার প্রস্তুতি নেন। দৃঢ় মানসিকতা ও সংকল্পের একাগ্রতার জন্য প্রমথনাথের এম.এ. পড়া সহজ সাধ্য হয়ে উঠল। তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দেন। ১৯৩২ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন।

কলকাতা থাকাকালে প্রমথনাথের সঙ্গে প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় সূত্র গড়ে ওঠে। প্রমথনাথ তাঁদের মত সাহিত্যসমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হলেন এবং ভাবলেন একদিন সাহিত্য রচনার মধ্যে দিয়ে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনবেন। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রমথনাথ কবিতীর্থ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যান রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাফল্যে উচ্চ প্রশংসিত হয়ে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার মহান ব্রত পালনের নির্দেশ দেন কিন্তু প্রমথনাথ গুরুদেবের উপদেশ পালন না করে সাহিত্যচর্চার সুবিধার্থে কলকাতায় চলে আসেন।

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৫ খ্রিঃ পর্যন্ত তিন বৎসর কাল রামতনু লাহিড়ী বৃত্তি নিয়ে পঁচাত্তর টাকা মাসোহারায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গবেষণার কাজে বৃত হন। তখন প্রখ্যাত গবেষকদের সঙ্গে প্রমথনাথের অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে পল্লীকবি জসিমউদ্দিন, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক এনামুল হক, সঙ্ঘমিত্রা রায়, সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ মুখোপাধ্যায় ও অয়ন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন প্রমথনাথের গবেষক বন্ধু। প্রমথনাথের গবেষণার ফল স্বরূপ 'রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ' গ্রন্থটি রচনা করেন, আলোচ্য গ্রন্থটি শান্তিনিকেতনে অধ্যয়নকালে প্রমথনাথ শুরু করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাকারে এটি প্রকাশিত হলেও প্রমথনাথকে ডক্টরেট ডিগ্রী অনুমোদন করেননি। মর্মান্তিক এই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তিনি 'সরল থিসিস রচনা প্রণালি' গল্পটি লেখেন। একসময় তিনি থিসিসের পরীক্ষক হয়ে কোন গবেষণা গ্রন্থকে বাতিল করেননি। নিজে বিষপান করে অপরকে তিনি অমৃত পান করিয়েছেন। গবেষক হিসেবে আত্মনিয়োগ করবার সময় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিভাষা কমিটির সহ-সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেন। অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং পরিভাষা কমিটির সভাপতির দায়িত্বভার অলঙ্কৃত করেছিলেন সাহিত্যিক রাজশেখর বসু। ১৯৩৬ খ্রিঃ প্রমথনাথের কর্মজীবনের সূত্রপাত ঘটে। রিপন কলেজে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। বর্তমানে এটি সুরেন্দ্রনাথ কলেজ নামে পরিচিত, সুদীর্ঘ দশ বছর এই কলেজে বৃত থেকে তাঁর পাশাপাশি সাহিত্য রচনার কাজে যুক্ত থাকেন। তাঁর সুযোগ্য ছাত্র গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের মতে—

"কৌতুক পরিহাসের আড়ালে নিজেকে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করলেও তিনি যথার্থ উচ্চস্তরের দার্শনিক। তাঁর স্বভাবে আর এক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ভাষণ। তবে রূঢ়তাকে পরিহার করার জন্য কথাকে একটু অলংকৃত করা তাঁর অভ্যাস।"[৭১]

প্রমথনাথ যখন সুনামের সঙ্গে রিপন কলেজে অধ্যাপনা করতেন সেই সময় একাধিক পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'যুগান্তর' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক পদে দুবছর থেকে পত্রিকা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে 'যুগান্তর' পত্রিকার আংশিক সময়ের কাজ ছেড়ে দেন। অধ্যাপনার বেতন আশানুরূপ না হওয়ায় প্রমথনাথ রিপন কলেজের অধ্যাপনার কাজে ইস্তফা দেন এবং আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। এখানে অধ্যাপনার চেয়ে বেতনের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি, 'আনন্দবাজার পত্রিকার' সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করে প্রমথনাথের সাহিত্যপ্রতিভা প্রকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ পেলেন, সেই সময় সুরেশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন 'আনন্দবাজার পত্রিকার' প্রধান দায়িত্বে এবং প্রধান সম্পাদক পদে যুক্ত ছিলেন চপলাকান্ত ভট্টাচার্য। পত্রিকা বিভাগ থেকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার সঙ্গে প্রমথনাথের পরিচয় ঘটে। বিভিন্ন প্রকাশক, লেখক ও পাঠকদের সঙ্গে প্রমথনাথের পরিচয় ঘটে। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সমাজতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকদের সংস্পর্শে এসে তাঁদের সান্নিধ্য প্রমথনাথকে সাহিত্য রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। প্রমথনাথের বেসরকারি কলেজের

অভিজ্ঞতা নিয়ে 'টিউশন', 'গণক', 'চাকরিস্তান', 'অর্থপুস্তক', 'উতঙ্গ', 'আধ্যাত্মিক ধোপা', 'ধনে পাতা' ও 'গদাধর পন্ডিত' প্রভৃতি গল্প লিখেছেন। পত্রিকা বিভাগে থাকাকালে কাঁচি, গন্ডার, জি.বি.এস. ও প্র.না.বি. প্রভৃতি ছোটগল্প লিখেছেন।

এরপর শিক্ষাব্রতী প্রমথনাথ আনন্দবাজার পত্রিকার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যে অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত হন। অধ্যাপক পদে যুক্ত হওয়ার পিছনে যাদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও সহযোগিতা ছিল সবচেয়ে বেশি তাঁরা হলেন অধ্যাপক শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৫০ এর ১৭ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৬৬ খ্রিঃ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ষোলো বছর নিরবছিন্ন ভাবে শিক্ষকতা পদে বৃত থাকেন, প্রথমে তিনি লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন তারপর রিডার পদে, পরিশেষে রিডার থেকে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৬ একটানা পাঁচ বছর রবীন্দ্র স্মারক চেয়ারের অধ্যাপক পদে বৃত থেকে নিজ যোগ্যতার পরিচয় দেন। সেই সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান পদ অলংকৃত করেন। তাঁর জীবনের আরও উত্তরণ ঘটে নিজ যোগ্যতা বলে তিনি একটানা ছয় বছর U.G.C. অধ্যাপক পদ অলংকৃত করেন, তিনি জীবনে বহুবার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বাপেক্ষা লোভনীয় পদে যোগদান করবার আমন্ত্রণ পেয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডঃ সুশীল কুমার দে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চপদে ও উচ্চবেতনে যোগদান করবার আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করেন, ত্রিগুণা সেন প্রমথনাথকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লোভনীয় পদে যোগদান করার অনুরোধ করেন, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করবার আমন্ত্রণ পাঠান ডঃ নির্মল সিদ্ধান্ত। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রমথনাথকে যোগদান করবার অনুরোধ করেন। কিন্তু প্রমথনাথ কলকাতাকে মনে প্রাণে ভালোবেসেছেন, কলকাতার সাহিত্য আসর ছেড়ে অন্য কোথাও কারো ডাকে তিনি সাড়া দেননি, তবে তাঁর কন্যা চিরশ্রী বিশী যখন দিল্লিতে একটি প্রখ্যাত কলেজে অধ্যাপনা করছিলেন তখন মাঝে মাঝে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যেতেন। দিল্লির অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি প্রচুর রসোত্তীর্ণ ঐতিহাসিক ছোটগল্পগুলি আমাদের উপহার দিয়েছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে প্রমথনাথ বিশীর বহু কৃতী ছাত্র ছিল, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি, রেবতীভূষণ, পবিত্র সরকার, বিজিত কুমার দত্ত, প্রণয়কুমার কুন্ডু, সুবোধ ঘোষ, চিত্র অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও উজ্জ্বল কুমার মজুমদার প্রমুখ। তাঁর পাঠদানের সময় অনুপম বাচনভঙ্গি ও রস সৃষ্টি ব্যাপারে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

"বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র", (বর্তমান অধ্যাপক) প্রমথনাথকে একদিন ক্লাসে বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করেন—আপনি কি অলংকারগুলো মুখস্থ করে ক্লাসে আসেন?—প্রমথনাথ বাবু উত্তরে বলেন মুখে সদাই বর্তমান থাকা মানে যদি 'মুখস্থ হয়', তাহলে ঠিক, নচেৎ নয়।"

প্রমথনাথের ছাত্র সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় যখন জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসের চলচ্চিত্রে অভিনয় করবার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন সেই সময় প্রমথনাথের সঙ্গে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের দেখা হয়। প্রমথনাথ তাঁকে জানালেন তুই যদি এম.এ. পড়তিস তা হলে এম.এ. পাশ করতে পারতিস।

পবিত্র সরকার প্রমথনাথের শিক্ষাদান প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করেছেন। তাঁর স্পেশাল পেপার উপন্যাস পড়াতেন প্রমথনাথ বিশী, একদিন তাঁর ছাত্রদের এক মারাত্মক বিপজ্জনক প্রশ্ন করলেন—"তোমরা উপন্যাস স্পেশাল পেপার নিয়েছ, তা ওয়াল্ট ার স্কট, জেন অস্টেন, থ্যাকারে, ব্রন্টি মিস্টারস, ফিল্ডিং, ডিকেন্স, টলস্টয়, ডস্টয়েভাস্কি, রোম্যা রোল্যাঁ এসব পড়েছ?"

ছাত্ররা নীরব থাকায় প্রমথনাথ বজ্রকণ্ঠে ক্লাস কাঁপিয়ে বলে উঠলেন, "ও! তাহলে তোমরা তো কিছুই পড়নি! তোমাদের আর কি ক্লাস নেব!" বলে তড়াক করে উঠে পড়লেন এবং রেজিস্টার বগলে চলে গেলেন।

আরেকদিন প্রমথনাথ শ্রেণিকক্ষে উক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করায় ছাত্ররা জানাল স্কট, ওয়েস্টন, ডিকেন্স, জয়েস, উলফ, সার্ভর, কাম্যু তাঁরা পড়েছে। সেদিন প্রমথনাথ বললেন, 'তোমরা সবই পড়েছ, তোমাদের আর পড়াব কি বলে আবার তড়াক করে উঠে রেজিস্টার বগলে বেরিয়ে গেলেন।'

পরীক্ষার আগে প্রমথনাথের কাছে ছাত্ররা নম্বর জানতে চাইলে তিনি তাঁদের নম্বর জানিয়ে দিতেন এবং বলতেন— "নম্বর যা পেয়েছ তাই তো থাকবে আমি না হয় একটু আগে জানিয়ে দিলুম।"

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত বিভিন্ন আলোচনা সভায় প্রমথনাথ বক্তৃতা দিতেন। বক্তা হিসেবে তিনি ছিলেন সুদক্ষ। তিনি যখন ভাষণ দিতেন তাঁর ভাষণে ছিল জাদু, অতি সহজে সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় শ্রোতাদের মনকে তিনি জয় করতে পারতেন।

প্রমথনাথ শুধু শিক্ষক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন না, ছিলেন অনুরাগী ছাত্রদের স্নেহশীল অভিভাবক। তিনি তাঁর স্নেহভাজনদের সুপরামর্শ দিয়ে তাঁদের ভবিষ্যতে অগ্রগতির পথকে প্রশস্ত করে দিতেন, ছাত্র অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়কে একদিন বলেছিলেন,—

"দেখো, আমি কাউকে যেচে উপদেশ দিই না, তোমাকে দিচ্ছি। দুটি কথা মনে রেখো। এক, কখনও বটগাছের আশ্রয় ছেড়ো না, তার ছায়াটাও ভালো। (অস্যার্থ—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ো না, উন্নতি হলে এখানেই হবে)। দুই, লোকে যখন তোমার নিন্দা করবে, তার তীব্র প্রতিবাদ করবে; যখন লোকে বলবে ব্যাটার খুব টাকা হয়েছে, তখন প্রতিবাদ না করে হাসিমুখে তাকিয়ে থাকবে।"[৭৩]

প্রমথনাথের ছাত্র রেবতীভূষণ ঘোষের স্মৃতিচারণ থেকে আমরা জানতে পারি প্রমথনাথ রিপন কলেজে বাংলা ক্লাসে যখন মধুসূদনের "মেঘনাদ বধ কাব্য" পড়াতেন তখন আবেগ মথিত কণ্ঠে আবৃত্তির সুরে এমনভাবে বলতেন যা শুনে প্রত্যেকটি ছাত্র ছাত্রী মুগ্ধ হয়ে যেত। তাঁদের মনে হত প্রমথনাথ যেন একজন সুপ্রসিদ্ধ আবৃত্তিকার।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি রবীন্দ্র সাহিত্যে অধ্যাপক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর স্নেহধন্যা ছাত্রী রিক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ থেকে আমরা জানতে পারি প্রমথনাথ বিশী বিহারী লাল চক্রবর্তীর 'সারদা মঙ্গল' রবীন্দ্রনাথের 'জীবন স্মৃতি', 'চতুরঙ্গ', 'গল্পগুচ্ছ' পড়াতেন। হাস্য কৌতুকের ফাঁকে ফাঁকে অনুপম কৌশলে ছাত্রদের পাঠদানে রত থাকতেন, একদিন এক ছাত্র প্রমথনাথেকে প্রশ্ন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ও শাক্তের মধ্যে কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন? প্রমথনাথ উত্তরে জানিয়েছেন তিনি এতদিন রবীন্দ্রনাথকে ব্রাহ্ম বলে জানতেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকর্মী হিসাবে তিনি পেয়েছেন ডঃ শশীভূষণ দাসগুপ্তকে, কাছে পেয়েছেন বুদ্ধদেব বসুকে এছাড়া আরোও বিদগ্ধ অধ্যাপকদের সঙ্গে তিনি পাঠদানের কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

প্রমথনাথের সুপ্রিয় নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র জানতে চেয়েছেন প্রমথনাথের সাংবাদিকতা ও অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে। প্রমথনাথ তাঁর উত্তরে জানিয়েছে—"সাংবাদিকতায় দেখেছি মূর্খের পান্ডিত্য আর অধ্যাপনায় দেখেছি পন্ডিতের মূর্খামি।"[৭৪]

শান্তিনিকেতনে প্রমথনাথ যেমন আড্ডার আসরে অংশ নিতেন ঠিক তেমনি কলকাতায় আড্ডার আসরে যেতেন। আড্ডার সঙ্গী হিসেবে তিনি কাছে পেয়েছেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, লীলা মজুমদার, বিমল মিত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, মোহিতলাল মজুমদার, রাণী চন্দ, সাগরময় ঘোষ, ভবতোষ দত্ত, সজনীকান্ত দাস, রবীন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত, প্রতুলচন্দ্র দত্ত, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ সাহিত্যিকদের। বিহারের ঘাটশিলা, দেওঘর ও ছোটনাগপুরে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ বিশী ভ্রমণে যেতেন। একই গাছের তলায় দুজনে দুদিকে বসে গল্প লিখতেন। এসময় প্রমথনাথের অতিলৌকিক ছোটগল্পগুলি রচিত হয়েছে।

প্রমথনাথ ছিলেন আড্ডাপ্রিয় মানুষ। আড্ডায় লঘু গুরু বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়। বিভিন্ন গল্পগুজব হাসি তামাসা, তর্কবিতর্ক হয়ে থাকে। আড্ডার আসরে রাজনীতি, সাহিত্য, সমাজনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি গুরুগম্ভীর বিষয় আলোচিত হয়। আড্ডার একটা বিশেষ আমেজ আছে। অনেকে আড্ডাকে সাহিত্যের ল্যাবরেটরি বলে মনে করেন। আড্ডাতে গিয়ে আড্ডাবাজরা সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান খুঁজে পান। সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত আড্ডার একটা বিশেষ স্থান আছে। বাংলাসাহিত্যে 'ভারতী', 'কল্লোল', 'শান্তিনিকেতন', 'প্রগতি,' 'কথাসাহিত্য' বিভিন্ন পত্রিকাকে ঘিরে সাহিত্যিকদের আড্ডার আসরে নামতে দেখা গেছে। উন্নত ও বিদগ্ধ সমাজে আড্ডার প্রবণতা বর্তমান। আড্ডাপ্রিয় মানুষদের নিজ নিজ গুণাবলী প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্গে বহু সমস্যা সমাধান আড্ডা থেকেই হয়ে থাকে। বলা যেতে পারে বিভিন্ন পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে আড্ডার আসর বসত তাঁর মধ্যে কল্লোলের আড্ডা ছিল সবচেয়ে বড়। আড্ডা চলাকালে আড্ডাপ্রিয় সাহিত্যিকরা হৈ

চৈ করতেন তা থেকেই নতুন নতুন সৃজনধর্মী সাহিত্য রচিত হত। বাঙালিরা আড্ডাপ্রিয় জাতি—

ক. "শুধু সাহিত্য নয়—সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি সকল ক্ষেত্রে পৃথিবীর যেখানে যে নতুন চিন্তার উদ্ভব হচ্ছে তারই সঙ্গে বাঙালি মনের যোগসাধনের অভিপ্রায় ছিল।"[৭৫]

খ. "শিল্পসংস্কৃতির আঁতুর ঘর এই আড্ডা থেকেই বেরিয়েছে কালান্তরে চিন্তা, রাজনীতির প্যাঁচপয়জার।"[৭৬]

গ. "আমাদের সমাজে জমে যা সে 'আড্ডা'—সে গ্রামে হোক, শহরে হোক, চন্ডীমন্ডপে হোক।"[৭৭]

ঘ. "বৈঠকখানা বদলাতে পারে, কিন্তু বৈঠক বদলায় না।"[৭৮]

ঙ. "আড্ডা তো—পার্লামেন্ট নয়—তাই হরবখৎ কথার পিঠে কথা চলবে এমন কোনো কসম দিব্যি নেই।"[৭৯]

চ. "নেশা যে জিনিসের হোক, একা একা ঠিক জমে না। নেশাখোরদের সঙ্গী চাই, চেলা চাই, দল চাই।"[৮০]

রিপন কলেজে অধ্যাপনা কালে প্রমথনাথ আড্ডার আসরে অংশ নিতেন। অধ্যাপকদের মধ্যে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, ভবতোষ দত্ত আরোও অনেকে। ভবতোষ দত্তের বাড়িতে প্রমথনাথ 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' বইটি রেখে ভবতোষকে না পেয়ে একটি চিরকুটে লিখে দিলেন—

"দানে পাওয়া বই, পড়ে না কেহই, তবু দেই সেটা স্বভাব দোষ। নাহি কো নালিশ, হবে তো বালিশ, দয়া করে নিন শ্রী ভবতোষ।"[৮১]

সাহিত্যরসিক প্রবোধচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আড্ডা চলাকালে প্রমথনাথ জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন নিম্নলিখিত কবিতার মাধ্যমে:

"সংসারে বিষবৃক্ষে
দুটি ফল মধুময়
কাব্যামৃত স্বাদ আর
সজ্জনের পরিচয়।"[৮২]

প্রমথনাথ তথাগত রায়ের স্ত্রী অনুরাধা রায়ের সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্য বিষয় আলোচনা করতেন। প্রমথনাথ মার্কিন সাহিত্যকে প্রাধান্য না দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক ছিলেন। টি.এস. এলিয়ট সুদীর্ঘ জীবন ইংল্যান্ডে কাটালেও যেহেতু তিনি আমেরিকান এইজন্য তাকে প্রমথনাথ সুনজরে দেখেননি। ভিক্টোরিয়ান যুগের পরবর্তী কালের রোমান্টিক কবিতা তিনি পছন্দ করতেন। 'স্যাটারডে রিভিউ', 'টাইমস্ লিটারারি', 'সাপ্লিমেন্ট' অত্যন্ত

মনোযোগ দিয়ে তিনি পাঠ করতেন।

প্রমথনাথ কোচবিহারে সিদ্ধেশ্বরী পাঠাগারে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে এসে অনুরাগী সাহিত্য রসিকদের সিদ্ধেশ্বরী পাঠাগারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভের কামনা করে জানালেন—

"সিদ্ধেশ্বরীর সিদ্ধি লাভ করুক।"

প্রমথনাথের সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিল কলকাতা কলেজ স্ট্রীটের মিত্র ও ঘোষের লাইব্রেরী। বলাবাহুল্য মিত্র হলেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র এবং ঘোষ হলেন সুমথনাথ ঘোষ। তাঁদের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত লাইব্রেরিতে মাঝে মাঝে প্রমথনাথ গজেন্দ্রকুমার মিত্রের বড় ইজি চেয়ারটি দখল করে বই পড়তেন এবং ঘন্টার পর ঘন্টা বসে আড্ডা দিতেন। ইতিহাস বিষয়ে মাঝে মাঝে তর্ক জমে ওঠে। তর্কের বিষয় ছিল ইউরোপের ইতিহাসে নেপোলিয়নের গুরুত্ব কতটুকু সেই প্রসঙ্গে আলোচনা, প্রমথনাথ বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতার মাধ্যমে যে যুক্তি গুলো উপস্থাপন করতেন তা নিঃসন্দেহে প্রমথনাথের ইতিহাস চেতনার ফল। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্সের আড্ডায় একদিন প্রমথনাথ একটা নতুন প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রস্তাবটি হল 'খেয়াল খুশির খাতা' নামে একটি খাতা খুলে খাতার শুরুতে তিনি লিখলেন—

"যার যা ইচ্ছে লিখতে পারেন কোনো দায়িত্বে নেই।"[৮৩]

এই খাতা সমৃদ্ধ হয়েছে নতুন নতুন লেখকের লেখা দিয়ে, বলতে গেলে অনেক লেখা ছিল তীক্ষ্ণ সরস মন্তব্যে দীপ্ত ও উজ্জ্বল। প্রমথনাথের দুটি মন্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হল—

১. "যারা আড্ডায় বসে পারিবারিক বা শারীরিক দুঃখ ব্যাধির কথা বলে তারা সত্যিই নির্দয়। ও সব সমস্যা তো প্রত্যেকেরই আছে—এখন প্রত্যেকে যদি আড্ডায় বসে সেই সব নোংরা কাপড় কাচতে শুরু করে তবে জীবন অচল হয়ে পড়ে। আড্ডা পরচর্চার প্রশস্ততম স্থান, কারণ ঘরে বসে সবাই ঠিক উল্টো কাজটা করে—যার নাম আত্মচর্চা।"[৮৪]

২. "১৯৬৩ সালে যখন এই খাতা খুলবার প্ররোচনা দিয়েছিলাম, সে আজ পনেরো বছর হল। এই খাতায় আরও এক বছর চলতে পারে, তারপর সত্যই হালখাতা করতে হবে। এই—ই যথার্থ হাল খাতা। তারপরে এই খাতা থেকে কিছু কিছু মন্তব্য সংকলন করে ছাপা যেতে পারে, বাংলা প্রকাশনা সাহিত্যের অভিনব ইতিহাস এই খাতা।"[৮৫]

প্রমথনাথের সঙ্গে সাহিত্যিক বিমল মিত্র ও রমাপদ চৌধুরী ও 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সাগরময় ঘোষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ঘটনাক্রমে ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে হাওড়া স্টেশন থেকে বোম্বাই ট্রেন যোগে যাওয়ার পথে ট্রেনের কামরায় সাগরময় ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী ও বিমল মিত্রের আড্ডা আসর জমে উঠেছিল। এ সময় প্রমথনাথ নতুন একটি গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা নিচ্ছিলেন। সাগরময় ঘোষ প্রমথনাথকে অ্যাকাডেমি প্রাইজ

পাওয়ার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করলে প্রমথনাথ জানালেন উক্ত পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা রয়েছে, সে বছর বিভিন্ন ভাষায় লিখিত গ্রন্থের অ্যাকাডেমি পুরস্কার ঘোষিত হলেও ভাষায় লিখিত গ্রন্থ উপেক্ষিত হয়েছে।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রমথনাথের আড্ডা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন "প্রমথনাথ যেমনি চিন্তাবিদ, তেমনই রসিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে তেমনই প্রচন্ড আড্ডাধারী। প্রমথনাথ যে আড্ডায় বসেন সে আড্ডাকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে রসের ভিয়ানে চাপাতে তাঁর বিলম্ব হয় না এবং যে যত বড় গাম্ভীর্য নিয়েই থাকুক না কেন সে গাম্ভীর্যকে ধূলিসাৎ করে দিতে তাঁর যে মুহূর্ত বিলম্ব হয় না।"৮৬

প্রমথনাথের সঙ্গে মাঝে মাঝে মোহিতলালের তর্ক বিতর্ক জমে উঠত। মোহিতলাল ছিলেন রগচটা প্রকৃতির মানুষ। তর্ক সূত্রে প্রমথনাথকে মাঝে মাঝে গাল দিতেন। প্রমথনাথ এব্যাপারে উত্তেজিত না হয়ে কৌতুকের হাসি হেসে মোহিতলালকে আরও রাগিয়ে তুলতেন।

সুবিখ্যাত পন্ডিত নীরদ চন্দ্র চৌধুরী ও পরিমল গোস্বামীর সঙ্গে রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে তর্ক হত। প্রমথনাথ রাষ্ট্রনীতি ভালো বুঝতেন। জার্মান সরকারের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধে কে জিতবে এ নিয়ে তিন বন্ধুর সঙ্গে প্রমথনাথের তর্ক হত। বন্ধুরা হিটলারের পক্ষে সমর্থন করলে প্রমথনাথ জানালেন ইংরেজ শক্তির জয় সুনিশ্চিত। বাস্তবিক পক্ষে সেই যুদ্ধে হিটলার পরাজিত হয়েছিল, ইংরেজ শক্তি জিতে গিয়েছিল।

প্রমথনাথ আড্ডাবাজ হলেও নাট্যকার হতে পেরেছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে নাটক যেখানে সীমাবদ্ধ বিষয়, সংযম বুদ্ধির সৌন্দর্য প্রাধান্য পায় যেখানে সংযমের সঙ্গে প্রমথনাথ 'পরিহাস বিজল্পিতম', 'বেনিফিট অব ডাউট', 'কে লিখিলে মেঘনাদ বধ' প্রভৃতি সার্থক নাটক আমাদের উপহার দিতে পেরেছেন। তাঁর প্রচুর ছোটগল্প সৃষ্টি হয়েছে আড্ডার অভিজ্ঞতা থেকে যেমন 'মাত্রাজ্ঞান', 'প্রনাবির সঙ্গে কথোপকথন'। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন প্রান্তে সাহিত্য সভায় প্রমথনাথ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগদান করতেন। জামসেদপুর, সিউড়ি, মেদিনীপুর, কলকাতা, শান্তিনিকেতন প্রভৃতি স্থানে তিনি বক্তৃতা দিতেন। জামসেদপুরে এক সভায় সভাপতির আসনে বসিয়েছিলেন প্রমথনাথকে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন নৃত্য শিল্পী উদয়শঙ্কর, তখন বিশেষভাবে উদয়শঙ্করকে উদ্যোক্তারা সমাদর করছিলেন দেখে প্রমথনাথ উদয়শঙ্করের পরিচয় জানতে পেয়ে তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক ভাবে জানালেন—

"আপনাকে তো কখনও স্বরূপে দেখিনি, কখনও দেখেছি আপনি শিব সেজে নৃত্য করছেন, কখনও বুদ্ধদেব রূপে মঞ্চে আর্বিভূত হয়েছেন। আসল চেহারা এই প্রথম দেখলাম।"৮৭

সিউড়ির বিদ্যাসাগর কলেজে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে প্রমথনাথ উপস্থিত হয়েছিলেন। ১৯৬০-৬১ শিক্ষাবর্ষের বাৎসরিক উৎসবে প্রধান বক্তা হিসাবে প্রমথনাথ রবীন্দ্র সাহিত্যের কঠিন তাত্ত্বিক দিক অতি সহজে সর্বজনবোধ্য করে ব্যাখ্যা

বিশ্লেষণ করেছিলেন তাতে রবীন্দ্রনুরাগী প্রমথনাথের রবীন্দ্রবন্দনা সার্থকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

১৯৪৭ সালে মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর হলে আয়োজিত হয়েছিল তিনদিন ব্যাপী সাহিত্য সম্মেলনে। প্রমথনাথ একঘণ্টার একটি মূল্যবান মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করেন। অভিভাষণ পুস্তিকাটি শ্রোতার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। প্রমথনাথের মূল্যবান বক্তৃতা প্রতিটি শ্রোতা অম্লানবদনে গ্রহণ করেছিল।

প্রমথনাথের সাহিত্যের উদ্দেশ্যে কি শঙ্করীপ্রসাদ বসু প্রমথনাথের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে সম্যক উপলব্ধি করেছেন, প্রমথনাথের মতে,

"সাহিত্যের কোনও সচেতন উদ্দেশ্যকে আমি স্বীকার করি না। বঙ্কিমের তো নয়ই, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের উদ্দেশ্যে সৌন্দর্যসৃষ্টি'কেও নয়। সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য, আমার মতে, পূর্ণতার সৃষ্টি। পূর্ণতা এত সুষমামন্ডিত যে তা মঙ্গলময়, সৌন্দর্যময় না হয়ে পারে না।"৮৮

প্রমথনাথ ছোটবেলা থেকেই পিতা নলিনীনাথের মতো ভারতের শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। তখন কংগ্রেস দল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাবশালী দল হিসেবে পরিচিত ছিল। কংগ্রেস দলের ভাবাদর্শ তিনি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ভাই কালিদাস বিশী ছিলেন কংগ্রেস পরিচালিত একটি শ্রমিক সংগঠনের অন্যতম নেতা। আই. এন. টি. ইউ. সি-র নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বিরোধী শ্রমিক সংগঠনের ব্যক্তিদের বোমার আঘাতে তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছিল বেলঘরিয়া সদর রাস্তার উপর, ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রমথনাথের ভাইয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি মর্মাহত হন। প্রমথনাথের রাজনৈতিক ছোটগল্পগুলিতে কমিউনিস্ট বিরোধী মানসিকতার পিছনে এই প্রভাব আছে বলে মনে করা যেতে পারে।

১৯৫২ সাল থেকে প্রমথনাথ কংগ্রেস দলের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থাকেন। কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে প্রমথনাথের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি সেই সময় কংগ্রেস দলের সদস্য পদ গ্রহণ না করলেও চৌরঙ্গী রোডের কংগ্রেস ভবনে তাঁর প্রভাব ছিল অনেকটাই। প্রমথনাথ বিশী রাজনীতিতে প্রকাশ্যভাবে অংশ গ্রহণ না করলেও কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা অতুল্য ঘোষের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। তাঁর গৃহে প্রমথনাথ যাতায়াত করতেন। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত ছিলেন পদ্মজা নাইডু। ১৯৬২-১৯৬৮ সালে প্রমথনাথ বিধান সভার সদস্য পদে মনোনীত হন। তাঁর সদস্য পদ মনোনয়নের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় একদিন আনন্দবাজার পত্রিকার রিপোর্টিং এর হল ঘরে টেলিফোন করে জানতে চেয়েছেন সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের ফোন নং। সেই ঘরে বসে ছিলেন অমিতাভ চৌধুরী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও বরুণ সেনগুপ্ত প্রমুখ। টেলিফোন তুলে নিয়েছিলেন অমিতাভ চৌধুরী। তিনি জানালেন অন্নদাশঙ্কর রায় যোধপুরের বাসিন্দা। কিন্তু টেলিফোন নম্বর তাঁর জানা ছিল না।

"সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন—আর কোনো বড় সাহিত্যিকের নাম জানা আছে? বললাম—সাহিত্যিক— সাহিত্যিক—প্রমথনাথ বিশীর নাম মনে আছে। ফোন নম্বর? বললাম জানা আছে।

এবং দিলাম। কিছুই জানিনা, কেনো টেলিফোন তাও বুঝতে পারলাম না। পরদিন সকালে কাগজ দেখে সব পরিস্কার হয়ে গেল; দিল্লির খবর—পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভায় মনোনীত হয়েছেন প্রমথনাথ বিশী—আমাদের বিশীদা।"৮৯

প্রমথনাথ গান্ধিজির রাজনৈতিক মতাদর্শকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। গান্ধিজির রাজনৈতিক ধারণা বা ভারত তত্ত্বে তাঁর বিশ্বাস ছিল অকুণ্ঠ। গান্ধিজির মতে ধর্মের মধ্যেই ভারতবাসীর ঐক্যের সুর নিহিত। খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত ভারতবর্ষকে এক সূত্রে গেঁথে ফেলার একমাত্র রাস্তা বলে মনে করেন। এইজন্য গান্ধিজি যে কোনো সভার শেষে রামধুন সঙ্গীত সমবেত ভাবে গাইতেন। এই জীবন দর্শনকে প্রমথনাথ আন্তরিকভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। প্রমথনাথ গণতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ভারতীয় রাজনীতিতে যখন জহরলাল নেহেরু নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাঁর আদর্শকে প্রমথনাথ মনে প্রাণে সমর্থন জানিয়েছেন এবং তাঁর অন্ধভক্ত হিসেবে নিজেকে বার বার প্রমাণ করেছেন। অন্যদিকে তিনি উইনস্টন চার্চিলের অনুরাগী পাঠক ছিলেন। ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের জীবনী ও যুদ্ধ বিগ্রহের বিবরণ তাঁর একান্ত প্রিয় ছিল, জার্মান সেনাপতি যোমেনের অভিযানমূলক গ্রন্থ এবং ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার লিখিত ভারতের ইতিহাস ছিল প্রমথনাথের একান্ত প্রিয়। বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ ছিল তাঁর একান্ত গ্রহণীয় বিষয়। প্রমথনাথের মতে "গান্ধি ইতিহাসের সর্বোচ্চ মানুষ, গান্ধিজিকে আমি ভক্তি করি, কিন্তু আমার হিরো যেহেতু সুভাষচন্দ্র, সেক্ষেত্রে গান্ধিজির রাজনৈতিক পথ বা সম্বন্ধে বিরাট কিছু আবেগ বোধ করি না। এ ব্যাপারে স্বীকার করি, আমি অ্যাভারেজ বাঙালি।"৯০

প্রমথনাথ ১৯৭২ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত রাজ্য সভার সদস্য পদ অলংকৃত করেন। এই পদে থেকে সর্বভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে তাঁর গভীর যোগসূত্র গড়ে ওঠে, সুদীর্ঘ বছর কংগ্রেস দলের সদস্য থেকে তিনি হয়ে উঠেছিলেন কম্যুনিস্ট বিরোধী। বলা বাহুল্য তাঁর এই বিরুদ্ধ মানসিকতার পেছনে সহোদর ভাইয়ের মৃত্যুর কারণ নিহিত থাকা স্বাভাবিক তবে তিনি কংগ্রেস দলের পরিকল্পনা ও কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করবার লক্ষ্য নিয়ে রাজনীতি করেননি, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল একজন দক্ষ রাজনীতিবিদের মতো দেশসেবা করা কোনো সাহিত্যিকের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। ব্যক্তি স্বাধীনতাপ্রিয় প্রমথনাথ ব্যক্তি স্বাধীনতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রমথনাথের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সন্দেহ নেই, ফল স্বরূপ তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেননি। সঙ্গত কারণে কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষ প্রমথনাথের মানসিকতা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন।

"রাজনীতিতে আগের দিন যাঁদের স্বদেশী বলতো উনি তাই। এবং সে বিষয়ে ওঁর যা মত তা প্রকাশ করতে কোনও দিন দ্বিধা করেন না।"৯১

প্রমথনাথ গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি আস্থাশীল। ব্যক্তি স্বাধীনতার পূজারী হয়ে স্বাধীন মতবাদকে তিনি প্রতিষ্ঠা করবার পক্ষপাতি, যেখানে স্বাধীনতাকে হরণ করা হয় এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা যেখানে উপেক্ষিত সেই ধরনের রাজনৈতিক মতবাদকে তিনি সমর্থন করেননি। সাম্যবাদী রাজনীতিতে তাঁর সমর্থন ছিল না। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে এই মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি বিষোদগার করেছেন। গজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রমথনাথের রাজনৈতিক

দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন—

"প্রমথবাবু মনেপ্রাণে ডেমোক্রিসিতে বিশ্বাস করেন। সেই জন্যই উনি নেহেরুর বিশেষ ভক্ত। আর কতকটা সেই জন্যই কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে ওর অকপট বিদ্বেষ। এ বিদ্বেষ ওঁর কাছে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের মতোই।"৯২

কংগ্রেসদলের কর্মী হয়ে বিধান সভা ও রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য পদে থেকে রাজ্যস্তরের ও কেন্দ্রীয় স্তরের বিভিন্ন সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক কর্ম কান্ডের সঙ্গে নিযুক্ত থেকেছেন। কিন্তু তাঁর চরিত্রে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল সেই ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিজে প্রথম সারিতে না থেকে নেপথ্যে থেকে কার্য পরিচালনা করতেন।

"সব সময়েই নিজেকে অলক্ষ্যে রাখতেন। আমরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি থেকে বহু সাহিত্যিককে সংবর্ধনা দিয়েছি। আমাদের পুরোভাগে প্রমথনাথ থাকতেন কিন্তু আমরা কোনো দিনই ওঁকে সংবর্ধনা দিতে সক্ষম হইনি।"৯৩

প্রমথনাথ 'যুগান্তর' ও 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। যুগান্তর পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল। আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে কর্মসূত্রে যুক্ত থেকে তাঁর সৃজনধর্মী সাহিত্যের নৈবেদ্য পাঠকদের করকমলে তুলে দিয়েছেন, এছাড়া 'শনিবারের চিঠি', 'প্রবাসী', 'দেশ', 'বঙ্গশ্রী', 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'কথাসাহিত্য', 'অমৃত', 'ভাবতবর্ষ', 'শুকতারা' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি লিখেছেন। প্রমথনাথের ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কাব্য, প্রবন্ধ উপরিউক্ত পত্রিকাগুলোতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই সব পত্র-পত্রিকাকে ঘিরে স্বনামধন্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে প্রমথনাথ লিখে চলেছেন। কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রমথনাথের মনোজ্ঞ পরিচয় তুলে ধরেছেন নিম্নোক্ত ভাবে—

"প্রথম সাক্ষাৎ শনিবারের চিঠি অফিসে।.....প্রমথবাবুকে সেই প্রথম দেখি। খর্বকায় সেই সময় বেশ একটু দুর্বলও। তবে আলাপের মধ্যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাঁকে খানিকটা বিশিষ্ট করে রেখেছে। পোষাক-আশাকে আজকের মত তখনকার দিনেও ছিলেন উদাসীন। গলাবন্ধ লম্বা চীনে কোট দেখে দেখে চোখ অভ্যস্ত হয়ে পড়ার জন্যে কি না বলতে পারি না তবে সেদিনও যেন তাঁকে কোঁচা ঝোলানোর ধুতির উপর এই কোটেই পাচ্ছি দেখতে।"৯৪

প্রমথনাথ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ভিন্ন-ভিন্ন ছদ্মনামে লিখেছেন। মূলত নিজেকে আড়ালে রেখে ছদ্মনামে লিখে পাঠক মহলে কৌতূহলের সঞ্চার করেছেন। যদিও বহু সাহিত্যিক ছদ্মনামে, বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্ত ছদ্মনামে, কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতুম প্যাঁচা ছদ্মনামে, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমথনাথ শর্মা ছদ্মনামে, প্যারিচাঁদ মিত্র টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচু ঠাকুর ছদ্মনামে, রবীন্দ্রনাথ ভানু সিংহ ছদ্মনামে, প্রমথ চৌধুরী বীরবল ছদ্মনামে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রমথনাথ বিশী মোট চৌদ্দটি ছদ্মনামে বিভিন্ন সাহিত্য রচনা করেছেন। 'প্রভাত' ও 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায়

নীহারিকা ছদ্মনামে, 'দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকায় প্র. না. বি ছদ্মনামে, আনন্দবাজার পত্রিকায় কমলাকান্ত শর্মা ও মাধব্য ছদ্মনামে, শনিবারের চিঠিতে শ্রী বিষুণশর্মা, কস্যচিৎ, স্কট টমসন ও শ্রী অমিত রায়, 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় তিব্বতী বাবা, শ্রী মর্কট, শ্রী রামকমল শর্মা, ও শ্রী মূর্খোত্তম ছদ্মনামে। শুকতারা পত্রিকায় হাতুরী ছদ্মনামে, সমুচিত শিক্ষা গল্প সংকলনে শ্রী নীলকণ্ঠ শর্মা ছদ্মনামে সাহিত্য রচনা করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

প্রমথনাথ কর্মসূত্রে কলকাতায় থেকে যুগ জীবনের অমৃত, ফুল ও কাঁটা সবটাই সমানভাবে দেখেছেন। যখন তিনি ছাত্র ছিলেন সেই ছাত্রাবস্থার প্রথম থেকে বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা তিনি শুনেছেন। প্রাক্ যুদ্ধ ও যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর ভারত তথা বহির্বিশ্বের প্রবল আলোড়ন তাঁর দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে যায়নি। এই সময় অবক্ষয়িত সমাজের নগ্নরূপ দেখে সেখান থেকে খুঁজে পেয়েছেন ছোটগল্পের উপকরণ। সমাজ জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে, অর্থনৈতিক জীবনে ও নৈতিক জীবনে যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল তাঁর ফলস্বরূপ সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা, স্বার্থপরতা খুব কাছ থেকে দেখে সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। একদিকে একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙ্গন, অসহায়তা, অস্থির অবস্থা প্রভৃতি মূল্যবোধের বিপর্যস্ত রূপ লেখকের ছোটগল্পের বিষয় হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। নাগরিক জীবনের পঙ্কিল ক্লেদাক্ত দিক সম্পর্কে প্রমথনাথের সচেতন দৃষ্টি ছিল। প্রমথনাথ তৎকালীন জীবন, সমাজ, মানুষের পদস্খলন তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন এবং তা থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ তিনি দিয়েছেন। বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতে শিল্প বিষয়ের প্রতিক্রিয়া যন্ত্রসভ্যতার সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের সংঘাত দেখা দিয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতভূমিতে বিভিন্ন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, সম্প্রদায়গত বিভেদ শুধু মাত্র বঙ্গদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রমথনাথ ভারতের এই রাজনৈতিক অস্থির অবস্থাকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাই তাঁর ছোট গল্পের প্লট খুঁজে পেতে কষ্ট হয়নি। অবশেষে ভারত পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হল কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে শান্তির বাতাবরণ রচিত হল না। সমাজে পাপবোধ নির্মূল হল না, চোরাকারবারীদের তান্ডব নৃত্য, কালোবাজারীদের ঘৃণ্য কার্যকলাপ দিন দিন বেড়েই যেতে লাগল। আমলাতন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ঘুষের রাজত্ব কায়েম হল। সমাজ জীবনের পদে পদে দুর্নীতির বিষবাষ্পে সমাজকে নিরন্ধ্র অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিল। প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসার স্থান হল গৌণ। মানুষের সুকুমার প্রবৃত্তিগুলোর ঘটল অপমৃত্যু। খন্ডিত ভারতের সাম্প্রদায়িকতার বিষ সমাজজীবনকে এক বীভৎস অবস্থার দিকে নিয়ে গেল। দেখা দিল উদ্বাস্তু সমস্যা, মুসলমান প্রধান পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা তাদের অতীত ঐতিহ্য, ভূসম্পত্তি সব কিছু ছেড়ে এতটুকু আশ্রয়ের প্রত্যাশায় বাঙালি অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিল। বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত উদ্বাস্তু শ্রেণির জীবন সংগ্রামময় হয়ে উঠল। অন্যদিকে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ছিল কেরানি তৈরির শিক্ষা। স্বাধীন ভারতে শিক্ষা

ব্যবস্থায় এল পরিবর্তন, ব্যবসা বাণিজ্যে বাঙালিরা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পেল না। রাজনৈতিক দলাদলি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব যুগজীবনকে কলুষিত করে তুলল সেইপ্রভাব আছড়ে পড়ল সাহিত্যজীবনে। প্রমথনাথ যুগজীবনের দিনপঞ্জি সাহিত্যের মুকুরে উপজীব্য করে তুললেন। প্রমথনাথ অখন্ড ভারতের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছেন ঃ

"প্রমথনাথ-মানস ভারতচেতনায় বিধৃত। আপাত দৃষ্টিতে তাঁকে বাঙালি বিদ্বেষী বলে মনে হলেও তিনি যথার্থ বাঙালি দরদী। বাঙালিকে ভালোবাসেন বলেই বাঙালির ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোকে তিনি নির্মম ভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করে থাকেন। আবার এই বাঙালি প্রীতি তাঁর ভারতপ্রীতিরই একটি ধাপ। খন্ডিত ভারত নয়, অখন্ড ভারতবর্ষই তাঁর সাধনার দেবী; অনুপ্রেরণার উৎস। প্রমথবাবুর সাহিত্যসাধনার মূল প্রেরণা ভারতোপলব্ধির প্রেরণা। তাঁর সাহিত্যের যদি কোনো দর্শন থাকে, তো ভারত দর্শন।"[৯৫]

প্রমথনাথের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'কেরী সাহেবের মুন্সী' বাংলা সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ১৭৯৩ খ্রিঃ থেকে ১৮১৩ পর্যন্ত দশ বছরের ইংরেজ সৃষ্ট কলকাতার ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়। ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে জীবন রসকে সার্থকভাবে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য ১৩৬৬ সালে গ্রন্থটি বিদগ্ধ সমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। সৃষ্টির মূল্য হিসেবে প্রমথনাথ গ্রন্থটির জন্য ১৩৬৬ সালে রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হন। বলা যেতে পারে ১৩৬৬ সাল প্রমথ প্রতিভার একটি স্মরণীয় বছর হিসেবে চিহ্নিত। ১৩৬৭ সালে 'আনন্দবাজার' পত্রিকার পক্ষ থেকে 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের সাহিত্য মূল্য বিচার করে প্রমথনাথকে আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। দুটি পুরস্কারের মূল্য ছিল পাঁচ হাজার টাকা। তিনি শুধু 'কেরী সাহেবের মুন্সী' লিখেই সম্মানিত হননি। তাঁর সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে বহুবার তাঁকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন, এছাড়া তিনি বিভিন্ন উপাধি পেয়ে সাহিত্য প্রতিভার অম্লান স্বাক্ষর রেখে যান।

প্রমথনাথ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন, রবীন্দ্রভারতীর সোসাইটির কর্ণধার হিসেবে নিজ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এই সোসাইটির প্রধান লক্ষ্য ছিল জোড়া সাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অধিগ্রহণ করে সেখানে একটি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তোলা। রবীন্দ্রানুরাগী প্রমথনাথের ইচ্ছে ছিল নাচ, গান, চিত্রকলার পাশাপাশি একটি রবীন্দ্র গবেষণার অন্যতম পীঠস্থান হয়ে উঠুক জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। রবীন্দ্র গবেষণা সম্পর্কে উৎসাহিত করবার জন্য প্রমথনাথের নির্দেশে বহু পন্ডিতদের নিয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য মযহারুল ইসলাম, ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, ডঃ অশোক ভট্টাচার্য, ডি. পি. পট্টনায়ক, কমল সরকার, মৌলানা মোবারক করিম, জওহরলাল প্রমুখ ব্যক্তিদের বক্তৃতাগুলি একত্রিত করে একটি গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র সংকলন গ্রন্থ সোসাইটির উদ্যোক্তা প্রমথনাথ, পুলিন বিহারী সেন ও শঙ্খ ঘোষ এগিয়ে এলেন। রচিত হল 'রবীন্দ্র বিতর্ক' নামে একটি মূল্যবান সংকলন গ্রন্থ। রবীন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র বিতর্কমূলক গ্রন্থ রচনা করলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ পবিত্র

সরকার। প্রমথনাথ রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটির সহ সভাপতি পদে নিযুক্ত হলেন। তেজবাহাদুর সপ্রু ছিলেন প্রথম সভাপতি, প্রথম ডিরেক্টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাধারণ সম্পাদক পদ অলংকৃত করেছিলেন সুরেশ চন্দ্র মজুমদার। সঙ্গে অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রতিমাদেবী, প্রতাপচন্দ্র চন্দ, ক্ষিতিমোহন সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র সিংহ যুক্ত ছিলেন। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় একসময় রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সভাপতি পদ অলংকৃত করেছিলেন।

রবীন্দ্র তত্ত্ববিদদের জন্য রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রতি দুই বছর অন্তর রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ব্যাপ্তি যেখানে সারা বিশ্ব জুড়ে সেজন্য প্রমথনাথ বিশী স্বদেশ ও বিদেশের বাঙালি ও অবাঙালিকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন। ডঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, রুশচিত্র শিল্পী শ্বেভশ্লাভ রোয়েচিককে, জাপানি রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ কাজুও আজুমাকে এবং রবীন্দ্র চর্চা ভবনের প্রতিষ্ঠাতা সমেন্দ্রচন্দ্র বসু রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

প্রমথনাথ সাহিত্য পরিষদের ট্রাস্টি, রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির ট্রাস্টি, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সভাপতি, শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের সভাপতি ও রবীন্দ্র পুরস্কার কমিটির সদস্য পদ অলংকৃত করেন।

"সব অবস্থাতেই তাঁর মেজাজ বৈঠকি আলাপের। মিষ্ট কথা, ইষ্ট কথা, শিষ্ট কথা, সব তিনি বলেন হাসির ছিটে দিয়ে। বাঁকা কথা, চোখা কথাতেও বাদ পড়ে না এটা।"[৯৬]

প্রমথনাথ গতানুগতিক চিন্তাধারাকে সমর্থন করেননি। তিনি অভিনব বিষয় নিয়ে চিন্তা করতেন, সেজন্য বহুজনের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর অনেক ব্যবধান থাকত, নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রমথনাথের স্পষ্টবাদিতা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—

"আসলে কিন্তু প্রমথনাথ আদৌ কাছের মানুষ নন—দূরের ঝাপসা, অস্পষ্ট মানুষ এবং সহজে কাছাকাছি তাঁর যাওয়া যায় না—তাঁর ব্যঙ্গ ও স্পষ্টোক্তির জন্য, তাঁর নিষ্ঠুর সত্যবাদিতার জন্য।"[৯৭]

প্রমথনাথ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যুক্ত থাকা কালে কর্মসূত্রে তাঁকে দিল্লিতে মাঝে মাঝে থাকতে হয়েছে। এছাড়া ইউ.জি.সির বিভিন্ন কাজে তিনি দিল্লিতে বহুবার এসেছেন। রাজ্যসভার সদস্য পদে বৃত থেকে বহুবার দিল্লির পার্লামেণ্ট ভবনে তিনি এসেছেন। প্রমথনাথের দিল্লির ঐতিহাসিক বিবরণ তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি তাঁর বন্ধুবর ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের গৃহে আতিথ্য নিতেন। তবে তাঁর সঙ্গে প্রমথনাথের গভীর সৌহার্দ গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে তাঁর কন্যা চিরশ্রী বিশীর সঙ্গে দিল্লির নিবাসী সুধাংশু শেখর চক্রবর্তীর বিবাহ হয়। তিনি মাঝে মাঝে নিউ দিল্লির J- 217 Saket-এ কন্যা জামাতার গৃহে আসতেন, চিরশ্রী বিশী চক্রবর্তী Lady Sriram College for Women-এ বাংলা অধ্যাপিকা পদে যুক্ত ছিলেন। পিতার সঙ্গে কন্যার শিক্ষা বিষয়ে

বিভিন্ন আলোচনা হয়। কন্যা চিরশ্রী ছিলেন সাহিত্যে অনুরাগী। পিতার সাহিত্যে রচনায় তিনি নিজেকে গর্ব অনুভব করতেন, পিতার সঙ্গে তিনি দিল্লির ইতিহাস খ্যাত স্থানে বহুবার ভ্রমণ করেছেন। চিরশ্রী বিশী দিল্লি প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"ভারতের ইতিহাসে অনার্য ভারত, হিন্দুভারত থেকে শক, হূন, পাঠান—মোগলদের লীলাভূমি—এই দিল্লির মাটিতেই সাতটি রাজধানীর উত্থান পতন ঘটেছে। কত লুটমার, রণহুঙ্কার, দুর্বার অশ্বখুরধ্বনি, নিষ্ঠুর রক্তগঙ্গা, বারুদের গন্ধে ভরা বিষাক্ত বাতাস, নির্বিচারে কোতলে আম, স্বজনহারা সম্মানহারা নারীর বুকফাটা হাহাকার—সব মিশে আছে এই দিল্লির ধূসর উদাসীন মাটির ধুলোতে। আবার সেই সঙ্গে মিশেছে—পায়েলের ঝঙ্কার, বুলবুলির সুর। ফোয়ারার কল্লোল, গজলের গভীর বাণী, দিল্লির চির রহস্যময়ী, তাই চির আকর্ষণীয়া।"[৯৮]

প্রমথনাথ দিল্লির ইতিহাসকে কেন্দ্র করে অজস্র ঐতিহাসিক ছোট গল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে প্রমথনাথ যখন পার্লমেন্টে রাজ্যসভার সদস্য তখন ফিরোজ শাহ রোডে একটি বাংলো পেয়েছেন, বাংলোটি ছিল সুসজ্জিত। অথচ বাংলোটি যুব কংগ্রেসের জন্য ছেড়ে দিয়ে তিনি গ্রেটার কৈলাশ শহরে কন্যা চিরশ্রীর গৃহে থাকতেন।

প্রমথনাথের জীবনে শান্তিনিকেতন পর্ব, রাজশাহী পর্ব, কলকাতা পর্বের পাশাপাশি দিল্লি পর্ব তাঁর ব্যক্তি জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বলা বাহুল্য দিল্লিতে অবস্থান না করলে হয়ত প্রমথনাথের সাহিত্য জীবন অপূর্ণ থেকে যেত। ঐতিহাসিক ছোটগল্প সৃষ্টির সংখ্যা সম্ভবত কম হত।

১৯৭৫ খ্রিঃ থেকে শারীরিক দিক থেকে প্রমথনাথ একাধিকবার অসুস্থ হন। প্রথমে দুরারোগ্য জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হন। এর পর ১৯৭৮ খ্রিঃ তাঁর গ্ল্যান্ড বেড়ে যাওয়ায় তিনি দীর্ঘদিন কষ্ট পেয়েছেন, এই কঠিন রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রথমে কলকাতার পি.জি. হাসপাতাল থেকে বেলভিউ ক্লিনিকে স্থানান্তরিত করা হয়, এই ক্লিনিকে তাঁর প্রস্টেট গ্ল্যান্ডে অস্ত্রোপচার হয়, অস্ত্রোপচারের ফলে তাঁর শরীরে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়, উপসর্গগুলি যথাক্রমে স্মৃতিশক্তি হ্রাস, দৃষ্টিশক্তি লোপ, রক্তচাপ কম, অসংলগ্ন কথাবার্তা প্রভৃতি। ১৯৭৯ খ্রিঃ তাঁর শারীরিক উন্নতি ঘটে। তাঁর কিছুদিন পর আবার অসুস্থ হলে প্রমথনাথকে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, তিনি সেখান থেকে সুস্থ হয়ে লেক গার্ডেন্সের নিজ গৃহে ফিরে আসেন, নিজ গৃহে থেকে প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডঃ জ্যোৎস্নাময় মুখার্জীর চিকিৎসা ও সুপরামর্শে প্রমথনাথের শারীরিক উন্নতি ঘটে, তিনি অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন, কিন্তু ১৯৮৫ খ্রিঃ এপ্রিলের নিজ গৃহে আকস্মিক ভাবে কোমরে আঘাত পান। রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলে। কিন্তু তাঁর কোমড়ের ব্যথা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে, এর ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে তারপর রামকৃষ্ণ সেবাপ্রতিষ্ঠান হাসপাতালে ১০ই মে, ১৯৮৫ শুক্রবার তিনি মায়াধাম ত্যাগ করেন।

তাঁর মরদেহ বিশেষ মর্যাদায় কলকাতার বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রমথনাথের

অনুরাগী ভক্ত, অনুরাগী ছাত্র ও তাঁর সুহৃদ, বিশিষ্ট সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, আত্মীয় পরিজন প্রত্যেকেই তাঁর গলায় পুষ্পমাল্য নিবেদন করেন। প্রমথনাথের মৃত্যুতে শোকাহত অজস্র ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিলেন কেওড়াতলা মহাশ্মশানে। ছাত্র সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি, সুভেন্দু সরকার, প্রমথনাথের ভাগ্নে অঙ্কন রায় চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন, তথাগত রায় আরো অনেকে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন, প্রমথনাথের মরদেহ বৈদ্যুতিক চুল্লিতে তুলে দেওয়ার আগে শেষবারের মত তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাল অগণিত প্রমথ অনুরাগী শ্মশানযাত্রী। নিমেষের মধ্যে তাঁর নশ্বর দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কিন্তু প্রমথনাথের কালজয়ী সাহিত্য বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে রেখেছে। তিনি আজও পাঠক মনে স্থায়ী আসন অধিকার করে আছেন।

মৃত্যুর পর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সংবর্ধনা দেবার জন্য কথাসাহিত্য পত্রিকার সংখ্যায় বিভিন্ন লেখকরা তাঁদের লেখা প্রকাশিত করতেন, এইভাবে সংবর্ধনা সংখ্যায় অভিনন্দন জানানো হয়েছিল বনফুল, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, পরশুরাম, প্রবোধ সান্যাল প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দকে। ঠিক তেমনি ভাবে কথাসাহিত্য পত্রিকায় প্রমথনাথের সংবর্ধনা সংখ্যায় লিখেছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজিতকুমার দত্ত, বিমল মিত্র, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, প্রণবরঞ্জন ঘোষ, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, দেবেশচন্দ্র রায় প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকবৃন্দ যাঁদের সঙ্গে প্রমথনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয় গড়ে উঠেছিল তাঁরা প্রত্যেকে প্রমথনাথের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন এবং তাঁর সাহিত্যকৃতী ও বিভিন্ন সাহিত্য বিষয়ে নব মূল্যায়ন করেছে . .

শতবর্ষের আলোকে প্রমথনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কলকাতার দীনবন্ধু মঞ্চে আয়োজিত হয় এক অনুষ্ঠান। প্রমথনাথ বিশীর প্রতি সংবর্ধনা জানাতে গিয়ে আয়োজিত উক্ত মঞ্চে প্রমথনাথ বিশী জন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতি প্রাথমিক পর্বের প্রমথনাথ বিশী জন্মশতবর্ষ স্মরণিকা প্রকাশ করেন। ২০০১ খ্রি ১১ই জুন তারিখে স্মরণিকার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সভাপতির পদ অলংকৃত করেছেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ-সভাপতির পদ অলংকৃত করেছেন সৌগত রায়, হোসেনুর রহমান, যুগ্ম-সম্পাদক পদ অলংকৃত করেছেন প্রণয় কুন্ডু ও সবিতেন্দ্র রায়। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সচিব শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সাহিত্য অ্যাকাডেমির সচিব ডঃ রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও কর্মসমিতির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন অরুণকুমার বসু, ভবতোষ দত্ত, নারায়ণ বসু, অলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত, সুভদ্র সেন, মঞ্জুলা বসু, জ্যোতির্ময় ঘোষ, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পবিত্র সরকার, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, শুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, শঙ্কু মহারাজ, মণীশ চক্রবর্তী, প্রদোষকুমার পাল, অমিতাভ চৌধুরী, বিজিত কুমার দত্ত, স্মরণ আচার্য, অলোক রায়, সুনীল দাস, তথাগত রায়, চিরশ্রী বিশী চক্রবর্তী, শোভন বসু, রমেন্দ্রনারায়ণ নাগ, সোমনাথ রায় প্রমুখ।

প্রমথনাথ বিশীর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতির উপদেষ্টামন্ডলী অন্নদাশঙ্কর রায়, সুধাংশু

চক্রবর্তী, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, নিমাইসাধন বসু, রবীন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত, কণিষ্ক বিশী, আবিরলাল মুখোপাধ্যায়, শংকরীপ্রসাদ বসু, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, মিলিন্দ বিশী, শঙ্খ ঘোষ ও সুধীরময় বসু প্রমুখ।

যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রমথনাথ বিশীর জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠান সাফল্য মন্ডিত হয়েছে সেই পৃষ্ঠপোষকমন্ডলী হলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী, মাননীয় শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মাননীয় শ্রীবিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী—রাজ্যপাল উত্তরপ্রদেশ, মাননীয় শ্রীসোমনাথ চট্টোপাধ্যায়—লোকসভা সাংসদ, মাননীয় শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি—লোকসভা সাংসদ, মাননীয় শ্রীদিলীপ সিনহা—উপাচার্য বিশ্বভারতী ও মাননীয় শ্রীআশিস বন্দ্যোপাধ্যায়—উপাচার্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রমুখ।

প্রমথনাথ বিশীর স্মারক গ্রন্থে প্রমথনাথের ব্যাক্তি জীবন ব্যক্তিত্ব ও স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধ লিখেছেন অনেকে। প্রতাপচন্দ, অমিতাভ চৌধুরী, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, শুকদেব সিংহ, পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, তথাগত রায়, চিরশ্রী বিশী চক্রবর্তী, অগ্নিমিত্র চৌধুরী, রেবতীভূষণ ঘোষ, রিক্তা বন্দোপাধ্যায়, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র সরকার ও জ্যোতির্ময় ঘোষ প্রমুখ।

প্রমথনাথ বিশীর সৃষ্টি ও স্রষ্টা প্রসঙ্গে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন—রবীন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবরঞ্জন ঘোষ, জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, কানাই সামন্ত, বিজিতকুমার দত্ত, অরুণকুমার বসু, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, মানসী দাসগুপ্ত, শিপ্রা মুখোপাধ্যায় বিশী, নবেন্দু সেন, সুজল আচার্য, অমৃতলাল বালা, বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রতনকুমার দাস, অমিয় দত্ত, আনন্দময়ী সিংহ, ভবতোষ দত্ত, প্রণয়কুমার কুন্ডু, রবিন পাল ও উজ্জ্বলকুমার মজুমদার প্রমুখ।

প্রমথনাথের ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এবং কল্পনার সঙ্গে জীবনরস যুক্ত করে তিনি যে ছোটগল্পগুলি আমাদের উপহার দিয়েছেন তার সাহিত্য মূল্য কালের অঙ্গে চির অঙ্কিত। জীবনচলার পথে তিনি খুঁজে পেয়েছেন অসংখ্য গল্পের চরিত্র, সেই সঙ্গে বহু কাহিনীর উৎসভূমি তৈরি হয়েছিল সন্দেহ নেই। অভিজ্ঞতার শিল্পী প্রমথনাথের ছোটগল্পে বহু চরিত্র তাঁর পরিচিত পরিবেশ থেকে লেখা। সমাজ জীবনের, সরকারি প্রশাসন বিভাগের ও রাজনীতির অসঙ্গতিকে অসাধারণভাবে ছোটগল্পে প্রমথনাথ স্থান দিয়েছেন।

লেখকের লেখনীতে তাঁর জীবনাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলিকে তিনি যুক্তিপূর্ণ ভাষায় কাহিনী বয়নের মাধ্যমে দূর করে হয়ে উঠেছেন সত্য ও সুন্দরের পূজারী। তিনি বাংলা সাহিত্যের এক শক্তিমান ছোটগল্পকার। কাহিনী, ভৌগোলিক পটভূমি চরিত্র আঙ্গিক নৈপুণ্যে, চিত্রধর্মিতা ও মানবিক আবেদনে প্রমথনাথের ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ হয়ে চিরকাল গল্পপাঠকের মনে স্থায়ী আসন অধিকার করে থাকবে এখানেই ছোটগল্পকার প্রমথনাথ বিশীর সার্থকতা, ছোটগল্পকার হিসেবে তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

উল্লেখপঞ্জী

(১) রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—প্রমথনাথ বিশী —পৃঃ ২৩

(২) তদেব—পৃঃ ৪৮

(৩) শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ—শ্রী সুধীর চন্দ্র কর ও শ্রীমতী সাধনা—পৃঃ ১৩

(৪) পুরানো সেই দিনের কথা—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ নিবেদন অংশ

(৫) রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৫

(৬) তদেব—পৃঃ ২৩

(৭) তদেব—পৃঃ ২৩

(৮) তদেব—পৃঃ ৫০

(৯) তদেব—পৃঃ ৭৬

(১০) তদেব—পৃঃ ১২৬

(১১) তদেব—পৃঃ ৫৪

(১২) ছাত্রাবস্থায় প্রমথনাথ বিশী : সুধাংশু রায়চৌধুরী (১৪৯১) —পৃঃ ৮৫

(১৩) রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—প্রমথনাথ বিশী —পৃঃ ৫৪

(১৪) কথাসাহিত্য—ভাদ্র—আশ্বিন সংখ্যা (১৫০৯) —পৃঃ ৭২

(১৫) রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—প্রমথনাথ বিশী —পৃঃ ৫৬

(১৬) তদেব—পৃঃ ৫৬

(১৭) কথাসাহিত্য—ভাদ্র—আশ্বিন (১৩৭৪ - ১৩৪৯)—পৃঃ ১১৯

(১৮) রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—প্রমথনাথ বিশী —পৃঃ ৭৯

(১৯) তদেব—পৃঃ ১০৭

(২০) তদেব—পৃঃ ১০৮

(২১) তদেব—পৃঃ ১৩৭

(২২) তদেব—পৃঃ ১৩৬

(২৩) প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস—অশোককুণ্ডুর লেখা প্রবন্ধ—প্রমথনাথ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথের পথিক—পৃঃ ৪৪৭

(২৪) শান্তিনিকেতন পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা (১৩২৯)—পৃঃ ৬৩

(২৫) প্রমথনাথ বিশী স্মারক গ্রন্থ : বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার— প্রমথনাথ বিশী ও তার ছদ্মনাম—রতনকুমার দাস—পৃঃ ২৮৯

(২৬) রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৪৩

(২৭) তদেব—পৃঃ ১৪৭

(২৮) তদেব—পৃঃ ১৫১

(২৯) তদেব—পৃঃ ১৫২

(৩০) তদেব—পৃঃ ১৫৭

(৩১) প্রমথনাথ বিশী স্মারক গ্রন্থ—পৃঃ ৩৪
(৩২) তদেব—পৃঃ ৩১
(৩৩) শান্তিনিকেতন পত্রিকা, অগ্রহায়ণ (১৩২৯)—পৃঃ ১২৪
(৩৪) শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গে : সুধীরচন্দ্র কর —পৃঃ ১৯৭
(৩৫) প্রাচীন আসামী হইতে (সনেট নং ৫২)—পৃঃ ৪১
(৩৬) তদেব (সনেট নং ৪৯)—পৃঃ ৫০
(৩৭) রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৬২
(৩৮) তদেব—পৃঃ ১৬৩
(৩৯) তদেব—পৃঃ ১৬৮
(৪০) রবীন্দ্রপ্রতিভার নিসর্গ প্রকৃতি ও শিল্পকলা : ডঃ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত—পৃঃ ৪৯
(৪১) রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১২১
(৪২) রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন—ডঃ আশরফ সিদ্দিকি—পৃঃ ৩৪
(৪৩) তদেব—পৃঃ ৪৮
(৪৪) তদেব—পৃঃ ১৪
(৪৫) তদেব—পৃঃ ২১
(৪৬) তদেব—পৃঃ ২১
(৪৭) তদেব—পৃঃ ২১২
(৪৮) প্রমথনাথ বিশী স্মারক গ্রন্থ—অরুণকুমার বসু—পৃঃ ২৪০
(৪৯) তদেব—প্রবন্ধ— প্রবোধ চন্দ্র সেন—পৃঃ ২০২
(৫০) শান্তিনিকেতন পত্রিকা (১৩২৬, শ্রাবণ সংখ্যা)—পৃঃ ৬৪
(৫১) রাজশাহীতে দু'বছর কথাসাহিত্য : প্রমথনাথ বিশী সংবর্ধনা সভা—পৃঃ ২৩
(৫২) তদেব—পৃঃ ৪৯
(৫৩) তদেব—পৃঃ ৪৯
(৫৪) তদেব—পৃঃ ৪৯
(৫৫) তদেব—পৃঃ ৫০
(৫৬) তদেব—পৃঃ ৫০
(৫৭) তদেব—পৃঃ ৫০
(৫৮) রাজশাহীতে দু'বছর : কথাসাহিত্য শ্রী প্রমথনাথ বিশী সংবর্ধনা সভা—পৃঃ ৫১
(৫৯) তদেব—পৃঃ ৫১
(৬০) প্রমথনাথ বিশীর শ্রেষ্ঠ কবিতা—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৮১
(৬১) তদেব—পৃঃ ১৮২
(৬২) তদেব—পৃঃ ১৮১
(৬৩) তদেব—পৃঃ ১৮২
(৬৪) তদেব—পৃঃ ১৮৬

(৬৫) তদেব—পৃঃ ১৮৩
(৬৬) তদেব—পৃঃ ১৮৭
(৬৭) তদেব—পৃঃ ১৮০
(৬৮) তদেব—পৃঃ ২৫১
(৬৯) তদেব—পৃঃ ২৬৮
(৭০) বড় বিস্ময় লাগে—গজেন্দ্রকুমার মিত্র (দেশ ১৩৬৬)—পৃঃ ১৯৫
(৭১) প্রমথনাথ বিশী স্মারক গ্রন্থ—পৃঃ ২৫
(৭২) তদেব—পৃঃ ১৮৮
(৭৩) তদেব—পৃঃ ১৪৭
(৭৪) তদেব—পৃঃ ১৪১
(৭৫) তদেব—পৃঃ ১৪২
(৭৬) আনন্দ বাগচী—'স্বর্গাদপি গরীয়সী দিনগুলি'—পৃঃ ১১১
(৭৭) প্রবন্ধ সংকলন—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—পৃঃ ১৩৬
(৭৮) উদ্ধৃতিকোষ—পৃঃ ১২৭
(৭৯) তদেব—পৃঃ ১২৫
(৮০) প্রবন্ধ সংকলন—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—পৃঃ ১৩৪
(৮১) প্রমথনাথ বিশী স্মারকগ্রন্থ—পৃঃ ৮৭
(৮২) বিচিত্র সংলাপ—উৎসর্গ অংশ—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২
(৮৩) প্রমথনাথ বিশী স্মারকগ্রন্থ—পৃঃ ১৭৯
(৮৪) তদেব—পৃঃ ২৭
(৮৫) তদেব—পৃঃ ২৮
(৮৬) তদেব—পৃঃ ২৯
(৮৭) প্রমথনাথ বিশী স্মারকগ্রন্থ ঃ প্রবন্ধ রসিক সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী, বীরেন্দ্র চন্দ্র ভদ্র—পৃঃ ৯৫
(৮৮) প্রমথনাথ বিশী স্মারকগ্রন্থ—পৃঃ ১৩০
(৮৯) তদেব—পৃঃ ২৪৯
(৯০) তদেব—পৃঃ ১০৩
(৯১) তদেব—পৃঃ ৯৩
(৯২) কষ্টকল্পিত—অতুল্য ঘোষ—দেশ—১৩৮৫—পৃঃ ১৫
(৯৩) বড় বিস্ময় লাগে—গজেন্দ্রকুমার মিত্র, দেশ—১৩৬৬—পৃঃ ১৯৭
(৯৪) দেশ—১৩৮৫—পৃঃ ১২
(৯৫) কথাসাহিত্য—১৩৭৩—পৃঃ ১২৮৮
(৯৬) কথাসাহিত্য—১৩৭৩—প্রণব রঞ্জন সেন—পৃঃ ১৩৪৫
(৯৭) কথাসাহিত্য, ১৩৭৩—নীহাররঞ্জন গুপ্ত—পৃঃ ১৪৫৪
(৯৮) প্রমথনাথ বিশী স্মারকগ্রন্থ—পৃঃ ১২৪

তৃতীয় অধ্যায়

প্রমথনাথের ছোটগল্পের বিবর্তন, শ্রেণিবিভাগ ও বিষয়বস্তু

বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রপরবর্তী যে সব ছোটগল্পকারগণের আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে প্রমথনাথ বিশী অন্যতম। বাংলা ছোটগল্পের জগতে প্রমথনাথ বিশীর আবির্ভাব তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। প্রমথনাথের ছোটগল্প রচনার আগে বাংলা ছোটগল্পের পথ অনেকটাই প্রশস্ত ছিল। রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রমথনাথ ছোটগল্প রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন। তাঁর প্রথম পর্বের ছোটগল্পগুলি অনেকটা রবীন্দ্রভাবধারার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। তাঁর সমকালে সমাজজীবন ও রাষ্ট্রজীবনে এক পরিবর্তিত রূপ পরিগ্রহ করে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক জীবনের অধঃপতন ঘটে। অনেকটা ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়ে সমাজজীবনের পুরাতন মূল্যবোধগুলির বিবর্তিত রূপ নিয়ে তখন আত্মপ্রকাশ করল। এই প্রতিকূল পরিবেশে হতাশা, অস্থিরতা, অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি করলো। স্বদেশে ও বিদেশে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির অশুভ প্রভাব আষ্ঠেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। স্বাধীনোত্তর যুগ জীবনের ছবি কথা সাহিত্যে উপস্থাপিত হল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অসঙ্গতি থেকে সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করে ছোটগল্পের বিষয় ও প্রকরণগত স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিলেন বিভিন্ন ছোটগল্পকারগণ, প্রমথনাথ বিশীর বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পকার হিসেবে আত্ম প্রকাশ ঘটে এমনি একটি সময়ে। তাঁর ছোটগল্পের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ভূদেব চৌধুরী মন্তব্য করেছেন—

"প্রমথনাথ বিশী ও কল্লোল যুগের তথা আমাদের আত্মখণ্ডিত বিশ শতকের অপূর্ণতা পীড়িত জীবনের শিল্পী। অন্তরের গভীরে আলোক তীর্থের পিপাসা আর প্রত্যক্ষ জীবনে শূন্যতা, অপূর্ণতা, রিক্ততা, বঞ্চনা, এ দুয়ের পারস্পরিক অভিঘাতে গঠিত হয়েছে প্র-না-বি-র রহস্য জটিল বিচিত্র শিল্প প্রকৃতি।"[১]

প্রাক্ স্বাধীনতা ও স্বাধীনোত্তর কালের সৃষ্টিমূলক সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশী যুগ ও জীবনকে অস্বীকার করেন নি। তাঁর গল্পের বিষয় ও আঙ্গিক পরিবর্তমান পরিস্থিতিতে বিবর্তিত হয়েছে। বলাবাহুল্য কোনো সাহিত্যিক সম্ভবত একই ধারায় সাহিত্য রচনা করেন না। তাঁদের বিচিত্রপিয়াসী মন নূতনত্বের অভিমুখে যাত্রা করে। রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাসের বিষয় ও শিল্পরূপ যেভাবে উপস্থাপন করেছেন 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে তার পরিবর্তিত রূপ আমরা খুঁজে পাই। শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীন' উপন্যাস যেভাবে লিখেছেন 'শ্রীকান্ত' ও 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে নতুন অভিজ্ঞতা ও নূতন চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। তেমনি প্রমথনাথ বিশীর প্রথমপর্বের ছোটগল্পগুলির যে বিষয় ও আঙ্গিক পরিণতি পর্বের গল্পগুলির বিষয় স্বাতন্ত্র্য ও রূপ বৈচিত্র্যে অনন্য। তাঁর ত্রিশ থেকে চল্লিশ বয়সের লেখা ছোটগল্পের সঙ্গে ষাট, সত্তর বছরের লেখা ছোটগল্পের পার্থক্য থাকবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। ভাদ্রসংখ্যা, ১৩২৩, 'প্রভাত' পত্রিকায় তাঁর প্রথম

ছোটগল্পের আত্মপ্রকাশ ঘটে। গল্পটির নাম 'কুলহারা'। আবেগতারল্য এখানে গল্পরসকে জমাট বাঁধতে দেয়নি। একটা অপরিণত মনের ছোটগল্প নিয়ে তাঁর উন্মেষপর্বের ছোটগল্পের আত্মপ্রকাশ। গল্পটিতে বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব ও আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য নয়। ১৩২৪, পৌষ সংখ্যায় 'বাগান পত্রিকায়' 'বাঁশীর সুর' নামে তাঁর দ্বিতীয় গল্প প্রকাশিত হয়। গল্পটির বিষয়বস্তুতে বদ্ধজীবন থেকে মুক্তির পিপাসা সুস্পষ্ট যা লেখকের মানবিক চেতনার পরিচয় বহন করে। রবীন্দ্র কাব্যের মূলসুর 'হেথা নয় হোথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে' এবং সীমা থেকে অসীমের ব্যঞ্জনা, খণ্ড থেকে অখণ্ডের প্রতিধ্বনি, অনু থেকে পরমানুতে বিস্তার—এরূপ বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর এই রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। সমকালের লেখা 'প্রণতা' গল্পটি অনবদ্য সন্দেহ নেই। এখানে প্রমথনাথের কবি সত্তা ও প্রাবন্ধিক সত্তা যুগপৎ আত্মপ্রকাশ করেছে যা তাঁর বহু গল্পের মূল বৈশিষ্ট্য।

প্রথম পর্বের 'ভাই ফোঁটা' ছোটগল্পটি করুণরস সমৃদ্ধ। ১৩২৫ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় 'প্রভাত' পত্রিকায় এর প্রথম প্রকাশ। কাহিনী বয়নে শরৎচন্দ্রের প্রভাব প্রমথনাথ অতিক্রম করতে পারেনি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের নির্মমতার পাশাপাশি নারীত্বের জয়গান এবং মহত্বকে লেখক আলোকপাত করেছেন আলোচ্য গল্পটিতে। পাষাণ হৃদয় পুরুষের মধ্যেও যে করুণার স্ফুরণ ঘটতে পারে তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করে আলোচ্য ছোটগল্পটি। এছাড়া বঙ্কিম প্রভাবিত পাঠকদের লক্ষ্য করে লেখক জানিয়েছেন তাঁর ব্যর্থতা—"যারা গল্প শুনতে এসেছেন তাঁদের নিরাশ করলাম ক্ষমা করবেন। রোমান্স লিখছি না, কারণ রোমান্স লিখবার মতো মনের অবস্থা নয়। সত্যের একটা জ্বালা আছে, যার তেজে ছোটখাটো অনেক জিনিস পুড়ে মরে।"[২] গল্পটি লেখক উপস্থাপন করেছেন উত্তমপুরুষের জবানীতে।

উন্মেষপর্বের 'জয়' ছোটগল্পটি লেখকের অনবদ্য সৃষ্টি। ১৩২৮ সালের, 'আষাঢ় শ্রাবণ' সংখ্যায় 'প্রভাত' পত্রিকায় প্রকাশিত আলোচ্য গল্পটি ঐতিহাসিক ছোটগল্পের নিদর্শন। ইতিহাস অনুরাগী গল্পকার ইংল্যান্ডের রাজা হেনরী ও প্রাশিয়ার রাজার যুদ্ধ, হেনরীর বন্দীত্ব ও উদ্ধারের কাহিনী সহজ সরল সাবলীল ভাষায় লিখেছেন। এই গল্পে নাট্যগুণের উপস্থাপনা লেখকের সার্থক সুন্দর সৃষ্টি।

উন্মেষপর্বে 'মাদুলী' গল্পটি একটি করুণরসাত্মক ছোটগল্প। ১৩২৫ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় 'শান্তি' পত্রিকায় গল্পটির প্রথম প্রকাশ। মানবিক রসসমৃদ্ধ গল্পটিতে প্রচলিত বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে।

১৩২৭ সালের 'ফাল্গুন ও চৈত্র' সংখ্যা 'শান্তি' পত্রিকায় 'ফুলদানী' গল্পটি প্রকাশিত হয়। গল্পটির মূল সুর করুণরসাশ্রিত; নায়কনায়িকার প্রেমভাবনার এক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আলোচ্য গল্পটির মূল প্রতিপাদ্য। ১৩২৮ সালের 'ভাদ্র' সংখ্যায় 'শান্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত অতিপ্রাকৃত বিষয়ক ছোটগল্প 'বিভীষিকা' নামে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ছোটগল্পকার গল্পটির নামকরণ পরিবর্তন করে 'অশরীরী' নামে 'অশরীরী' ছোটগল্প গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৩১ বৈশাখ সংখ্যায় 'আরোগ্য স্নান' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়। প্রকৃতিবিমুখ ও আরামপ্রিয় চরিত্রটি রোগগ্রস্ত হয়ে পরিশেষে উদার প্রকৃতির সান্নিধ্যে কিভাবে রোগমুক্ত হল তারই কাহিনীই আলোচ্য গল্পটির মূল বিষয়। গল্পটি কাব্য গুণের সার্থক সংযোজন। কবিকল্পনা ও কবিভাষায় সমৃদ্ধ আলোচ্য গল্পটিতে শিল্পকুশলতার প্রকাশ ঘটেছে। বর্ণনার গুণে আলোচ্য ছোটগল্প এক নিটোল শুভ্র মুক্তাবিন্দুর মতো হয়ে উঠেছে। রাঢ়বঙ্গের অন্তগর্ত বীরভূমের প্রকৃতি লেখকের কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। জীবনানুভূতি ও প্রকৃতিপ্রেমের মেলবন্ধনে 'আরোগ্য স্নান' ছোটগল্পটি লেখকের সার্থক সংযোজন।

প্রমথনাথ শিক্ষাসূত্রে সতেরোটি বসন্ত কাটিয়েছেন শান্তিনিকেতনে। তখন এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে লেখকের ঘটেছিল আত্মিক পরিচয়। তাঁর উন্মেষ পর্বের ছোটগল্পগুলিতে ব্যঙ্গধর্মিতা প্রাধান্য পায়নি। সেখানে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে জীবনরস ও নিসর্গভাবনা।

'কল্লোল' পত্রিকায় ১৩৩১ এর আষাঢ় সংখ্যায় 'সাগরিকা' নামে ছোটগল্পটি প্রকাশিত হয়। গল্পটি রোমান্টিক প্রেমের গল্প হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। এখানে লেখককে আমরা খুঁজে পাই রোমান্সপ্রিয় ও নিসর্গপ্রেমিক হিসেবে। বোধের সঙ্গে বোধির এবং হৃদয়ানুভবের সঙ্গে শাণিত বুদ্ধির সার্থক মেলবন্ধন ঘটেছে আলোচ্য গল্পটিতে। বাক্যবিন্যাস ও শব্দ নির্বাচনে গল্পটির মৌলিকত্ব প্রমাণ করে। রবীন্দ্র প্রভাবিত স্বর্গীয় আলোক পথের অভিযাত্রী হলেও জীবনশিল্পী লেখকের কলমে কল্লোল যুগের বৈশিষ্ট্য গল্পটিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। একদিকে আলোক তীর্থের প্রত্যাশা অন্যদিকে রিক্ততা, বঞ্চনা, শূন্যতা ও অপূর্ণতার অভিঘাত এই দ্বৈত মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে আলোচ্য গল্পে।

'শনিবারের চিঠি' সাপ্তাহিক পত্রিকায় ১৩৩১ সালের ১৪ই অগ্রহায়ণ 'নূতন কথামালা' গল্পগুলি প্রকাশিত হয়। 'বিষ্ণুশর্মা' ছদ্মনামে কথামালার গল্পগুলি লেখক প্রকাশ করেন। এই পর্বে লেখক রঙ্গরসের শিল্পী হলেও তাঁর গভীর জীবনভাবনার প্রকাশ ঘটেছে।

প্রমথনাথ বিশী ১৯৪৪-৪৫ খ্রিষ্টাব্দে দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে এবং ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ খ্রিঃ পর্যন্ত 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। এসময়ে তাঁর ব্যঙ্গধর্মী, ঐতিহাসিক, অতিলৌকিক প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের ছোট গল্পগুলি প্রকাশিত হতে থাকে। লেখকের রাজনৈতিক ভাবনা মুক্ত অসংখ্য ছোটগল্প এই পর্বে প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে প্রমথনাথের গল্পগ্রন্থগুলির প্রকাশ ঘটতে থাকে।

১৩৪৮ সাল থেকে ১৩৬৯ পর্যন্ত প্রমথনাথের একে একে একুশটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

প্রমথনাথের প্রথম গল্পসংকলন গ্রন্থ 'শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব'। ১৩৪৮ সালে প্রকাশিত এই গল্পগ্রন্থটিতে মোট ২০টি গল্প স্থান পেয়েছে। গল্পগুলি যথাক্রমে ঃ—'শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব', 'ন-ন-লৌ-ব-লিঃ', 'বাইশ বৎসর', 'যন্ত্রের বিদ্রোহ', 'ঋণজাতক', 'ভৌতিক কমেডি', 'ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল প্ল্যানিং', 'চিত্রগুপ্তের রিপোর্ট', 'আর্টফর আর্টস সেক', 'টিউশন', 'কাঁচি', 'অটোগ্রাফ', 'সিন্ধবাদের অষ্টম সমুদ্রযাত্রার কাহিনী', 'নর-শার্দূলসংবাদ', 'নির্বাণ',

'জি.বি.এস. ও প্র.না.বি, বাঘদত্তা', 'নগেন হাঁড়ির ঢোল', 'ভেজিটেবল বোম' ও রোহিণীর কি হইল? প্রভৃতি।

'শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব' গল্পটি রচনা বা গল্প সংকলনটির নামকরণের পিছনে লেখকের ব্যক্তিজীবনের ঘটনা বিধৃত হয়ে আছে। কোনো এক রবিবাসরের সাহিত্যসভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে প্রমথনাথ গিয়েছিলেন খগেন্দ্রনাথ মিত্রের গৃহে। সেই সাহিত্যসভার সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। খগেন্দ্রনাথ যখন প্রমথনাথ বিশীর পরিচয় শরৎচন্দ্রকে দিলেন তখন শরৎচন্দ্র বললেন যে তিনি কখনো প্রমথনাথের নাম শোনেন নি। শরৎচন্দ্রের এ ধরনের মন্তব্যে প্রমথনাথ অত্যন্ত ব্যথিত হন। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের জনপ্রিয়তা ছিল তখন সাহিত্য অঙ্গনের শীর্ষচূড়ায়। শরৎচন্দ্রের স্মৃতিতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবার জন্য তিনি 'শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব' গল্পগ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। যদিও গল্পগ্রন্থটিতে শরৎচন্দ্রের প্রতি লেখকের ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য শরৎচন্দ্র ও লেখক স্বয়ং দুজনেই ব্যথিত হয়েছেন সন্দেহ নেই। এছাড়া গ্রন্থ প্রকাশকের বিক্রয় বৃদ্ধির প্রত্যাশা এই নামকরণের পেছনে কাজ করেছিল। গল্পগুলিতে তিনি অনুপম রসসৃষ্টির কৌশলের স্বাক্ষর রেখেছেন। গল্পগুলি উপভোগ্য ও বিচিত্রস্বাদী। তবে উপহাস, বিরক্তি ও বিক্ষোভের প্রকাশে গল্পরসের মর্যাদা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

এই পর্বে ইতিহাস রস ও উদ্ভট রসের সংযোজন হয়েছে। গল্পে নাট্যগুণ ও বাস্তবতার অভাব নেই। কোনো কোনো গল্পে নাগরিক সভ্যতা ও গ্রামীণ সভ্যতার দ্বন্দ্ব মুখ্য উপজীব্য হয়ে উঠেছে। আবার বাঙালি চরিত্রের অসারতার প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়েছে লেখকের বিদ্রূপ বাণ। কিছু গল্পে তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবতার যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। একদিকে এই গল্পগ্রন্থে তাঁর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুট হয়েছে, অন্যদিকে কোনো কোনো গল্পে মনুষ্যেতর প্রাণীকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে পশুপ্রীতির পরিচয় প্রদর্শিত হয়েছে।

প্রমথনাথের দ্বিতীয় গল্প গ্রন্থ "শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব" ১৩৫১ সালের মাঘে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গল্প গ্রন্থে পনেরোটি গল্প স্থান পেয়েছে। তিনি যে ব্যঙ্গধর্মী ছোটগল্পকার তার নিদর্শন পাওয়া যায় আলোচ্য গল্প সংকলনটিতে। এখানে তিনি যেন হয়ে উঠেছেন জীবনরসিক শিল্পী। তাই বলে তিনি উপেক্ষা করেননি জীবনবোধকে। মানবপ্রীতি ও মমত্ববোধের হাসি ও অশ্রু দুটি দিককেই লেখক আলোকপাত করেছেন অসাধারণ নিপুণতার সাথে। গল্পগুলি যথাক্রমে ঃ 'শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব', 'উতঙ্ক, গণক', 'সরল থিসিস রচনা প্রণালী', 'অর্থ পুস্তক', 'চাকরিস্তান', 'প্রফেসর রামমূর্তি', 'আধ্যাত্মিক ধোপা', 'চিত্রগুপ্তের অ্যাড্ভেঞ্চার', 'মারণ যজ্ঞ', 'সদা সত্য কথা কহিবে', 'ভূতের গল্প', 'কাঙালী ভোজন', 'মধুসূদন-ভারতচন্দ্র সংবাদ' ও 'পরিস্থিতি' প্রভৃতি।

এই পর্বে লেখকের কল্পনাশক্তির সঙ্গে বাস্তবের মেলবন্ধন ঘটেছে। প্রচলিত বিশ্বাস অবিশ্বাস, বঙ্গদেশের বিচিত্রমুখী চরিত্রের উপস্থাপনা ও কঠিন বিষয়কে সাবলীলভাবে তুলে ধরবার প্রয়াস লক্ষণীয়, যদিও অনেকাংশে গল্পগুলি অনেকটা হাল্কা চালের, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গভীর উপলব্ধির অভাব থেকে গেছে, তা সত্ত্বেও রঙ্গব্যঙ্গপ্রিয় প্র. না. বি. কে আমাদের চিনে নিতে কষ্ট হয় না।

১৩৫২ সালে প্রকাশিত ৮টি গল্পের সংকলন গ্রন্থ 'গল্পের মতো'। নামকরণটি শুনে আমাদের মনে হতে পারে যে খুব সম্ভবত গল্পগুলি শিল্প সৃষ্টির স্তরে পৌঁছতে পারেনি। আপাতদৃষ্টিতে তা মনে হলেও প্রমথনাথের এই গল্পগ্রন্থের প্রত্যেকটি গল্পই বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদরূপে চিরপরিচিত হয়ে থাকবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই গ্রন্থে যে গল্পগুলো স্থান পেয়েছে সেগুলি হল ঃ 'গঙ্গার ইলিশ', 'পূজা সংখ্যা', 'কীটাণুতত্ত্ব', 'আরোগ্যস্নান', 'দ্বিতীয়পক্ষ', 'উল্টাগাড়ি', 'মাধবী মাসী', 'ভবিষ্যতের রবীন্দ্রনাথ'।

এই গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি বিভিন্ন স্বাদের। কোনোটি তিক্ত পরিহাসযুক্ত, কোনোটি শ্লেষ ও মধুর রসযুক্ত। কিন্তু রসাবেদনের ক্ষেত্রে প্রতিটি ভিন্নতর। কখনো তিনি বাস্তব সচেতন শিল্পী আবার কখনো গা-ছম-ছম করা অতিপ্রাকৃত রসের সংযোজনকারী শিল্পী। মানব চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিক্‌টি লেখক নূতন কলাকৌশলে তুলে ধরেছেন আলোচ্য গল্পগুলিতে! লেখকের নিবিড় সহানুভূতির স্পর্শে প্রতিটি গল্পেই ভাবের সঙ্গে ভাষার সুষ্ঠ সমন্বয় গড়ে উঠেছে। আলোচ্য গল্পগুলিতে সার্থক ছোটগল্পকার হিসেবে তাঁর পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

১৩ টি গল্পের সম্ভার নিয়ে লেখক উপস্থিত হয়েছেন পাঠকদের দ্বারপ্রান্তে। মূলত এই ১৩ টি গল্প তাঁর চতুর্থ গল্পগ্রন্থ 'গালি ও গল্প' কে সমৃদ্ধ করেছে। ১৩৫২ সালে এই গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গল্পগুলি হল যথাক্রমে ঃ—'অতি সাধারণ ঘটনা', 'চারজন মানুষ ও একখানা তক্তপোশ', 'বিপত্নীক', 'এ্যাক্‌সিডেন্ট', 'একটি ঠোঁটের ইতিহাস', 'প্র-না-বির সঙ্গে কথোপকথন', 'সত্যমিথ্যা কথা', 'টেনিস কোর্টের কান্ড', 'প্রা-না-বির সঙ্গে ইন্টারভিউ', 'ইংলণ্ডকে স্বাধীনতাদানের চেষ্টা', 'মাত্রাজ্ঞান', 'বিষকুম্ভ পয়োমুখম্‌', 'ভাঁড়ুদত্ত' প্রভৃতি।

এই পর্বের প্রতিটি গল্পেই প্র. না. বির নিজস্ব মৌলিক ব্যঙ্গ বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ বাণী ধরা পড়েছে। গল্পের মোড়কে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও সামাজিক অসঙ্গতির প্রতি আলোকপাত করেছেন। এই পর্বের গল্পগুলি যেন বিচিত্র স্বাদের। হাসির আড়ালে তিনি বিদ্রূপের কষাঘাত করেছেন। আবার দাম্পত্যপ্রেমের আশ্রয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে কিছু কিছু গল্প। তিনি পৌরাণিক চরিত্রকেও আধুনিকতার মোড়কে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর পরিণত মনের ছাপ ফুটে উঠেছে আলোচ্য গল্পগুলি রচনায়।

১৩৫২ সালে সাতটি গল্পের সমষ্টি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে 'ডাকিনী'। গল্পগুলি হলো ঃ—'ডাকিনী', 'গদাধর পণ্ডিত', 'পেস্কারবাবু', 'একগজ মার্কিন ও এক চামচ চিনি', 'নীলমণির স্বর্গলাভ', 'সিন্ধুক ভূতপূর্ব'। এই গল্পসংকলনে প্রতিটি গল্পই জীবনরসে সিক্ত। কখনে তিনি রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছেন আবার কখনো করুণরসের প্লাবনে ভেসে গেছেন। জীবনের ব্যথা বেদনা ও মুক্তির কাহিনী আলোচ্য গল্পগ্রন্থের কোনো কোনো গল্পে প্রকাশিত হয়েছে। পূর্ববর্তী দুটি গল্পগ্রন্থে তিনি যেমন ব্যঙ্গশিল্পী হিসেবে পাঠক মানসে পরিচিত হয়েছেন তেমনি এই গল্পগ্রন্থে তিনি জীবন চেতনাযুক্ত এক অনবদ্য শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

১৩৫৫ সালে প্রকাশিত প্রমথনাথ বিশীর ষষ্ঠ গল্পগ্রন্থ 'ব্রহ্মার হাসি' নানা কারণে

বিশিষ্টতার দাবি রাখে। বিভিন্ন রসের সমন্বয়ে ১৪ টি গল্প লেখকের অনবদ্য সৃষ্টি। এখানে লেখক বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এই গল্পগুলিতে তিনি মানবপ্রেমের প্রীতি মধুর আলেখ্য অঙ্কন করেছেন। আবার মানব চরিত্রের ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলোকে তিনি আক্রমণ করেছেন। এই পর্বের ছোটগল্পগুলিতে রাজনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কখনো ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে, কখনো মূল্যবোধহীন শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে, প্রশাসনিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদী চেতনা সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন সমন্বয়বাদে বিশ্বাসী এবং বীর পূজারীরূপে দেশবরেণ্য নেতাদের প্রতি ছোটগল্পের মাধ্যমে জানিয়েছেন ঐকান্তিক শ্রদ্ধা। ঐতিহ্যে বিশ্বাসী লেখক আধুনিক কবিদের কবিতার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের প্রতি ব্যঙ্গ করেছেন। যুগযন্ত্রণার প্রভাবে মানুষের শুভ প্রয়াস ও কর্তব্যবোধ কি করে ব্যর্থ চোখের জলে রূপান্তরিত হয় তার মনস্তাত্ত্বিক দিকটির প্রতি লেখক আলোকপাত করেছেন। এই পর্বের গল্পগুলি হল ঃ 'ব্রহ্মার হাসি', 'শকুন্তলা, গণ্ডার', 'শার্দুলের শিক্ষা', 'শৃগালের মনুষ্যত্ব বর্জন', 'পূজার রচনা', 'প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ', 'সুতপা', 'রাজকবি', 'অন্নকষ্ট, রত্নাকর', 'মাতৃভক্তি', 'স্টেশনে', 'হাতুড়ি' প্রভৃতি। লেখকের পরিণত মনের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য গল্পগুলিতে।

'অশরীরী' গল্পগ্রন্থ প্রমথনাথের এক অনবদ্য সৃষ্টি। গ্রন্থটির প্রকাশকাল মুদ্রিত হয়নি। এই গ্রন্থের পর্ব সংখ্যা মোট ৮টি। অতিপ্রাকৃত শ্রেণির গল্পগুলো শিল্পসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। তিনি যেন এই পর্বের গল্পগুলোতে রবীন্দ্রমানসিকতা থেকে অনেকটা সরে এসেছেন। অতিপ্রাকৃতিক পরিমণ্ডল গঠনে, রোমান্স এবং রহস্যময়তা সৃষ্টিতে লেখকের মুন্সিয়ানার পরিচয় সুস্পষ্ট। কাহিনী অনেকক্ষেত্রে ট্র্যাজেডি লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। তবে কাহিনী বয়নে ভৌতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠলেও স্থানে স্থানে বাস্তবতার স্পর্শে গল্পরস অনেকটা জমে উঠেছে। বস্তুত এই পর্বের ঃ 'অশরীরী', 'দ্বিতীয়পক্ষ', 'কালোপাখী', 'স্বপ্নলব্ধ কাহিনী', 'শুভদৃষ্টি', 'কপালকুণ্ডলার দেশে', 'নিশীথিনী', 'পুরন্দরের পুঁথি' প্রভৃতি গল্পগুলো অতিলৌকিক ছোটগল্পের সমপর্যায়ভুক্ত।

১৩৫৯ সালের অপর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের নাম 'ধনেপাতা'। মোট ৬টি গল্প নিয়ে এই গল্পগ্রন্থ গঠিত। তিনি যেন এই পর্বে হয়ে উঠেছেন ইতিহাস সচেতন শিল্পী। এখানে অতীত ইতিহাস ও প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি লেখক দৃষ্টিনিবদ্ধ করেছেন। অপূর্ব রচনা কৌশলে ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে সাহিত্য সত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। বিশেষত তাঁর দৃষ্টিতে সম্ভাব্য সত্য যেন বিধৃত হয়ে আছে। ইতিহাস সচেতন লেখকের গল্পগুলো নানা কারণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক রসের সমন্বয়ে কাহিনীগুলো উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। যে গল্পগুলো এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে সেগুলো হল : 'মহেঞ্জোদড়োর পতন', 'ধনেপাতা', 'মহালগ্ন', 'যক্ষের প্রত্যাবর্তন', 'অসমাপ্ত কাব্য', 'গুরুমারা চেলা' প্রভৃতি।

'চাপাটি ও পদ্ম' ১৩৬২ সালে প্রকাশিত হয়। এই গল্পগ্রন্থে ১২ টি ইতিহাসাশ্রিত গল্প স্থান পেয়েছে। গল্পগ্রন্থটি ইতিহাসাশ্রিত গল্পের পর্যায়ভুক্ত। এখানে ছোটগল্পকার প্রমথনাথ বিশী ভারত ইতিহাসের এক খণ্ডিত পর্বকে বেছে নিয়ে এই পর্বের ছোটগল্পগুলো সৃষ্টি

করেছেন। বিশেষত সিপাহী বিদ্রোহজনিত ঘটনাবলম্বনে মৌলিক প্রতিভার স্পর্শে গল্পগুলো হয়ে উঠেছে বিচিত্র স্বাদের। ইতিহাস নিষ্ঠার সাথে সাথে গল্পকার অলৌকিকরস, রোমান্স রহস্য, নায়ক-নায়িকার জটিল মনস্তাত্ত্বিক দিকের প্রতিও আলোকপাত করেছেন। তিনি আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন আলোচ্য গল্পগ্রন্থটিতে। ১২টি ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলি যথাক্রমে—'সেই শিশুটি', 'ছায়াবাহিনী', 'কোকিল', 'জেমিগ্রীনের আত্মকথা', 'ছিন্নদলিল', 'গুলাব সিং এর পিস্তল', 'মড', 'রুথ', 'নানাসাহেব', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'রক্তের জের', 'অভিশাপ' প্রভৃতি।

১৩৬৬ সালে প্রকাশিত লেখকের দশম গল্পগ্রন্থ 'নীলবর্ণ শৃগাল'। অন্যান্য গল্প গ্রন্থগুলোর মধ্যে এটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। মোট ২০ টি গল্পের সমন্বয়ে এই বহুমুখী রচনার কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে তিনি যেমন গোয়েন্দা কাহিনীর রহস্যরোমান্সের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন তেমনি অতিলৌকিক গল্পরসকে স্থাপিত করেছেন অসাধারণ কৌশলের সাথে। এছাড়া কিছু কিছু গল্প কৌতুক রসসিক্ত ও ব্যঙ্গধর্মী। তাঁর একাধিক ঐতিহাসিক গল্প 'নীলবর্ণ শৃগাল' গল্পগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এই গ্রন্থে যে গল্পগুলো মুদ্রিত হয়েছে তা হল—'অবচেতন', 'সেকেন্দর শার প্রত্যাবর্তন', 'সেই সন্ন্যাসীটির কি হইল', 'ভৌতিক চক্ষু', 'খেলনা ফাঁসি গাছ', 'বিনা টিকিটের যাত্রী', 'আয়নাতে', 'চিলা রায়ের গড়', 'পাশের বাড়ি', 'সাহিত্যে তেজিমন্দি', 'জামার মাপে মানুষ', 'থার্মোমিটার', 'গৃহিনী' 'গৃহমুচ্যতে', 'গোল্ড ইঞ্জেক্‌শন', 'রামায়ণের নূতন ভাষ্য', 'সংস্কৃতি', 'রাশিফল', 'অলঙ্কার', 'অদৃষ্ট সুখী' ইত্যাদি।

১৩৬৪ সালে প্রকাশিত 'অলৌকিক' গল্পগ্রন্থটিতে ১৭টি অতিপ্রাকৃত রসযুক্ত গল্প নিয়ে সার্থক গল্পগ্রন্থ লিখেছেন গল্পকার। আলোচ্য গল্পগ্রন্থে যে গল্পগুলো স্থান পেয়েছে তন্মধ্যে 'তান্ত্রিক' গল্পটি ছাড়া বাকি ১৬ টি গল্প অন্যান্য গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক মূলত অতিপ্রাকৃত গল্প যেমন—'ভৌতিক', 'অশরীরী', 'ব্রহ্মদৈত্যে', 'আত্মা', 'স্বপ্নময় জগৎ' প্রভৃতি নিয়ে বিশদভাবে পর্যালোচনা করেছেন এই পর্বের গল্পগুলিতে। তিনি অলৌকিক শ্রেণির গল্পগুলির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যেভাবে করেছেন, সেখানে ছোটগল্পকার প্রমথনাথের প্রতিভার পরিচয় সুস্পষ্ট। তিনি যে অনুপম রসসৃষ্টিতে কুশলী শিল্পী তার দৃষ্টান্ত রয়েছে অলৌকিক গল্পগ্রন্থের গল্পগুলিতে।

প্রমথনাথের ১৯ টি গল্পসংকলন গ্রন্থ এলার্জি প্রকাশিত হয়েছে ১৩৬৫ সালে। এলার্জির অধিকাংশ গল্পেই হাসির অনাবিল ফল্গুধারা প্রভাবিত হয়েছে। তিনি যে কতটা কৌতুকপ্রিয় তার সাক্ষ্য রেখে গেছেন 'এলার্জি' গল্পগ্রন্থের বিভিন্ন গল্পে। যে গল্পগুলি এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তা হল—'এলার্জি', 'এলসেশিয়ান ডগ্‌', 'ছোটগল্প উপন্যাস রহস্য', 'টিকি, পঞ্চশীলা', 'ওরা', 'ওলটপালট পুরাণ', 'কৃষ্ণ নারায়ণ সংবাদ', 'পকেটমারের প্রতিকার', 'হাতি', 'একশ চুয়াল্লিশ ধারা', 'কলপ', 'ফ্যামিলি প্ল্যানিং', 'শ্রীভগবানকে চাই', 'মরুভূমির প্রতিহিংসা', 'নূতন তীর্থ', 'সিংহ চর্মাবৃত গর্দভ', 'পলাশীর শতবার্ষিকী', 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি।

এই গল্পগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পটি 'চাপাটি ও পদ্ম' গল্পগ্রন্থে ইতিপূর্বে

প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয়। ১২ টি গল্প নিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থটি লেখক দুটি সংস্করণে নিবেদন করেছেন। প্রথম সংস্করণের সঙ্গে আরো তিনটি ছোটগল্প সংযোজন করে অনেক আগে অনেক দূরে দ্বিতীয় সংস্করণ গ্রন্থে প্রকাশ করেন। প্রথম সংস্করণে যে ১২ টি গল্প প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো হল—'রাজা কি রাখাল', 'পরী', 'কোতলে আম', 'দর্শনী', 'আগম্-ই-গন্নাবেগম', 'তিনহাসি', 'বেগম শমরুর তোশাখানা', 'মহেঞ্জোদড়োর পতন', 'মহালগ্ন', 'অসমাপ্তকাব্য', 'যক্ষের প্রত্যাবর্তন', 'ধনেপাতা' প্রভৃতি। এর সঙ্গে দ্বিতীয় সংস্করণ গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে—'নাদির শা'র পরাজয়', 'মৌলবাক্স', 'বাহাদুর-শা-র বুলবুলি'। ইতিপূর্বে ধনেপাতা গল্পগ্রন্থে—মহেঞ্জোদড়োর পতন, মহালগ্ন, অসমাপ্ত কাব্য, যক্ষের প্রত্যাবর্তন, ধনেপাতা প্রকাশিত হয়।

মূলত এই গ্রন্থের বেশিরভাগ গল্পই মোঘল সম্রাটদের ও বাদশাহি আমলের অবক্ষয়কে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। প্রেম, হিংসা, প্রতিহিংসা, লোভলালসার প্রতিলিপি গল্পগুলির মূল উপজীব্য।

১৩৬২ সালে প্রমথনাথ বিশীর স্বনির্বাচিত গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গল্পগ্রন্থে ১৯ টি গল্প স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে ১৩ টি গল্পই পূর্ব প্রকাশিত গল্পগ্রন্থে নির্বাচিত হয়েছে সেগুলি যথাক্রমে—'তিমিঙ্গিল', 'রাঘব বোয়াল', 'চোখে আঙুল দাদা', 'ব্লাক্‌মেল', 'জেনুইন লুনাটিক', 'ভগবান কি বাঙালী' প্রভৃতি। প্রমথনাথের ছোটগল্পের বিবর্তন এই পর্বের ছোটগল্পগুলো থেকে শুরু হয়েছে। ইতিপূর্বে গল্পগুলোতে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তার তুলনায় এই পর্যায়ের গল্পগুলো অনেকটা ভিন্নমুখী। এই পর্বের গল্পগুলিতে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মানসিকতা অনবদ্য হয়ে উঠেছে। এখানে আঙ্গিক প্রকরণ অনেকটা রচনাধর্মী, গল্পরসে কোনো স্থায়িত্বের বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারেননি। বরং সেগুলো অনেকটা ক্ষণস্থায়ী আবেদন সৃষ্টি করেছে। তিনি যেন এই পর্বের ছোটগল্পগুলোকে কল্পনার রঙে রাঙিয়েছেন এবং সমাজ বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন তাই বলে বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসকে উপেক্ষা করেননি।

আনুমানিক ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে 'প্র-না-বি-র নিকৃষ্ট গল্পগ্রন্থ' প্রকাশিত হয়। এই গল্পগ্রন্থের প্রকাশকাল অমুদ্রিত। তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই নিকৃষ্ট গল্পগুলি উৎসর্গ করেছেন। সহৃদয় পাঠকের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন এগুলো নিকৃষ্ট গল্পের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তবে এগুলো নিকৃষ্ট গল্পের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ নয়। এর চেয়েও নিকৃষ্টতর গল্প তিনি লিখতে পারেন। তারপরে নিকৃষ্টতর গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্র-না-বি-র নিকৃষ্টতর গ্রন্থে ১৮ টি নিকৃষ্টগল্প প্রকাশিত হয়। সেগুলি হল—'চেতাবনী', 'ভিক্ষুক কুকুর সংবাদ', 'মোটর গাড়ি', 'ঘোগ', 'অথকৃষ্ণার্জুন সংবাদ', 'ভগবান কি বাঙালী', 'চোখে আঙুল দাদা', 'লবঙ্গীয় উন্মাদাগার', 'সাবানের টুকরো', 'দুঃশাসনের শাস্ত্রী', 'মানুষের গল্প', 'শিখ', 'গাধার আত্মকথা', 'রত্নাকর', 'অধ্যাপক রমাপতি বাঘ', 'শিবুর শিক্ষানবিশী', 'অদৃষ্ট সুখী', ও 'গুহামুখ' প্রভৃতি।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণে 'দুঃশাসনের শাস্ত্রী' ও 'মানুষের গল্প', ছাড়া প্রথম সংস্করণের

গল্পগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয় আরো ১৩ টি গল্প। সেগুলি হল—'ডাকিনী', 'পেস্কারবাবু', 'গদাধর পণ্ডিত', 'একগজ মার্কিন' ও 'এক চামচ চিনি', 'সিন্দুক', 'অতিসাধারণ ঘটনা', 'বিপত্নীক', 'চারজন মানুষ ও একখানা তক্তপোষ', 'একটি ঠোঁটের ইতিহাস', 'শকুন্তলা', 'মাতৃভক্তি', 'অন্নকষ্ট' প্রভৃতি।

এই গ্রন্থে তিনি অনেকটা বাস্তবমুখী। তৎকালীন সমাজ জীবনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আলোচনামূলক গল্প ও সামাজিক নীতি এবং অর্থনৈতিক সংকটের প্রতিলিপি সার্থক ও সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন বিভিন্ন গল্পে। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সমাজ জীবনে কতটা অনিবার্য সমস্যার সৃষ্টি করে তার বাস্তব চিত্র প্রমথনাথের লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে।

১৩৬১ সালে প্রকাশিত প্র-না-বি র নিকৃষ্টতর গল্প গ্রন্থে ২০ টি গল্প রয়েছে। এর প্রকাশকাল উল্লেখ করা হয়নি। গল্পগুলো অনেকটাই কাল্পনিক, উদ্ভট, আজগুবি শ্রেণিভূক্ত। স্থানে স্থানে একাধারে যেরূপ কৌতুকরসের সংযোজন ঘটেছে তেমনি রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রতি কবির ব্যঙ্গলেখনী হয়েছে সোচ্চার। তিনি এই স্তরের গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটিগুলিকে দেখিয়েছেন, অন্যদিকে স্বজনপোষণযুক্ত রাজনৈতিক নেতাদের ভূয়া রাজনীতির দিকটিকে ছোটগল্পে উপস্থাপিত করেছেন। সাম্প্রদায়িক বিভেদ কতটা বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে তাও এই পর্বে তিনি দেখিয়েছেন। কোনো কোনো গল্পে বাঙালি চরিত্রের প্রতি তিনি কটাক্ষ করেছেন। এই গ্রন্থের ২০ টি গল্প যথাক্রমে—'পঞ্চম বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস', 'চাচাতুয়া', 'জেনুইন লুনাটিক', 'বস্ত্রের বিদ্রোহ', 'খড়ম', 'শার্দূল', 'ছবি', 'ব্লাক্‌মেল', 'বাল্মীকির পুর্নজন্ম', 'পুতুল', 'যমরাজের ছুটি', 'ছেঁড়াকাঁথা ও লাখটাকা', 'দক্ষিণরায়ের দাক্ষিণ্য', 'ভারতীয় নৃত্য ও ভারতীয় ব্যাঘ্র', 'শাপমুক্তি', 'রাঘব বোয়াল', 'ইয়াসিন শর্মা এণ্ড কোং', 'সিদ্ধান্ত', 'পুকুরচুরি', 'নরপশু সংবাদ' প্রভৃতি।

প্র. না. বি-র অমনোনীত গল্প গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৩৬৪ সাল। এই গ্রন্থে তিনি মোট ১৬টি বিভিন্ন স্বাদের গল্প লিখেছেন। কিছু কিছু গল্প কৌতুকরসের, কোনোটি অতিলৌকিক শ্রেণিভূক্ত। বেশির ভাগ গল্পগুলোতে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় সুস্পষ্ট। এই গ্রন্থে তিনি এক বিশেষ পত্রাশ্রয়ী রীতির অনুসরণে গল্পরচনা করেছেন যা বাংলা ছোটগল্পে অভিনবত্বের দৃষ্টান্ত। প্রকাশরীতির নূতন কলা কৌশলে লেখকের শিল্পদৃষ্টির পরিচয় পরিস্ফুট। অন্যদিকে সাম্প্রতিক বিষয় অবলম্বনে লেখকের ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। কোনো কোনো গল্পে প্রাচীন মিথ কাহিনীর আধুনিক রূপায়ন ঘটেছে। দু'একটি গল্প নীতিমূলক। এই গ্রন্থের ১৬ টি গল্পের মধ্যে যে ১৩ টি পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি হল—তান্ত্রিক, গন্ডার ও ব্রহ্মার হাসি, বাকি ১৩ টি গল্প হল—'জগবন্ধুর মোহমুক্তি', 'নহুষের অতৃপ্তি', 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র', 'পক্ষীরাজ গাধা', 'বাজীকরণ', 'কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূল কারণ', 'শাশুড়ী', 'ভগবান কি বিজ্ঞাপন দাতা', 'রজ্জুতে সর্প', 'স্বপ্নাদ্য কাহিনী', 'সতীন', 'সিন্ধুক' প্রভৃতি।

প্রমথনাথ বিশীর নীরস গল্প সঞ্চয়ন গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে। এই গ্রন্থে ২৩টি গল্প আছে। তন্মধ্যে তিনটি গল্প পূর্বে প্রকাশিত হয়নি। সেগুলি হল— 'গোষ্পদ',

'বাঁশ ও কঞ্চি' ও 'কুকুর বিড়ালের কান্ড'। এই তিনটি ছাড়া যে পূর্ব প্রকাশিত গল্পগুলো প্রকাশিত হয়েছে তা হল—'ন. ন. লৌ. ব লিঃ', 'যন্ত্রের বিদ্রোহ', 'ঋণজাতক, চিত্রগুপ্তের রিপোর্ট', 'সিন্ধবাদের অষ্টম সমুদ্রযাত্রার কাহিনী', 'নরশার্দূল সংবাদ', 'নির্বাণ, বাঘদন্তা', 'নগেন হাঁড়ীর ঢোল', 'অশরীরী', 'স্বপ্নলব্ধ কাহিনী', 'কপালকুন্ডলার দেশে', 'গঙ্গার ইলিশ', 'কীটাণুতত্ত্ব', 'দ্বিতীয়পক্ষ', 'উল্টাগাড়ী', 'মাধবীমাসী', 'বস্ত্রের বিদ্রোহ', 'ডাকিনী', 'কল্কি' প্রভৃতি।

বলাবাহুল্য প্রমথনাথ বিশীর এই গল্পগুলো পূর্ববর্তী বিভিন্ন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। লেখকের পশুপ্রীতি, জমিদারি প্রথা বিলোপ, অলৌকিক রস সৃষ্টি প্রভৃতির পরিচয় তাঁর এই গ্রন্থের গল্পগুলোতে পাওয়া যায়। এই পর্বের গল্পগুলি প্রমথনাথের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় বহন করে।

১৩৬৭ সালে প্রকাশিত 'গল্প পঞ্চাশৎ' গল্পগ্রন্থটিতে ৫০টি গল্প সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৮ টি গল্প নূতনভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি হল—'নহুষের অতৃপ্তি', 'কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূল কারণ', 'শাশুড়ী', 'স্বপ্নাদ্য কাহিনী', 'সতীন', 'রজ্জুতে সর্প', 'বাজীকরণ', 'তুক' প্রভৃতি।

১৫টি গল্প নিয়ে 'সমুচিত শিক্ষা' গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বলাবাহুল্য প্রত্যেকটি গল্পই পূর্ববর্তী গ্রন্থে প্রকাশিত। প্রমথনাথ বিশীর সর্বশেষ গল্পগ্রন্থের প্রকাশকাল ১৩৬৯ সাল। গ্রন্থটির নাম 'যা হলে হতে পারতো'। এই গ্রন্থে ১৬ টি গল্প সংকলিত হয়েছে। গল্পগুলি হল—'উঠতি গুন্ডা', 'পশু শিক্ষালয়', 'প্রত্যাবর্তন', 'দর্জ্জি' ও 'প্রেম', 'ছাপ সন্দেশ', 'রাধারাণী', 'এক টিন খাঁটি ঘি', 'যার যেথা স্থান', 'প্রাণান্তকর গল্প', 'দৃষ্টিভেদ', 'কমলার ফুলশয্যা', 'কুন্দনন্দিনীর বিষপান', 'রক্তবর্ণ শৃগাল', 'খুল্লবিহার', 'নিচ্চধনের পরীক্ষা' প্রভৃতি।

এই গল্পগুলোতে তিনি একদিকে যেমন কমিউনিস্টদের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষিপ্ত করেছেন, অপরদিকে আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন সহজ সবল মানুষের জীবনকথা উপস্থাপিত করেছেন। কোনো কোনো গল্পে লেখক বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সম্পাদকদের বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছেন। গল্পগুলোতে লেখক বাস্তবের সঙ্গে কল্পনাশক্তির যোগসূত্র স্থাপন করে মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পগুলির বিষয়বস্তুকে আঙ্গিক প্রকরণ বৈচিত্র্য অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়। অলৌকিক ও ইতিহাস রসের প্রতি লেখকের কৃতিত্ব অসাধারণ। অন্যদিকে ব্যঙ্গাত্মক গল্প, রোমান্টিক প্রেমের গল্প. কৌতুকরসাশ্রিত গল্প এবং গভীর চেতনাযুক্ত গল্প সেই সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণীদের নিয়ে ছোটগল্প রচনায় লেখকের সাফল্য অবিসংবাদিত। তাঁর ছোটগল্পগুলোতে একদিকে যেমন গল্পরস জমে ওঠে পাঠক মনে এনে দেয় উপভোগ্যতা, অপরদিকে তাঁর কল্পনাপ্রবণ মন, বাস্তব সহানুভূতিশীল দৃষ্টি ও গল্পবয়নের অসাধারণ কৌশল, সর্বোপরি বিষয়ভিত্তিক ভাষার সংযোজন এবং কাহিনীর গতি, চরিত্রনির্মাণ, সংলাপ নৈপুণ্য ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রথম শ্রেণির ছোটগল্প হিসেবে

প্রমথনাথ বিশীর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। সম্ভবত প্রমথনাথের লেখনীতে যে সরস বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত ছোটগল্পের জন্ম হয়েছে বাংলা ভাষার এরূপ ছোটগল্পের দৃষ্টান্ত খুবই কম। তবে ইতিহাসাশ্রিত গল্পে প্রমথনাথের সাফল্য অন্যান্য গল্পের চেয়েও কোন অংশেও কম নয়। ইতিহাস রস উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি মানব জীবনরসকে একটি বারের জন্যও ছোট করে দেখেননি। তাঁর ব্যঙ্গধর্মী গল্পের নৈপুণ্য সর্বজনবিদিত সন্দেহ নেই। একদিকে যেমন তাঁর ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী যা চর্মভেদ করে মর্মে প্রবেশ করে অন্তর্দাহ সৃষ্টি করে কিন্তু রক্তপাত ঘটায় না। অন্যদিকে তাঁর নির্মল কৌতুকরসের গল্প পাঠকচিত্তে অনাবিল হাস্যরস সৃষ্টি করে এনে দেয় আনন্দধারা ও প্রসন্নতা। তাঁর বিচিত্রমুখী ছোটগল্পগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—

রঙ্গব্যঙ্গমূলক, বিশুদ্ধ কৌতুকরসাত্মক, গভীর জীবনবোধ যুক্ত, ঐতিহাসিক, অলৌকিক, রূপকধর্মী, প্রেমের গল্প, রাজনীতি বিষয়ক, সাহিত্য বিষয়ক, শিক্ষা বিষয়ক, ধর্ম ও দেবদেবী বিষয়ক। বিষয় অনুসারে গল্পগুলি নিম্নে প্রদত্ত হল :

১। **রঙ্গব্যঙ্গমূলক :** লেখকের রঙ্গ-ব্যঙ্গ মূলক ছোটগল্পগুলি হল—'গাধার আত্মকথা', 'উতঙ্ক', 'গণক', 'সরল থিসিস রচনা প্রণালী', 'চাকরিস্তান', 'টিউশন', 'অর্থপুস্তক', 'প্রফেসর রামমূর্তি', 'গদাধর পণ্ডিত' প্রভৃতি।

২। **বিশুদ্ধ কৌতুকরসাত্মক :** ব্যঙ্গধর্মী গল্প রচনায় তিনি নিপুণ হলেও নির্মল কৌতুকরসের গল্পসৃষ্টিতেও তিনি যে অসাধারণ তাতে সন্দেহ নেই। প্রমথনাথের বিশুদ্ধ কৌতুকরসের গল্পগুলো হল— 'থার্মোমিটার', 'অদৃষ্টসুখী', রাশিফল, কৃষ্ণ নারায়ণ সংবাদ, পকেটমারের প্রতিকার, এলার্জ্জি, এলসেশিয়ান ডগ্, একশ চুয়াল্লিশ ধারা, ফ্যামিলি প্ল্যানিং, গুরুমারা চেলা, চেতাবনী, একগজ মার্কিন ও একচামচ চিনি, সাবানের টুকরো, শিখ, পুতুল, রাঘব বোয়াল, চাচাতুয়া, শার্দূল, ছবি, তিমিঙ্গিল, পুকুর চুরি, ছাপ সন্দেশ, দর্জি ও প্রেম, নহুষের অতৃপ্তি, রজ্জুতে সর্প, বাইশ বৎসর, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূল কারণ, ভগবান ও বিজ্ঞাপনদাতা, অটোগ্রাফ, বাঘদত্তা, ভেজিটেবল বোম. উতঙ্ক, গণক, মারণযজ্ঞ, গঙ্গার ইলিশ, পূজা সংখ্যা প্রভৃতি।

৩। **গভীর জীবনবোধ যুক্ত ছোটগল্প :** প্রমথনাথ তাঁর ছোটগল্পগুলিতে মানব জীবনবোধের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। মানুষের প্রতি মমত্ব, সহানুভূতি তাঁর রচনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই পর্বের গল্পগুলি—গদাধর পণ্ডিত, ডাকিনী, সুতপা, পেস্কারবাবু, মাধবী মাসী, অতি সাধারণ ঘটনা, প্রত্যাবর্তন, বিপত্নীক, হাতি, নূতন তীর্থ প্রভৃতি।

৪। **ঐতিহাসিক ছোটগল্প :** ইতিহাসাশ্রিত গল্পে প্রমথনাথের সাফল্য অসাধারণ। তাঁর এই পর্বের গল্পগুলি হল—মহেঞ্জোদড়োর পতন, ধনেপাতা, অসমাপ্ত কাব্য, যক্ষের প্রত্যাবর্তন, রাজা কি রাখাল, পরী, দর্শনী, ছিন্নমুকুল, বেগম শমরুর তোষাখানা, মহালগ্ন, নানাসাহেব, জেমিগ্রীনের আত্মকথা, গুলাব সিং-এর পিস্তল, রক্তের জের, প্রায়শ্চিত্ত, রুথ, মড, ছায়াবাহিনী, অভিশাপ, তিনহাসি, কোকিল, আগম-ই-গন্নাবেগম, পলাশীর শতবার্ষিকী প্রভৃতি।

৫। অলৌকিক ছোটগল্প : চিলারায়ের গড়, পাশের বাড়ি, আয়নাতে, বিনা টিকিটের যাত্রী, খেলনা, কালো পাখি, ভৌতিক চক্ষু, অবচেতন, দ্বিতীয় পক্ষ, তান্ত্রিক, ভূতের গল্প, পুরন্দরের পুঁথি, নিশীথিনী, কপালকুন্ডলার দেশে, স্বপ্নলব্ধ কাহিনী, অশরীরী, গোষ্পদ, স্বপ্নাদ্য কাহিনী প্রভৃতি।

৬। **রূপকধর্মী গল্প :** পক্ষিরাজ গাধা, বাজীকরণ প্রভৃতি।

৭। **নীতিমূলক গল্প :** রামায়ণের নূতন ভাষ্য, জামার মাপে মানুষ, টিকি, ওরা, ওলট পালট পুরাণ, সিংহ চর্মাবৃত গর্দভ, ঋণজাতক', সদা সত্য কথা কহিবে, শার্দুলের শিক্ষা,শৃগালের মনুষ্যত্ব অর্জন, ভিক্ষুক কুকুর সংবাদ, চোখে আঙ্গুল দাদা, দক্ষিণরায়ের দাক্ষিণ্য, ভারতীয় শৃগাল, রক্তাতঙ্ক, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রভৃতি রূপক শ্রেণিভুক্ত ও নীতিমূলক গল্প।

৮। **প্রেমের গল্প :** শকুন্তলা, সুতপা, অতি সাধারণ ঘটনা, প্রত্যাবর্তন, উল্টাগাড়ি, মাধবী মাসী, ছবি, চেতাবনী প্রভৃতি।

৯। **রাজনীতি বিষয়ক :** হাতুড়ি, শ্রী ভগবানকে চাই, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যানিং, সিন্ধবাদের অষ্টম সমুদ্রযাত্রার কাহিনী, চিত্রগুপ্তের অ্যাড্‌ভেঞ্চার, রক্তাতঙ্ক, রক্তবর্ণ শৃগাল প্রভৃতি ছোট গল্প।

১০। **সাহিত্য বিষয়ক :** শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব, শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব, সেই শিশুটি, কমলার ফুলশয্যা, কুন্দনন্দিনীর বিষ পান, রাধারাণী, ভাঁড়ু দত্ত, প্র-না-বি-র সঙ্গে কথোপকথন, ভূতের গল্প, রোহিনীর কি হইল, জি-বি-এস ও প্র-না-বি, কপালকুন্ডলার দেশে, শকুন্তলা, বাল্মীকির পুনর্জন্ম, শাপে বর প্রভৃতি।

১১। **শিক্ষা বিষয়ক :** গাধার আত্মকথা, শিবুর শিক্ষানবিশী, টিউশন, সরল থিসিস রচনা প্রণালী, গণক, চাকরিস্তান, আধ্যাত্মিক ধোপা, উতঙ্ক, অর্থ পুস্তক, প্রফেসর রামমূর্তি, ধনে পাতা, গদাধর পণ্ডিত প্রভৃতি।

১২। **ধর্ম ও দেবদেবী বিষয়ক :** ন-ন-লৌ-ব-লিঃ, চিত্রগুপ্তের রিপোর্ট, কল্কি, ব্রহ্মার হাসি, রামায়ণের নূতন ভাষ্য, ওলট পালট পুরাণ, চোখে আঙ্গুল দাদা, যমরাজের ছুটি, জগবন্ধুর মোহমুক্তি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূল কারণ, অটোগ্রাফ, চিত্রগুপ্তের অ্যাড্‌ভেঞ্চার, কীটাণুতত্ত্ব, নিচ্চধনের পরীক্ষা ও খুল্ল বিহার প্রভৃতি।

সাহিত্যের প্রতিটি শাখা অর্থাৎ কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প নাটক, প্রবন্ধ যে কোনো শ্রেষ্ঠ শাখার যথাযথ মূল্যায়ন করতে গিয়ে সাহিত্য সমালোচনার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে এই দুটি আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমারসেট মম্ শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সম্পর্কে একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। ঠিক উপন্যাসের মতো ছোট গল্পে থাকবে একটি রমণীয় বিষয়বস্তু যার মধ্যে উচ্চারিত হবে এক চিরন্তন মানবিক আবেদন। যে আবেদন একটা নির্দিষ্ট কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তা হবে কালজয়ী বা যুগোত্তীর্ণ। আমরা জানি

জীবনের একটি খণ্ডাংশ অবলম্বনে রচিত হয় ছোটগল্প। সেই খণ্ডাংশ ছোটগল্পের বিষয়বস্তু।

ডঃ সরোজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়বস্তু সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। "তাঁর মতে বিষয়বস্তু হলো বিষয় বা বিষয়াশ্রয়ী বক্তব্যের রূপক। বিষয়বস্তু বলতে কাহিনীর সারাংশকে তিনি বলতে চাননি।"[৩]

মার্কসীয় সৌন্দর্য্য তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে—

"বিষয়বস্তু কোনো দৈবপীড়িত ব্যাপার যেমন নয়, তেমনি বস্তু নিরপেক্ষ কোনো ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালখুশির একান্ত মনোগত মনন ও অনুভূতি মাত্র নয়। বিষয়বস্তু হল সামগ্রিক জীবনের প্রতিফলন। অর্থাৎ কোনো শিল্পবস্তু বা রচনাকর্মের সঙ্গে লেখকের মনোজগৎ ও বস্তুজগৎ কিভাবে কতখানি সম্পৃক্ত হয়ে আছে অর্থাৎ বস্তুজগতের অপরিহার্য দিকগুলি তার সামাজিক সম্পর্কগুলি এবং ঐতিহাসিক গতিপ্রবাহ কিভাবে কতখানি দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়ে লেখকের রচনা বা শিল্পকর্মে বিবৃত হয়েছে তার বিচার। শিল্পের বিষয়বস্তু এইভাবে শিল্পকর্মে ধরা পড়ে।"[৪]

মার্কসবাদী সমালোচক বলেন "সাহিত্য কাব্যের শিল্প বিষয়বস্তুর দিক থেকে সম্পূর্ণ নতুন হওয়া উচিত। যদি বিষয় নতুন না হয় তাহলে সেই সৃষ্টির মূল্য নিতান্তই নগণ্য। পূর্বে যা প্রকাশিত হয়নি, শিল্পীর উচিত তাকেই প্রকাশ করা। একই জিনিস সব সুন্দর তা সত্ত্বেও তা শিল্প নয়। এই দিক থেকে নতুন বিষয়বস্তু নতুন রূপের মাধ্যমে তুলে ধরতে হয়। মার্কসবাদী সমালোচক নতুন রূপের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বিষয়বস্তুর প্রতি সম গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁদের মতে— সেই লেখকই মহৎ যিনি জটিল ও মূল্যবান সমাজ সময়কে মৌলিক সারল্যে অগণিত মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করে দিতে পারেন। কিন্তু তাঁর পরেই বলেছেন সেই শিল্পী মহৎ যিনি সমগ্র মানুষের হৃদয়ের সমন্বয় করতে পারেন অপেক্ষাকৃত সহজ বিষয়বস্তুর দ্বারা।"[৫]

ছোটগল্পের বিষয়বস্তুর বিশেষত্ব নির্ভর করে লেখকের সমকালীন ও শিল্পগত ঐতিহ্যের উপর। দেশ ও কালের কাছে একজন ছোটগল্পকার বিষয়বস্তুর জন্য ঋণী। দ্বন্দ্ব জটিল শিল্প রূপের সার সত্য হল সাহিত্যের বিষয়বস্তু। সেইদিক থেকে বিচার করলে সাহিত্য হল সমাজ জীবনের দর্পণ ও তার শিল্পসম্মত রূপ। বলাবাহুল্য আমরা যে কোনো সাহিত্যে যা পাই তা শুধুমাত্র বিষয়বস্তু নয় লেখকের সমাজ চেতনা, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জীবন দর্শনের সঙ্গে বিষয়বস্তুর সম্পর্ক যুক্ত। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বস্তুর বিবর্তন ঘটে। সমাজ বিবর্তনের ঐতিহাসিক দলিল সাহিত্যে স্থান পায় তার শিল্পসম্মত রূপ নিয়ে। এক সময় পাঠকের কাছে বড় গল্প বৈচিত্র্য ঘটাতো না। কিন্তু বর্তমান কর্মব্যস্ততার যুগে কিংবা বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে সমাজ জীবনে যে সংকটাবর্ত সৃষ্টি হয়েছে সে সমাজে ছোট ছোট বিষয় অবলম্বনে ছোটগল্প রচিত হল। ছোটগল্পের বিষয়কে আমরা বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে বেছে নিতে পারি।

ছোটগল্পেব বিষয়বস্তুতে কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে জীবন সম্পর্কিত বক্তব্য স্থান পাবে। সমাজ ও সভ্যতার জটিলতা সেই সঙ্গে দেশ কালের আলোচনা বিষয়বস্তুতে প্রাধান্য পাবে। গল্পের বিষয়ে সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে দাম্পত্য জীবন, প্রেমের ঘাত প্রতিঘাত,

যন্ত্রণা স্থান পেতে পারে, অতীত ঐতিহ্য পুরাণ কিংবা ধূসর অতীত ইতিহাস ছোট গল্পের বিষয় হতে পারে। সমাজ সমস্যা, বৈষম্য, শোষণ, অত্যাচার, কুসংস্কার বঞ্চনা প্রভৃতি প্রতিবাদী চেতনা ছোটগল্পের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য এনে দেয়। ছোটগল্পে বিষয়বস্তুর উপযোগী ভাষা থাকবে। লেখকের চিত্রানুগ দৃশ্যানুগ ও নাট্যানুগ বর্ণনার দ্বারা সাধারণ বিষয়বস্তু বক্তব্যের গুণে অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে। জগৎ, ঈশ্বর, মৃত্যু, জীবন, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, ব্ল্যাক্আউট, রাজনৈতিক আবহ ছোটগল্পের বিষয় হতে পারে।

বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আঙ্গিক বিষয়বস্তুর মতো পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ সমাজচেতনার পরিবর্তন সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিক। স্রষ্টা তাঁর বিষয় ও বক্তব্যকে অভিনয়ের মাধ্যমে বিকশিত করে তোলেন অর্থাৎ গল্পকারের মনে যেভাবের উদয় থেকে ছোটগল্পের সৃষ্টি হল সেই ছোটগল্পের বিষয়কে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্য আঙ্গিকের প্রয়োজন। এই জন্যই ভারতীয় আলংকারিকরা বলে থাকেন ভাবের সঙ্গে ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গির হরগৌরী মিলনের ফলে রচনা শিল্প সার্থক হয়ে ওঠে।

এ প্রসঙ্গে প্রবোধকুমার সান্যালের 'কবরের তলা থেকে গল্পসংগ্রহ' গ্রন্থটির উল্লেখ করা চলে। নিজের গল্প লেখা সম্পর্কে প্রবোধকুমার লিখেছেন "কোথাও অনাচার ঘটল, কেহ বিনা দোষে মারা গেল, কেউ অহেতুক অপমানে নুয়ে পড়ল অমনি আমার গল্পলেখা শুরু। নিছক আর্টের আনন্দ বিতরণ করব। ফুল, চাঁদ, লতা, মৌমাছি আর বিরহ মিলন, নিয়ে কাহিনী ফাঁদবো এ আমি কোনো কালেই পারিনি। আমি ভাবতুম রক্তের ধারা যে লেখায় নেই তাকে কিছুতেই সাহিত্য সৃষ্টি বলা চলবে না, আমি সমাজের পথঘাটে গল্প খুঁজে বেড়িয়েছি।"[৬]

বহুনিন্দা ও প্রশংসাসূচক 'রোহিণীর কি হইল' ছোটগল্পটিতে বঙ্কিম অনুরাগী প্রমথনাথ বঙ্কিম ও শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছেন, প্রমথনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে সমালোচনার প্রতিবাদস্বরূপ শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন উপন্যাসের সাবিত্রীর চরিত্র সম্পর্কেও সমালোচনায় মুখর হন। গল্পটিতে প্রমথনাথ রোহিনী ও সাবিত্রী এই চরিত্রদ্বয়ের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখিয়েছেন। প্রমথনাথ ব্যঙ্গধর্মী শিল্পী। তাঁর ব্যাঙ্গের প্রথম স্বাক্ষর উপস্থাপিত হয়েছে শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব ও শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্বের ছোটগল্পগুলোতে। 'রোহিনীর কি হইল' গল্পে পতিতা নারীর চরিত্রাঙ্কন করতে গিয়ে প্রমথনাথ বঙ্কিমচন্দ্রে প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে বঙ্কিমচন্দ্রের পতিতা চরিত্র শিল্পগুণ সমৃদ্ধ ও মানবিক রসযুক্ত।

"শ্রীকান্ত ভাবিতেছিল, এই কি সেই রূপ, যাহা বারুণী পুষ্করিণীর স্বচ্ছ জলের তরল আয়নায় নিমজ্জমান দেখিয়া গোবিন্দলালের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল? এই কি সেই রূপ, যাহার তুলনায় হতভাগিনী ভ্রমর উপেক্ষিত হইয়াছিল? এই কি সেই রূপ, যাহা দেখিয়া অভয়া কমললতা রাজলক্ষ্মী অবজ্ঞাকারী শ্রীকান্তের বৈরাগ্য কন্‌ক্রিট মনও ছ্যাঁত করিয়া উঠিয়াছিল?"[৭]

নারী মনস্তত্ত্বের সুগভীর ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে। অন্যদিকে শরৎচন্দ্রের পতিতা নারীর প্রতি তিনি কটাক্ষ করেছেন। শরৎচন্দ্রের নারীর প্রতি অপরিসীম দরদ প্রমথনাথের মনকে নাড়া দিতে পারেনি।

'অতি সাধারণ ঘটনা' ছোটগল্পটি করুণ রস প্রধান। মধুর দাম্পত্য প্রেম ধীরে ধীরে কিভাবে বিয়োগান্তক পরিণতি সৃষ্টি করে তার অনবদ্য কাহিনী এই গল্পটি। এই গল্পের অশ্রুসজল কাহিনী পাঠক মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে। প্রমথনাথ প্রেমের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপিত করেছেন আলোচ্য ছোটগল্পে। বাঙালি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সংসার জীবন যে কত কঠোর ও সংগ্রাম মুখর এবং তাদের জীবন যে কতটা মর্মান্তিক তার অনবদ্য কাহিনী সমৃদ্ধ গল্প এটি।

"ওদের সংসার কেমন করে চলে এ প্রশ্ন অবান্তর, কারণ সংসার চলে না, চালাতে হয়। শমিতা কিছু সঞ্চয় করেছিল, তার সঙ্গে মায়ের টাকা যুক্ত হয়ে একরকম করে তাদের দিন চলে যায়—যাতে ভিতরে ভিতরে টান পড়ে অথচ বাইরে টোল খায় না।"[৮]

স্বামী স্ত্রীর সুগভীর প্রণয় বন্ধন এবং পরিণতিতে আত্মত্যাগ গল্পটিকে ট্র্যাজেডির স্তরে উন্নীত করেছে। প্রমথনাথ আলোচ্য গল্পে মানব প্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। বেদনাঘন মৃত্যু পথযাত্রী চরিত্রদ্বয়কে সহানুভূতির সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন।

'চারজন মানুষ ও একখানা তক্তপোষ' ছোটগল্পে প্রমথনাথ চার ধরনের জীবিকা যুক্ত সমাজের চার প্রতিনিধিকে উপস্থাপিত করে হাসির আড়ালে সুতীব্র শ্লেষ বিদ্ধ করেছেন। গল্পটিতে হাস্যরস থাকলেও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লজ্জা ও অস্বস্তিকর দিক। সামাজিক অসঙ্গতির প্রতি লেখকের সুতীব্র কটাক্ষ আলোচ্য ছোট গল্পটির বিষয়; গল্পটি বাস্তবরস সমৃদ্ধ। এর মধ্য দিয়ে তিনি দেখাতে চেয়েছেন সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে শিক্ষক, চিকিৎসক, সাহিত্যিক ও সিনেমা স্টারের মধ্যে সিনেমা স্টাররা অনেক উপরে। এই দিকটিতে তিনি হাসির আড়ালে বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধিদের ব্যঙ্গ করেছেন।

'ভাঁড়ু দত্ত' ছোটগল্পে—প্রমথনাথ বিশী 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের ভিলেন চরিত্র ভাঁড়ু দত্তকে মধ্যযুগীয় আবহ থেকে মুক্ত করে আধুনিক যুগের পটভূমিকায় স্থাপন করে নতুনত্বের সঞ্চার করেছেন। আধুনিক বণিক প্রধান সমাজ শ্রেণির উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠার একটি অন্যতম মাধ্যম ভাঁড়ু দত্তের উদ্ভট মকরধ্বজ হাসি। ব্যক্তিজীবনে ভাঁড়ু দত্তের দুর্দশা শুধুমাত্র সেকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে।

"ভাঁড়ু ঝুড়ি নামাইল। ভিতরে গোটা দুই লাউ, গোটা দুই কুমড়ো, কিছু বেগুন, উচ্ছে ইত্যাদি।

—ভাঁড়ে?

ভাঁড়ু বলিল—তেল।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—এতে কি নায়েব খুশি হবে?

সে বলিল বলেন কি? খাওয়ার জিনিস পেলে খুশি হয় না এমন মানুষ কি সম্ভব? মানুষকে সবচেয়ে খুশি করা যায় খাওয়ার জিনিস দিয়ে আর খাইয়ে, টাকা পয়সা যতই দিন, মানুষ সন্তুষ্ট হয় না।

আশার অন্ত নেই—কিন্তু পেটের একটা সীমা আছে।”[৯]

প্রমথনাথ লিখেছেন চণ্ডীমঙ্গলের দামুন্যা গ্রাম যেন সমস্ত বাংলাদেশের দামুন্যায় পরিণত হয়েছে। ভাঁড়ু দত্তের মতো খলচরিত্রের আধুনিক সমাজে অভাব নেই।

কল্পনার আলোকে লিখিত প্রমথনাথের 'ব্রহ্মার হাসি' গল্পটির বিষয়বস্তু হল রাজনীতির দ্বারা স্বার্থ-সিদ্ধির ঐকান্তিক প্রয়াস এবং সবাক চিত্রজগতের প্রতি অনাবিল আগ্রহ। লেখক তাঁর ক্ষুরধার লেখনীতে সমাজ জীবনের স্বার্থান্ধ মানুষদের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেছেন।

“ব্রহ্মা হঠাৎ হাসিয়া উঠিল, বিশ্বসৃষ্টির পর হইতে সে হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছিল—এই সে প্রথম হাসিল। সে হাসির আঘাতে মানস সরোবরে ঢেউ উঠিল, আকাশে তারা ফুটিল, তারায় জ্যোতি ফুটিল, পৃথিবী হরিৎ হইল, আকাশ নীল হইল, স্বর্গচ্যুত দেবতারা আবার স্বর্গে ফিরিয়া অধিষ্ঠিত হইল—মানুষ আবার মনুষ্যত্ব লাভ করিল, ব্রহ্মাণ্ড চটকা ভাঙিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিল। সেই হাসির আঘাতে নির্বাসিত সত্য, সৌন্দর্য, আনন্দ মানুষের অন্তরে পুনঃস্থাপিত হইল। সেই হাসির দিব্য জ্যোতিতে মানুষ দিব্য দৃষ্টি পাইল। ব্রহ্মার হাসিতে ব্রহ্মাণ্ড পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইল—মানুষের নবজন্ম লাভ ঘটিল। সেই হাসি বিশ্বে এখনও ধ্বনিত হইতেছে—কবি ও সাধকগণের দিব্য কর্ণ তাহা শুনিতে পায়।”[১০]

তাঁকে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব থেকে অবনমিত করবার ইঙ্গিতটি আলোচ্য গল্পের বিষয়।

'শকুন্তলা' গল্পে মহাকবি কালিদাসের ভাবপ্রবণতা থেকে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে আধুনিক যুগের মানসিকতার সঙ্গে। শকুন্তলা ছোটগল্পে রাজা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার সংলাপ অংশটি প্রদত্ত হল—

“রাজা। (শকুন্তলাকে দেখিয়া) এই অম্লানকান্তি সুন্দর রূপ যে পূর্বে পরিগ্রহ করিয়াছিলাম, চিত্তনিবেশপূর্বক চিন্তা করিয়াও তো তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছি না।

শকুন্তলা। যদি প্রকৃতপক্ষেই আপনি পরদারা জ্ঞানে আশঙ্কা করেন, তবে কোনরূপ অভিজ্ঞান দেখাইয়া আপনার সে আশঙ্কা দূর করিতেছি।

রাজা। সেই কথাই ভালো।

শকুন্তলা। (অঙ্গুরীয় স্থান দেখিয়া) হা ধিক্! হা ধিক্! আমার অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় নাই।”[১১] সুকৌশলে তিনি এই গল্পে দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার মিলন ও বিচ্ছেদের ঘটনাকে উপস্থাপিত করেছেন।

প্রমথনাথের 'সুতপা' গল্পটি এক সার্থক সংযোজন। গল্পটির বিষয় মানবিক অনুভূতিযুক্ত করুণরসের ফল্গুধারা। সুতপা চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি লেখক সুকৌশলে তুলে ধরেছেন।

“রমা সুতপার নাম ধরে ডাক্‌লো—কোন সাড়া নেই। এবারে ভালো করে আলো ফেলতেই

দেখতে পেলো সেই নারীমূর্তির ডান হাতে একখানা চিঠি, পাশে গড়াচ্ছে একটা ওষুধের শিশি। রমা মরিয়া হয়ে উঠেছে—এবারে ধাক্কা দিতে দরজার একখানা পাল্লা খুলে যেতেই একটি অসাড় নারী দেহ মাটিতে পড়ে গেল—রমা দেখল—সুতপার প্রাণহীন দেহ।"[১২]

কিভাবে গল্পের নায়িকা সুতপার প্রগাঢ় প্রেম ধীরে ধীরে বিয়োগান্তক পরিণতি এনে দিয়েছে সেই ব্যর্থ প্রেমের ঘটনা আলোচ্য ছোটগল্পটির বিষয়।

প্রেমের গল্প হিসেবে 'রত্নাকর' গল্পটি প্রমথনাথের অনবদ্য সৃষ্টি। আন্তরিকভাবে নিরঞ্জন ভালোবেসেছিল প্রতিমাকে। উভয়ের প্রেম বহন করে এনেছে মিলনান্তক পরিণতি। নায়ক নায়িকার প্রেমের উন্মেষ বিকাশ ও সার্থকতার এক অনবদ্য রূপ অঙ্কন আলোচ্য ছোটগল্পের বিষয়।

ছোটগল্পকার প্রমথনাথের 'মাতৃভক্তি' ছোটগল্পটি নানাকারণে বিশিষ্টতার দাবি রাখে। গল্পটি অতি বাস্তব এবং করুণরস সিক্ত। সন্তানের গভীর মাতৃভক্তি কিভাবে কারুণ্যের সৃষ্টি করে অসহায় দর্শকের মতো নীরবে নিভৃতে অশ্রুধারায় প্লাবিত হয়ে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয় তার বাস্তবোচিতরূপ হল আলোচ্য ছোটগল্পটি। যেখানে স্ত্রী পুত্রদের লালন পালন একটা গুরু দায়িত্ব এবং ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মায়ের প্রতি কর্তব্য থেকে সরে আসতে হয়েছে নায়ককে তারই মনস্তাত্ত্বিক দিকটির প্রতি লেখক আলোকপাত করেছেন আলোচ্য ছোটগল্পে।

'অষ্টম স্বর্গ' গল্পটিতেও কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্ কাব্যের' প্রভাব আছে। কাব্যটি সপ্তম পর্বে শেষ করবার পর সেই কাব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রমথনাথ 'অষ্টম স্বর্গ' ছোটগল্পটি লেখেন। কালিদাস যেখানে শিবপার্বতীর বিবাহ ঘটিয়ে কাব্যের পরিসমাপ্তি টেনেছেন, সেখানে প্রমথনাথ বিবাহোত্তর বাসর ঘরের মিলনমধুর পরিবেশটি সৃষ্টি করে গল্পটি রসগ্রাহী করে তুলেছেন। কালিদাসের ব্যক্তি জীবনের ঘটনা 'অষ্টম স্বর্গ' ছোটগল্পে লেখক উপস্থাপন করেছেন।

প্রমথনাথের 'অসমাপ্ত কাব্য' ছোটগল্পটিতে তিনি ইতিহাস ও কল্পনার সংমিশ্রণে অনুপম রসসৃষ্টি করেছেন। গল্পে শিলাবতী মহাকাল মন্দিরের পূজারিণী। কুমার গুপ্তের নির্দেশে হূণদের পরাজিত করবার পর বিজয়োৎসব উপলক্ষে কালিদাস যে কাব্য সৃষ্টি করেন তাই হল 'কুমারসম্ভবম্ কাব্য'। শিলাবতী প্রত্যহ কালিদাসের লেখা এই কাব্যটি আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন কোনো কোনো দিন কাব্য পাঠের পর স্বপ্নে কুমার জননী উমাকে দেখতেন। অন্যদিকে কাব্যবিচারে কাব্যের সমাপ্তি অংশে ত্রুটি থাকায় রাজাদেশ হল কবিকে সমাপ্তি অংশটি আরোও সমৃদ্ধ করতে হবে।

"কালিদাস বলিল—শিলাবতী, আমাকে বিদায় দাও, আমার যাত্রাকাল আসন্ন।

তারপরে বলিল—নিচুল; কিয়ৎদূর আমার সঙ্গে যাবে।

শিলাবতী। তুমি কোথায় যাবে?

—রামগিরিতে। সেইখানেই যাইবার আদেশ হইয়াছে।

শিলাবতী। তোমাকে মহারাজা পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু দেবী সরস্বতী তোমার

সঙ্গেই চলিলেন।

—এখন তবে বিদায় হই?

শিলাবতী। তোমার এই অপমানের অন্ধকার ভেদ করিয়া মহত্তর কাব্যের সূর্যোদয় হইবে। আজিকার নির্বাসনের অভিজ্ঞতা কাব্যে গাঁথিয়া দিও। তোমার ও তোমার কাব্যের প্রতীক্ষায় আমি রহিলাম। মহাকাল তোমাকে রক্ষা করিবেন।"[১৩]

কিন্তু কালিদাস এই প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করে ছেড়ে চলে যান অন্যত্র। এভাবেই গল্পটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

'পরিস্থিতি' ছোটগল্পটিতে পত্রিকা সম্পাদকের উদ্দেশ্যে লেখক ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষেপ করেছেন। মূলত পত্রিকার সম্পাদনা করতে গিয়ে ছোটগল্পকার প্রমথনাথ বিশী যে বাস্তব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন তার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে আলোচ্য ছোটগল্পে। লেখক আত্মকথন ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন সাংবাদিক ও সাহিত্যিকের গুরুদায়িত্বকে। একই ব্যক্তি যখন এই দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তখন সাহিত্যিকের চেয়ে সাংবাদিকতার ওপর বেশি প্রাধান্য দিতে হয়। সাংবাদিকতার বাস্তব সত্য বর্ণনা এবং বিশেষ ঘটনা ও পরিস্থিতির সত্যরূপ উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে অনেক সময় ইস্তফা দিতে হয় সাংবাদিকতার কর্তব্যকে।

'জি. বি. এস. ও প্র. না. বি.' গল্পে প্রমথনাথ সাংবাদিকতা বৃত্তি প্রসঙ্গে রঙ্গব্যঙ্গ করেছেন, বিশেষ পরিস্থিতিতে সাংবাদিকরা অনেক সময় বাস্তব ঘটনাকে উপেক্ষা করে কাল্পনিক সংবাদ পরিবেশন করতে বাধ্য হন। তৎকালীন বাংলা সংবাদপত্র সম্পর্কে প্রমথনাথ এই অপ্রিয় সত্যকথা বলতে পেরেছেন সাহসের সাথে।

প্রমথনাথ 'কাঁচি' গল্পটিতে জার্নালিজম্ বৃত্তিধারী ব্যক্তিদের প্রতি ব্যঙ্গ করেছেন। গল্পের বিষয়বস্তুতে রয়েছে যারা জার্নালিস্ট তাদের জ্ঞানবৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। কাঁচি দিয়ে কাগজ কেটে সেঁটে দেওয়াকে সরস্বতীর দর্জি বলে তাদের উদ্দেশ্যে প্রমথনাথ রসিকতা করেছেন নিম্নোক্তভাবে :

"পকেট নয় গো, পকেট নয়—পিরামিড হাসিয়া উঠিল। ওঃ সে কী হাসি! যেন ভূমিকম্পে খানকতক পাথর গড়াইয়া পড়িল। হাসি থামিলে বলিলেন—কাগজ! কাগজের কাটিং কেটে সেঁটে দেবে! এরই নাম জার্নালিজম্, এতে লেখাপড়ার কী দরকার? আমরা হচ্ছি সরস্বতীর দর্জি।

দর্জিগিরি আজ কয়মাস করিতেছি। দিনে ঘুমাই, রাতে জাগি, দেশি বিলিতি কাগজ কাটিয়া অনুবাদ করিয়া জার্নালিজম্ করি। সত্য মিথ্যা ছোট বড় ভাল মন্দর ভেদ ঘুচিয়া গিয়া পৃথিবী বেশ সমতল হইয়া আসিয়াছে।"[১৪]

প্রমথনাথের 'গন্ডার' গল্পটি হাস্যরসাত্মক, গণেশের মোটা চামড়া ছিল বলেই পত্রিকা সম্পাদকের পদটি সে পেয়েছে। পত্রিকার মালিক গণেশের গায়ের চামড়া হাতিয়ে নিয়ে যখন বুঝল যে সে অনেক আঘাত সহ্য করেছে কাজেই তাকে আর আঘাত দেবার প্রয়োজন নেই।

'পূজার রচনা' ছোটগল্পটি ব্যঙ্গধর্মী। আধুনিক বাংলা কবিতা ও আধুনিক কবিদের

প্রতি প্রমথনাথ ব্যঙ্গ নিক্ষিপ্ত করেছেন। মূলত বিদেশী সাহিত্যে বিশেষ করে বিদেশী কবিতার অনুকরণ করে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় লেখনী ধারণের ব্যর্থ প্রয়াসে রত শিল্পমূল্য বিচারে সেই সাহিত্য সত্তার সার্থকতায় রূপান্তরিত হতে পারে না। সে বিষয়ে প্রমথনাথের বিদ্রূপাত্মক কাহিনী নিয়ে আলোচ্য ছোটগল্পের অবতারণা। "অজয় নিবারণবাবুর ঘরে প্রবেশ করিতেই তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। পূজা সংখ্যা? কি চাই? কবিতা? পঞ্চাশ টাকা। না, না কিছুতেই তার কম হবে না। আমেরিকা থেকে দেয় পাঁচশো ডলার, দেশের লোকের জন্য পঞ্চাশ টাকা। এটা কন্‌সেশন।

আমার কবিতায় ইউরোপীয়ান atmosphere তাই তাকে ইউরোপীয়ান temperature এ রাখতে হয়। নতুবা নষ্ট হবার আশঙ্কা। শেষ পর্যন্ত টাকা নয়, এক বাক্স সিগারেটের বিনিময়েই তিনি কবিতাটি বিক্রি করলেন।"[১৫]

'রাজকবি' ছোটগল্পের বিষয় হল যে সমস্ত অখ্যাত কবি নিম্ন মানের সাহিত্য রচনা করে সাহিত্যিক হবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করছেন তাদের প্রতি প্রমথনাথের তীব্র শ্লেষ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। "মানুষে না পারিলেও পশুতে অবশ্যই যথার্থ সাহিত্যিককে চিনিতে পারিবে। আসলে যত অযোগ্য লোক আজ সাহিত্যের আসরে ভিড় জমাতে চায়—তাই প্র. না. বি-র ব্যঙ্গ কুশলী লেখনী ঝলসে ওঠে—সাহিত্যিক হওয়ার পক্ষে সাহিত্য সৃষ্টি নিতান্তই গৌণ, না থাকিলেও চলে, থাকিলেও ক্ষতি নাই।"[১৬]

তাই ব্যঙ্গশিল্পী প্রমথনাথ মনে করেন এই ধরনের সাহিত্যের তাৎপর্য মানুষ যথার্থ উপলব্ধি না করতে পারলেও পশুরাই তার যোগ্য মূল্য দেবে।

'সিন্ধবাদের অষ্টম সমুদ্র যাত্রার কাহিনী' গল্পে প্রমথনাথের ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বিশেষত আধুনিক সংবাদপত্র সাংবাদিক বৃত্তিধারী ব্যক্তিদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের পরিধি ও বাণিজ্যিক মানসিকতা প্রমথনাথকে ব্যথিত করেছে। সংবাদপত্র সম্পর্কে তিনি ছোটগল্পে জানিয়েছেন লেখক যেখানে ধূর্ত, প্রকাশক সেখানে প্রতারক। যৌনতত্ত্ব শিক্ষা ও মিথ্যাতত্ত্ব পরিবেশন এবং ভুল বানান ও ভুলবাক্য যার হাতিয়ার তাকেই তিনি সংবাদপত্র আখ্যা দিয়ে সংবাদ বিভাগের প্রতিটি স্তরের ব্যক্তিদের ব্যঙ্গ করেছেন। পত্রিকা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এই ত্রুটিগুলিকে তিনি লক্ষ্য করেছেন আলোচ্য গল্পে। প্রমথনাথের দৃষ্টিতে রাজনীতি হল ক্ষুধা বাড়াবার জন্য বাক্ ব্যায়াম। মঞ্চে বক্তৃতাই হল এই বাক্ ব্যায়ামের নামান্তর। নেতাদের রাতের ক্ষুধা যাতে বেশি বাড়ে এজন্য সভাগুলো বেশির ভাগ বিকেল ও সন্ধ্যাতেই অনুষ্ঠিত হয়।

প্রমথনাথের 'নর শার্দূল সংবাদ' ছোটগল্পটিতে ব্যঙ্গের তীব্রতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সে ব্যঙ্গ মানবমনের পীড়াদায়ক। ছোটগল্পকার প্রমথনাথের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল একটি জীর্ণ ও মৃতপ্রায় জাতিকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে জর্জরিত করে জাতির প্রকৃত চেতনার জাগরণ করা। যখন তিনি বাক্যের বাণে জাতির চৈতন্য জাগ্রত করতে ব্যর্থ হয়েছেন তখন সে জাতির উদ্দেশ্যে ঢিল ছুঁড়বার নির্দেশ দিয়েছেন।

'নূতন বজ্র' গল্পটিও ব্যঙ্গধর্মী। প্রমথনাথ আলোচ্য গল্পে পত্রিকার সম্পাদকদের প্রতি

তীব্র ব্যঙ্গ নিক্ষেপ করেছেন। পত্রিকা সম্পাদককে জ্ঞানসমুদ্রের সাবমেরিন বলে ব্যঙ্গ করেছেন। প্রতিদিনকার সংবাদপত্রে সম্পাদক যে সংবাদগুলো প্রকাশ করেন সেই প্রকাশনার মধ্য দিয়ে কত মিলন, বিরহ, প্রেম, মৃত্যু, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপিত হয় এবং সেই বিষয়ের নির্বাচন যদি পক্ষপাতিত্বমূলক হয় সে প্রসঙ্গে তিনি সম্পাদকের প্রতি তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ করেছেন।

'সাহিত্যে তেজি মন্দা' ছোটগল্পে একদিকে অর্থ উপার্জন অন্যদিকে বিদ্যালাভ এই দুটো বিষয়ের উপস্থাপনা করা হয়েছে। লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে উদ্যোগী ব্যক্তিদের মধ্যে। ছোটগল্পকার প্রমথনাথ মনে করেন লক্ষ্মীদেবীর কৃপা বর্ষিত হলে অতি সাধারণ লেখা আলোড়ন সৃষ্টি করে উপার্জিত হতে পারে প্রভূত অর্থ ও পুরস্কার। আবার সরস্বতীর বরপুত্র হলে পত্রিকা সম্পাদকের গৃহ প্রযোজক, প্রকাশক প্রভৃতি ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ধন্য হয়। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় সাহিত্যে পুরস্কার লাভের পেছনে নিহিত থাকে বিশেষ কতগুলো কারণ। বিশেষত রাজনৈতিক দলাদলি অর্থদান প্রভৃতির উপর নির্ভর করতে হয় পুরস্কার প্রাপকদের। এমনকি পুরস্কার প্রদান কমিটির দাক্ষিণ্যে অযোগ্য ব্যক্তিও লাভ করতে পারে যোগ্য পুরস্কার, আবার একজন অসাধারণ লেখকও বঞ্চিত হতে পারে তার যোগ্য পুরস্কার থেকে।

প্রমথনাথের 'জামার মাপে মানুষ' ছোটগল্পটি বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত। সাহিত্যের বাজারে বিজ্ঞাপনের চাকচিক্যে অনেক সময় যোগ্য প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটে। পুস্তক ক্রেতারা গ্রন্থের মূল বিষয়ের দিকে না তাকিয়ে বইয়ের মলাটের জৌলুসে অর্থাৎ রঙ রেখা সুদৃশ্য প্রচ্ছদ দেখে বই কিনে নিজেরা ঠকে। অথচ যে সারগর্ভ গ্রন্থগুলোর সাহিত্যিক মূল্য অসাধারণ সে গ্রন্থগুলো ক্রেতাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। সাহিত্যের বাজারে এই অবস্থা দেখে প্রমথনাথ ক্ষুব্ধ হয়ে আলোচ্য ছোটগল্প রচনা করেছেন।

'শাপ মুক্তি' ছোটগল্পে অমরনাথ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এক মাসে তিনি ৩৫০ টির ঊর্ধ্বে লেখা দিয়েছেন। বৃহৎ সংখ্যক এই লেখাগুলো সংগৃহীত হয়েছে অমরনাথের ছেলে মেয়ের স্কুলের খাতা থেকে কিংবা তার স্ত্রীর হিসেব রাখবার খাতা থেকে। নিজে লিখেছেন মাত্র কয়েকটি। অপেক্ষাকৃত যোগ্যতাহীন লেখকরাও সাহিত্য জগতে অবাধ বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। বিশেষ করে পূজাসংখ্যা পত্রিকায় শুধুমাত্র স্ত্রী পুত্র কন্যাই নয়, বাড়ির চাকর পর্যন্ত লেখা প্রকাশের জন্য কিভাবে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে তারই বাস্তব সম্মত ঘটনা আলোচ্য ছোটগল্পের বিষয়বস্তু। গল্পকার লিখেছেন "অনেকক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটির পরে এক টুকরো চিরকুট পাইল, তাহাতে লেখা আছে—ডেস্ক ঘেঁটে একটি লেখা পেলাম, নিয়ে গেলাম, পূজাসংখ্যা বের করে তাতে প্রকাশ করব। দক্ষিণা থেকে আমার দুমাসের প্রাপ্য বেতন কেটে নিয়ে যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তা আপনাদের পাঠিয়ে দেব।"[১৭]

'বাল্মীকির পুনর্জন্ম' এবং 'শাপে বর' ছোট গল্পদুটির বিষয়বস্তু অনেকটা সমধর্মী। প্রমথনাথ আলোচ্য ছোটগল্প দুটিতে সাহিত্যমূল্যহীন সাহিত্যিকদের প্রতি ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষেপ করেছেন। ব্যক্তিজীবনে পত্রিকা সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণের পর পত্রিকা

বিভাগের অসঙ্গতিগুলিকে ছোটগল্পকার প্রমথনাথ বিশী ছোটগল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'জগবন্ধুর মোহমুক্তি' ছোটগল্পটিতে সাংবাদিকদের মিথ্যে তথ্য পরিবেশনের বিরুদ্ধে লেখকের শাণিত বিদ্রুপবাণ বর্ষিত হয়েছে। রসাতল সংবাদপত্রে পাঠক যেখানে নাবালক, নিউজ এডিটর সেখানে সাবালকের মর্যাদা পায়। সেখানে সংবাদপত্রে পরিবেশিত তথ্য কতটা সত্যরূপে প্রকাশিত হতে পারে তা পাঠকমাত্রই উপলব্ধি করতে পারেন।

'চিত্রগুপ্তের অ্যাড্‌ভেঞ্চার' ছোটগল্পের রাজনৈতিক কোন্দল কতটা কলঙ্কিত হয়ে ওঠে তার প্রতি প্রমথনাথের ব্যঙ্গ বর্ষিত হয়েছে। বিশেষত আলোচ্য ছোটগল্পে আইন পরিষদের দলাদলি কতটা রাজনৈতিক নেতাদের হীন মানসিকতার পরিচয় দিতে পারে তারই বাস্তবসম্মত দলিল চিত্র আলোচ্য ছোটগল্পের বিষয়। জনগণ দ্বারা নির্বাচিত এই সব প্রতিনিধিরা ক্ষমতা ও অর্থের জোরে অসম্ভবকে সম্ভব করে দেয়। পূর্বের সূর্য পশ্চিমে ওঠে, এই মিথ্যাকে সত্যতার পর্যায়ে নিয়ে যেতে তারা কুণ্ঠিত নয়।

প্রমথনাথের 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যানিং' ছোটগল্পটিতে প্রমথনাথ রাজনীতির প্রতি আক্রমণমুখী হয়ে উঠেছেন। তিনি লিখেছেন পকেটমাররা যদি রাজনৈতিক নেতা হত তাহলে লোকের পকেট কেটে অর্থ চুরি না করে অবলীলাক্রমে তারা মানুষের গলা কাটতে পারত।

'হাতুড়ি' ছোটগল্পটিতে কাস্তে হাতুড়ি তারা চিহ্নিত লাল পতাকাবাহী কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সরাসরি আক্রমণ করা হয়েছে। আত্মকথনভঙ্গিতে প্রমথনাথ নিজেকে একজন প্রভাবশালী কমিউনিস্ট নেতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। শোষক শ্রেণির পক্ষ অবলম্বন করতে সিদ্ধহস্ত নেতাদের সংখ্যা এদেশে কম নেই।

'শ্রী ভগবানকে চাই' ছোটগল্পে তিনি দেখিয়েছেন কমিউনিস্টরা মানে না ভগবানকে। তাদের কাছে কার্ল মার্কসের নির্দেশিত পথই শ্রেষ্ঠ। ধর্ম হল আফিং এর নেশামাত্র। ধর্ম প্রচারকরা এই নেশা খেয়ে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে। আবার নিজস্বার্থসিদ্ধির খাতিরে এই কমিউনিস্ট নেতারাই কমিউনিজমের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে পূজা অর্চনা করতে উদ্যত হয়।

'সেকেন্দার শার প্রত্যাবর্তন' ছোটগল্পে বাঙালি জাতির বাস্তব স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। লেখক আলোচ্য গল্পে বিবর্তনবাদের তত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বিশেষত একটি নিম্ন প্রজাতির প্রাণী ভেড়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মানবচরিত্রের সূক্ষ্ম সংগতি দেখিয়েছেন। ভেড়া অত্যন্ত সহিষ্ণু জাতি। ভেড়ার চামড়া বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেন মানুষের চামড়ায় রূপান্তরিত হয়েছে। তেমনি ভাবে চরিত্রগত অসংগতি বর্তমান। বাঙালিরা কতটা অনুকরণশীল ও পারস্পরিক বিদ্বেষপ্রবণ তা আলোচ্য গল্পে প্রমথনাথ সার্থক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রমথনাথের 'থার্মোমিটার' গল্পটি কৌতুক রসাশ্রিত। ডাক্তারের প্রদেয় ঔষধ খেয়ে যে শিশুটির জ্বর কিছুতেই কমল না তখন আবিষ্কৃত হল বাস্তব সত্যটি। আসলে থার্মোমিটার যন্ত্রটি যে দীর্ঘদিন ধরে অকেজো হয়ে ৯৯ তে স্থির হয়ে আছে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হল।

শিশুটি সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ ছিল অথচ তাকে ঔষধ দিয়ে অসুস্থ করা হয়েছে। আলোচ্য ছোটগল্পে লেখক হাতুড়ে ডাক্তারদের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করেছেন।

'গোল্ড ইনজেক্শন' একটি অনবদ্য ছোটগল্প। প্রমথনাথ কতটা কৌতুকপ্রিয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আলোচ্য ছোটগল্পটি। নারীরা একান্ত ভাবেই অলঙ্কার প্রিয়। তারা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে স্বর্ণালঙ্কারে নিজেদের সাজিয়ে রাখতে। তাদের সর্বরোগের মহৌষধ হল অলঙ্কার। এই অলঙ্কার পেলেই অসুস্থ নারীরা সুস্থ হয়ে ওঠে। ফিরে আসে তাদের সংসারে শান্তির স্পর্শ। ছোটগল্পকার আলোচ্য ছোটগল্পে নারী মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে দক্ষতার পরিচয় দেখিয়েছেন।

'পেস্কারবাবু' ছোটগল্পটি করুণরসাশ্রিত। আলোচ্য গল্পে রতনমণিবাবু একজন অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী। তিনি কর্মবিমুখ নন। একনিষ্ঠ কর্মী হয়ে ভালোবাসেন কর্মজীবনকে ও কর্মময় জগতকে, অবসর জীবনের পরেও তার কর্মধারা থেমে থাকেনি। অথচ সেই কর্মীপুরুষ যখন বয়ঃকনিষ্ঠ একজন কর্মচারীর কাছে উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হন, তখন এই প্রবীণ কর্মীর জীবনে বেদনার সঞ্চার ঘটে। তার প্রতি যে নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছে সে শোকে-বেদনায় একদিন রতনমণিকে চিরবিদায় নিতে হয়েছে। লেখক তার মৃত্যু ঘটনা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করেছেন—

"বাড়ি ফিরিয়া সেই রাতেই রতনমণিবাবুর বিষম জ্বর হইল এবং অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জ্বর ঘোর বিকারে পরিণত হইল। খবর পাইয়া আদালতের কর্মচারিগণ দেখিতে গেল—কিন্তু চৈতন্যহীন রতনমণিবাবু কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না। ডাক্তার জবাব দিয়া চলিয়া গেল, বন্ধুরা হতাশ্বাসে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—আর মুমূর্ষু রতনমণিবাবু বিকারের ঘোরে নথীর নম্বর হাঁকিয়া যাইতে লাগিলেন—

৭৭৩। ২১ খাজনা

৩৯৩। ২৩ মর্টগেজ

২৯১। ২৪ মোৎফারাক্কা

... চাপ্‌রাশি, বাবুকো বাহার দেখ্‌লাও ....

... হুজুর, আমার নথী ঠিক আছে ...

... না, না, আমি বাইরে যাবো না ...

... শ্যামাচরণ, নথী ঠিক থাকলে আর কোন ভয় নাই ...

... চিপ্‌রাশি, বাবুকো বাহার দেখ্‌লাও ...

... হুজুর, আমার নথীপত্র সব ঠিক আছে ...

... না ... না ... আমি বাইরে যাবো না ...

৭৭৩। ২১ খাজনা

৩৯৩। ২৩ মর্টগেজ

২৯১। ২৪ মোৎফারাক্কা ...

সবাই বুঝিল আর কোন আশা নেই, তাহারা নীরবে দাঁড়াইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিল—আর মুমূর্ষু পূর্বোক্তরূপ বকিয়া যাইতে লাগিত।

... না, না, হুজুর আমার নথী ঠিক আছে ...

... ৭৭৩। ২১ খাজনা ...

এইরূপ বকিতে বকিতে মুমূর্ষু ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিকারের উক্তিও ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে সন্ধ্যার কিছু আগে ঠিক আদালত ভাঙিবার সময়ে রতনমণিবাবু শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। এখানকার আদালতের লীলা তাঁহার শেষ হইল।"[১৮]

'ডাকিনী' ছোটগল্পটি প্রমথনাথের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। বঙ্গদেশের কুসংস্কারাছন্ন মানসিকতা সমাজ জীবনে কতটা অভিশাপ বহন করে মানুষকে ঠেলে দেয় বিপর্যয়ের মুখে তার বাস্তবসম্মত চিত্র 'ডাকিনী' ছোটগল্পটি। উচ্চশিক্ষিতা ও সুন্দরী মল্লিকার বিয়ে হয়েছিল এক পাত্রের সঙ্গে। বিয়ের কিছুদিন পর থেকে মল্লিকার স্বামী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। পুত্রের অসুস্থতার জন্য শাশুড়ী অভিযুক্ত করে মল্লিকাকে। তারই পাপে আজ শশাঙ্ক পীড়িত। সেই কুসংস্কারপ্রবণ মানসিকতা নিয়ে শাশুড়ি নির্মমভাবে অত্যাচার করে মল্লিকাকে। এমনকি মল্লিকাকে 'ডাইনী' রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সে সচেষ্ট। মিথ্যা অপবাদে একদিন শোকে দুঃখে মল্লিকাকে প্রাণ হারাতে হল। "মল্লিকার মনে হইল আজ ব্যথার জোয়ার, নৈরাশ্যের হোলি। নিম্নে উর্ধ্বে কোথাও আজ পরিত্রাণ নাই, পরিচিত দিগন্ত আশ্রয়ের তীর ধুইয়া মুছিয়া কোথায় সব অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মল্লিকা দেখিল এই সর্বপ্লাবী বন্যার মুখে কোথাও তাহার কোন আশ্রয় নাই; না পতিকুলে না পিতৃকুলে, সংসারের সব দিগন্ত কোন সর্বনাশের তলায় নিশ্চিহ্ন। এই প্রলয় পয়োধির মুখে কোন্ বটপত্রকে অবলম্বন করিয়া সে বাঁচিবে? কোথাও যে তাহার কোন আশ্রয় নাই। মল্লিকা চিলে কোঠার ছাদে উঠিয়া একবার পৃথিবীটা নিরীক্ষণ করিয়া লইল এবং পরক্ষণেই মাগো রব করিয়া অতি নিম্নে গুড় নদী লক্ষ্য করিয়া ঝাঁপ দিল।

পরদিন সকালে যখন মল্লিকার মৃতদেহ নদীর জলে পাওয়া গেল, তখনো তাহাদের মত পরিবর্তন ঘটিল না। সবাই বলিল, ডাকিনী মানব দেহটা ফেলিয়া কঙ্কাল হইয়া উড়িয়া গিয়াছে—কামরূপ কামিখ্যেয় নরদেহে যাইবার উপায় নাই;

মানুষের ঘরে মানুষের রূপে আসিয়াছিল—এবার স্বরূপ ধরিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। যাইহোক, বাড়ির ডাকিনী দূর হওয়াতে সবাই নিশ্চিন্ত বোধ করিল এবং উত্তরোত্তর শশাঙ্কর স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিতে লাগিল।"[১৯]

তার মৃত্যুর পরও তার আত্মীয় পরিজন ও প্রতিবেশীদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি এবং সমবেদনা সে পায়নি। বরং সে ডাইনী অপবাদ পেয়েছে এটাই মল্লিকার জীবনের ট্র্যাজেডি।

'হাতি' ছোটগল্পটি প্রমথনাথের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। অবক্ষয়িত এক জমিদারের শেষ সম্বল ছিল হাতিটি। জমিদারের আর্থিক অসঙ্গতি হাতির লালন পালনের ক্ষেত্রে অন্তরায়

হলেও একদিন এই হাতিটি জমিদার কন্যার বিবাহের পথকে প্রশস্ত করে দিয়েছে। হাতিটির উপস্থিত বুদ্ধি এই মধুর মিলনের সহায়ক হয়ে উঠেছে। প্রমথনাথ মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতি কতটা সহানুভূতিশীল তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আলোচ্য ছোটগল্পটি।

'মহেঞ্জোদড়োর পতন' ছোটগল্পটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের। আলোচ্য ছোটগল্পে অতীত ঐতিহ্যবাহী মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতার ধ্বংসের প্রকৃত কারণ লেখক উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে এই সভ্যতার ধ্বংসের প্রধান দুটি কারণের একটি হল সিন্ধুনদের বিধ্বংসী বন্যা অপর কারণ হল বহিরাগত শক্তি, অর্থাৎ আর্যজাতির আক্রমণ। প্রমথনাথ তৎকালীন যুগের পটভূমিকায় আলোচ্য গল্প উপস্থাপিত করেছেন। যদিও তিনি দ্বারস্থ হয়েছিলেন প্রাচীন পণ্ডিতদের ঐতিহাসিক যুক্তির ওপর। মূলত লেখকের মতে মহেঞ্জোদড়োর পতন উপরোক্ত কারণ দুটির সঙ্গে আরও একটি কারণ উল্লেখ করেছেন। কারণটি হল মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বিলাসিতা ও অকর্মণ্যতা। যদিও ছোটগল্পকার কাল্পনিক কিছু বিষয়ের অবতারণা করেছেন আলোচ্য ছোটগল্পে তাই বলে ইতিহাস রসকে তিনি উপেক্ষা করেননি। ইতিহাসের সম্ভাব্য সত্যকে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করে একটি শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।

'রাজা কি রাখাল' গল্পটিতে ঐতিহাসিক সত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন ছোটগল্পকার। গল্পটিতে বাদশা ঔরঙ্গজেবের দৈন্যতা পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি একজন দীনদরিদ্র ভিখারিনীর চেয়েও কতটা দুঃখী ছিলেন তারই কাহিনি এখানে বর্ণিত হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে গল্পটিতে ঐতিহাসিক সত্য আক্ষরিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলেও বাদশা আলমগীরের ভাগ্য বিপর্যয়কে প্রমথনাথ যথাযথ ভাবে তুলে ধরেছেন। ঔরঙ্গজেবের ব্যক্তিজীবনের ট্রাজেডি আলোচ্য ছোটগল্পে লেখক দেখাবার চেষ্টা করেছেন।

প্রমথনাথের ইতিহাসভিত্তিক ছোটগল্প হিসেবে 'ধনেপাতা' গল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। প্রমথনাথ আলোচ্য ছোটগল্পে বাঙালি জাতির প্রতি নিন্দাসূচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁর লিখিত গ্রন্থ দশোপদেশ-এ উল্লেখ করেছেন কাশ্মীর প্রবাসী বিদ্যার্থীদের কথা। বিশেষ করে গৌড়ীয় ছাত্রদের আচরণ যে প্রশংসনীয় নয় বরং তারা যে নিন্দার পাত্র তার বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়া বাঙালির ইতিহাস গ্রন্থের লেখক শ্রী নীহাররঞ্জন রায় তাঁর গ্রন্থে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে গৌড়ীয় বিদ্যার্থীদের যে দিকটি আলোকপাত করেছেন তা নিঃসন্দেহে বাঙালি চরিত্রের গৌরবোজ্জ্বল দিক নয়। আলোচ্য ছোটগল্পে প্রমথনাথের বাঙালি ছাত্রদের চরিত্র বিষয়ে যে ত্রুটিপূর্ণ দিকটিকে তুলে ধরেছেন তার জন্য লেখক অনেকটা ব্যথিত হয়েছেন সন্দেহ নেই।

প্রমথনাথের 'মহালগ্ন' ছোটগল্পটি বিষয় ঐতিহাসিক রস পরিবেশন। মূলত গল্পটিতে রোমান্টিক প্রেমকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গ্রীক বীর আলেকজান্ডার যখন ভারতে আসেন সে সময় চন্দ্রগুপ্ত অনেকটা উচ্চকাঙ্ক্ষা প্রবণ হয়ে উঠেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত আশাবাদী ছিলেন এজন্য যে এই আগমন উপলক্ষে তার ভাগ্যের উন্নতি ঘটবে। ঘটনাচক্রে চন্দ্রগুপ্ত প্রগাঢ় প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন এক গ্রীক রমণীর সঙ্গে। উভয়ের প্রেমের চিত্রাঙ্কনে

প্রমথনাথের মুন্সিয়ানার পরিচয় আছে।

'পরী' গল্পটি ইতিহাসাশ্রিত। ইতিহাসের ধারাপথে নেমে এসেছিল মোগল সাম্রাজ্যের অনিবার্য পতন। একদিন যে সকল মোগল বেগমরা দাসদাসী বেষ্টিত হয়ে কাটাত বিলাসী জীবন, রাজকীয় ঐশ্বর্যে যারা ছিল সমৃদ্ধ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থানে হারিয়ে যায় সেই বেগমদের প্রাধান্য। তারা যেন রাজপ্রাসাদে ছেড়ে ভিখারিতে উপনীত হয়েছে। অনাহারক্লিষ্ট দুর্দশাগ্রস্ত ভাগ্যের ক্রীড়নকে বন্দী বেগমরা রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পরতো ভিক্ষার জন্য। বেগমদের করুণ চিত্র অঙ্কনে প্রমথনাথ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। একটি বিশেষ যুগের অবক্ষয়িত সমাজের বাস্তবচিত্র লেখকের কলমে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

ঐতিহাসিক রসযুক্ত 'কোতলে-আম' ছোটগল্পে দেখান হয়েছে অত্যাচারী পারস্য সম্রাট নাদির শাহ্ এর দিল্লি বাসের অভিজ্ঞতা। সে সময় দিল্লিতে আয়োজিত হয়েছিল এক নাচের আসর দেশীয় এক সুন্দরী নর্তকীর রূপমুগ্ধ নাদির শাহের ভোগ্যকাঙ্ক্ষা ও রূপজ মোহ থেকে মুক্তিলাভের বাসনা এবং নারীত্বের মহিমাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরবার প্রচেষ্টা আলোচ্য ছোটগল্পের বিষয়। প্রমথনাথের লেখনীতে নর্তকীর মনস্তাত্ত্বিক দিক্‌টি সার্থক সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

'অথ কৃষ্ণার্জুন সংবাদ' ছোটগল্পটি রূপকাশ্রয়ী। শ্লেষ ও ব্যঙ্গের মিশ্রণে গল্পটি পাঠক মানসে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। নামকরণ থেকে মনে হতে পারে গল্পটি পুরাণ কাহিনী ধর্মী। লেখক আলোচ্যগল্পে সমাজ জীবনের দুষ্ট ক্ষত থেকে নিরাময়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আধুনিক যুগের পটভূমিকায় চোরাকারবার সমাজ জীবনের অভিশাপ স্বরূপ। কৃষ্ণ ও অর্জুন হল আধুনিক যুগের দুই রথী ও সাথী, তারা দ্জনেই চোরাকারবারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রমথনাথ বলেছেন চোরাবাজার হল চোরদের বাজার নয়, এ যেন দিনে দুপুরে ডাকাতের কারবার। এই চোরাবাজারীরাই হল সমাজের ধারক ও বাহক। এমনকি রাষ্ট্র যন্ত্রও তাদের নিয়ন্ত্রাধীন। সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা থেকে সহজ সরল জীবন যেখানে নির্বাসিত হয়েছে সেখানে গান্ধিজির আদর্শবাদের মূল্য কতটুকু? নিজ আয়ে সাধারণ মধ্যবিত্তের মোটর গাড়ি কিনতে হলে ঘুষ নেওয়া একান্ত আবশ্যক। এই শ্রেণি প্রতিনিধিদের কখনো বিবেক আহত হয় না। তাদের ছেলেমেয়েরা, স্ত্রী সকলেই উল্লসিত হয়।

'বেগম শমরুর তোষাখানা' ছোটগল্পে প্রেম প্রতিহিংসা লোভ কিভাবে মানব জীবনে বিয়োগান্তক পরিণতি বহন করে আনে তার বাস্তবসম্মত দিকটি প্রমথনাথ তুলে ধরেছেন। গল্পটিতে ঐতিহাসিক রসের সঙ্গে মানবরসের সমন্বয় ঘটেছে।

প্রমথনাথের 'ছিন্নমুকুল' ছোটগল্পটি ইতিহাস রসসঞ্জাত। গল্পটির উপাদান নিহিত আছে সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায়। গল্পটিতে বাঙালি চরিত্রের ইংরেজ প্রশস্তি, ভীরুতা ও মোসাহেবিয়ানার প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। তবে বাঙালিরা যে প্রত্যেকেই ইংরেজ তোষণনীতিকে মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারে না তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল তারক চরিত্রটি। বঙ্গদেশে এমনি শত শত তারক আছে যারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানসিকতার

পরিচয় দিয়ে স্বদেশ প্রেমের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছে।

'রামায়ণের নতুন ভাষ্য' ছোটগল্পটি নীতিমূলক। সমাজে একশ্রেণির মানুষ আছে যারা বাস্তব বুদ্ধিহীন এবং কাল্পনিক জগতের বাসিন্দা। তাদের সংসার জীবনে কখনো সুখস্বপ্ন উপস্থিত হয় না। এই উপদেশকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আলোচ্য ছোটগল্পের অবতারণা।

'অলঙ্কার' ছোটগল্পটিও নীতিমূলক। আলোচ্য ছোটগল্পে প্রমথনাথ অলঙ্কারের সঙ্গে ইষ্টক খণ্ডের তুলনা করেছেন। যে অলঙ্কার অব্যহৃত ও সযত্নে গচ্ছিত রাখা হয় এবং যে অলঙ্কার দেহের সৌন্দর্যবর্ধন করতে পারে না তা থাকা না থাকা অনেকটা সমান। অলঙ্কার আছে অথচ তার ব্যবহার নেই। অলঙ্কার আছে বাক্সে আর এই কল্পনাই অনেক ক্ষেত্রে আনন্দের কারণ। অলঙ্কারের পরিবর্তে যদি একটা ইঁটের খণ্ডকে অলঙ্কার বলে মনে করা যায় তাহলে তাতে আনন্দের অভাব কোথায়? আলোচ্য গল্পটি অনেকটা রূপক ধর্মী। গল্পটিতে আমরা পাই—

"কয়েকদিন পরে তাহার একখানা ঘর পুড়িয়া গেল।

পড়শীরা বলিল—নতুন ঘর তোলো।

টাকা কোথায়?

এবার ২। ১ খানা অলঙ্কার বেচো।

না ভাই, ও বস্তু বেচতে নাই, অলঙ্কার স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি।

পড়শীরা রাগিয়া উঠিয়া গেল—বলিয়া গেল, তবে সোনার তালসিন্দুকে রেখে রোদে জলে ভিজে মরো।"

ছোটগল্পকার প্রমথনাথের 'পঞ্চশীলা' ছোটগল্পটি নীতিধর্মী। পঞ্চশীলাতে দেশের মঙ্গলের জন্য গৃহীত নীতি এবং তার যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে অন্তরায় দেখা যায় তার ইঙ্গিত করেছেন আলোচ্য ছোটগল্পে। দেশ কল্যাণের মহৎ উদ্দেশ্য থাকলেও সেই উদ্দেশ্য যদি সঠিকভাবে রূপায়িত না হয় তা হলে পরিকল্পিত লক্ষ্য স্থলে তা পৌঁছতে পারা যায় না। এটাই আলোচ্য গল্পের বিষয়।

প্রমথনাথ ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে প্রসারিত মনের অধিকারী, সাম্প্রদায়িক বিভেদ তিনি মনেপ্রাণে সমর্থন করেন নি তার উজ্জ্বল নিদর্শন হল 'টিকি' গল্পটি। বিশেষতঃ হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধ কোন সুষ্ঠু পথ নির্ণীত হয় না। বরং পারস্পরিক সংঘাত হত্যা, রক্তপাত প্রভৃতি বিপর্যয় ডেকে এনে সমাজ জীবনকে করে তোলে কলুষিত। প্রমথনাথ আলোচ্য ছোটগল্পে বিভেদ, বিরোধ যে কতটা অসার তার বাস্তবানুগচিত্র শিল্পকুশলতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

প্রমথনাথের 'সিন্দুক তত্ত্ব' ছোটগল্পটি অনবদ্য। সাধারণতঃ প্রাচীনকালে টাকা সঞ্চয় করে রাখা হত সিন্দুকে। যে ব্যক্তি এক সময় ছিল প্রকৃতই ধনবান, সেই ব্যক্তিটি ভাগ্য বিপর্যয়ে পড়ে অর্থশূন্য হয়ে গেলেও টাকার খ্যাতি কীভাবে ব্যক্তি জীবনে সাফল্য এনে দেয় তার বাস্তবসম্মত কাহিনী আলোচ্য ছোটগল্পের বিষয়।

'ওরা' ভাষা বিষয়ক এক সার্থক ছোটগল্পের নিদর্শন। বাঙালীরা অনেক ক্ষেত্রে

হিন্দীভাষাভাষী ব্যক্তিদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। আবার তারাই ঘটনাচক্রে রাষ্ট্রভাষা হিন্দীর প্রতি প্রয়োজনের তাগিদে নির্ভরশীল হয়ে ওঠে এবং নিজেদের অকর্মণ্যতার পরিচয় কীভাবে দেখায় তারই এক বাস্তবচিত্ররূপ আলোচ্য ছোটগল্পের বিষয়।

'সিংহ চর্মাবৃত গর্দভ' গল্পটি রূপকধর্মী। আলোচ্য ছোটগল্পে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ নীতি কতটা বিপর্যয় ডেকে আনে তার বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে। হিন্দু মুসলমানের দ্বিজাতিতত্ত্ব ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপনের অন্তরায়, সেদিকটি আলোকপাত করেছেন ছোটগল্পকার।

'ঋণ জাতক' ছোটগল্পটিতে দার্শনিক চেতনা প্রাধান্য পেয়েছে। জগতে জন্ম হলে মৃত্যু অনিবার্য এই চরম সত্যবাণী প্রকাশিত হয়েছে, সেই সঙ্গে ঋণ গ্রহণ বিষয়টিও চিরন্তন সত্য। আমরা প্রত্যেকে প্রকৃতির কাছে ঋণী। এই ঋণ অপরিশোধ্য একথা বাস্তব সত্য।

প্রমথনাথের 'সদা সত্য কথা কহিবে' গল্পটি নীতিমূলক ছোটগল্পের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আলোচ্য গল্পে প্রমথনাথ দেখিয়েছেন যে সত্যের জয় সর্বদাই। সত্য যেখানে সেখানে ধর্মের অবস্থান। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যারা সত্যকে উপেক্ষা করে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের জীবনে সুখ মেলে না। ইহকাল এবং পরকাল তাদের কাছে অন্ধকারময়। কাজেই স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করে সর্বদা সত্য কথা বলা সঙ্গত। আপাত দুঃখকর হলেও পরিণামে সত্য আদর্শই গ্রহণযোগ্য।

'পক্ষিরাজ গাধা' ছোটগল্পটি নীতি ধর্মী। গাধাকে প্রমথনাথ তুলনা করেছেন মানুষের সঙ্গে। গল্পের দেখিয়েছেন গাধার যতই ডানা গজাক, যতই সে ডিগ্রিলাভ করুক কিংবা সভাপতিত্ব বা সম্পাদকত্ব যে পদই প্রাপ্ত হোক না কেন, গাধা গাধাই থাকবে তার বেশি কিছু সে হতে পারবে না।

'বাজীকরণ' ছোটগল্পটিও নীতিকথামূলক। গাধা যদি কখনো ঘোড়ায় রূপান্তরিত হয় তাহলে যেমন বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়, তেমনি একটি মূর্খ যদি পণ্ডিতে উপনীত হয় তাহলে একই বিড়ম্বনা দেখা দেয়। আবার যদি একজন ভিখারি রাতারাতি রাজার আসন অলংকৃত করে তাহলে সমজাতীয় বিড়ম্বনা সৃষ্টি হবে, এটাই আলোচ্য গল্পের বিষয়বস্তু।

'ওলট পালট পুরাণ' গল্পে দেখান হয়েছে যে বর্তমান শতাব্দীতে অর্থের প্রবল প্রাধান্যের কথা। এই গল্পের মাধ্যমে আমাদের প্রচলিত পুরাণের ধ্যানধারণাকে কিছুটা কটাক্ষপাত করা হয়েছে। বর্তমানকে প্রাধান্য দিয়ে শাশ্বত সত্যকে অস্বীকার করবার একটা প্রবণতা ব্যাপকভাবে গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। ব্যক্তিমানুষ কিভাবে অর্থের সন্ধানে নিজের আত্মসম্মানকে বিকিয়ে দিতে পারে সহজ সাবলীল ভাষায় লেখক তা ফুটিয়ে তুলেছেন।

'সেই শিশুটি' ছোটগল্পটি রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস প্রভাবিত। সিপাহী বিদ্রোহের সময় গোরা পিতৃমাতৃহীন হয়ে পড়লে গোরাকে কুড়িয়ে পায় কৃষ্ণদয়ালবাবু। গোরা জানত না যে কৃষ্ণদয়ালবাবু ও আনন্দময়ী তার পিতা ও মাতা নয়। আনন্দময়ীর অপত্যস্নেহধারা বর্ষিত হয়েছিল গোরার ওপর। প্রমথনাথ 'গোরা' উপন্যাসের খণ্ডিত অংশটি বেছে নিয়েছেন আলোচ্য গল্পে। গোরার জন্মরহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টা আছে

আলোচ্য ছোটগল্পে। গল্পটির বিষয়বস্তু হল, গোরার শৈশবকালীন আশ্রয় লাভের ঘটনা বর্ণনা।

প্রমথনাথের রবীন্দ্রপ্রভাবিত আরেক অনবদ্য ছোটগল্প হল 'কমলার ফুলসজ্জা'। রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের রমেশ কমলা ও নলিনাক্ষের জীবনে যে জটিল সমস্যার উদ্ভব ঘটেছিল সে সমাধানসূত্র রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে নিরূপণ করেছেন প্রমথনাথ সেই পথে না এসে ভিন্নপথে সমাধানের সূত্র নির্ণয় করে কাহিনীর পরিসমাপ্তি টেনেছেন। গল্পটিতে যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত হয়েছে তার সার্থক শিল্পরূপ দিতে পেরেছেন ছোটগল্পকার প্রমথনাথ বিশী।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের খণ্ডাংশ অবলম্বনে রচিত যে ছোটগল্পটি প্রমথনাথ লিখেছেন তার নাম 'কুন্দনন্দিনীর বিষপান'। বিষবৃক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন কুন্দনন্দিনী বিষপান করে আত্মহত্যা করেছে। অভিমানিনী এই নারীর আত্মহত্যায় উদ্বুদ্ধ করেছিল হীরাদাসী। প্রমথনাথের কুন্দনন্দিনী বিষপান করেও মরে না। তাঁর কল্পনায় এই চরিত্রটি আরোও বহুদূর এগিয়ে গেছে। বিষপান করলেও তাকে সেবা শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে। সে কমলমণির গৃহে আশ্রয়লাভ করে বিদ্যাসাগরের উৎসাহে শিক্ষা জীবনে প্রবেশ করে। এরপর উচ্চশিক্ষিতা হয়ে একটি গ্রামের বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষয়িত্রী পদ অলংকৃত করেছে। শিক্ষিকা বৃত্তি গ্রহণ করে তার জীবন যখন সহজ সরল পথে আবর্তিত হয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে সূর্যমুখীর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। সেও সূর্যমুখীর সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের দাম্পত্য জীবনের দ্বিতীয় পত্নীর মর্যাদা পেতে আগ্রহী। সে বুঝতে পেরেছে নারী জীবনের পূর্ণতা আসে স্বামী ও পুত্রের উপস্থিতিতে। সেজন্যে পুনরায় জীবনে প্রত্যাবর্তনের সুখস্বপ্ন সে দেখেছে কিন্তু সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী' উপন্যাস অবলম্বনে রচিত প্রমথনাথের 'রাধারাণী' ছোটগল্পটি। তবে প্রমথনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারাণী চরিত্রের বিবর্তন দেখিয়েছেন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে রাধারাণীর পরিণতি টেনেছেন মিলন মধুর রোমান্টিক আবহে প্রমথনাথ সেখানে বিয়োগান্তক পরিণতি দেখিয়ে অত্যাধুনিক যুগযন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন। গল্পটিতে বঙ্কিম উপন্যাসের নব রূপায়ণ ঘটেছে। মিলন নয় বিচ্ছেদ বেদনায় রূপান্তরিত হয়েছে কাহিনী। এখানেই প্রমথনাথের মৌলিকত্ব।

'শুভদৃষ্টি' গল্পে আছে অলৌকিক পরিবেশ। তবে গল্পকার গল্পটি লিখতে গিয়ে বাস্তবতাকে অস্বীকার করেননি। কোন এক শীতের রাতে নির্জন স্টেশনে জনহীন ওয়েটিং রুমে গল্পকথক এক শীর্ণ চেহারাযুক্ত বিবর্ণ মুখযুক্ত একটি লোকের সঙ্গে পরিচিত হন। লোকটি শুনিয়ে যায় তার অতীত জীবনের স্মৃতি। সে আন্তরিকভাবে ভালোবেসেছিল নমিতাকে। কিন্তু সামাজিক বাধায় তারা বিবাহের স্তরে পৌঁছাতে পারেনি। আবার যেদিন কমলা নামে অন্য এক মেয়েকে বিয়ে করতে গিয়েছিল তখন বিবাহের শুভদৃষ্টির সময় দেখতে পেল সে কমলা নয়, তার অতীত প্রেমিকা অসুস্থ নমিতা। বাসর ঘরে পৌঁছে নববধূ অজ্ঞান হয়ে পড়ল। আর সে বেঁচে উঠল না। লোকটি জানাল নমিতার মৃত্যু

হয়েছে সকালে, ঠিক কমলার মৃত্যু হয়েছে একই সময়ে। তখন তার মনে হল নমিতা ও কমলা অভিন্ন। তখন গল্পকথক বাইরের দিকে দ্রুতবেগে ছুটে এল এবং তার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ভোরের আলো মিলিয়ে গেল। আলোচ্য গল্পে প্রমথনাথ নমিতার প্রতি লোকটির ভালোবাসার আবির্ভাব মুহূর্তটি সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

'স্বপ্ন লব্ধ কাহিনী' ছোটগল্পে প্রমথনাথ অতিলৌকিক জগত থেকে ফিরে এসেছেন লৌকিক জগতে। আলোচ্য গল্পের কাহিনী গল্পলেখকের স্বপ্নে দেখা। স্বপ্নে যেভাবে ইন্দিরাকে দেখেছেন তার সার্থক বর্ণনা আছে এই গল্পে। লেখকের লেখার কৌশলের সঙ্গে স্বপ্নে দেখা মেয়েটির কোথাও অমিল নেই। এমনকি মেয়েটির হস্তাক্ষর ও তার কথাবার্তার মাধ্যমে যে ভাষা বেরিয়ে এসেছে সেই ভাষারই যথাযথ প্রতিলিপি আছে এই গল্পে। লেখক জানিয়েছেন যে স্বপ্নের মধ্যে উঠে এসে তিনি গল্পটি লিখে ফেলেছেন। লেখক দেখিয়েছেন নির্জন রজনীতে ইন্দিরার সাহচর্য লাভ। গল্পটিতে চমক আছে সন্দেহ নেই, তবে অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' ছোটগল্পের সঙ্গে তুলনীয়।

প্রমথনাথের 'উল্টা গাড়ি' ছোটগল্পে পরিবেশিত হয়েছে অতিলৌকিক রস। গল্পকার যখন প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছেন সে সময় অতীত স্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে যৌবনের প্রথম প্রেমকে উপলব্ধি করেছেন, গল্পটির বিষয়বস্তু হল কোনো এক শীতের দুপুরে ছোট্ট একটি রেল ষ্টেশনের ট্রেনের জন্য প্ল্যাটফর্মের বসবার জায়গায় বসে বসে প্রবীণ নায়ক স্মরণ করে চলেছেন তার অতীতের প্রেমের কথা। প্রেমিকার নাম ছিল মঞ্জুলা। লেখক দেখলেন একটি কিশোরী প্রতীক্ষালয় থেকে বেরিয়ে এসে দেশলাইটি চাইল। তখন কিশোরীটির সঙ্গে আলোচনা করে নায়ক জানতে পেলেন কিশোরীটি আসলে মঞ্জুলারই মেয়ে। মা ও মেয়ে অকেকটা একই দৈহিক গঠন বিশিষ্ট। সুদীর্ঘ ২৭ বছর পর আবার ফিরে এল তার পূর্বের প্রেমিকা অর্থাৎ মঞ্জুলা। তখন মঞ্জুলা বয়সে প্রবীণা। সপ্তদশী সুন্দরী লাবণ্যময়ী অনন্তযৌবনা মঞ্জুলার অনেকটা বিবর্তন ঘটে গেছে। ক্ষণকালের জন্য গল্পের নায়কের মনে গভীর বেদনার সৃষ্টি হলেও মঞ্জুলার লাবণ্যহীন লোলদেহ দেখে তার হৃদয় থেকে যন্ত্রণার অবসান ঘটল। সময়ের গতির সঙ্গে তাল রেখে দুজনের মধ্যে একজন বার্ধক্যে অন্যজন প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে গেছে। এই অবস্থা তাদের মনে ইতিপূর্বে তেমন ভাবে রেখাপাত করেনি। বার্ধক্য মঞ্জুলাকে কিছুটা স্পর্শ করলেও সে যেন আজও আনন্দময়ী ও কলকণ্ঠী। কিন্তু দুজনই বার্ধক্যের বিষপাত্র আকণ্ঠ পান করেছেন। এরপর প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছল একটি ট্রেন। মঞ্জুলা তার মেয়েকে নিয়ে চলে গেল তার গন্তব্যস্থলে, কিন্তু রেখে গেল নায়কের মনের প্রেমের সুতীব্র অনুভূতি। সে উপলব্ধি করল বয়স বেড়ে গেলেও প্রেম প্রেমই থাকে বাস্তব জীবনের এটাই সত্য। রবীন্দ্রনাথ যে কায়ানৈকট্যহীন প্রেমের কথা ব্যক্ত করেছেন নাটকে, গল্পে, উপন্যাসে, গানে তার সার্থক রূপ হল প্রমথনাথের 'উল্ট াগাড়ি' ছোটগল্পটি। রবীন্দ্র কথিত প্রেমের পূর্ণতার ছবি আলোচ্য ছোটগল্পের বিষয়।

প্রমথনাথের লেখা 'পাশের বাড়ি' ছোটগল্পটিতে পরিবেশিত হয়েছে ভৌতিক রস। জনহীন পরিত্যক্ত বাড়িটিকে ঘিরে ছোটগল্পকার রহস্যের জাল বিস্তার করেছেন। ধীরে

ধীরে অতিলৌকিক আবহ যখন ঘনীভূত হয়েছে সে মুহূর্তে কঠিন কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে অতিলৌকিক পরিবেশ থেকে লৌকিক জগতে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আলোচ্য 'পাশের বাড়ি' গল্পটি সার্থক ভৌতিক রস সৃষ্টি হতে পারেনি।

'আয়নাতে' ছোটগল্পটি অতিলৌকিক। গল্পটিতে প্রমথনাথ আতঙ্ককর ও গা-ছমছম করা এক ভৌতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টির প্রয়াসী হয়েছেন। সে বহুকার আগের কথা, এক বিশাল প্রাসাদে ঘটেছিল এক হত্যাকাণ্ড। এ হত্যালীলা ছিল বীভৎসতা ও কারুণ্য রসযুক্ত যা প্রত্যেক পাঠকের কাছে গভীর সমবেদনার সৃষ্টি করে। গল্পটিতে অতিলৌকিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে এক রোমহর্ষক ঘটনার মধ্য দিয়ে। সে অট্টালিকার একটি সাজানো গোছানো ঘরে একটি বৃহৎ আয়না আটকানো ছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য অতীতের ঘটে যাওয়া নির্মম হত্যাকাণ্ড প্রতিরাতে সেই আয়নার ওপরে ছায়াভিনয় ঘটত। কিভাবে হত্যাকারী এগিয়ে এসে নির্মমভাবে হত্যা করল সে ঘটনা দেখা যেত। প্রারম্ভ থেকে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত যে ঘটনাধারা আবর্তিত হয়েছে, ছায়াছবির পর্দার মধ্যে যা দেখা যেত যা পাঠক মনে এই রোমাঞ্চকর কাহিনীর মাধ্যমে অতিলৌকিক রস সৃষ্টি করেছে।

'বিনা টিকিটের যাত্রী' ছোটগল্পটিতে লেখক অতিলৌকিক রস আমদানি করেছেন। স্টেশন মাস্টার তার অভিজ্ঞতার কাহিনী পরিবেশন করে চলেছেন ট্রেন ফেল করা বিনা টিকিটের যাত্রী এক ভদ্রলোককে। ভদ্রলোকটি হলেন ভৌতিক কাহিনীর একজন শ্রোতা। একটি নির্জন স্টেশনে শীতের অন্ধকারে বিরাজ করছিল রাতের নিস্তব্ধতা সেখানে একটানা ঝিঁ ঝিঁর ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। স্টেশন মাস্টারের ঘরে চারজন লোক নীরবে শুনে যাচ্ছে গল্পকথক বর্ণিত রোমাঞ্চকর কাহিনী। গল্পকার গল্পটিতে ভৌতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন নিম্নলিখিতভাবে—

"বাহিরে অন্ধকারে শীতের মধ্যে ঝিঁঝিঁর একটানা আওয়াজে রাত্রির নিস্তব্ধতা ঝিমঝিম করিতেছে—পৃথিবীতে আর যেন কোনো শব্দ নাই। ঘরের মধ্যে মৃদু আলোয় আমরা চারিটি প্রাণী চারিটি ছায়া লইয়া নীরবে বসিয়া আছি। মাস্টারবাবু বলিতেছেন।"[২১]

প্রমথনাথের অতিপ্রাকৃত রসাত্মক ছোটগল্প 'খেলনা' এক অনবদ্য সৃষ্টি। গল্পটি হয়ে উঠেছে রহস্যময়। পিতামাতার একমাত্র স্নেহ ভালবাসা গড়ে উঠেছিল একমাত্র শিশুটিকে ঘিরে। সেই শিশুটি যখন পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিল তখন থেকে ঝরে যাওয়া শিশুটিকে ঘিরে পিতামাতার মনে খেলনার মাধ্যমে গড়ে তুলেছিল এক কল্পজগৎ। তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার যে খেলাঘর তৈরি হয়েছিল তা যখন রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে ব্যর্থতায় উপনীত হল তারই বিশ্বাস অবিশ্বাসের কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে আলোচ্য ছোটগল্পের পরিমণ্ডল। লেখক সুকৌশলে সন্তান বাৎসল্যের এক অনবদ্যরূপ চিত্রিত করেছেন আলোচ্য ছোটগল্পে।

'অবচেতন' ছোটগল্পটি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের আলোকে অতিলৌকিক রস পরিবেশনের প্রয়াসী হয়েছেন ছোটগল্পকার। গল্পটির পটভূমি গড়ে উঠেছিল এক গভীর অরণ্যের ভয়াল পরিবেশে। লেখক অবচেতন মন নিয়ে গল্পের নায়কের যে কামনা সদ্যজাগ্রত ছিল তারই চরিতার্থ

কামনা রূপায়িত করেছেন। লেখকের মনে গড়ে উঠেছিল যে কল্পজগৎ তা চরিতার্থ হল। গল্পে প্রমথনাথ অতিলৌকিক পরিবেশে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সংযোজন ঘটাতে পেরেছেন। লেখক জানিয়েছেন—"বাদানুবাদে নামিতে আমি অপারগ; যাহারা খুশি বিশ্বাস করিবেন, যাহারা খুশি নয়, অন্যথা করিবেন।"[২২]

'কপালকুণ্ডলার দেশে' ছোটগল্পটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস পাঠের ফলশ্রুতি। গল্পটির নায়ক স্বয়ং লেখক। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো গল্পলেখক একদিন পৌঁছে গেছেন কপালকুণ্ডলার দেশে অর্থাৎ রসুলপুরে। নবকুমার, কপালকুণ্ডলা ও কাপালিক এই ত্রয়ী চরিত্রকে গল্পকার উপস্থাপিত করে সেখনাকার প্রকৃতিচিত্র অঙ্কন করেছেন। কপালকুণ্ডলার দেখা না পেলেও কাপালিক ও নবকুমারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল লেখকের। লেখক আশ্রয় নিয়েছিলেন একটি ভিটের উপর একটি জীর্ণ ঘরে। সেখানে নিস্তব্ধ রজনীতে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছেন কাপালিকের মত দীর্ঘাকায় বলিষ্ঠ দৃঢ় শরীর ও মাথায় জটাধারী এক পুরুষ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। সেই আলো ঘরের মধ্যে এসে পৌঁছেছে। ঘুম থেকে জেগে দেখতে পেলেন বারান্দায় ও ঘরের মেঝেতে কার যেন পদচিহ্ন। সেটা যেন স্বপ্নমূর্তির পায়ের আনুপাতিক ছাপ। পরক্ষণে গল্পকথক সেই ঘর ছেড়ে দ্রুত যাত্রা করে কিছুদূরে দেখতে পেলেন একটি লোককে। প্রশ্নের উত্তরে গল্পকথক জানালেন তিনি একটি ঘরে রাত কাটিয়েছেন। লোকটি বিস্মিত হয়ে জানাল, এখানে ঘর এল কোথা থেকে, এতো এক শূন্য ভিটে। তারপর লোকটি চলে গেল, গল্পকথক তার মোটরগাড়িখানার দিকে দ্রুত এগিয়ে এলেন। কিন্তু তার মনে এই অতিলৌকিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে প্রশ্নের মুখোমুখী হতে হয়েছিল তার সমাধানসূত্র কোনদিনই খুঁজে পাননি।

প্রমথনাথের অতিলৌকিক ছোটগল্পের এক অনবদ্য সংযোজন 'কালোপাখী' গল্পটি। মিনু নামে এক বালিকা একটি ছোট্ট কালোপাখি ধরে এনেছে তার বাড়িতে। পাখিটি কোকিলের মত কালো, কিন্তু ঠোঁট দুটি লাল নয়, তার গলায় ময়নার মতো একটা কণ্ঠী আছে যার রং ছিল লাল। সম্ভবত পাহাড়ি ময়নার মতো পাখিটি দেখতে। সে পাখিটিকে একটি খাঁচায় আবদ্ধ করে রেখে ছাতু, ফড়িং ও ছোলা জাতীয় খাদ্য খেতে দিত। অল্পসময়ের মধ্যে পাখিটি পোষ মানে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পাখিটি স্বপ্নে মিনুকে জানিয়ে দিয়েছে সে দিনের বেলা খাঁচায় থাকবে, কিন্তু রাতের বেলায় চলে যাবে দূর দেশে খাদ্যের অন্বেষণে। পাখিটির সঙ্গে নিবিড় স্নেহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মিনুর বিরাট পরিবর্তন ঘটল। যে মিনু তার বাবার কাছে বেশির ভাগ সময় কাটাতো এখন সে তার বাবার কাছে আসে না বললেই চলে। আগে সে খুব কথা বলতো এখন সে প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না। এমনকি সে তার সঙ্গীদের সাহচর্য থেকে অনেকদূরে, খেলাধূলোতে তার মন নেই। দিবারাত্র শুধু পাখিটিকে নিয়েই সে ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু আশ্চর্য দিনের বেলা খাঁচায় বন্দী পাখিটি কোনো খাবার খায় না। কিছুদিন পর মিনুর মামা এসে দেখল মিনুর শরীর খারাপ হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে তার মৃত্যু হল। এইভাবে ঝুমঝুমিরও মৃত্যু ঘটল। এই মৃত্যুঘটনা রহস্যময়।

"কালো পাখীটার সঙ্গে কোনো অজ্ঞেয় সূত্রে নিশ্চয় মিনুর মৃত্যু জড়িত। ঝুমঝুমির সব শেষ হয়ে যাবার পর থেকে পাখীটাকে আর দেখা যায়নি।"২৩

ছোটগল্পকার প্রমথনাথের 'ভৌতিক চক্ষু' গল্পটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। গল্পের ভৌগোলিক পটভূমি ইংল্যাণ্ডের বার্কশায়ার। গল্পটি একসময় সমগ্র ইউরোপের শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। জন ফস্টারের পাঁচ বছরের বুদ্ধিমতী, সুন্দরী সুশীলা ও লক্ষ্মীরূপা কন্যা সোফিয়াকে ঘিরে ছোটগল্পটি আবর্তিত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় চাকুরী ছেড়ে জন ফস্টার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল একটি গ্রামে। সেখানে জমি ও বাড়ি কিনে চাষবাস করে সহজ সরল জীবন ধারা অতিবাহিত করছিল। একদিন সোফিয়ার বামচোখ একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। ফস্টারের রিচার্ড নামে ভারতে থাকাকালীন সময়ে এক বন্ধুর পরিচয় ঘটেছিল। বন্ধু মেরিগোল্ড নামে চক্ষু চিকিৎসক জানিয়েছিলেন লণ্ডনে সুচিকিৎসায় সদ্যমৃত ব্যক্তির চোখ অস্ত্রোপচারের দ্বারা স্থাপন করা যায়, ফস্টার মেরীগোল্ডের শরণাপন্ন হলে সোফিয়ার বামচোখে নতুন দৃষ্টিলাভ করল। আনন্দিত ফস্টার গ্রামের লোকেদের আমন্ত্রণ জানিয়ে উৎসবের ব্যবস্থা করলেন। কয়েকদিন বাদেই সোফিয়ার আচরণে, দৃষ্টিতে ও কথাবার্তায় ব্যাপক পরিবর্তন দেখা গেল। তার চোখের দিকে তাকাতে ফস্টারের ভয় হত। করুণাময়ী বালিকার চোখটিতে যেন একচক্ষু শয়তান বাসা বেঁধেছে। এই নিষ্ঠুর দৃষ্টি ফস্টারকে ভাবিয়ে তুলেছিল। যে সোফিয়ার সঙ্গে আগে গৃহপালিত হাঁস মুরগি ও খরগোশের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। একদিন ফস্টার দেখতে পেল বেশ কয়েকটি প্রাণী মুন্ডহীন অবস্থায় পড়ে আছে। তখন থেকে সোফিয়ার প্রতি ফস্টারের সন্দেহ সৃষ্টি হল। রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য একদিন ফস্টার দেখলেন জাল ঘেরা সুবৃহৎ খাঁচার দরজা খুলে প্রবেশ করেছে সোফিয়া। এরপর ছিন্ন কণ্ঠ হাঁস, মুরগি ভূতলে পড়ে রইল। করুণাময়ী কন্যার প্রত্যক্ষদর্শী এই কান্ড দেখে তার মনে হল, তার কন্যা কি মানবী না শয়তানী। কন্যাবৎসল পিতা কন্যার এই পরিবর্তন সংবাদ জানালেন রিচার্ডকে এবং অনুরোধ করলেন তার গৃহে আসবার জন্য। বৈঠকখানায় বসে আছেন ফস্টার ও সোফিয়া। ডঃ রিচার্ডস আসবার পর সোফিয়া মহাআক্রোশে তার কণ্ঠ চেপে ধরল। বালিকার এই দুর্বিনীত আচরণ থেকে নিরস্ত্র করলেন দুজনে। ইতিমধ্যে রিচার্ডস ডঃ মেরীগোল্ডকে সংবাদ জানালেন। মেরীগোল্ড সোফিয়ার হিংস্র ব্যবহার জেনে স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন ফস্টারের গৃহে। মেরীগোল্ডের আগমন সংবাদ শুনে সোফিয়া উনুন খোঁচাবার লৌহদন্ড হাতে নিয়ে ছুটে এসে জানাল এই আমার হত্যাকারী। তারপর সোফিয়ার লৌহদন্ড কেড়ে নিয়ে তাকে একটি ঘরে আটকিয়ে রাখা হল। ডঃ মেরীগোল্ড জানালেন সোফিয়ার বাম চোখটি যার কাছ থেকে স্থানান্তর করা হয়েছিল সে একজন হত্যাকারীর। তার ফাঁসির হুকুম হয়। ফাঁসির দু'দিন আগে জানিয়ে যায় মৃত্যুর পরে তার বাম চোখটি যেন চক্ষু ব্যাঙ্কে দান করা হয়। ডঃ মেরীগোল্ড হত্যাকারী স্মিথের একটি ডায়েরি সংগ্রহ করে সেখানে যে তথ্য সংগ্রহ করেন, তার মধ্যে লেখা ছিল ডঃ গোল্ডের সাক্ষ্যে তার ফাঁসি হয়। মেরীগোল্ড জানালেন হত্যা করতে না পেরে ব্যর্থ কামনা পূর্ণ করবার জন্য সে দিয়ে যায় তার

বামচোখটি। যে ব্যক্তির দেহে এই চোখ স্থানান্তরিত হবে সেই স্মিথের অভিলাষ পূরণ করবে। এই জন্য সেই ভৌতিক চক্ষুযুক্ত সোফিয়া হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল ডঃ মেরীগোল্ডকে। এ নিয়ে যখন রিচার্ডস মেরীগোল্ড ও ফস্টারের কথাবার্তা চলছিল পরে কন্যাকে উদ্ধারের পন্থা নির্ধারিত হল তখন পাশের ঘর থেকে শোনা গেল সোফিয়ার আর্তনাদ। দেখা গেল সোফিয়ার বামচোখটি আমূল বিদ্ধ। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট ফট করে সে তার বাবার শরণাপন্ন হল। সম্ভবত সেই শয়তান তার দেহ ছেড়ে চলে যাবার আগে সোফিয়ার চোখকে হরণ করে নিল। তারপর সোফিয়ার প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল পিতার কোলে। আলোচ্য ছোটগল্পটিতে চক্ষুবিজ্ঞানী বুঝতে পারল কোনো এক অদৃশ্য শক্তির হাত আছে যে শক্তির কাছে সে নিজেও পরাভূত।

'ফাঁসি গাছ' ছোটগল্পটি অতিপ্রাকৃত রসযুক্ত। একটি বিশাল বলিষ্ঠ সমুন্নত প্রাচীন গাছটিকে ঘিরে ফাঁসিগাছ ছোটগল্পটির সৃষ্টি। সুদীর্ঘ বছর ধরে প্রচলিত ধারণা গড়ে উঠেছিল যে নবাবী আমলে প্রাণদন্ডে দন্ডিত ব্যক্তিদের গাছের ডালে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হত। শতাধিক বছর ধরে পরিচিত ছিল এই গাছটি ফাঁসিগাছ নামে। সেই বনের ধারে অবস্থিত এই গাছটির পাশ দিয়ে রাতের বেলায় কেউ ভয়ে যেত না। কত পথিক রাতের বেলায় অজান্তে যেতে যেতে মূর্ছিত হয়ে পড়ত। কেউ দেখত গাছটির ডালে ডালে ঝুলছে সারি সারি মৃতদেহ। এক বিদেশী গাছ তলায় পৌঁছালোমাত্র তার পায়ের তলায় এক মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছে। কেউ শুনতে পেত মুমূর্ষুর অন্তিম আর্তনাদ। একদিন গল্পলেখক ফিরছেন সেই স্টেশনের পাশ দিয়ে সেই গাছের তলা দিয়ে। গল্পলেখকের মন থেকে মুছে যায়নি অতীত স্মৃতি বিজড়িত সেই ফাঁসিগাছটির কথা। একটা টম্‌টম্ গাড়িতে চেপে যাত্রা পথে লেখক দেখতে পেলেন সেই গাছটিকে, যে গাছটি প্রকাণ্ড এক দৈবী অতিকায় পুরুষের মতো অন্ধকারে শাখা প্রশাখা মেলে অবস্থান করেছে। গাছটি অতিক্রম করবার পর দারোয়ান লেখককে জানাল আজ থেকে পাঁচ বছর আগে কালবৈশাখীর ঝড়ে গাছটির মাথায় বাজ পড়ে আগাগোড়া পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে। তারপর ঝড়ে জলে গাছটির অস্তিত্ব হয়েছে বিলুপ্ত। কিন্তু গল্পলেখক ফিরে আসবার পথে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া গাছটিকে জীবন্তভাবে দেখতে পেলেন কিভাবে তার কোন সদুত্তর তিনি খুঁজে পাননি। ক্রমাগত অবিশ্বাস্য এই ঘটনা আলোড়িত করে তুলেছিল তার মনকে, তার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তিনি খুঁজে পাননি।

প্রমথনাথের 'গোষ্পদ' ছোটগল্পটি অতিপ্রাকৃত শ্রেণির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। গোষ্পদ গল্পটির নায়ক ও কথক অমলেন্দু। সে সন্ত্রাসবাদী মতবাদে বিশ্বাসী। সে পরিবেশন করেছে ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী। কলকাতা থেকে স্বগ্রাম তালপুকুরে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে তাকে ফিরতে হচ্ছে নিজ বাড়িতে। বাড়ি ফেরার বহুপথের মধ্যে অমলেন্দু বেছে নিল সংক্ষিপ্ত মেঠো পথ। একাকী চলতে চলতে দেখতে পেল চাদর গায়ে জড়ানো এক মুসলমান চাষিকে। অমলেন্দু সঙ্গী পেয়ে গল্প জমাতে জমাতে পথ চলছে। দূরে যখন লোকালয়ের আলো দেখা যাচ্ছিল তখন অমলেন্দু স্বস্তি পেল একারণে যে তার ভয়ের

কাল অতিক্রম হয়ে গেছে, একথা জানবার পর মুসলমান চাষীটির চোখের দৃষ্টি দেখে ও কণ্ঠস্বর শুনে অমলেন্দুর মনে ভয়ের সঞ্চার ঘটল। মুসলমান চাষীটি জানাল, বটে মাঠ পেরিয়ে এসেছ বলে কোনো ভয় নেই। তারপর অমলেন্দু শুনল অমানুষী কণ্ঠস্বর, দেখতে পেল তার হাঁটু থেকে নীচে অব্দি পা দুখানা গরুর বা গোষ্পদ। তখন তাকে দেখে অমলেন্দুর চেতনা শক্তি বিলুপ্ত হয়ে মাঠে শায়িত অবস্থায় পড়ে আছে। যাবার বেলায় সেই মিঞা অমলেন্দুর মা ও বোনকে জানিয়ে যায় এক ছেলে ভিটের ওপর অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে আসবার পর দেখে সেখানে উপস্থিত তার মা ও বোন। তাদের আকস্মিক আগমনে অমলেন্দু জানতে পেল মিঞার চেহারা যুক্ত লোকটিই খবর দিয়েছে। একথা শুনে শ্রোতাদের মুখে কথা ফোটেনি, সকলেই অন্ধকার রাত্রিতে নিস্তব্ধভাবে বসে রইল।

প্রমথনাথের 'গুলাব সিং এর পিস্তল' ছোট গল্পটিতে ইতিহাস রস ও অতিলৌকিক রসের সমন্বয় ঘটেছে। গুলাব সিং এর পিস্তলটির সঙ্গে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী গড়ে উঠেছে। গুজরানপুরের থানাদার মর্দান আলি তার প্রতিদ্বন্দ্বী গুলাব সিংকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে তারা দুজনেই নিহত হয়। মর্দান আলির বরকন্দাজরা গুলাব সিং এর পিস্তলটি উদ্ধার করে জমা রাখে সরকারি মালখানায়। পিস্তলটি ছিল গুলাব সিং এর পূর্বপুরুষদের ব্যবহৃত। কানপুরের ম্যাজিস্ট্রেট টাকার সাহেব চল্লিশ টাকার বিনিময়ে গুলাব সিং এর পিস্তলটি কিনে নিয়েছিল। পিস্তলটির সঙ্গে যে একটা রোমাঞ্চকর কাহিনী জড়িত ছিল বলেই অনেকদিন থেকে সেই সাহেব পিস্তলটি সংগ্রহের লোভ সংবরণ করতে পারেনি। কানপুর থেকে বিলেতে যাত্রার আগে টাকারের গৃহে অর্জুন নামে এক শিখ যুবক এসে সে যে গুলাব সিং এর পুত্র জানিয়ে তাদের দু তিন পুরুষের স্মৃতিজড়িত পিস্তটি চাইল এবং টাকারকে জানিয়ে দিল পিস্তলটি সে সঙ্গে রাখলে তার অমঙ্গল সুনিশ্চিত। মর্দান আলির কাছে যে সময় পিস্তলটি ছিল তখন তার এক পুত্রের পিস্তলের গুলিতে মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু টাকার তার অনুরোধ অগ্রাহ্য করে পিস্তলটি ফেরৎ না দিয়ে বিলেতে নিয়ে যায়। তার কয়েক বছর পর টাকার কানপুরের ম্যাজিস্ট্রেট পার্কারকে একখানি পত্র লিখে জানাল, পুলিন্দায় প্রেরিত পিস্তলটি যেন অবিলম্বে গুজরানপুরের মৃত গুলাব সিং এর পুত্র অর্জুনকে ফেরৎ দেওয়া হয়। সে সতর্ক করে দিল পার্কার যেন পিস্তলটি কোনক্রমেই ব্যবহার না করে। একমাত্র গুলাব সিং এর বংশধর ছাড়া অন্য সকলের হাতে পিস্তলটির শোচনীয় পরিণাম ঘটেছে। এমনকি টাকার সাহেবের ছোট ছেলেও একদিন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় নিহত হয়ে পড়ে আছে। পাশে ছিল তার পিস্তলটি। খেলবার জন্য সেই পিস্তলটি তার ছেলে নিয়ে গিয়েছিল অথচ পিস্তলে কোনো গুলি ছিল না। তবে সে গুলি কিভাবে এল তার কোনো সমাধানসূত্র টাকার খুঁজে পায়নি। পার্কার কৌতুহলের সঙ্গে পিস্তলটি লক্ষ্য করে মনে করল কোনো হিংস্র প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর জীর্ণ চোয়াল দিয়ে পিস্তলটি প্রস্তুত হয়েছিল।

'পুরন্দরের পুঁথি' ছোটগল্পটি প্রমথনাথের সফল সৃষ্টি। পুরন্দর গ্রন্থ পাগল লোক। বই

কেনা ও বই পড়া তার নেশা। গ্রন্থগুলো সে কিছু পড়ত কিছু রেখে দিত, যখন তার বই কেনার সামর্থ্য থাকবে না সে সময় পড়বার জন্য। তার বিছানায় আলমারিতে তক্তপোশে শুধু বই আর বই। সে গ্রন্থ বিলাসী বিজ্ঞাপন দেখে পুরোনো বই বেশি কিনত। এইজন্য মাঝে মাঝে সে গ্রাম থেকে ছুটে যেত কলকাতায় বই কেনার জন্য। গ্রন্থ পাগল এই লোকটি জীবনে বিয়ে করবার কথাও ভাবতে পারেনি। গল্পলেখকের সঙ্গে পুরন্দরের ঘনিষ্ঠতা ছিল অনেক বেশি। ছোটনাগপুরের কাছে লেখক ও পুরন্দর থাকত আলাদা আলাদা বাড়িতে। একদিন পুরন্দর চাকরকে দিয়ে লেখককে ডেকে পাঠালেন এবং দেখালেন কাঠের বাক্স খুলে সদ্য আনা অনেক বই। বইগুলো ছিল এক সাহেবের। সাহেব ছিল বড় পণ্ডিত ও বহুভাষাবিদ, চীনা ভাষাতেও তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। পুরন্দর চীনে ভাষা ও হিন্দি ভাষার বইগুলি পাঁচশো টাকার বিনিময়ে কিনে এনেছিল। ইতিমধ্যে লেখক চলে গেছেন কলকাতায়, সেখান থেকে ফিরে পুরন্দরের গৃহে এসে জানতে পেল পুরন্দরের কয়েকদিন থেকে চোখে ঘুম নেই। সে প্রত্যহ বইখুলে বসলেই ঘুমিয়ে পড়ত.এবং এক দুঃস্বপ্ন দেখত। স্বপ্নে যাকে দেখতে পেত তার চোখ দুটি খুবই ছোট নাক চ্যাপ্টা, চোয়াল উঁচু, সামান্য কটা দাড়ি ও মাথায় জটাযুক্ত একটি লোক। গল্পকথক পুরন্দরের গৃহে কয়েকদিনের জন্য রাতে শুতে এলেন তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বইগুলো পড়বার। একদিন পুরন্দর ঘুমিয়ে পড়লে গল্পকথক রাত বারোটা পর্যন্ত বই পড়ে জানালার দিকে তাকিয়ে বাইরে দেখতে পেলেন একটি লোককে। লোকটি পুরন্দর বর্ণিত চেহারা যুক্ত। গল্পলেখক কে? কে? বলাতে পুরন্দর জেগে উঠল, এল তার কাছে, পুরন্দর সেই লোকটির স্বপ্ন দেখেছে। গল্পলেখক দেখলেন জানালার পাশে ভেজা মাটি। কিন্তু কোনো পায়ের চিহ্ন নেই। পুরন্দর জানাল এটা ভ্রম ছাড়া কিছু নয়। পরদিন একজন ঘুমিয়ে থেকে অন্যজন জাগরণে যে ব্যক্তিটি দেখেছিল তারা এক ও অভিন্ন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হল। রায়মশাই নামে তিনি পরিচিত। রায়মশাই সদ্য কিনে আনা বইগুলো দেখতে আগ্রহী হয়। পুরোনো পুস্তক ব্যবসায়ী পুরন্দর এর কাছে বইগুলো বেচে দেবার পর থেকে প্রত্যহ এক অদ্ভুত লোকের দুঃস্বপ্ন দেখত। ইতিমধ্যে বিলেত থেকে সাহেব লিখেছে তিব্বতি ভাষায় হাতে লেখা পুঁথিটি ভুল করে সে বিক্রি করেছে। উক্ত বইটি সে এয়ার মেল এ পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ করে। অনেক চেষ্টার পর রায়মশাই বইটি পেয়ে পাতা ওলটাতে গিয়ে সাদা পাতায় সেই স্বপ্নে দেখা লোকটির ছবি দেখে চমকে উঠল। পুরন্দর ও গল্প কথকও দেখল। তিব্বতি বইটিতে সেই স্বপ্নে দেখা লোকটির ছবি, তারপর রায়মশাই বইটি নিয়ে এয়ার মেল পাঠিয়ে দেবার পর থেকে কেউ আর স্বপ্নে সে মূর্তিটি দেখতে পায়নি। এই কার্যকারণ সূত্র তারা কেউ আবিষ্কার করতে পারে নি।

অতিলৌকিক শ্রেণিভুক্ত 'অশরীরী' ছোটগল্পটি প্র. না. বি.-র অসাধারণ সৃষ্টি। গল্পের বিষয়বস্তু হল কয়েকটি মৃত্যু ঘটনার কারণ অনুসন্ধান। একটি পরিবারে কয়েক মাসের মধ্যে চার চারটি মৃত্যু এক অনৈসর্গিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। প্রথমে ছাদ থেকে পড়ে মারা গেল ছোট ছেলে, সেই শোকে অল্পদিনের মধ্যে তার মা মারা যান। তার কয়েকদিন

বাদেই তৃতীয় মৃত্যু ঘটল বয়স্ক এক বালকের। বিদ্যুতের সুইচ্ টিপতে গিয়ে সে প্রাণ হারায়। চতুর্থ মৃত্যু ঘটল বাড়ির চাকরের। মৃত্যুর মিছিলে শোকাভিভূত হয়ে পড়ল বাড়ির সকল সদস্য। সকলেই চিন্তিত ছিল আবার মৃত্যু কাকে হরণ করবে। কোনো এক অদৃশ্য শক্তির অঙ্গুলি হেলনে মৃত্যুগুলো সুসম্পন্ন হচ্ছে এটা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। দৈনন্দিন কাজকর্মে তারা নিযুক্ত থাকলেও তাদের প্রত্যেকের মনে মৃত্যু ভয় জাগ্রত হত। বাড়িতে সৃষ্টি হয়েছিল নিঝুম পরিবেশ। কোনো কণ্ঠস্বর ও পদধ্বনি তাদের আতঙ্কিত করে তুলত। এমন সময় এক পশ্চিমা চাকর নিযুক্ত হল সেই গৃহে। একদিন রাতে নবনিযুক্ত চাকরটির তীব্র আর্তস্বর শোনা গেল। ভয়ে সে থরথর করে কাঁপছিল। জানা গেল জানালার বাইরে বকুল গাছটির কাছে সে দেখেছে দুটি দেও একজন লেড়কা, অন্যজন ঔরৎ। তারা দুজনেই জানালার দিকে মুখ করে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে। গৃহকর্তা তাকে বহুভাবে বোঝালে। ভোরবেলায় পশ্চিমা চাকর সেলাম জানিয়ে বিদায় নিয়ে চলে যায়। যাবার বেলায় জানিয়ে গেল এই বাড়িতে দেও বা অপদেবতা আছে। এই ভীতিভাব সকলের মনে সঞ্চারিত হল। তখন গৃহকর্তা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তার জানালেন নার্ভাস শক, এর জন্য তার এই অসুস্থতা। এই রোগের লক্ষণ দেহ বৈকল্য, যার ঔষধ অনাবিষ্কৃত। এই রোগের প্রথমে মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ হয় পরে ভেঙ্গে পড়ে শারীরিক স্বাস্থ্য। গৃহকর্তা ঘুম ভেঙ্গে জানালার দিকে তাকিয়ে দেখলেন একটি কালো মস্তক। এরপর একদিন 'অশরীরী' জলপান করবার জন্য এসেছে বকুলগাছের তলায়। ঘরে গ্লাস ভর্তি জল ঢাকা ছিল পিরিজ দিয়ে কিন্তু সেটা জলশূন্য। তাহলে জল খেল কে? অন্যদিন দেখল সেই গ্লাসটির উপর এক ইংরেজি গল্পের বইটি। চমকে উঠে গৃহকর্তা ভাবলেন এই বইটি নীচে লাইব্রেরিতে ছিল। তার মনে প্রশ্ন উদয় হল বইটিকে এখানে আনল কে? আর গ্লাসের জলই বা পান করল কে? গৃহকর্তার কলকাতার বাড়িতে বসে শিমূলতলার বাড়ির ঘুঘুর ডাক শুনতে। তারপর ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে চলে এলেন শিমূলতলায়। ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বেড়িয়ে পড়লেন দূর ভ্রমণে। তার ভ্রমণসঙ্গী জুটল আরও দুজন। হঠাৎ চায়ের নেশা পাওয়ায় দুধের অভাবে দেখা দিল, দূরে গোটা কয়েক গরু ও রাখালকে দেখে দুধ কিনবার জন্য মনস্থ করলেন। কিন্তু অন্যসঙ্গীরা গরু ও রাখাল কিছুই দেখতে পেলেন না। গৃহকর্তার প্রশ্ন জেগেছে এখানেও কি সেই অশরীরীর প্রভাব লেগেছে। এরপর ট্রেন থেকে নেমে আশ্রয় নিলেন বিহারের এক ঘরে। সেই ঘরে ইংরেজ গভর্নরের এক ছবি টাঙানো ছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য সেই ছবিটা উল্টানো রয়েছে। তার মনে হল এটাও সেই অশরীরীর কাজ। ট্রেনের বাথরুমে আলো জ্বালিয়ে দরজা বন্ধ করে কে যেন গুনগুন করে গান গাইছে। দরজা খুলে গেলে দেখতে পেলেন জনশূন্য বাথরুম। তারপর চুনার স্টেশনে নেমে এক বৃহৎ অট্টালিকায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ঝাউগাছে ঘেরা কবর দেখতে গিয়ে গল্পকথক হারিয়ে ফেলেছেন একজোড়া জুতো। সে সময় গোরস্থানের রক্ষক এক মুসলমান একজোড়া জুতো এনে জানালেন দুজন লোক এসে জুতো জোড়া ফেলে রেখে চলে গেছে। তাহলে তার মনে প্রশ্ন জাগল এই দু'জনও কী অশরীরী? সেই অট্টালিকায় ফিরে এসে গভীর

রাতে কেউ যেন কড়া নাড়ছে। ঘুম ভেঙ্গে কারো সাড়া না পেয়ে অশরীরী উপস্থিতি লক্ষ্য করলেন। তারপর ঘরের আয়নায় দেখতে পেলেন ছায়া। এ ছায়া যেন কোনো এক অদৃশ্য শক্তির প্রতীক। তখন তিনি অশরীরীর শিস্ ধ্বনি শুনে, পিস্তল নিয়ে অন্ধকারে গুলি নিক্ষেপ করলেন অশরীরীর উদ্দেশ্যে। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হলেন। পিস্তলের গুলিতে আয়না গেল ভেঙ্গে। তারপর গল্পকথক টেলিফোন করলেন শিমূলতলায় তার আত্মীয়পরিজনদের আসবার জন্য। সেখান থেকে কয়েকজন এলে তিনি ফিরে এলেন শিমূলতলায়। কাহিনীটি বন্ধুদের কাছে পরিবেশন করলে তারা জানাল এটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার।

অতিলৌকিক ছোটগল্পগুলোর মধ্যে 'স্বপ্নাদ্য কাহিনী' ছোটগল্পটি প্রমথনাথের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। লেখক আলোচ্য ছোটগল্পটি পত্রাকারে পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। অরবিন্দ পত্রটি লিখেছে যতীনকে উদ্দেশ্য করে—পত্রের যথাযথ উত্তরের ব্যাখ্যা চেয়ে। জাপানি বোমার আক্রমণের ভয়ে কলকাতা থেকে তিন বন্ধু এসেছিল বিহারের কোনো একটি বাড়ি ভাড়া ঠিক করে পরিবারবর্গদের নিয়ে থাকবার জন্য। এক শেঠজী ছিল বিহারের সেই পুরোনো বৃহৎ বাড়ির মালিক। সে বাড়িতে কোন ভাড়াটেই থাকতে পারত না প্রত্যেকেই দেখতে পেত দেয়ালের মধ্যে নরকঙ্কালের ছবির স্বপ্ন। প্রত্যেকের মতো নরকঙ্কালের স্বপ্ন দেখেছিল সেই গৃহে অবস্থানকালে তিন বন্ধু। গল্পকথক রাতে জেগে থেকে দেখতে পেলেন একটি জোনাকির মতো ক্ষীণ আলো তবে সে আলো মিট মিট করে জ্বলেনি অনেকটা ছিল একদম স্থির। তারপর দেখতে পেল আরো একটি আলো। টিপবাতি জ্বালিয়ে দেখলে দেয়ালটি পরিষ্কার সাদা। তারপর দেখল দুই আলোকবিন্দু দুটি চোখের মতো দেয়ালের গায় একটা নরকঙ্কালকে। কঙ্কালটি একটি চোখ যেন ক্রোধের অন্যটি হিংসার রশ্মি। নরকঙ্কালটি যেন দেয়াল থেকে এগিয়ে আসছে তার দিকে। এই দৃশ্য দেখে গল্পকথক অজ্ঞান হয়ে ভূমিতে পড়ে রইলেন। সকাল হতে না হতেই বাড়িওয়ালা শেঠজী ভাড়ার টাকাটি নিতে এল। কমল জানাল শেঠজীকে দশটার সময় আসতে। তারপর বাড়িওয়ালা চলে যাবার পর অরবিন্দ জগৎকে জানাল কাল রাতে সে দেখেছে এক বীভৎস স্বপ্ন সে রাতে চার পাঁচ জন মিলে একটা লোককে খুন করতে পাঁচবার দেখেছে। জগৎ যে একই ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছে তা জানাল। সে স্বপ্নে দেখেছে কেউ একটা লোককে খুন করবার পর বাড়ির দেয়াল ইট সাজিয়ে মৃতদেহটাকে খাড়া করে ইট গেঁথে সমান করে দিচ্ছে। গল্পলেখক ও অরবিন্দ জানালো তার রাতের স্বপ্নটি। পরিশেষে বাড়িটা ভাড়া নেওয়া হল না একদিন সকালবেলা অরবিন্দ সংবাদপত্রের একটি কলমে 'রহস্যময় আবিষ্কার' শীর্ষক আলোচনায় জানতে পেল মির্জাপুর জেলায় গঙ্গাতীরে অবস্থিত এক বাড়ির দেয়াল সংস্কার করাতে গিয়ে একটি দণ্ডায়মান নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়। পুলিশের অনুমান ২৫০/৩০০ বছর বেশি এই কঙ্কালটির বয়স। বিশেষজ্ঞদের অনুমান গোপনে লোকটিকে মেরে ফেলে দেহটাকে দেয়ালে গেঁথে রেখেছে। একটি বিদেহী সত্তা অপর দেহকে প্রভাবিত করবার পেছনে যে কারণ তা হল মানুষের অতৃপ্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা আশা আকাঙ্ক্ষা মানবজন্মের ক্ষেত্রে কিছুদিন সক্রিয় ও সজীব থাকে।

প্রমথনাথের অতিলৌকিক শ্রেণিভুক্ত সার্থক ছোটগল্প 'তান্ত্রিক' প্রমথ প্রতিভার উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আলোচ্য গল্পে কথক ভ্রমণ পিপাসু মন দিয়ে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে বন্ধুর উৎসাহে পল্লীর উন্নয়নে অংশগ্রহণ করলেন। সেসময় এক তান্ত্রিকের সান্নিধ্যে রক্তাম্বর ও নরকপাল সংগ্রহ করে তার খাঁটি তান্ত্রিক হবার বাসনা জাগ্রত হয়। প্রথম পরিচিত তান্ত্রিকের আকস্মিক মৃত্যু হলে পঞ্চকোট পাহাড়ের কাছে অন্য এক মহাতান্ত্রিকের সন্ধানে গল্পকথক বেড়িয়ে পড়লেন। পথে দেখতে পেলেন রক্তচন্দনের তিলক ও রক্তবসনযুক্ত রুদ্রাক্ষের মালা পরিহিত এক তান্ত্রিককে। তার সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে জানতে পারলেন যে তন্ত্রসাধনার পথ বহু বাধা বিঘ্ন যুক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ তান্ত্রিক তার নিজস্ব জীবন কাহিনী শুনিয়ে যায় একে একে। কোনো এক শুভদিনে সংসার জীবনে প্রবেশের পর স্ত্রীপুত্র নিয়ে সুখীসমৃদ্ধ জীবনযাপন করেও একজন অভিজ্ঞ তান্ত্রিক রূপে ঘটল তার পরিচয়। দেশদেশান্তর থেকে অনুরাগী ভক্তরা এসে তাদের গৃহে শান্তিস্বস্ত্যয়ন করে স্বচ্ছল জীবনযাপন করতে থাকে। ইতিমধ্যে মহেন্দ্র ও অনাদি নামে দুই চেলা জুটে গেল মহানন্দ ঠাকুরের। তান্ত্রিক মহানন্দ ঠাকুরের সঙ্গে কলকাতায় পরিচয় হল এক ধনী সজ্জন যদুপতিবাবুর। সে জানতে চাইল গিরিডিতে একটি বাড়ি কেনার পর তার পরিবারের বিভিন্ন জনের ঘন ঘন মৃত্যুর কারণ। একে একে তার ভাই, ভাই বৌ, অবিবাহিত কন্যা, পুত্রবধূ এবং পরিশেষে তার পুত্রও মারা গেল। এখন একমাত্র বেঁচে আছে যদুপতিবাবু ও তার স্ত্রী এবং শিবরাত্রির সলতের মতো তার একমাত্র নাতি। মহানন্দ ঠাকুর শান্তিস্বস্ত্যয়নের পরামর্শ দিলেন। বিপুল অর্থব্যয়ে কলকাতা থেকে পূজার উপকরণাদি সংগ্রহ করে গিরিডির বাড়িতে শান্তিস্বস্ত্যয়নের সংকল্প করলেন। সঙ্গে গেল মহানন্দ ঠাকুর ও তার দুই শিষ্য তাদের সঙ্গে যদুপতিবাবু ও তার স্ত্রী। মহানন্দঠাকুর তার নাতিকে শাস্ত্রোক্ত কবচ দিয়ে কলকাতার বাড়িতে থাকবার পরামর্শ দিলেন। গিরিডির বাড়িতে পৌঁছানোর পর সেই গৃহে এক বৃদ্ধ খালি গায়ে খড়ম পায় প্রবেশ করে। বৃদ্ধলোক, মহানন্দ ও তার দুই চেলা মহেন্দ্র ও অন্যদিকে বিপদ থেকে রক্ষার জন্য গিরিডি থেকে ফিরে যেতে বললেন। কিন্তু কি আশ্চর্য সে বৃদ্ধলোকটির নির্দেশে দুই শিষ্য শান্তিস্বস্ত্যয়নের ব্যাপারে নিরুৎসাহ হলেও পরে মহানন্দের উদ্যোগে শান্তিস্বস্ত্যয়নের সিদ্ধান্ত জানায়। যদুপতিবাবুর গৃহে তিনদিন ধরে শান্তিস্বস্ত্যয়ন চলল। দেওয়া হল পূর্ণাহূতি। প্রথমদিন তাঁরা শুনতে পেল খড়মের খটখট শব্দ। তৃতীয়দিনে ডাকাতদের বাড়ি চড়াও হবার আওয়াজ শুনলেও তারা ভীত হল না। মহানন্দ প্রত্যেককে নিজ নিজ স্থানে থাকবার নির্দেশ দেয়। তাঁর কিছুক্ষণের মধ্যেই চারজন বিরাটকায় পুরুষ খালি গায়ে ও খড়মপায়ে এলে তাদের কারণসুধা দিয়ে সন্তুষ্ট করল তান্ত্রিক মহানন্দঠাকুর, প্রাণভরে কারণসুধা পান করে তারপর তার চলে যাওয়ায় প্রমাণিত হল সার্থক হয়েছে এই তিনদিনের শান্তিস্বস্ত্যয়ন। মহেন্দ্রঠাকুর তান্ত্রিক ক্রিয়া সমাপন করে কলকাতায় ফিরে এসে তার চাকরের কাছ থেকে শুনলেন তার স্ত্রী ও পুত্র প্রাণ হারিয়েছে ওলাওঠায়। সেদিন থেকে মহানন্দঠাকুর আর ঘরে ফেরেনি। দেশে দেশে তান্ত্রিক বেশে ভ্রমণ করে চলেছেন। এজন্য গল্পকথককে তিনি

সাবধান বাণী শোনালেন। তান্ত্রিকের পথ বড় কঠিন। সে পথ যারা গ্রহণ করে তাদের সকলের জীবনে ঘটে থাকে চরম দুর্দশা।

প্রমথনাথের 'চিলারায়ের গড়' ছোটগল্পটি অতিলৌকিক। গল্পকথক তার দুই বন্ধু অরবিন্দ ও প্রবোধকে নিয়ে ভ্রমণে এসেছেন কুচবিহারে। নদী ও অরণ্য বেষ্টিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর কুচবিহারের চিলারায়ের গড়টি অবস্থিত। যে গড়টি সম্পর্কে লোকদের ধারণা নদীর মধ্য থেকে চিলারায়ের কামান উঠেছে। এই কামান গর্জনকে কেন্দ্র করে এক অতিলৌকিক কাহিনী পল্লবিত হয়ে উঠেছে। এই কামানটি নিয়ে নানা রকম কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। কারো কারো মতে তরাই-এর অরণ্যে গিয়ে মহাদেবের সাধনা করে কামানটা কিরাত রূপী মহাদেবের নিকট থেকে বর হিসেবে পেয়েছিল। কারো কারো মতে নেপাল অথবা তিব্বতের জনৈক রাজা চিলারায়ের বীরত্বের খুশি হয়ে তাকে এটা পুরস্কার হিসেবে দিয়েছিল। আবার কারো কারো মতে এটা ছিল মহাবীরের অস্ত্র। সেই বীরের মৃত্যু হলে কামানটা ব্রহ্মাপুত্র নদের মধ্যে আত্মগোপন করেছিল। রাজা নীলধ্বজের ছোটভাইয়ের প্রকৃত নাম ছিল শুক্লধ্বজ। চিলের মত শুক্লধ্বজ অতর্কিতে শত্রু সেনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুকে ছিন্নভিন্ন করে দিত। তখন থেকেই শুক্লধ্বজের নাম চিলারায় হিসেবে পরিচিত হয়েছে। নীলধ্বজের নির্দেশে চিলারায় দরংরাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে শিবির স্থাপন করেছিল ব্রহ্মপুত্রের ধারে। সন্ধ্যাবেলা চিলারায় দেখতে পেল প্রকাণ্ড এক অজগর সাপ উঠে আসছে জল থেকে। এমন সময় দৈববাণী হল এই কামান নিয়ে যাও, তুমি সর্বত্র শত্রুজয়ী হবে। বাস্তবিকই এই কামানটা পাওয়ার পর চিলারায় অপরাজেয় হয়ে উঠেছিল। ইতিমধ্যে ভুটানের নতুন রাজা এসেছিল নীলধ্বজের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে। প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে নীলধ্বজ ভুটান রাজের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কালুখাঁ নামে পরিচিত কামানটি না দেখে নীলধ্বজকে সপরিবারে হত্যা করে এবং চিলারায়ের দুর্গটিকে ভগ্নস্তূপে পরিণত করে। চিলারায় আসাম থেকে প্রত্যাবর্তন করে ভ্রাতৃবিয়োগে ভগ্নহৃদয় হয়ে ভুটান রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে। তারপর চিলারায় নিজেকে কালুখাঁর সাথে বেঁধে গড়ের কাছে নদীতে আত্মবিসর্জন করে। সেই থেকে প্রতিবছর মাঘী অমাবস্যার রাতে কালুখাঁ নামের কামানটি নদীর তীরে ভেসে উঠে অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে গর্জন ও গোলাবর্ষণ করে। সেই গর্জন আজও অনেকে শুনতে পায়। এই গর্জনকে কেন্দ্র করে যে কিংবদন্তী প্রচলিত সে ঘটনা অতিলৌকিক সন্দেহ নেই।

প্রমথনাথের 'নিশীথিনী' ভিন্ন স্বাদের একটি অতিলৌকিক গল্প। গল্পটির ভৌগোলিক পটভূমি বিহারের সিংভূম জেলার নরসিংগড়। ভ্রমণ রসিকদের কাছে আদিম পাহাড় ও অরণ্যে ঘেরা এই স্থানটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। কেঁদ, পিয়াশাল ও পাহাড়ীশাল বেষ্টিত এই স্থানে প্রবাহিত হয়েছে শুভ্র স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা। গল্পকথক, গুপ্ত ও প্রকাশ এই তিন বন্ধু মিলে একটা জিপ গাড়িতে চেপে বেরিয়ে পড়েছিল অতিরহস্যে ঘেরা এই স্থানটি দেখবার জন্য। অতি পরিচিত গুপ্তের কাছে এই স্থানটি এখানকার গাছপালা মানুষের মত অনেকটা সচল চড়াই উৎরাই এর মধ্য দিয়ে জিপগাড়িটি এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ গোঁ গোঁ শব্দ করতে

করতে গাড়িটির ইঞ্জিন নিশ্চল হয়ে দণ্ডায়মান। এমতাবস্থায় তিন বন্ধু গাড়িটিকে ছেড়ে যাত্রা করল পাহাড়ি স্থান থেকে সমতলের দিকে। গভীর নিশুতি রাতে যে স্থানটিতে তিনবন্ধু আশ্রয় নিয়েছিল তাদের মধ্যে একমাত্র গল্পকথক জেগে দেখছে এক অতিলৌকিক ঘটনা। রাতের অন্ধকারে বনভূমির অজস্র গাছ যেন নড়ছে। বনে আকস্মিক ঝড়ের আবির্ভাব ঘটেছে অথচ তাদের আশ্রিত মাচাটি নিশ্চল ভাবে অবস্থান করছে। বনভূমিতে অনেকটা চঞ্চলতা দেখা গেলেও কোথাও হাওয়ার আভাস লক্ষ্য করা যায়নি। অথচ দিনেরবেলায় যে উপত্যকাটি ছিল ফাঁকা এবং গাছপালাহীন সেখানে রাতের অন্ধকারে এই গাছের আবির্ভাব হল কিভাবে? আলো জ্বালিয়ে গল্পকথক দেখতে গেলেন উপত্যকাটি বৃক্ষহীন ও ফাঁকা। আলো নেভানো মাত্র দেখলেন অসংখ্য গাছপালার সমারোহ। শুনতে পেলেন টুং টুং ঘণ্টার আওয়াজ ও বিচিত্র প্রাণীদের ডাক। মনে হচ্ছিল মোহ সৃষ্টিকারী এক যাদুকরী নিশীথিনী রূপে যেন অন্ধকারের থলি থেকে জাদুদণ্ড বের করে প্রত্যেকের চোখে বুলিয়ে দিয়েছে। সুউচ্চ পাহাড়টিকে মনে হচ্ছিল ছায়ার মতো। গাছপালাকে মনে হচ্ছিল এক মায়াপুরী। গল্পকথক আরো দেখতে পেলেন গাছের ডালপালাগুলো যেন আর্তনাদ করে চলেছে। এ যেন মায়ালোকের মত এক অতিলৌকিকতার জগৎ। গল্পকথক, গুপ্ত ও প্রকাশকে গভীর রাতে ডেকে জানাল তার রাতের অভিজ্ঞতার কথা। তারপর জিপগাড়িটি স্টার্ট দেবার পর ঝড় উঠেছে তখন গল্পকথকের মনকে মাঝে মাঝে নাড়া দিয়েছে চলমান বৃক্ষযুক্ত অভিজ্ঞতার কথা। বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখক মানবজীবনের সঙ্গে বৃক্ষ জীবনের তুলনা করে অতিলৌকিক রস আমদানি করতে পেরেছেন।

ছোটগল্পকার প্রমথনাথের 'কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূল কারণ' ছোটগল্পটি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি -তে উপস্থাপিত করেছেন। কৌরবপক্ষের দুর্যোধন এবং পাণ্ডব পক্ষের যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে আপোষ আলোচনার প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন পাণ্ডব পক্ষের দূত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। আলোচনা যখন অনেকটা আশাপ্রদ হয়ে উঠেছিল সেসময় দ্রৌপদী ও দুর্যোধনের পত্নী ভানুমতীর অতিসাধারণ বিষয় নিয়ে মতান্তরের সূত্রপাত হয়। তার জের এসে পৌঁছেছে কৌরব ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধের পর্যায়ে। প্রমথনাথ ব্যঙ্গ রসিক শিল্পী। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূল কারণ যে দ্রৌপদী মহাভারত পাঠক মাত্রই প্রত্যেকেরই জানা। একদিন ভানুমতির দাসী সরলা ও দ্রৌপদীর দাসী বিন্তির পুকুরের ঘাটে কাপড় কাচতে গিয়ে জলের ছিটে লাগবার জন্য কলহ যখন তুঙ্গে উঠেছে সে সময় ভানুমতী তীক্ষ্ণ বঁটি নিয়ে দুর্যোধনের কাছে খেদ প্রকাশ করে এবং বঁটি দিয়ে তাকে হত্যার জন্য দুর্যোধনকে প্ররোচিত করে। অন্যদিকে দ্রৌপদীর সঙ্গে যুধিষ্ঠির অনুরূপ কথোপকথন ঘটে, এই পরিস্থিতিতে বিদ্রোহিনী নারীদের সন্তুষ্ট করতে উভয়পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। আলোচ্য গল্পে প্রমথনাথ জানিয়েছেন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে বাণিজ্যে তেজি ভাব দেখা যায় না, এজন্য একশ্রেণির মুনাফাখোর মানুষ ছোটো খাটো কারণ দেখিয়ে যুদ্ধ সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

বাস্তবধর্মী ছোটগল্পের অনবদ্য নিদর্শন হল প্রমথনাথের 'শাশুড়ি' ছোটগল্পটি। অরিন্দম

একজন মোটা মাইনের চাকুরে। চাকুরীতে প্রমোশন পেয়ে বেতন বৃদ্ধি হতেই অরিন্দম পত্নী নিরুপমা রেডিও সেট কেনার জন্য বায়না ধরে। একমাত্র খরচ কমালেই রেডিও সেট কেনা সম্ভব বলে মনে করে। নিরুপমা ছোট ভাই অরবিন্দকে কলেজে পড়া ছেড়ে দিয়ে কর্মসংস্থানে প্রচেষ্টা করতে বলে। তারপর নিরুপমা অরিন্দমের কাছে বায়না ধরে টেলিফোনের। বান্ধবীদের সঙ্গে ঘরে বসে কথা বলার জন্য তার টেলিফোনের একান্ত প্রয়োজন। বি.এ. পাশ বোন ননীমালার বিয়ের জন্য অরিন্দমের বাবা মৃত্যুর আগে রেখে গিয়েছিল আড়াই হাজার টাকা, নিরুপমা পূর্বগচ্ছিত টাকা দিয়ে টেলিফোন সংগ্রহে উদ্যোগ নেয়। সে অরিন্দমকে জানায় তার বোনের পেছনে এমনি কত আড়াই হাজার টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। অরিন্দম ননীমালাকে জানায় চাকরী সংগ্রহ করে নিজে নিজেই বিয়ে করে নিতে। তার বিয়ের খরচ বহনে সে অসম্মত। ননীমালা শিক্ষয়িত্রী চাকুরী পেয়ে জোড়হাটে চলে যায়। এখন ভাই ও বোনের সঙ্গে পূর্বের সুসম্পর্ক আর নেই। এরপর যেদিন নিরুপমা একটি মোটর কেনার প্রস্তাব উত্থাপন করল তখন অরিন্দম স্ত্রীকে জানাল শাশুড়ীকে দেশে পাঠিয়ে খোরপোশ ও ঘরভাড়া বাবদ যে টাকা বেচে যাবে সেই অর্থ কয়েক বছর জমালে মোটর গাড়ি আনা অসম্ভব কোনো ব্যপার নয়। একদিন বাস্তবিকই তাদের ঘরে মোটর গাড়ি প্রবেশ করে। অরিন্দমের শাশুড়িকে স্বগ্রামে পাঠিয়ে দেবার পরেই হৃদ্‌রোগে মৃত্যু ঘটে। তবে এই মৃত্যু অনেকের কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে। আলোচ্য গল্পে মানুষের সীমাহীন আশা আকাঙ্ক্ষা কিভাবে ভাই, বোন ও নিতান্ত প্রিয়জনের সান্নিধ্য থেকে অনেক দূরে ঠেলে দেয় তার এক সার্থক রূপ আলোচ্য ছোটগল্পটি।

প্রমথনাথের 'নহুষের অতৃপ্তি' ছোটগল্পটিতে মনুসিং নামে এক ব্যক্তি এসে পৌঁছেছিল স্বর্গরাজ্যে। সেখানে চিত্রগুপ্ত ও ব্রহ্মার সঙ্গে তার ভাব জমে উঠল। ব্রহ্মা তাকে বহুভাবে বুঝিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এসে বিপুল অর্থ দিয়ে ব্যবসা চালাতে বলে। মন্নু ধর্মঘটের ভয়ে ব্যবসা করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তখন ব্রহ্মার আহ্বানে দেবতাদের কার্যনিবাহক সমিতির জরুরি অধিবেশনে মন্নু সিং এর ডাক এল। সে সুখে শান্তিতে স্বর্গে বাস করতে আগ্রহী, অর্থাভাবে মন্নু স্বর্গে নূতন বাড়ি করতে পারছে না, তখন সিদ্ধান্ত হল তার জন্য স্বর্গে একটা বাস সার্ভিস খোলা হবে। ইন্দ্রলোক থেকে ব্রহ্মালোক পর্যন্ত বাসরুটে নারী পুরুষ প্রত্যেকই সেই বাসে চেপে চলাচল করতে পারবে। শেয়ালদা থেকে হাওড়া পর্যন্ত বাসভাড়া 'ছ' পয়সা। স্বর্গে একটিমাত্র বাস বলে তার মন স্বর্গে তৃপ্তি পেল না। এক অতৃপ্তিবোধ প্রতিনিয়ত মন্নুকে স্বর্গ থেকে মর্তে আসতে উৎসাহিত করেছে। আলোচ্য গল্পে প্রমথনাথ কলকাতাকে স্বর্গের চেয়ে শ্রেষ্ঠতম স্থান দেখাতে গিয়ে নহুষের অতৃপ্ত বাসনার প্রকাশ করেছেন।

প্রমথনাথের আরেক বিচিত্র স্বাদের ছোটগল্প 'খড়ম'। গল্প বর্ণনায় আধুনিককাল থেকে লেখক চলে গেছেন প্রাচীনকালে। প্রাচীনকালে মুনি ঋষিরা ব্যবহার করতেন কাষ্ঠ নির্মিত পাদুকা বিশেষ। খড়মের খট্ খট্ শব্দে শিষ্যরা গুরুর আগমন বার্তা জানতে পারত। এজন্য নতুন খড়মের অভাব ঘটত না গুরুগৃহে। লেখক জানিয়েছেন দুর্বাশা মুনি শকুন্তলাকে

অভিশাপ দিতেন না যদি কিনা তার পায়ে খড়ম জোড়া থাকত। সম্ভবত দুষ্মন্তপুত্র ভরতের নামে ভারতবর্ষ না হয়ে ভারতীয়রা জম্বুদ্বীপের জাম্বুমান বলে পরিচিত হত। কাজেই একজোড়া খড়মকে সামান্য পাদুকা মাত্র বলে উপেক্ষা করা অর্থহীন। অন্যদিকে খড়ম যেমন ভক্তিভাজনের পাদুকা ও নিরীহের পুত্র, পুত্রবধূ, মা ও মেয়ে সকলে সাবধান হবার সুযোগ পেত অর্থাৎ খড়ম হল ওয়ার্নিং এর একমাত্র শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। অথচ যে কাঠ দিয়ে খড়ম তৈরি হত আজ তা দিয়ে তৈরি হচ্ছে সাইনবোর্ড। ছোটগল্পকার আলোচ্য গল্পে কৌতুক রস আমদানি করেছেন।

প্রমথনাথের 'শার্দূল' ছোটগল্পটি হাস্যরসাত্মক তবে তার মধ্যে ব্যঙ্গের ছিটেও রয়েছে। জোড়াদীঘি গ্রামে প্রচারিত হয়ে গেছে সেখানে এক ধরনের বাঘের আবির্ভাব ঘটেছে যে বাঘটি পাঁঠা, ছাগল, ভেড়া ছাড়া আর কিছুর মাংস খায় না। প্রাণীতত্ত্বে এম. এ নরেন চক্রবর্ত্তীর ধারণা শুধুমাত্র পাঁঠা ছাগল খায় এ ধরনের বাঘের আবির্ভাব অসম্ভব। অনেক অনুসন্ধানের পরও গ্রামবাসী প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করতে পারেনি। এদিকে সুরেন পোদ্দার নামে জনৈক গ্রামবাসীর গৃহে পাঁঠার মাংস ছাড়া আহার সম্পন্ন হত না। সে বিয়ে করেনি, স্ত্রী পুত্রকে মাংসের ভাগ দিতে হবে এজন্য। দাঁত তার বাঁধানো, সে পাঁঠা চুরি করত না, টান দিত। পাঁঠাটা, খাসিটা, ভেড়াটা রাতের অন্ধকারে ধরে মশলা সহযোগে সুস্বাদু করে রেঁধে খেত। সে ব্রহ্মময়ী মায়ের কাছে জানাত মৃত্যুর পরে যেন তাকে ছাগলোকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং তার দাঁতগুলো যেন থাকে অক্ষয় হয়ে। স্বপ্নে সে প্রত্যহ বিচরণ করত ছাগলোকে। যে দিন নরেন চক্রবর্তীর কলকাতা থেকে বহুমূল্যে কিনে আনা দুম্বা ভেড়ার বাচ্চাটি খুঁজে পেল না, সেদিন সে খেপে উঠে অবিনাশ ও অন্যকয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে খানাতল্লাশি করে সুরেন পোদ্দারের বাড়িতে খুঁজে পায় একটা পাঁঠা বাঁধবার দড়ি, ক্যাঠারি, রান্নার জিনিস ও শিলনোড়া। তার ঘর থেকে আবিষ্কৃত হল একটি বড় সাইজের খাতা দুটি গ্রামের পাঁঠা খাসির ও ভেড়ার আদমশুমারি রয়েছে এই খাতায়। কোন বাড়িতে কটা খাসি বা পাঁঠা আছে তাদের বয়স, ওজন, কবে কোনটি ধরে এনেছে, সে তথ্য সম্বলিত খাতাটি উদ্ধার করে প্রত্যেকেই স্থির প্রত্যয়ে এসে পৌঁছেছে এটা আসলে সুরেন পোদ্দারের কাজ। তাকে শিক্ষা দেবার জন্য এগিয়ে এসে তার ঘরে বালিশের নীচ থেকে উদ্ধার করা হল বাঁধানো দাঁত। সুরেনের দাঁত জোড়া ছিনিয়ে নিতে গিয়ে সে ব্যর্থ হয়। তার পরদিন থেকে আর সেই জোড়াদীঘি গ্রামে সুরেনকে দেখা গেল না। এরপর থেকে আর কোনদিন শোনা যায়নি বাঘের ডাক ও খাসি পাঁঠার নিয়ে যাবার ঘটনা। আলোচ্য গল্পে প্রমথনাথ ছদ্মবেশী একশ্রেণির লোভী মাংসপ্রিয় মানুষের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন।

প্রমথনাথের 'রাঘববোয়াল' ছোটগল্পটি অসাধারণ সৃষ্টি। সরকারি চাকুরে ওঙ্কারনাথের চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে গল্পটি আবর্তিত হয়েছে। সে কেন চুরি করবে, কেন করবে না এই নিয়ে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপিত করে। তার মতে আইনসংগত চুরির নিরাপত্তা যুক্ত উপায় হল ধার করা। একদিন অফিস ছুটির পর ওঙ্কারনাথ তার অধস্তন কর্মচারীর নিকট থেকে একশত টাকা ধার নেয়। তখন ঋণদাতাকে সে জানায় 'মাসের

প্রথমেই'। দেখা গেল এমনিভাবেই একদিন জনৈক অফিসের সাহেবের স্ত্রী মিসেস বোস ওঙ্কারনাথের স্ত্রীর কাছ থেকে ৫০০ টাকা চেয়ে নিয়ে বলে যায় 'মাসের ঠিক প্রথমেই' তখন ওঙ্কারনাথের মনে পড়ল সেও তো এভাবেই একশত টাকা নিয়েছিল। সে চিন্তিত মনে চুরির সার্থকতা বুঝতে পেরে জানালো কেউ যদি একশত টাকা চুরি করে তাহলে তার ৫০০ শত টাকা চুরি হয়ে যায় এবং চুরির পথটা সুগম নয়। এরজন্য প্রতিভার প্রয়োজন। তা না হলে ঠকতে হয় পদে পদে। ওঙ্কারনাথের এমনভাবে বেরিয়ে গেল একশত টাকার পরিবর্তে ৫০০ শত টাকা। সে সিদ্ধান্ত নিল জীবনে সে আর কখনও চুরি করবে না। আপন অভিজ্ঞতা থেকে সে বুঝতে শিখল তিমির চেয়ে তিমিঙ্গিল বড়, তিমিঙ্গিলের চেয়ে বড় রাঘব বোয়াল। এখানে তিমিঙ্গিলের সাথে তুলনা করা হয়েছে ওঙ্কারনাথের এবং রাঘব বোয়ালের সাথে তুলনা করা হয়েছে মিসেস বোসের। আলোচ্য নীতিমূলক গল্পে প্রমথনাথ এ কথাই পাঠক মানসে উপস্থাপিত করেছেন যে চৌর্যবৃত্তি জীবনের সার্থকতার পথকে প্রশস্ত করে দিতে পারে না।

হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রীতিমূলক 'ইয়াসিন শর্মা অ্যান্ড কোং' গল্পটি প্রমথনাথের সফল সৃষ্টি। এই গল্পের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে ভারতবিভাজনকে কেন্দ্র করে। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ খণ্ডিত হওয়ার ফলে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানসূত্রের ব্যর্থ প্রচেষ্টা দেখিয়েছেন গল্পকার। গল্পে ইয়াসিন ও গোপাল শর্মার দুই বন্ধু দুই শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছে। একই গ্রামের একই পাড়ার দুই বন্ধু পাঠশালা থেকে ইংরেজি স্কুল পর্যন্ত অধ্যয়ন করে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে সরস্বতীর সঙ্গে দেনাপাওনা মিটিয়ে দেয়। কর্মসূত্রে তারা দুজনেই বিদ্যালয় প্রধান। একজন হেড মৌলবি অপরজন হেড পণ্ডিত। দুই বন্ধুকে মনে হয় বাংলা মায়ের কোলে হিন্দু ও মুসলমান দুইভাই। ঠিক সে সময় শুরু হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। তখন পূর্বাঞ্চলের হিন্দুরা পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমানরা পূর্বাঞ্চলে স্থান পরিবর্তনে তৎপর। নিয়ামৎপুর গ্রামেও সেই অভিঘাত এসে উপস্থিত হলেও দুই বন্ধুর মধ্যে সম্পর্কের বিন্দু মাত্র ফাটল ধরেনি এবং পুনর্বাসনের কথাও ভাবতে পারেনি। যেদিন গোপালের বাড়ি জবর দখল করে এবং এক মুসলমান সজোরে কোরান পাঠ করে সেইরাতে ইয়াসিন ও গোপাল সেই গ্রাম ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গ আসবার জন্য যাত্রা করে। ধীরে ধীরে তারা যখন সীমান্তবর্তী এলাকায় এসে পৌঁছায় তখন তারা গাছতলায় বসে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে তার দুজনেই এমনভাবে সীমান্ত বরাবর বাড়ি করবে যাতে ইয়াসিনের বাড়ির অংশ পূর্ববঙ্গে এবং গোপালের বাড়ির অপর অংশ পশ্চিমবঙ্গে থাকে। তারপর দেখা দিল সীমান্ত এলাকাময় উদ্বাস্তুদের যাতায়াত। তখন হিন্দুরা মুসলমান সেজে মুসলমানরা হিন্দু সেজে দুই অঞ্চলে যাতায়াত করতে আরম্ভ করল। তখন লুঙ্গি ফেস ধুতি খদ্দর টুপি এগুলোর চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় দুইবন্ধু সেগুলোর ব্যবসা শুরু করে সম্মিলিত ব্যবসার নামকরণ করে ইয়াসিন শর্মা অ্যাণ্ড কোং। ব্যবসায়ে তারা প্রভূত লাভবান হয়। একদিন এক উদ্বাস্তুকে তাড়া করছে এক সীমান্ত প্রহরী। সে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ে সীমান্ত বরাবর। তখন হিন্দুরা এলে লোকটিকে ধুতি ও খদ্দরের টুপি পরানো

দেখলে হিন্দুরা তাদের দেশের লোক মনে করে। মুসলমানরা এলে তাদের লোক বলে চিহ্নিত করে। এমতাবস্থায় দ্বৈতটানাপোড়েনে লোকটির প্রাণহানির সম্ভাবনা দেখা দিল। আলোচ্য গল্পে প্রমথনাথ দুই ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের পারস্পরিক সহাবস্থান যেমনভাবে দেখিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে দুনৌকায় পা রাখলে তার অনিবার্য বিপদের সম্ভাবনাকে আলোচ্য ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন।

প্রমথনাথের 'সিদ্ধান্ত' গল্পটি কাল্পনিক শ্রেণিভুক্ত, ব্রহ্মার সভাপতিত্বে বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে নিয়ে যে জরুরি অধিবেশন শুরু হয়েছিল তার আলোচ্য বিষয় মানুষের শক্তির প্রাধান্য কতটুকু সে বিষয়ে একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। ব্রহ্মার দৃষ্টিতে জগতে মানুষ সৃষ্টির পর মানুষকে দেওয়া হয়েছে বস্তু ও শক্তি। যার ঐশী শক্তিবলে মানুষ হয়ে উঠবে সর্বশক্তিমান। বিশেষত মানুষ তার স্বীয় উদ্‌ভাবনী ক্ষমতাবলে বস্তুকে শক্তিতে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছে। মানুষের যদি দৈব প্রাপ্তি ঘটে তাহলে বিপন্ন হবে স্বর্গের দেবতাদের অস্তিত্ব। এর প্রতিকার আবশ্যক মনে করেন স্বয়ং মহাদেব। মানুষ অস্ত্র আবিষ্কার করবার ফলে অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে স্বর্গ উদ্ধারের দিকে এগিয়ে যাবার সম্ভাবনায় মহাদেব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে ব্রহ্মা তাকে আশ্বাস দেয় ধ্বংসের পরে নবসৃষ্টি, এই সৃষ্টি ও ধ্বংসচক্র নিয়ে বিশ্বের পূর্ণমূর্তি। প্রস্তাবিত ব্রহ্মার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। প্রত্যেকে সিদ্ধান্তের কাগজখানিতে স্বাক্ষর করে আশ্বস্ত হলেন। আলোচ্য গল্পে প্রমথনাথ বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক দিকটি পাঠক সমাজের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।

ছোটগল্পকার প্রমথনাথের 'পুকুর চুরি' গল্পটি সৃষ্টির অনবদ্যতা অনস্বীকার্য। গল্পকার একজন এরোপ্লেনের যাত্রী। এরোপ্লেনটি যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য সমতলে অবতরণে বাধ্য হয়। উড়োজাহাজ থেকে নিরাপদে নেমে গল্পকার হবুনগরে পৌঁছে দেখলেন সেখানকার কাণ্ডকারখানা অনেকটা আজগুবি। কয়েকজন লোক চারটি গর্ত খুঁড়ে জল ও মাছ সহ পুকুরচুরি করে এ সংবাদ প্রচারিত হয়ে যায় হবুচন্দ্র রাজার রাজ্যে। গল্পকথক হাতি চুরির ঘটনা শুনেছেন কিন্তু পুকুর চুরি ঘটনা শুধু প্রবাদ বাক্য রূপে শুনেছেন। আসলে গল্প লেখক বড় ধরনের চুরির ঘটনাকে এই গল্পে দেখিয়েছেন।

শিল্পী প্রমথনাথের 'নর পশু সংবাদ' ছোটগল্পটি কাল্পনিক শ্রেণিভু। শহুরে বাবুদের প্রতি ব্যঙ্গের বাণ বর্ষিত করেছেন লেখক আলোচ্য গল্পে। বাবুদের আমোদ আহ্লাদে পাঁঠার মাংস ও পোলাও এর ব্যবস্থার দায়িত্বভার অর্পিত হল রমেশের উপর। ক্রীত ছাগটিকে রাম দা দিয়ে কাটতে গিয়ে রমেশ ও ছাগলের প্রশ্নোত্তরের বিচিত্র কাহিনী আলোচ্য গল্পের বিষয়। গল্পকার বর্ণিত ছাগটি মানুষের মতো কথা বলতে পারে। ছাগ ও রমেশের যুক্তি তর্কের মধ্যে দিয়ে গল্পকার কিছু তত্ত্বকথা উপস্থাপিত করেছেন। ছাগের যুক্তিপূর্ণ বাক্য নিঃসন্দেহে বিশ্বস্রষ্টার জবানী। রমেশ রামদা তুলে ছাগকে হত্যা করতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে তার রামদা ছিটকে পড়ে। সে সুযোগ পাঁঠা উক্ত দাখানা দিয়ে রমেশকে হত্যা করে নরমাংস বাবুদের মধ্যে পরিবেশিত হয়। ছাগটি রমেশের পোশাক পরে বাবুদের কাছে মাথা নেড়ে সায় দেয়। আলোচ্য গল্পে ছাগটি মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারে, ইংরেজি,

বাংলা কোটেশন দেয় সে ছাগ আর যাই হোক না কেন মানুষের পিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

বিয়য়বস্তু ও ভাবগত দিক থেকে 'পুতুল' গল্পটি শ্রেষ্ঠ কৌতুক রসাত্মক ছোটগল্প। ১৩ জন অবিবাহিত পুরুষ সভ্যদের নিয়ে গল্পটি শুরু হয়েছে। এই সভ্যদের একজন অপরের আকস্মিক অনুপস্থিতি সকলের দৃষ্টিতে আসে। একদিন তপন এসে পুতুল প্রতিবেশীর দ্বারা তার প্রেমের ব্যর্থতার কথা সবাইকে জানায়। সভ্যদের সকলেই এই পুতুলটিকে নারী হিসেবে কল্পনা করে কিভাবে প্রতারিত হয়েছে তা তপন পরিশেষে জানতে পারে।

প্রমথনাথের 'যমরাজের ছুটি' ছোটগল্পটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। গল্পটিতে ব্রহ্মার সঙ্গে যমরাজের সংলাপে মৃত্যু যে অনিবার্য এবং মৃত্যু না হলে সমগ্র পৃথিবী জরা ও ব্যাধিতে পরিপূর্ণ করে বিঘ্নিত হবে স্বাভাবিক জীবনধারা এই চরমসত্য দার্শনিক কথাটি বর্ণিত হয়েছে। মর্ত্যমানব অভিযোগ জানিয়েছে মৃত্যু-রাজ যম প্রতিনিয়ত মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে হস্তক্ষেপ করে চলেছে। বিশেষত বন্যা, ভূমিকম্প, যুদ্ধবিগ্রহ, রোগ, মহামারী, গাড়ি চাপা প্রভৃতি উপায়ে কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। এই মৃত্যু শোকে অধীর হয়ে মর্ত্যমানব অভিযোগ রেখেছে যমরাজের উপর। ব্রহ্মা মর্ত্যমানবের আবেদনে সাড়া দিয়ে যমকে দেয় ছুটির আদেশ। ফলত মৃত্যু আর মানব জীবনে নেমে এল না। কিন্তু তার ফল হল বিপরীত। মানুষের যেখানে মৃত্যু নেই সেখানে গড়ে উঠল সিনেমাগৃহ ও পাঠশালা। মানুষের মৃত্যু যেখানে নেই সেখানে খাদ্যের প্রয়োজন বা কতটুকু। এই ভেবে মানবেরা হয়ে উঠল তৃণভোজী। ফলে খাদ্যাভাবে গবাদি পশুকুলের মৃত্যু ঘটল। যুদ্ধের প্রয়োজন রইল না। আনবিক বোমা নিক্ষেপের ফলে মানুষের প্রাণসংশয় ঘটে না। ধীরে ধীরে সমগ্র পৃথিবী বার্ধক্য, জীর্ণদেহ, রুগ্ন ও মুমূর্ষু ব্যক্তিতে পরিপূর্ণ হল। ঘরে ঘরে শুধু কাসির খক্‌খক্, লাঠির ঠক্‌টক্ রোগীর আর্তযন্ত্রণা। মুমূর্ষুর আর্তনাদে পৃথিবী থেকে আনন্দ, হাসি গান, শিল্প, সাহিত্য সব মুছে গেল। সে সময় এক গাছের ডালে ক্রৌঞ্চক্রৌঞ্চীর মিথুনানন্দের দৃশ্য দেখে নবীনানন্দের জীবনে আনন্দের সঞ্চার ঘটল। সে নতজানু হয়ে দেবতার কাছে করুণকণ্ঠে প্রার্থনা জানায় চিরন্তন জরার কারাগার থেকে, নিরানন্দ মরুভূমি থেকে, বার্ধক্যের মরুপ্রদেশ থেকে মুক্ত করতে। যেখানে আনন্দ আছে, আছে সৌন্দর্য, আছে যৌবনের তরঙ্গ সেই জন্মমৃত্যুর প্রার্থনা শুনে ব্রহ্মা যমরাজকে কর্মে নিযুক্ত হতে বলেন। তারপর থেকে বিশ্ববিধান অনুসারে জন্ম মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠল। জরা ব্যাধির হাত থেকে মুক্ত হয়ে পৃথিবী সুস্থ সুন্দরের আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিণত হল।

প্রচলিত একটি প্রবাদকে নামকরণ হিসেবে নির্বাচন করে ছোটগল্পকার প্রমথনাথ এক দার্শনিক বিষয়কে পাঠক সাধারণের কাছে উপস্থাপিত করেছেন 'ছেঁড়া কাঁথা ও লাখ টাকা' ছোটগল্পে। তার স্বপক্ষে গল্পকার যে যুক্তিগুলির অবতারণা করেছেন তা নিঃসন্দেহ লেখকের প্রজ্ঞাদৃষ্টির পরিচায়ক। আলোচ্য লাখ টাকার বিষয় হল এক দুর্লভ আদর্শ। একটি মহৎ আদর্শকে পেতে হলে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে থেকেও পাওয়া যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ লেখক জানিয়েছেন আকবর বাদশা থেকে হারুণ অল রুশীদ, মহাবীর, অশোক,

গান্ধি সকলেই ছেঁড়া কাঁথার আড়াল থেকে এক মহৎ আদর্শকে দেখেছেন। আবার শবাসনে বসে তান্ত্রিকরা জীবনের সাধনা করে বুঝতে পেরেছেন মৃত্যু ছাড়া বুঝতে পারা যায় না জীবনের রহস্য। রামচন্দ্র জীবনের বেশিরভাগ সময় বল্কল পরিহিত থেকেছেন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন বৃহন্নলার ছদ্মবেশে থেকে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রতীক্ষা করেছেন, কৃষ্ণ বাঁশি ছেড়ে সুদর্শনচক্র ধরেছেন। স্বয়ং মহাদেব ছিন্ন বাস পরে অন্নপূর্ণার কাছে হাত পেতেছেন। সুতরাং আদর্শকে লাভ করতে হলে প্রয়োজন সাধনার, সে সাধনার পথ ছেঁড়া কাঁথার মাধ্যমে রূপায়িত হয়। মৃৎশিল্পী ছিন্ন কাঁথা থেকে পুতুল তৈরি করে লক্ষ টাকা রোজগার করে, সেক্সপীয়ার তাঁর কালজয়ী নাটকগুলো উপহার দিয়েছেন ছিন্ন কাঁথায় শুয়ে থেকেই। অন্যদিকে স্বর্ণসিংহাসনে বসে রাজা মহারাজারা দরিদ্র প্রজাদের শোষণ করে পূর্ণ করেন তাঁদের কোষাগার। কাজেই ছেঁড়া কাঁথায় বসে লাখ টাকার চিন্তা না করাটাই হল অপরাধের। গল্প লেখক তাঁর ব্যক্তিজীবনের উত্তরণ ঘটিয়েছেন ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে থেকেই। এজন্য পাঠকদের উপদেশ দিয়েছেন ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে থেকেই লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখা সম্ভব এবং যা আদর্শবাদের মূল চাবিকাঠি।

প্রমথনাথের 'দক্ষিণরায়ের দাক্ষিণ্য' ছোটগল্পটির প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক সম্প্রীতির ব্যর্থতায় যা কাহিনীর করুণ পরিণতি বহন করে এনেছে। রাম ও রহিম নিয়ামৎপুরের বাসিন্দা। তাদের ছেলেবেলা কেটেছে পারস্পরিক সৌহার্দ্যে। শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবনে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল সুমধুর। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই প্রতিনিধির মিলন দৃষ্টান্ত দশটি গ্রামের মধ্যে ছিল অবিদিত। রাম ও রহিম অভিন্ন। ছবি তুলে হিন্দু মুসলমানের সৌহার্দ্য সম্পর্কের আবিষ্কর্তার ছবি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকে। যেদিন হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক দাঙ্গায় উত্তাল হয়ে ওঠে এপার বাংলা ও ওপার বাংলার জীবনধারা তখন বঙ্গবিভাগের সূত্রধরে পূর্ববঙ্গের এই দুই বন্ধু একদিন স্বগ্রাম ছেড়ে লুঙ্গি ও ফেস পরে বেড়িয়ে পরে রাতের অন্ধকারে। স্বগ্রাম ছাড়ার একটা সংগত কারণ ছিল। রামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সংবাদ পেয়েছে রহিম তারপর তারা প্রবেশ করে পূর্বোক্ত পোশাক বদল করে ধুতি ও গান্ধি টুপি পরে অনুপ্রবেশ করে পশ্চিমবঙ্গে। শান্তির বাতাবরণ যুক্ত স্থানে ঘর ভাড়া নিয়ে দুজনে হিন্দু সেজে পারস্পরিক সহাবস্থান করে। কিন্তু যেদিন গণকের গণনায় ধরা পরে রাম ও রহিম পরস্পর ভিন্নজাতের, ধর্ম তাদের ভিন্ন সেদিন তারা ধর্ম নিরপেক্ষ স্থান বেছে নিতে আগ্রহী হয়। তৎকালে ধর্ম নিরপেক্ষ পোশাক হল কোট ও প্যান্ট। এই পোশাক পরে তারা বঙ্গ দেশ থেকে কিছুটা দূরে সুন্দরবনের পরিবেশ বেছে নেয় এবং সেখানে দক্ষিণ রায়ের শরণাপন্ন হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ স্থান নির্বাচন করে। কিন্তু দেখা গেল সুন্দরবনের জলাজঙ্গলে পরিপূর্ণ বাদাবন ছিল বাঘের আশ্রয়স্থল। তারা দুজন যখন সুখনিদ্রায় শায়িত তখন এক বাঘের আক্রমণে তাদের চারটি পা হারাতে হয়। কথিত আছে দক্ষিণ রায়ের চারটি পা। তাঁদের জীবনের অন্তিমলগ্নে বন্ধুত্বও ছিল অটুট, এমনকি মৃত্যুকেও বরণ করে নিয়েছে একইসঙ্গে। আলোচ্য গল্পে গল্পকার যে বাঘের কথা তুলে ধরেছেন আমাদের বুঝতে

অসুবিধা হয় না সেই বাঘ হল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ পুষ্ট এক শ্রেণির প্রতিনিধি। তাদের হাতে প্রাণ হারাতে হয়েছে রাম ও রহিমের।

ভারতীয় নৃত্যের সঙ্গে ভারতীয় ব্যাঘ্রের তুলনামূলক প্রমথনাথ লিখিত 'ভারতীয় নৃত্য ও ভারতীয় ব্যাঘ্র' ছোটগল্পটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় নৃত্যশিল্পী হিসেবে শশীমুখীর নাম বিশেষভাবে সুপরিচিত। কলকাতা থেকে প্রসিদ্ধ গায়ক ও নর্তকী এসেছে সুন্দরবনের প্রত্যন্তগ্রামে অনুষ্ঠিত জলসায়। সুন্দরবনের মহাক্ষুধা ও বহুক্ষুধা নামে দুই ব্যাঘ্র সেই জলসায় প্রসিদ্ধ ড্যান্সার শশীমুখীর উপর প্রলুব্ধ হয়। যথা সময়ে গায়ক ও নর্তকী সহযোগে মজলিসের আসরে তারা দেখতে পায় ভারতীয় নৃত্যের কলা কৌশল। তাদের দৃষ্টিতে মনে হল ড্যান্সারের নৃত্য ভঙ্গিমায় চারটি পা, চারটি হাত। আবার ঝম্পে ভীতিসন্ত্রস্ত দুই ব্যাঘ্র শশীমুখীর আশা ছেড়ে পলায়ন করে। গল্পকার ভারতীয় নৃত্যের বৈশিষ্ট্য আলোচ্য ছোটগল্পে উপস্থাপিত করেছেন।

প্রমথনাথের 'ব্ল্যাক্‌মেল' ছোটগল্পটি রূপকধর্মী। সমাজের বুর্জোয়া ধনী ও স্বার্থান্ধ রাজনৈতিক নেতারা কতটা অসার সেই দিকটি আলোচ্য গল্পে লেখক তুলে ধরেছেন। এই গল্পটি ব্রহ্মা, মহাদেব, ইন্দ্র, বিষ্ণু, চন্দ্র, রাম প্রভৃতি দেবতারা বুর্জোয়া ধনী ও স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতা। গোবর্ধন নির্ভীক ও স্পষ্টবক্তা। সে ব্রাহ্মণ জমিদারের জীবন্ত গোমস্তা। সে এসে উপস্থিত হয়েছে স্বর্গের নেতাদের আশ্রয়স্থলে। স্পষ্টবক্তা গোবর্ধন জানিয়েছে প্রতিনিয়ত এই দেবতারা বা নেতারা বৃথা আস্ফালন করে। দেশের সার্বিক কল্যাণ না করে সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে গোবর্ধনের দৃষ্টিতে। গোবর্ধন এই বুর্জোয়া শ্রেণির স্বরূপ জেনে জনতার আদালতে তা প্রকাশ করে দিতে চাইলে নেতারা তাকে আশ্বাস দেয়। এর ফলশ্রুতি হিসেবে নেতাদের দাক্ষিণ্যে গোবর্ধনের অর্থাগম ঘটে। প্রতিনিয়ত যারা ব্ল্যাক্‌মেল করে যাচ্ছে গোবর্ধন তাদের উপর ব্ল্যাক্‌মেল করে যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে শিল্পী প্রমথনাথ যে সমাজ বাস্তবতার দৃষ্টান্ত রেখেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

প্রমথনাথের 'তিমিঙ্গিল' গল্পটি দুই উত্তমর্ণ ও অধমর্ণকে নিয়ে লিখিত। বঙ্কুবিহারী ও সিদ্ধিনাথ দুজনে এক ব্যবসার পার্টনার। সিদ্ধিনাথ বঙ্কুবিহারীকে একসময় দশ হাজার টাকা ঋণ দেয় কিন্তু উক্ত ঋণের টাকা বঙ্কুবিহারী পরিশোধ করেনি। দীর্ঘ দশ বছর বাদে একদিন অফিসে সিদ্ধিনাথকে দেখে বঙ্কুবিহারী পালিয়ে যায়। গল্প কথক সিদ্ধিনাথের কাছ থেকে তার পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে নেয়। বঙ্কুবিহারী এক চিঠিতে সিদ্ধিনাথের গৃহে এসে তাকে না পেয়ে দশ বছর বাদে আবার দেখা হবে একথা এক চিঠিতে জানায়। বঙ্কুবিহারী সিদ্ধিনাথের ছবিটি তার গৃহে টাঙিয়ে রাখে। বঙ্কুবিহারীর কাছে সিদ্ধিনাথ তিমিঙ্গিল স্বরূপ। তিমির চেয়ে তিমিঙ্গিল বড় এই বাস্তব কথা 'তিমিঙ্গিল' গল্পে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রমথনাথের 'ছবি' গল্পটিতে ক্যামেরাম্যানের কারসাজি বর্ণিত হয়েছে। অবিনাশ প্রসিদ্ধ ক্যামেরাম্যান হিসেবে পরিচিত। তার ওস্তাদীতে গল্পকথকের একান্ত প্রিয় কৃষ্ণার প্রেমানুরাগের উপেক্ষা করে ফটোখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। তার পরদিন স্টুডিও থেকে জেদবশত আটটি ছবি তুলে এনে একটি ছবি বাঁধিয়ে

ঘরে টাঙিয়ে রাখে। ছবিটি যেন একজন বৃদ্ধের বলে মনে হয়। এ অবস্থায় কৃষ্ণা উক্ত ছবিটি সরিয়ে ফেলবার প্রস্তাব উত্থাপন করলে গল্পকথক বুঝতে পারে সে এখনো তেমন বার্ধক্যে উপনীত হয়নি। তারমধ্যে তারুণ্যের প্রতিমূর্তি উদ্ভাসিত। আনাড়ি ফটোগ্রাফার প্রদত্ত ছবিটি তার জীবনের গতিকে পরিবর্তিত করে দিল। অথচ অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফার অবিনাশ গল্পকথক কর্তৃক তিরস্কৃত হল।

প্রমথনাথ বিশীর 'তুক' গল্পটি অতিলৌকিক পর্যায়ভুক্ত। গল্পের নায়ক জগবন্ধু একজন অফিসের বড় সাহেব। ঘরে তার সুলতা নামে নতুন বউ। বিয়ের পরে জগবন্ধু রাতের বেলায় দেখতে পেত কঙ্কালের ছবি। কঙ্কালটি যেন তাকে ধরবার জন্য এগিয়ে আসছে। কিন্তু দিনের বেলায় সুস্থ স্বাভাবিক ভাব তার মধ্যে বিরাজ করত। ভাইবোনের প্রত্যেকের জগবন্ধুর এই পরিবর্তন দেখে তাদের মনে বিভিন্ন সন্দেহ জেগে ওঠে। কারও মতে গাঁজা কিংবা কোকেন খেয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে এরূপ আচরণ করছে। কারও মতে তাকে অপদেবতা ভর করেছে এজন্য তার আত্মীয় পরিজনরা কালীঘাটে গিয়ে ষোড়শোপচারে পূজা দিয়ে জগবন্ধুর মাথায় ফুল ঠেকিয়ে বিছানার তলায় ফুলটি রাখবার পর দেখা গেল জগবন্ধুর রাতে চিৎকারের পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে গেল। এরপর জলপড়া, চালপড়া, তাবিজ, কবচ কোনো কিছুতেই তার কোনো উন্নতি ঘটেনি। একদিন তার পকেট থেকে শিল্প প্রদর্শনীর টিকিটের কাউন্টার ফয়েল উদ্ধার করে জগবন্ধুর দাদা জগন্নাথ। জগবন্ধুকে নিয়ে তিনি সাইকিয়াট্রিস্ট ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় সঙ্গে ছিল স্ত্রী সুলতা ও মালতী। শহরের বিখ্যাত মনের ডাক্তার ডঃ গিরিধারী জগন্নাথের কেস হিস্ট্রি নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন করে বুঝতে পারে ব্যাপারটি খুব জটিল। আলোচনাক্রমে ডাক্তারটি মুক্তাঙ্গন ভাস্কর্যশিল্প প্রদর্শনীর বুকলেটে পালকহীন মুরগিকে দেখায় তখন জগবন্ধু ডাক্তারের কণ্ঠরোধ করতে উদ্যত হয়। সেবার ডাক্তার তার প্রকৃত রোগ আবিষ্কার করতে পারেনি। কিছু সময়ের জন্য জগবন্ধুর স্ত্রী ও বোন সেই প্রদর্শনীতে গিয়ে জীবজন্তুর বিকৃত চেহারা যুক্ত লিফলেট এনে ঘরে রাখে এবং জগবন্ধু সেখানকার বিকৃত চেহারাযুক্ত ছবিটিকে দেখে উত্তেজিত হয়। ইতিমধ্যে জগবন্ধুর পিসি সুলতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করে তাকে পিত্রালয়ে পাঠাবার পরামর্শ দেয়। ব্যথিত চিত্তে সুলতা যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে সে সময় জগবন্ধু ফিরে আসে স্বাভাবিক অবস্থায়। তার এই আকস্মিক পরিবর্তনে পত্নীপ্রেম জেগে ওঠে এবং মূর্চ্ছিত সুলতার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। তার পিসি এদিকে প্রচার করে বেড়ায় যে সুলতাকে কেউ তুক করেছে এজন্য তার এ অবস্থা। যাই হোক সুলতা প্রদর্শনীর প্রোগামটিকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। আলোচ্য গল্পের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক জড়িত। প্রদর্শনী দেখে জগবন্ধুর মনে যে বিকৃত ছবিগুলো প্রভাব বিস্তার করেছিল তারই ফল হল জগবন্ধুর মানসিক ভারসাম্যের অভাব। পরে তার এ অবস্থা থেকে ঘটেছিল উত্তরণ।

'চাচাতুয়া' ছোটগল্পটি মনুষ্যেতর প্রাণীকে অবলম্বন করে রচিত। চাচাতুয়া আসলে কাকাতুয়ার ছদ্মনাম। কাকাতুয়াটিকে কুসুমের জন্য কিনে এনেছিল তার কাকা। কুসুম তার আদরের পাখিটিকে একটি ছড়া শিখিয়েছে, ছড়াটি হলঃ

"রাধাকৃষ্ণ বলো রে ভাই
তার চেয়ে আর বড় নাই।"

ছড়াটি মধুরস্বরে এমনভাবে কাকাতুয়াটি গাইত মনে হত যেন বেতারের নারীকণ্ঠ। আকস্মিক রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে যেদিন কুসুম ও তার মা নিজেদের আশ্রয় ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করে সেদিন কাকাতুয়াটি সে স্থান ত্যাগ করেনি। তাদের বাড়িতে যখন নৈমুদ্দি গফুর ও আমিনারা এসে বসবাস শুরু করল তখন নৈমুদ্দি শুনতে পেল পাখিটির কণ্ঠে সেই ছড়াটি। ইসলাম ধর্মাবলম্বী নৈমুদ্দি হিন্দু দেবদেবীর নামযুক্ত ছড়াটি শুনে ক্রুদ্ধ হয়। সুদীর্ঘ সময় ধরে বহু ভয় দেখিয়ে পাখিটি তার পুরোনো ছড়ার পরিবর্তে আমিনার শেখানো নতুন ছড়া সুমধুর কণ্ঠে শোনায়। ছড়াটি হল :

"আল্লাতাল্লা বল, মিএাঁ
বেহ্স্ত যাবে বুঁচ্‌কি নিয়া।"

তখন থেকে নৈমুদ্দি খুশিতে কেয়াবাত কেয়াবাত ধ্বনিতে মুখরিত করে জানায় এ হল খোদার মর্জি বা কুদরৎ। তখন তারা হিন্দু নাম কাকাতুয়া পরিবর্তিত করে নাম রাখে চাচাতুয়া। মুসলমান নাম ও আরবি ভাষার আবৃত্তিটি শুনে পুত্র গফুর ধেই ধেই করে নাচে আর বলে 'চাচাতুয়া রে চাচাতুয়া'। ছোটগল্পটিতে লেখক ধর্মবোধের অভিন্নতা দেখিয়েছেন রাধাকৃষ্ণ ও আল্লাতাল্লা যেমন এক তেমনি কাকাতুয়া ও চাচাতুয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

'বস্ত্রের বিদ্রোহ' গল্পটি রূপকধর্মী। গল্পটিতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন করতে গিয়ে বিক্ষুদ্ধ জনতাকে ইংরেজ প্রশাসনযন্ত্র কিভাবে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে তারই এক অনবদ্য ঘটনা রূপক কাহিনীর মাধ্যমে পরিবেশন করে শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন ছোটগল্পকার। রজক সম্রাট রঞ্জু বাড়ির সামনে এক ফাঁকা মাঠে সারি সারি বাঁশের সঙ্গে দড়ি খাটিয়ে কাপড় চোপড় শুকাতে দিত। পোশাকের বৈচিত্র্যের অভাব নেই ধুতি, পাঞ্জাবি, সার্ট ও কোর্ট, পায়জামা, গেঞ্জি, ফতুয়া, শাড়ি, সায়া সেমিজ, ব্লাউজ, পাগড়ি, বিছানার চাদর, নামাবলি ও কৌপিন প্রভৃতি বিচিত্র কাপড় ধোপাবাড়িতে বস্ত্র ধৌতির জন্য পাঠানো হত। মূলত স্ত্রী, পুরুষ, সৈন্য, অফিসার, কেরানি, সৌখিন লোক, কৌপিনবস্ত সন্ন্যাসী, পুরুত ঠাকুর কত বিচিত্র অধিবাসীর পোশাক আসত সেখানে। লেখকের মতে ধোপাবাড়ি হল সংসার জীবনের প্রতীক এবং ধোপার খাতা হল মানব জাতির অ্যালবাম। সেখানে সাধু, দুর্জন, ধনী, দরিদ্র, বিজ্ঞ ও মুর্খ, স্ত্রী ও পুরুষের কোনো ব্যবধান নেই যা একটা শ্রেণিহীন সমাজের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। একযোগে যখন বিভিন্ন বস্ত্র যারা এক একটি শ্রেণির প্রতিনিধি তাদের প্রতিবাদী সত্তা একাকার হয়ে যায় তখন শুরু হয় বিদ্রোহ। সুদীর্ঘ বছর ধরে একটানা অত্যাচার ও অবিচার নীরবে সহ্য করেছে যারা, তারা যখন ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে শরিক হয়ে ঝাণ্ডাতোলে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ', শ্লোগানে মুখরিত হয় সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রত্যাশায় তখন রাতের অন্ধকারে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পোষা পুলিশবাহিনী বিপুল জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করে স্তব্ধ করে

দেয় তাদের বিদ্রোহ। মারমুখী জনতা নিমেষের মধ্যে যায় ছত্রভঙ্গ হয়ে সংগ্রাম তখন ব্যর্থতায় রূপান্তরিত হয়। রূপকধর্মী আলোচ্য গল্পে শুকনো বস্ত্রে আস্ফালন যখন দিক দিগন্ত পরিব্যপ্ত তখন সংগ্রামরত বস্ত্রজনতার গায়ে ঢেলে দেয়া হল বাল্‌তি বাল্‌তি জল। সঙ্গে সঙ্গে নিষ্প্রভ হয়ে গেল তাদের তেজ ও চঞ্চলতা। ঠিক ভিজে বেড়ালটির মত নেতিয়ে পড়ে তারা। গল্পকার রূপকচ্ছলে অসংগঠিত ও অনভিজ্ঞ আন্দোলনকারীদের রাজনৈতিক আন্দোলন কতটা ক্ষণভঙ্গুর সেই দিকটি আলোকপাত করেছেন আলোচ্য ছোটগল্পে।

ছোটগল্পকার প্রমথনাথ 'পঞ্চম বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস' ছোটগল্পে মানুষের সঙ্গে পশুর যুদ্ধে পশুদের জয়ের ফলে পশু ও মানুষের ব্যবধান ঘুচে যাবার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গল্পটি আবর্তিত হয়েছে উঁচকপালী নামে একটি মেয়ের সঙ্গে নিরীহ দংশন নামে এক ব্যাঘ্র যুবার বিবাহকে কেন্দ্র করে। দুজনেই রাজবংশের সন্তান। একজন পশুসমাজের রাজা বৃহৎ উঁচের পুত্র। অন্যজনের পিতা ক্ষুদ্র পুচ্ছ নামে এক রাজা। সুদীর্ঘ দশ বছরব্যাপী রাজায় রাজায় সশস্ত্র সংগ্রামে দুর্বলতর মানুষের পরাজয় ঘটল পশুসমাজের কাছে। বিবাহকে কেন্দ্র করে যে বিরোধের সূচনা হয়েছিল, বিবাহের মধ্য দিয়ে ঘটল তার পরিণতি। উঁচকপালীর গর্ভে মহামানব নামে যে শিশুর জন্ম হল ধীরে ধীরে সে হয়ে উঠল সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। তার যোগ্য শাসনে পশু ও মানবের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠল। গল্পকারের মতে পৃথিবীর অখণ্ড শান্তিলাভের জন্য যে শেষ বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল তাই হলো পঞ্চম বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস।

'জেনুইন লুনাটিক' ছোটগল্পটি প্রমথনাথের উল্লেখযোগ্য। গল্পটির নায়ক ভানুপ্রকাশ বেকার যুবক। কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা নেই দেখে পাগলা গারদে থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করে কিন্তু সেজন্য 'জেনুইন লুনাটিক' কিংবা ভায়োলেন্ট সার্টিফিকেটের প্রয়োজন। সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ভানুপ্রকাশ যেদিন বদ্ধ উন্মাদের আচার আচরণ কিরূপ তা দেখতে গিয়ে কৌশলে রাঁচির উন্মাদাগারে পৌঁছে একজন পাগলকে তার পক্ষ থেকে বাইরে আসবার সুযোগ করে দিয়ে রামতারণের কক্ষে ভানুপ্রকাশ প্রবেশ করে এবং বদ্ধ উন্মাদের ভূমিকা পালন করে। উন্মাদাগারে প্রবেশ করে সুখাদ্য ভক্ষণ করে কিন্তু ঔষধপত্র ফেলে দিয়ে চেঁচায় এবং গান করে ও মারামারি করে। ধীরে ধীরে ভানুপ্রকাশ সেখানে সুখের মুখ দেখে এবং পাগলা গারদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আরোও সুযোগ সুবিধা আদায় করবার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

প্রমথনাথ নিবেদিত গল্পসম্ভারের সবচেয়ে দীর্ঘতম ছোট গল্প হিসেবে 'মহামতি রাম ফাঁসুড়ে' ছোটগল্পটির একটি বিশেষ স্থান আছে। গল্পটিকে উপন্যাসোপম ছোটগল্প হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। গল্পে রাম ফাঁসুড়ে শিক্ষা দীক্ষা সাধনা সিদ্ধি এ চারটি পর্বে বিন্যস্ত করে কাহিনী ধারা হয়েছে আবর্তিত। বলাবাহুল্য রামলোচন চক্রবর্তী ওরফে রাম ফাঁসুড়ের নাম সমগ্র বাংলাদেশে সুপরিচিত। তৎকালীন কোম্পানিশাসিত বঙ্গদেশে এক শ্রেণির সমাজবিরোধীরা ঠাণ্ডামাথায় একটুকরো কাপড়ের মাথায় সীসা বেঁধে সুকৌশলে

নিরীহ লোকদের নির্মম ভাবে হত্যা করে দ্রব্যসামগ্রী অপহরণ করত। কাশীতে ব্যাকরণ, সাহিত্য, ন্যায়, স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় রামলোচন বেদান্তবাগীশ শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম না করে সে বুঝেছিল পৃথিবীতে সত্য মিথ্যা, ধর্মা ধর্ম, শুভাশুভ নীতিদুর্নীতি কিছু নেই। সর্বপ্রথম খলচূড়ামণির কাছ থেকে ফাঁসুড়ে বিদ্যা আয়ত্ত করে। এরপর একটি বাছুরকে পরীক্ষামূলকভাবে ফাঁসবদ্ধ করে মেরে ফেলে। নরহত্যার চেয়ে হিন্দুদের কাছে গোহত্যা গর্হিত বলে শীর্ষসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হল। গীতাতত্ত্বের ব্যাখ্যাকাররূপে সে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে। পরবর্তীতে তারাচাঁদ শিরোমণির কাছে দীক্ষা নিয়ে রামলোচন গুরুপ্রণামী দিতে গিয়ে অতর্কিতে ফাঁস এঁটে গুরুকে সাধনোচিতধামে প্রেরণ করে। গুরুকন্যা বিস্তিকে গুরুপ্রদত্ত মিথ্যে উপদেশ শুনিয়ে তাঁকে বিয়ে করে এবং বিস্তির জন্য ফাঁসুড়ে বৃত্তি করে প্রচুর স্বর্ণালংকার সংগ্রহ করে। আকস্মিকভাবে বিস্তির মৃত্যুর পর কালীঘাটে পৌঁছে গঙ্গায় অস্থি বিসর্জন করে শেষরাতে দিব্যকর্ণে শুনতে পেলেন দেবী তাকে রূপচাঁদপক্ষীর কাছে গিয়ে মনের ইচ্ছা পূরণ করবার কথা জানাচ্ছেন। ইতিমধ্যে রামলোচনের শিষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কোনো এক পুণ্যতিথিতে দরিদ্র নারায়ণ সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে এবং এর জন্য নিজের প্রচুর অর্থ খরচ করে। এরপর কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। তার গৃহের নামকরণ হয় রামনিবাস। একদিন গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে গাছে উঠে ধর্মালোচনা করতে গিয়ে গাছ থেকে উল্লসিত হয়ে মাঠে পড়ে আঘাত পেয়ে রাম ফাঁসুড়ে সাধনোচিত ধামে চলে যান। মহামতি রামপণ্ডিতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন হবে এই নিয়ে তাঁর গুণগ্রাহীরা চিন্তিত হলে তাঁর বালিশের তলায় সহস্তে লিখিত একখণ্ড কাগজ পায়। তাঁতে লেখা ছিল—

"না পোড়াইও রাম অঙ্গ, না ভাসাইও জলে—
মরিলে বান্ধিয়া রেখ তমালের ডালে।"

ভক্তরা ভাবল রাধাভাবে ভাবিত হয়ে গুরু দেহত্যাগ করেছেন। তারা তমাল গাছ না পেলে তমালের মামবাদ দিয়ে তালগাছে খোল করতাল কাঁপিয়ে বেঁধে রাখল। উর্ধ্বপদে হেঁট মুণ্ড দোদুল্যমান রামফাঁসুড়ের অপমৃত্যু ঘটেছে দেখে পুলিশ বাহিনী পাড়ায় লোকের প্রাণান্ত ঘটিয়ে ফিরে গেল। এই হল রামফাঁসুড়ের জীবনের সাধারণ ইতিহাস। প্রমথনাথ বঙ্গদেশের ফাঁসুড়ে চরিত্রস্বরূপ যেভাবে আলোচ্য গল্পে উপস্থাপিত করেছেন তা নিঃসন্দেহে লেখকের শিল্পকুশলতার পরিচয় বহন করে।

'সেই সন্ন্যাসীটির কি হইল' ছোটগল্পে এক সন্ন্যাসী জীবনে সংসারের মায়া মোহ ত্যাগ করে সুদীর্ঘ বছর পর আবার সংসারের প্রতি কিভাবে আসক্ত হয় পড়ল সেই কাহিনি আলোচ্য গল্পের বিষয়। সন্ন্যাস ধর্ম পালন অত্যন্ত কঠিন এই পথ সকলের জন্য নয়। যারা গৃহী তাদের কাছে এই ধর্ম পালন অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থতার নামান্তর। অভিজ্ঞান বর্ধন নামে এক সন্ন্যাসী দীর্ঘজীবন সন্ন্যাসব্রত নিয়ে যখন পথে প্রান্তরে তীর্থে ভ্রমণ করছিল তখন আকস্মিকভাবে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় তরুণ যুবক তথাগতের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। ভিক্ষা প্রাপ্তিতে ব্যর্থ হয়ে তার সংসার জীবনের প্রতি আসক্তি জন্মে। একদিন সে তার চীর ও

অজিন ছেড়ে যখন অরণ্যের দিকে যাচ্ছিলেন সেখান থেকে ফিরে এসে সেই বস্ত্রের পরিবর্তে রাজবেশ দেখে অদৃষ্টের ইঙ্গিত মনে করে রাজপোশাক পরিহিত অভিজ্ঞান বর্ধন এসে পৌঁছালো তার রাজপ্রসাদে। মন্ত্রীর সহযোগিতায় রাজকার্য পরিচালনা করতে থাকে। তার পুত্র মাধব মন্ত্রী কন্যাকে নিয়ে বিয়ের স্বপ্ন দেখছে। প্রজারা রাজকর মকুবের ঘোষণায় আনন্দিত, এমতাবস্থায় সন্ন্যাসীর আগমনে সৈন্যদলের মধ্যে দেখা দিল হর্ষধ্বনি। আসন্ন যুদ্ধের কথা ভেবে ও বেতন বৃদ্ধির প্রত্যাশায় তাদের এই উৎফুল্লতা। রাণী, পুত্র, মন্ত্রী সকলেই রাজানুগত্যের ভান দেখিয়ে স্বর্ণরৌপ্য খচিত এক শূন্য আসন তৈরি করে রাজ্যাভিষেকের কাজে ব্যস্ত। এমতাবস্থায় রাজা যখন স্বর্ণসিংহাসনের উপবেশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন একটি সারস ঠোঁট দিয়ে সিংহাসনের উপরে স্থাপিত আসনটি সরিয়ে নিতেই রাজা দেখতে পান সেখানে এক অতলস্পর্শ গহ্বর। এই ঘটনায় রাণী, যুবরাজ ও মন্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে নিজে রাজসিংহাসন অলংকৃত করেন। তারপর একদিন গভীর নিশীথে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে সন্ন্যাসধর্ম পালন করে প্রকৃত সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যলাভের প্রত্যাশায় কপিলাবস্তুতে বুদ্ধের শরণাপন্ন হন। বুদ্ধদেব তাকে সংসারজীবনে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিয়ে পাঁচবিঘা জমিতে কৃষিচর্চা করে সহজ সরল জীবন অতিবাহিত করবার নির্দেশ দেন। পাঁচবিঘা থেকে ধীরে ধীরে তার পঁচাত্তর হাজার বিঘা জমিতে পরিণত হয়। এখন তার বারোটি উপপত্নী। স্ত্রীর অত্যাচারে তার বিবাহের মোহভঙ্গ হয়। এখন তার অসংখ্য পুত্র, নিত্য নব নব উৎসবে রোশনাই আলোতে নৃত্যে গীতে মদিরায় বিদূষণায়, বারাঙ্গনায় প্রবর্তন করেছে কর্মচক্র। তার চিন্তার অবসর নেই। শিষ্য সংখ্যাও কম নয় এই সংবাদ বুদ্ধদেবকে জানালেন। বুদ্ধদেবের আগমনে তার বারোটি উপপত্নী এসে প্রণাম করে বুদ্ধের স্মরণ নিয়ে যাত্রা করে বুদ্ধের সঙ্গে। বুদ্ধ তার ভূস্বামীকে জানালেন তার দেহ সুখের উপকরণ উপপত্নীরা তার সঙ্গে যাওয়ায় তার সুখের অভাব ঘটেছে কিনা। ভূস্বামী জানালেন বয়স্কা উপপত্নীর পরিবর্তে আরো দ্বাদশটি তরুণী সুন্দরী উপপত্নীদের নিয়ে প্রণয় উল্লাসে মেতে থাকবে এটাই তো তার সবচেয়ে বড় পাওনা।

প্রমথনাথের 'সংস্কৃতি' গল্পটি ভিন্ন স্বাদের। গল্পটির ঘটনা কালীঘাট ট্রাম ডিপোর কাছে। ট্রামে আরোহণ নিয়ে দুজনের বাক্ বিতণ্ডা কাহিনির মূলবিষয়। তারা নিঃসন্দেহে জুতা জামা কাপড়ে ভদ্র বাঙালি। কিন্তু তাদের অভদ্র আচরণ ট্রামের কামরায় সীমা ছাড়িয়ে গেছে। দু'জনের হাতাহাতি কাপড় ছেঁড়া, রক্ত কলেবর দেখে ট্রামের যাত্রীরা বিরোধ থামাতে গিয়ে জানতে পেল এই দু'জন যাত্রী হল দক্ষিণ কলকাতা সংস্কৃতি সমিতির একজন সেক্রেটারি অন্যজন প্রেসিডেন্ট। বেশ নামডাক শুনে একাধিক যাত্রী সমিতির সভ্য হওয়ার জন্য আবেদন পত্র হাতে নিয়ে সংস্কৃতি সমিতির অফিসে যাচ্ছিল। এসময় তাদের আচরণে বীতশ্রদ্ধ হয়। দুই যাত্রীর কাছ থেকে জানতে পারে এটা সমিতির অধিবেশন নয় একটি ট্রামের কামরা মাত্র। এখানে কলহে লজ্জা কোথায়। একথা শুনে সভ্য পদ প্রার্থী যাত্রীরা উল্টা বাসে বাড়ি ফিরে এল। তারা আর সংস্কৃতি সমিতির সভ্যপদ গ্রহণ করেনি।

প্রমথনাথের ‘গৃহিনীর গৃহমুচ্যতে’ ছোটগল্পটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। গল্পটির ঘটনাস্থল যমালয়। চিত্রগুপ্ত বিচারকপদে আসীন হয়ে প্রৌঢ় রামহরির বিচার করেছেন। চিত্রগুপ্ত দেখলেন রামহরির জীবনে প্রাক্ বিবাহিত সময়কাল অর্থাৎ তেইশ বছর অবধি পুণ্যের ভাগ ছিল বেশি। কিন্তু বিবাহোত্তর জীবনে পত্নীর সান্নিধ্যে এসে তার পাপের ভার আশাতীতভাবে বেড়েই চলেছে। স্ত্রীর অত্যাচারে হাজার তীক্ষ্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রামহরি বাধ্য হত মিথ্যে তথ্য পরিবেশন করতে। অর্থলোভী স্ত্রীকে যখন জানাল পাওনা টাকার তাগাদায় গিয়ে তার দেরি হয়েছে তখন তার স্ত্রী মাসিক আয়ের বাড়তি টাকার দাবি জানায়। এমনকি তার বেতনের পরিমাণ কত তার সঠিক তথ্য স্ত্রীকে না জানিয়ে কমিয়ে বলতে বাধ্য হত। অফিসে যাওয়ার সময় তার স্ত্রী জলখাবারের জন্য প্রদত্ত অর্থ থেকে বঞ্চিত করত। অথচ একজন পলিটিশিয়ানের মতো মাতাল বলে খোঁটা দেবার জন্য মদের পয়সা দিতে তার বাঁধতো না। চিত্রগুপ্ত তার ছেলে মেয়ের মৃত্যুর কারণ জানতে চাইলে প্রত্যুত্তরে জানাল তিনজনের মৃত্যু ঘটেছে দুধের পরিবর্তে কৌটা গোলা বার্লিতে মিশ্রিত জল খাইয়ে, অন্যরা ডাক্তারের পরিবর্তে গোবরার জলপড়া খাইয়ে বাকি দুজন অসদুপায়ে অর্থ পাবার জন্য অসহায় বিধবার গচ্ছিত তহবিল ভেঙেছে এমনকি এক ধনী বিধবা যুবতীর ইচ্ছাপূরণ করতে বাধ্য হয়েছে স্ত্রীর অনুরোধে। অন্য দিকে বৃদ্ধ পিতা মাতাকে তীর্থে পাঠিয়ে, ভাই বোনদের বাড়ি থেকে তাড়িয়েছে স্ত্রীর পরামর্শে। বিধবার ধন হরণ করবার উদ্দেশ্য কি তা জানতে চাইলে রামহরি জানায় কলকাতা শহরে একটি বাড়ি তৈরি শাস্ত্রের প্রসঙ্গ তুলে সে জানায় ‘গৃহিনী গৃহমুচ্যতে’ তখন চিত্রগুপ্ত তার পাপের দণ্ড দিতে গিয়ে রামহরির কাছ থেকে জানতে পেল তিরিশ বছর বিবাহিত জীবনে তিরিশ হাজার বছর নরকবাসের চেয়েও বেশি দণ্ড ভোগ করেছে। এজন্য চিত্রগুপ্ত রামহরির আকাঙ্ক্ষিত পুনর্জন্মের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কিন্তু তার শেষ আবেদন হল তিনি যেন কোষ্ঠীতে বিবাহযোগ না লিখে শুধুমাত্র প্রেমযোগ লিখে রাখেন। তখন রামহরির অশরীরী সত্তা স্বর্গ থেকে মর্ত্যলোকে এসে উপস্থিত হয়। কলহপ্রিয় পত্নীর আবির্ভাবে স্বামীর জীবন কতটা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে তার সার্থক দৃষ্টান্ত আলোচ্য ছোটগল্পটি।

প্রমথনাথের ‘রাশিফল’ ছোটগল্পটিতে জ্যোতিষ চর্চার দিক্‌টির আলোকপাত ঘটেছে। অপরেশবাবু ও দুই সাহিত্যিক একদিন কৃষ্ণচরণবাবু নামে কলকাতার এক বিখ্যাত জ্যোতিষের কাছে ভাগ্য গণনা করতে আসে। তারা মন্ত্রী উপমন্ত্রী না হলেও চরিত্রে কথাবার্তা হাবভাবে ভবিষ্যতে তাদের মন্ত্রীপদ পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। জ্যোতিষী অপরেশবাবুকে জানাল দিল্লির এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ট্র্যাংকল করে জানতে চেয়েছেন নেহেরুর ক্যাবিনেট তাকে রাখতে অনিচ্ছুক। জ্যোতিষী গণনা করে তাকে অভয় দিয়ে জানালেন যে অবশ্যই তিনি ক্যাবিনেটে থাকবেন। অন্যদিকে এক মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী কেঁদে কেঁদে জানালেন শেয়ারের দাম অনেক কমেছে বাড়বে কিনা? জ্যোতিষী জানালেন অবশ্যই বাড়বে। সেদিন দুপুরের মধ্যেই শেয়ারের দাম বৃদ্ধির সংবাদ শুনে মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী আশ্বস্ত হলেন। জ্যোতিষীর একটা বৈশিষ্ট্য দেখা গেল তিনি অতীত নয় ভবিষ্যৎ গণনায়

বিশেষ অভিজ্ঞ। কবে বিশ্বযুদ্ধ ঘটবে কোন কোন রাষ্ট্র থাকবে, ভারত নিরপেক্ষ থাকবে কিনা সে সংবাদ তার নখদর্পণে। এরপর ঘন্টাখানেক পরে ভোজনরসিক জ্যোতিষীকে নিয়ে রেস্তোঁরায় গিয়ে অনেক টাকা বিল তুলে ট্যাক্সি যোগে স্বনিকেতনে তারা পৌঁছে দেয়। কিন্তু তারা নিজেদের ভাগ্য গণনার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল জ্যোতিষীর কাছে অথচ তারা প্রশ্ন করবার কোনো সুযোগ পেল না। জ্যোতিষী মহাপুরুষের সান্নিধ্যে আত্মপ্রসঙ্গ ভুলে গেল। বাড়িতে ফিরে সংবাদপত্রে সাপ্তাহিক রাশিফল দেখে জ্যোতিষের গণনাশক্তি বিবেচনা করে সান্ত্বনা পেল।

প্রমথনাথের 'অদৃষ্টসুখী' ছোটগল্পটি বিশেষ আকর্ষণীয়। এর কাহিনী অনেকটা রমণীয়। 'অদৃষ্ট সুখী' নামে এক অন্ধ ব্যক্তির সংসার ছিল সুখের। কিন্তু তার মনে ছিল না সুখ। স্নেহময়ী পত্নী পিতামাতা বন্ধু প্রতিবেশী পুত্র প্রত্যেকের নিবিড় সান্নিধ্যে সে বুঝতে পারে নি দুঃখের অর্থ। কিন্তু একদিন নিজেকে হতভাগ্য মনে করে তার দৃষ্টিশক্তি না থাকবার জন্য। সে ভেবেছিল ঐ উদার নীলাকাশ, সবুজ পৃথিবী, উজ্জ্বল দিন, রাতের নক্ষত্র, পরমাসুন্দরী নারী ও পত্নীর লাবণ্যময় রূপ সে দেখতে পেত না অন্ধ বলে। এজন্য একদিন আতা গাছের তলায় কঠিন তপস্যায় বসে দেবতার কাছে থেকে বর পেল। বিধাতা তাকে বার বার জানালেন সে অন্ধ বলেই সুখী। সুখ দৃষ্টির ওপর নির্ভর করে না। অদৃষ্টসুখী নাছরবান্দা হয়ে তার অভীষ্ট বর পেয়ে ফিরে পেল তার দৃষ্টিশক্তি। তারপর প্রথম শুভদৃষ্টিতে পত্নীর মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে দেখল তার নাকের নীচে একটা গোঁফ। চাকররা তাকে কর্মবিচ্যুতির জন্য গাল দিল। পিতা তাঁর সম্পত্তির ভাগ অন্যান্য ভাইদের সমবন্টন করে দিল। বন্ধুদের ব্যঙ্গাত্মক বক্তব্য, পুত্রের প্রতারক পিতার পরিচয়ে, প্রতিবেশী মেয়েদের পরিহাসে, ভাইদের নির্দেশে বুঝতে পেল বিধাতার নির্দেশ না মেনে সে ভুলই করেছে। আবার সে তপস্যায় বসে ভগবানের কাছে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার আবেদন জানিয়ে দৃষ্টিহীন অদৃষ্ট সুখী দেখল, প্রত্যেকের কাছে সে আবার প্রিয় হয়ে উঠেছে।

"অদৃষ্ট-সুখী পুনরায় অন্ধ হইয়া অতিশয় আনন্দে ফিরিয়া আসিল। পরদিন তাহাকে অন্ধ দেখিয়া পিতা, পত্নী, মাতা, আত্মীয়-স্বজন ভৃত্যবর্গ এবং পাড়ার রমণীগণ সকলেই বহুকালের অভ্যস্ত আনন্দের স্বাদ পাইল।"[২৪]

সে নিজেকে অদৃষ্ট সুখী নামকরণের তাৎপর্য উপলব্ধি করল। স্বয়ং ভগবান কাউকেই পূর্ণ সুখী করে রাখেন নি। যে কোনো একটি দিকে মানব মনে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা থাকবেই। এটাই বিশ্ব পিতার এক লীলা মাত্র। লেখক আলোচ্য গল্পে সুখের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে শিল্প প্রতিভার সার্থক পরিচয় দিয়েছেন।

ছোটগল্পকার প্রমথনাথ বিশীর 'ন-ন লৌ-ব-লি' ছোটগল্পে রূপকের আড়ালে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটিপূর্ণ দিকটি আলোকপাত করেছেন। ঘুণ ধরা সমাজব্যবস্থার প্রতিটি রন্ধ্রে ঘুষ নেবার যে প্রবণতা সমাজ জীবনকে কলুষিত করে দিচ্ছে তারই এক জীবন্ত দলিল আলোচ্য গল্পটি। স্বর্গ ও মর্ত্যের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে শিল্পী প্রমথনাথ সামাজিক সত্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। স্বর্গের নন্দনবনে পারিজাত বৃক্ষের তলায় প্রচণ্ড

ভিড়। উক্ত গাছের ডালে একখন্ড কাগজে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞাপনদাতা ন-ন-লৌ-ব-লি-র প্রধান কর্মসচিব। কোম্পানিটির পুরোনাম নন্দন নরক লৌহবর্ম্ম লিমিটেড। নন্দন নরকের সঙ্গে স্বর্গের যোগসূত্র স্থাপনের জন্য দ্বারপালের প্রয়োজন। উক্ত পদের আবেদন প্রার্থীর সংখ্যা এক লক্ষ। সিলেকশন কমিটি সৎ চরিত্র, সাধু, কর্মঠ ও পরিশ্রমী এবং ঘুষের প্রতি যাদের বিন্দুমাত্র মোহ নেই এরূপ বারোজনকে বেছে নেবার পর তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে কম বেতনে কাজ করতে স্বীকার করেছে তারা হলেন যুধিষ্ঠির, বুদ্ধ ও যীশুখ্রিষ্ট। এই তিনজন নবনিযুক্ত দ্বাররক্ষী উর্দি পোশাক ও টুপি পড়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করে। অনেক অবাঞ্ছিত লোক নন্দন নরক থেকে স্বর্গে প্রবেশের সময় তারা ভুলে যেতে পারেনি। পৃথিবীর দীর্ঘকালীন অভ্যাসকে মনে রেখে প্রত্যেকেই উপঢৌকন হিসেবে ডালাভর্তি টাটকা ইলিশ ফলমূল তরকারি ঢাকাই শাড়ি, একজোড়া অনন্ত ও কানের দুল দিয়ে স্বর্গে প্রবেশ করতে আগ্রহী। প্রথম অবস্থায় এই তিন দ্বাররক্ষী ঘুষ নিতে অসম্মত হলে যাত্রীদের বক্তব্য সূত্রে ঘুষের পরিবর্তে ডালা ব্যবহৃত হয়েছে। তারপর নিজেরা সেই ডালাকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। একযাত্রী ডালা ভরে আনবার পর শাড়ি ও অলঙ্কার না পেয়ে যুধিষ্ঠির পা দিয়ে ডালাটিকে সরিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে তারা প্রত্যেকেই ডালা না পেলে অসন্তুষ্ট হয়। ঘটনাক্রমে এই ডালার সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় তিন দ্বাররক্ষীর ঘটল কর্মবিচ্যুতি। তখন বেকার যুধিষ্ঠির, বুদ্ধ ও যীশুখ্রিষ্ট মন্দাকিনীর বন্যায় বিধ্বস্ত শরণার্থীরা যারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করছে তাদের দলে ভিড়ে গিয়ে চাল ও ডালা পেয়ে মন্দাকিনীর তীরে খিচুড়ি রেঁধে ক্ষুধা নিবৃত্ত করে। আলোচ্য গল্পে লেখক দেখিয়েছেন সমাজব্যবস্থায় এমনি যেখানে একটা সৎ লোককেও নিজব্যক্তিত্ব বিকিয়ে দিয়ে ঘুষখোরদের দলভূক্ত হতে হয়। অন্যদিকে কম বেতনে তাদের নিযুক্ত করার অর্থ হল যাতে তারা সাংসারিক অসচ্ছলতায় অসৎ পথে পা বাড়ায়।

প্রমথনাথ বিশীর 'নির্ব্বাণ' ছোটগল্পটিও সমাজজীবন কেন্দ্রিক। আলোচ্য গল্পে ছোটগল্পকার দেখিয়েছেন বিভিন্ন জীবন জীবিকা থেকে ফিল্ম স্টারদের সামাজিক মর্যাদা অনেক বেশি। গল্পটিতে এক রাজপুত্র ফিল্ম স্টার হতে চেয়েছে। রাজপুত্রটি হলেন সিদ্ধার্থ প্রথমে তিনি সমগ্র সংসার ভেজাল পুর্ণ দেখে সংসারত্যাগী হতে চেয়েছেন। তার পিতা চেয়েছেন রাজপুত্র হয়ে উঠুক সংসারী। এজন্য সিদ্ধার্থের নগর ভ্রমণের সময় যাতে সংসার জীবনের বন্ধনে সে জড়িয়ে পড়ে এজন্য সংসার আসক্তিমূলক বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছেন। একদিন নগর ভ্রমণে বেরিয়ে সিদ্ধার্থ দেখলেন পথের দুধারে সারিবদ্ধভাবে প্রজারা হাসির ঝর্ণা ধারায় উদ্বেল, তা দেখে সিদ্ধার্থের মনে হল এ জগৎটা সত্যই আনন্দময়। তারপর পথে দেখা হল এক বেকার ছেলের, ছেলেটি ছিল সিদ্ধার্থের সেরা ছাত্র। তারপর দেখতে পেলেন সৌন্দর্য যৌবন ও বিলাসী এক বারাঙ্গনাকে। তার পরদিন পথের দুধারে দেখতে পেলেন নববস্ত্রে সুসজ্জিত শ্রেষ্ঠ ধনীদের। এই দৃশ্যগুলি দেখে তিনি বুঝলেন সত্যিই পৃথিবীটা ঐশ্বর্য ও সম্পদে ভরপুর। তারপর একে একে ঋণী, সুপুরুষ ও দরিদ্রক্লিষ্ট কেরাণিকে দেখলেন, কেরানিটি টাকা গুনে গুনে চোখ নষ্ট করেছে।

তার স্বাস্থ্য ভগ্ন এবং তার মন নিরানন্দযুক্ত। সংসার জীবনের ভালো মন্দ বিভিন্ন দৃশ্য দেখে সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগে অনিচ্ছুক হলে সঙ্গে সঙ্গে সারথির কাছ থেকে জানতে পেলেন সুদৃশ্য পোশাক পরিচ্ছদে সুসজ্জিত এক ফিল্মস্টারকে। ফিল্মস্টাররাই এযুগের অবতার তাদের দুঃখ নেই, জরা নেই, বার্ধক্য নেই, ঋণ নেই, আছে শুধু হাসি, বাঁশি, গান, যৌবন, বসন্ত, আর আছে নায়ক ও নায়িকার সুগভীর প্রেমানুভব। এটা দেখে সিদ্ধার্থ পবিত্রারণ্য নামক সিনেমা কোম্পানিতে যোগ দিলেন, এতে বোঝা গেল সমাজে ফিল্মস্টারদের জীবন সবচেয়ে আনন্দমধুর।

প্রমথনাথের 'নগেন হাঁড়ীর ঢোল' ছোটগল্পে জমিদারি ব্যবস্থার অনিবার্য বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নগেনের সুগভীর বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সহজ সরল নগেনের সুপ্ত ইচ্ছে ছিল সে একদিন হবে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ঢুলি। যে সময়ে জোড়াদীঘি গ্রামের জমিদারের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র গ্রাম্য জীবনে যখন কলেরা ও মহামারীর প্রাদুর্ভাবে শ্মশানভূমিতে পরিণত হল সে সময় হাঁড়ি পাড়ার নগেন ও তার মা ছিল বেঁচে। নগেনের পূর্বপুরুষরা বাজাত ঢোল। মায়ের মৃত্যুর পর নগেন ফিরে এসেছিল সেই গ্রামে। গ্রাম ছাড়বার আগে একটি ঢোলের খোল সিন্দুক ও তক্তপোশ তার মা রেখে গিয়েছিল স্বগ্রামে। নগেন স্বগ্রামে ফিরে এসে সেগুলো উদ্ধার করতে পারেনি, শুধুমাত্র বিশ্বস্ত মোতি ছুতার ফিরিয়ে দিয়েছিল নগেনকে তার ঢোলের খোলটি। অতীত ঐতিহ্যবাহী ও অতীত স্মৃতিযুক্ত সেই ঢোলের খোলটি জমিদার তারানাথবাবুর অর্থনৈতিক সহযোগিতায় চামড়া লাগিয়ে পালিশ করে পালকে সাজ পরিয়ে নতুন করে ফেলল। মনের আনন্দে নগেন হাঁড়ি ডুম্ ডুম্ ডুম্ ঢোল বাজাত। শোনা যেত সকালে বিকালে দুপুরে হাটে বাজারে পথে সর্বদা সর্বত্র কেবল নগেনের ঢোলের শব্দ। গ্রামের অনেকে তার প্রতি অতিষ্ঠ হয়েছিল সন্দেহ নেই। আবার তার গৃহে ঢোল বাজানোর জন্য লোক সমাগমের অভাব ঘটেনি। ঢোল বাজাতে অনিচ্ছুক হওয়ায় হরিচরণের সঙ্গে নগেনের হাতাহাতি হয়েছে একাধিকবার। রতন মুচির দুই পুত্র জন্মালে ষষ্ঠীপূজায় সে ঢোল বাজায়নি। ঢোলের জাত আছে কিনা একথা রতন জানালে জাত তুলে কথা বলার জন্য নগেন রেগে যায়। নগেনের মধ্যে একটা আভিজাত্যবোধ ছিল বলেই সে সকলের বাড়ির ক্রিয়াকর্মে ঢোল বাজাত না। আন্তরিকভাবে সে জমিদারকে শ্রদ্ধা করত। জমিদারের নাতি জন্মালে নগেন উল্লাসিত হয়ে তার অন্নপ্রাশনের ঢোল বাজাবার প্রত্যাশায় নতুন নতুন অনেক বোল শিখে নিয়েছে। কিন্তু নগেনের সে আশা পূরণ হয়নি। নাতির অন্নপ্রাশনের কয়েকদিন আগে তারানাথবাবুর জমিদারি নিলাম হবে এই ঘোষণা জারি করবার জন্য নগেনকে ঢোল বাজাতে হবে। জমিদারের একান্ত অনুগত নগেন ঢোল বাজাতে সম্মত হয়নি। তখন চাপরাশি ও পেয়াদারা নগেনের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে নগেনের গৃহ তল্লাসি করে ঢোলটি উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালায়। পরিশেষে চামড়াহীন পালকহীন শুধু খোলটি দেখতে পেয়ে সুবিধামত নগেনকে বিপদে ফেলবার ষড়যন্ত্র করছে এই সংবাদ পেয়ে নগেন সেদিন থেকে ঢুলি হবার আশা ত্যাগ করে।

প্রমথনাথের 'মাধবী মাসী' মনস্তত্ত্বমূলক ও চরিত্র প্রধান ছোটগল্প। মাধবী চরিত্রকে ঘিরে গল্পের ঘটনা ধারা আবর্তিত হয়েছে। গল্পটিতে নারী মনস্তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। কালের নিয়মে পরিবর্তিত হয়ে যায় জীবনের বিভিন্ন স্তর। কৈশোর থেকে যৌবনে, যৌবন থেকে বার্ধক্যে উপনীত হবার বিশ্বনীতিকে সুকৌশলে প্রমথনাথ তাঁর আলোচ্য গল্পে তুলে ধরেছেন। বালবিধবা মাধবী কর্মসূত্রে একটি গার্লস হোস্টেলের পরিচারিকা। প্রত্যেকের কাছে সে মাধবী মাসি। কলেজে যাবার সময় কিংবা ফিরে আসবার সময় মাধবী ছিল ছাত্রীদের একান্ত আপনজন। প্রত্যেক ছাত্রীর সঙ্গে মাধবীর সুসম্পর্ক থাকলেও বিনতার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা ছিল সবচেয়ে বেশি। প্রতি রবিবার বিনতা চুলের খোপা বেঁধে দিত। বয়সের দিক থেকে মাধবী ছিল পূর্ণ যুবতী। উভয়ের মধ্যেই সুখ দুঃখের কথা বিনিময় হত। ধীরে ধীরে মাধবীর প্রতি বিনতা হয়ে উঠেছিল সহানুভূতিশীল। মাধবীর আরও একটি গুণ ছিল সে উল বুনত অবসর সময়ে। বিনতার হোস্টেল ছেড়ে চলে যাবার দুবছর বাদে বিয়ে উপলক্ষে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল মাধবীকে। সে দায়িত্বশীল কাজের চাপে বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেনি। তবুও একটি জামা উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছিল যথাসময়ে। উক্ত তারিখটি লাল দাগ দিয়ে রেখে প্রতি বছর বিনতাকে পাঠাতো একটি করে তার হাতে তৈরি সুন্দর জামা। একদিন গাড়িতে চেপে বিনতা এসেছিল মাধবী মাসির কাছে। তার মেয়ে মমতা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেই কলেজে হোস্টেলে এসেছে এবং অর্পণ করেছিল মমতার দায়িত্ব মাধবী মাসির কাছে। মমতার আবির্ভাবে সে উপলব্ধি করতে পেরেছে বয়স সম্পর্কে ধারণা। আজ সে যৌবন থেকে বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে। হারানো যৌবন থেকে বার্ধক্যে পৌঁছে তাঁর হৃদয়ে জেগেছে গভীর শূন্যতাবোধ। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানবজীবনের পরিবর্তন ঘটে এই সত্যটি আলোচিত হয়েছে আলোচ্য গল্পটিতে।

প্রমথনাথের পশু প্রীতির উজ্জ্বল নিদর্শন যুক্ত সার্থক ছোটগল্প 'কুকুর বিড়ালের কান্ড'। গল্পটিতে ছোটগল্পকার দেখতে চেয়েছেন বন্ধুত্বের সম্পর্কে ফাটল ধরতে পারে কিন্তু পশুদের মধ্যে মৈত্রী বন্ধনে থাকে অটুট। অজিত ও দিলীপ দুই বন্ধু। তাদের বন্ধুত্বের কথা সুবিদিত। অজিত কিনেছিল একটি কুকুর ছানা যার নাম কালো জোনাক। দিলীপের ছিল একটি পোষা বিড়াল। যার নাম ফেনী। সুদীর্ঘ জীবনের তাদের বন্ধুত্বে ফাটল ধরেছিল প্রাপ্ত একটি বাড়ি ভাড়াকে কেন্দ্র করে। সেই বিরোধ ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে যখন তুঙ্গে ওঠে তখন দুই বন্ধু বিবাদমান হয়ে আহত হয়। এই সংবাদ দিলীপের স্ত্রী শুনে অজিতের পোষা কুকুরটিকে প্রাণপণে ঠেঙালো এবং কুকুরটি কিন্তু সুরমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে মাথা নাড়াতে লাগল। বিড়ালটি সঙ্গী কুকুরটির বিপদে বিব্রত হয়ে লাফিয়ে উঠে সজোরে সুরমাকে আঁচড় দেয়। কুকুর ও বিড়াল তাদের খাদ্য ভাগাভাগি করে খেত। তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার অভাব ছিল না। কুকুর ও বিড়াল যে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল সে বন্ধন দুই বন্ধুর মধ্যেও অটুট ছিল না।

প্রমথনাথের 'বাঁশ ও কঞ্চি' ছোটগল্পটিতে জমিদার ও নায়েবের জীবন দর্শন ব্যক্ত

হয়েছে। সরকার কর্তৃক জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির আদেশজারির সঙ্গে সঙ্গে নায়েব ও গোমস্তার বিপরীতধর্মী মানসিকতা কিভাবে পরিস্ফুট হয়েছে তাই হল আলোচ্য গল্পের বিষয়। জমিদার রমেশের জমিদারি আয় যৎসামান্য, এজন্য জমিদারি ছেড়ে দিতে তার কোন বেদনা নেই। কিন্তু নায়েব পাইক ও বরকন্দাজ নিয়ে জমিদারিস্বত্বের সিংহভাগ পেয়ে সচ্ছল জীবনের অধিকারী। এমন কি হাইকোর্টে মামলা করে স্টে অর্ডার নিয়ে সে চালিয়ে যেতে চেয়েছে জমিদারি স্বত্ব। আলোচ্য গল্পে নায়েব তারাচরণবাবুর যেন পৌষমাস অন্যদিকে জমিদার রমেশের যেন সর্বনাশ। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হবার পর এই দুই পক্ষের মানসিকতাকে লেখক সুকৌশলে তুলে ধরেছেন।

ছোটগল্পকার প্রমথনাথ 'কীটাণুতত্ত্ব' ছোটগল্পে বিশ্বের প্রথম জীব সৃষ্টির প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। বিশ্বের জীবপুরের উৎস হল মৃত কণিকা। এই মৃত কণিকাগুলি জল ও হাওয়ায় পচে গিয়ে কীটাণু সৃষ্টি করেছে। এই নগন্য কীটাণু থেকে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে মানবকুলের। বলাবাহুল্য মানুষ হল জীবশ্রেষ্ঠ। তার প্রথম আবির্ভাব ঘটেছে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে।

প্রমথনাথের 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' ছোটগল্পটি রূপক ও ব্যঙ্গধর্মী। ধর্মনিরপেক্ষতা নাম করে রাষ্ট্র জীবনে যে অবক্ষয় নেমে আসে সেদিকটি ছোটগল্পকার আলোচ্য গল্পে আলোকপাত করেছেন। গল্পটির ঘটনা ধারা আবর্তিত হয়েছে সুন্দরবনে ও তৎসংলগ্ন এলাকায়। সুন্দরবন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। কিন্তু সেখানে ধর্ম নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিষ্টান প্রতিটি জাতি সেখানে বিপর্যয়ের মুখে, প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে যা বোঝায় প্রতিটি ধর্মের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও পরমতসহিষ্ণুতা। অথচ যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে চলে অরাজকতা সেখানে বক্তৃতার মাধ্যমে আদর্শবাদ অর্থহীন। ছোটগল্পকার কথিত বিপুল ক্ষুধা ও বহুক্ষুধা নামে দুই ব্যাঘ্র ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে রাজা দক্ষিণা রায়ের রাজত্বে পৌঁছে তাদের জীবন যে সংঘাতের মুখোমুখি হয়েছিল, তা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে প্রহসন ব্যতীত কিছুই নয়। এই সত্য প্রকাশ করতে লেখকের আলোচ্য গল্পের অবতারণা।

মানবেতর প্রাণীদের নিয়ে লিখিত প্রমথনাথের ছোটগল্পগুলোর মধ্যে 'নীলমণির স্বর্গলাভ' ছোটগল্পটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। নীলমণি আসলে একটি ভালুক। জয়ন্তী নদীর ধারে সুয়া পাহাড়ের কোলে মহুয়ার মধুর গন্ধে মদির সাঁওতাল পরগনার একটি সুরম্য স্থানে জন্মেছিল নীলমণি। ঘটনাক্রমে দাসত্বশৃঙ্খলে সে হল আবদ্ধ। নীলমণির জীবনের মধ্য দিয়ে যে গভীর বেদনার সঞ্চার ঘটেছিল সে পরাধীনতার বেদনা প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু স্বর্গবাসের মধ্যে ও নীলমণির অন্তরে সুপ্ত বেদনার সঞ্চার ঘটেছিল। কোনো এক আকস্মিক ঘটনায় মাতৃহারা নীলমণিকে কাটাতে হয়েছে শৃঙ্খলিত জীবন। গল্পকার ভালুকওয়ালাকে নীলমণির বাবা বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রতিদিন ডুগডুগি বাজিয়ে সে খেলা দেখাত। কয়েক মাস খেলা দেখিয়ে সারা বছরের রোজগার করত বলে নীলমণির যত্নের অভাব ঘটত না। সে প্রশিক্ষণ পেয়ে দক্ষ নাচ শিখেছে। যখন নীলমণির

বাবা তাকে শোনাত বৌ কি করে শ্বশুরবাড়ি যায় তা দেখাতে, তখন নীলমণি পিতৃগৃহ ছেড়ে যাওয়া বধূর মন্থর গতিতে যাবার কৌশল দেখাতো। আবার শ্বশুরবাড়ি থেকে নববধূ বাপের বাড়ি কিভাবে আসে দেখতে গিয়ে দ্রুতপায়ে তাড়াতাড়ি চলনভঙ্গি দেখাত। এর ফলে দর্শকমনে হাসির সঞ্চার ঘটত। কখনো জ্বরের ধন্বন্তরী ঔষধ হিসেবে নীলমণির লোম টেনে ছিঁড়ে পয়সার লোভে বিক্রি করত। যেদিন জয়ন্তী নদীতে বন্যার জলোচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছিল নীলমণির বাবার অনুপস্থিতিতে জলোচ্ছ্বাসে ভাসতে ভাসতে চলল নীলমণি। তখন তার জ্ঞান লুপ্ত হয়েছে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে নীলমণি দেখল তাকে ঘিরে রেখেছে কয়েকটি ভালুক। স্থানটি শাল মহুয়া পলাশ শিমূলে রাঙা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা আর রয়েছে মধুর চাক এবং অজস্র মহুয়ার ফুল। নীলমণি চাকচুষে মধু খেল আর খেল মহুয়ার ফুল। শরীর তখন তার নেশাগ্রস্ত। বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে মনের আনন্দে শুকনো পাতার তালে তালে নেচে চলছে সে ভাবতে পারেনি স্থানটি স্বর্গ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সে ভুলে যেতে পারেনি তার পালক পিতার কথা। তিনি বেঁচে থাকলে তাকে সে দেখিয়ে দিত ঐশ্বর্যময় আনন্দময় স্বর্গীয় এই জগৎটিকে। এজন্য সে দুঃখ অনুভব করেছে সন্দেহ নেই তবুও মুক্ত প্রকৃতির কোলে শৃঙ্খলমুক্ত জীবন ছিল তার একান্ত প্রিয়। সমালোচকের মতানুসারে বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মায়ের কোলে এই আপ্তবাক্যটিকে সামনে রেখে একটি পশু হৃদয়ের মনস্তাত্ত্বিক অনুবৃতিকে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন ছোটগল্পকার।

প্রমথনাথের সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিতে লেখা মনোরম ও চিত্তাকর্ষক একটি গল্প হল 'জেমি গ্রীনের আত্মকথা।' ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে স্বদেশী সিপাহীদের বিরোধ নিয়ে লেখা গল্পগুলোর মূলসূত্র পেয়েছিলেন সিপাহী বিদ্রোহ প্রসঙ্গে মুদ্রিত গ্রন্থে যার নাম 'History of Indian mutiny.' গল্পটিতে জেমি গ্রীনের জীবন কথা স্থান পেয়েছে। যার প্রকৃত নাম মহম্মদ আলী খাঁ। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি প্রাপ্ত এই সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমান ছেলেটি তার পিতার নির্দেশে কোম্পানির চাকরি গ্রহণ করেছে। সে নিযুক্ত হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের জমাদার পদে। কর্মক্ষেত্রে তার প্রতি ইংরেজ কর্মচারীর অপ্রীতিকর আচরণ ও নেটিভ বলে ঘৃণা করায় সেই কাজ ছেড়ে দিয়ে বাদশাহী ফৌজের জুনিয়ার পদ অলংকৃত করে। কানপুর, মিরাট প্রভৃতি স্থানে বাহাদুর শাহের ফৌজ বীর বিক্রমে কোম্পানি শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চলেছে। সে ইঞ্জিনিয়ার হয়েও গোয়েন্দার মতো ইংরেজ কামানগুলি কতটা শক্তিশালী সেটা যাচাই করবার জন্য ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশে ইংরেজ কোম্পানির রেজিমেন্টে পৌঁছে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে নিরাপদে ফিরছে। এসময়ে তার এক সঙ্গীর বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি ধরা পড়লেন। তারপর বিচারে তার ফাঁসির দণ্ডাদেশ হয়। ফাঁসির মঞ্চে ওঠার পূর্বে সে সবিনয়ে জানিয়েছিল গুপ্তচরবৃত্তি সে গ্রহণ করেননি। কিছু সময় ধরে দণ্ডাদাতাকে জানিয়েছিল তার অতীত জীবন কাহিনি। শেষ নমাজ পড়ে নিয়ে জেমি তার মাথার লম্বা চুল থেকে একটি সোনার আংটি বের করে উপহার হিসেবে সাহেবকে দিয়েছিল। সে জানাল মন্ত্রপূত অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এই আংটিটি একটি ফকির ইস্তাম্বুলে

থাকাকালীন সময়ে দেয়। সেটি পেয়ে বহু বিপদ থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছেন। একমাত্র পাপীর ক্ষেত্রে সঙ্গ নিয়ে চলতে গিয়ে আংটির যাদু আর তার খাটেনি। তাই মৃত্যুর আগে আংটিটি দিয়ে সে জানাল যখন সন্ধ্যে ছ'টা দণ্ডের প্রারম্ভির ডাক পড়বে তার একদিকে সে ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাইবে অন্যদিকে তার স্ত্রী ও ছেলেরা নিরাপত্তার জন্য জানাবে খোদার কাছে প্রার্থনা। পরদিন সাহেব দেখতে পেলেন জেমি গ্রীনের মৃতদেহ ফাঁসি গাছে ঝুলছে। সাহেব আংটিটি সঙ্গে রেখে বহুবার অনিবার্য বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। কর্নেলের আদেশে চারজন বারুদের থলি নিয়ে রন্ধ্রপথে যখন লাফ দিয়েছিল যুদ্ধকালীন সময়ে, তখন কি আশ্চর্য তিনজন মরে গেলেন, বেঁচে গেলেন সাহেব। সাহেব সৈন্যবাহিনী থেকে ইস্তফা নিয়েছেন কিন্তু জেমি গ্রীনের আংটিটি মৃত্যুকালে দিয়ে যান তার পুত্রকে এমনি তার পুত্রকেও সেই আংটিটি দিতে যেন ভুলে না যায়। আলোচ্য গল্পটি Forbis Matche এর লেখা Reminiscenes of the great Mutiny 1857-59 গ্রন্থটি থেকে আলোচ্য গল্পটি লেখার সুত্র খুঁজে পেয়েছেন ছোটগল্পকার।

প্রমথনাথের 'কোকিল' ছোটগল্পটি রোমান্টিক লক্ষণাক্রান্ত। আলোচ্য গল্পে ইতিহাস রসের সঙ্গে কাব্য রসের মেলবন্ধন ঘটেছে। গল্পের মূল বিষয়ের সঙ্গে কোকিলের কু-উ-কু-উ ধ্বনি বিশেষ সম্পর্কযুক্ত। প্যালিসারের জীবনে কোকিলের ডাক বহন করে এনেছে বিবর্তন। তার জীবনের বহুস্মৃতি কোকিলের ডাকের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যক্তিজীবনে প্যাপিরাস একদিন কোকিলের ডাক শুনে কোকিলটিকে দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে একটি গাছের দিকে তাকাতে তাকাতে যখন এগিয়ে যাচ্ছিল তখন অবচেতন মনে আকস্মিকভাবে ধাক্কা লাগে এক আর্টিস্টের সঙ্গে। মহিলা আর্টিস্ট বসে বসে আঁকছিল কোকিলটির ছবি। ছবিটি ছিল তখন অসম্পূর্ণ। সুন্দরী আর্টিস্ট মেয়েটির নাম মিসেস রবার্ট ডিউস। তারপর ডিউস ও প্যালিসার ইংল্যাণ্ড থেকে বিবাহের পর চলে এসেছে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রেল দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার পদে। একদিন প্যালিসার পেয়েছিল একটি লেদার কেস। তার ভেতর ছিল এক সুন্দরী তরুণীর ছবি। সে ছবিটি যে মিসেস ডিউসের এতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল এই ছবিটি এল কি করে। প্যালিসার ছবিটির দিকে তাকিয়ে আবার শুনতে পেল কোকিলের কু-হু ডাক। কোকিলের ডাকের মধ্য দিয়ে রোমান্টিক নায়ক নায়িকার জীবনের ঘটেছে মিলন আলোচ্য গল্পে প্রমথনাথ সে দিকটি আলোকপাত করেছেন।

ইতিহাস সচেতন প্রমথনাথের সিপাহী বিদ্রোহকে নিয়ে একাধিক ইংরেজি গ্রন্থ পাঠের সুযোগ ঘটেছিল। ইতিহাসকাররা এই বিদ্রোহকে জাতির জাগরণ বলে মেনে না নিলেও এটি যে প্রথম ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এতে কোনো সন্দেহ নেই। বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক নানাসাহেব তার স্বকীয় রাজনৈতিক বিদ্রোহে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে অনেকটা প্রকম্পিত করে দিয়েছিলেন। ইতিহাস অনুরাগী ছোটগল্পকার প্রমথনাথ নানাসাহেবকে নিয়ে একাধিক গল্প উপহার দিয়েছেন তন্মধ্যে 'ছিন্নদলিল' ছোটগল্পটি এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সিপাহীদের সংকেতরূপে বিদ্রোহকালে ব্যবহৃত হয় চাপাটি ও পদ্ম। এই গল্পটি

গৃহীত হয়েছে তাঁর ইতিহাস কেন্দ্রিক গল্প গ্রন্থ 'চাপাটি ও পদ্ম' থেকে। সে সময় ভারতে রাজভক্তের অভাব ছিল না বহু ভারতীয় জানিয়েছিল কোম্পানি শাসনকে সমর্থন। তাঁরা কোম্পানির সেনাবিভাগে যোগদান করতে প্রবল উৎসাহিত ছিল। বদ্দিনাথ মুখার্জী, ঘোষাল ও বাড়ুজ্জে এই তিন বঙ্গসন্তান যোগ দিয়েছিল ইংরেজ কোম্পানিতে। তখন নানাসাহেবের দোর্দন্ড প্রতাপে ভারতীয় সিপাহীরা স্বদেশ চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে মৃত্যুপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। সে সময় শেরার সাহেব ছিল কোম্পানির সেনাবিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদে আসীন। বদ্দিনাথ নিরাপত্তার প্রায়োজনে একটি কাগজ শেরার সাহেবের পরোয়ানা সংগ্রহ করে তার ঘরে টাঙিয়ে রেখেছিল যাতে তাঁর রাজভক্তি প্রমাণিত হয়। বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের অপরাধে ইংরেজরা ভারতীয়দের উপর চালিয়েছিল নির্মম অত্যাচার। জেনারেল নীলের শাসনে কানপুর ছিল আতঙ্কিত। শত শত ভারতীয় আসামীদের মৃত্যু ছিল সে সময়কার দৈনন্দিন ঘটনা। একদিন রাজভক্ত বদ্দিনাথ মুখুজ্জ্যের গৃহে ছিন্নবসন ও উদ্বাস্তু চেহারাযুক্ত এক যুবক আশ্রয়প্রার্থী হয়। সেই যুবকটি যে ছদ্মবেশী নানাসাহেব হতে পারে তা তাঁর বিন্দুমাত্র মনে হয়নি। শেরার সাহেব যখন এক গোয়েন্দা যুবকের অনুসন্ধানে ব্যতিব্যস্ত সে সময় যুবকটি মুখুজ্জ্যের গৃহে আত্মগোপন করেছিল। সুযোগ বুঝে সাহেবের পরোয়ানা বা ঘরের টাঙানো দলিলটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে অন্য কাগজে লিখে রেখেছে This House belongs to tiaitors to the country NANA Sahib. মুখুজ্জ্যে এটি দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে নানাসাহেবের উদ্দেশ্যে তীব্র ভৎর্সনা করে।

নানাসাহেবকে বন্দী করবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সেনাপতি হোপগ্রান্ট, ল্যাফটেনেন্ট রবার্টস, স্যার কলিন ক্যাম্বেলদের নেতৃত্বে যখন লক্ষ্ণৌ, কানপুর, এলাহাবাদ প্রভৃতি উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে চলেছিল ব্রিটিশ বাহিনীর দুর্ধর্ষ অভিযান এবং কামানের গোলায় উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল সিপাহীদের ঘরবাড়ি, সে সময় আর্দালি অঞ্জন তেওয়ারীকে সঙ্গে নিয়ে রবার্টর্স ঘুরে ঘুরে যুদ্ধের তদারক করছিলেন। তখন এক মুসলমান বৃদ্ধ রবার্টর্সকে সবিনয়ে আবেদন জানিয়েছিল তাঁর বাড়িটিকে রক্ষা করার জন্য। সেদিনই মুসলমান বৃদ্ধটির পাঁচটি পুত্রের মধ্যে তিনজন মৃত্যুর কোলে ঢলে পরে। সে আবেদন অনুমোদন করেছিল রবার্টস। বৃদ্ধটি হাত আকাশের দিকে তুলে খোদার উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অশ্রুধারা বর্ষণ করে। সে সময় রবার্টসের প্রতি কৃতজ্ঞতাসূত্রে দিয়ে যায় একটি ছোট কালো পাথর যা তার বিপদ আপদকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবে। পাথরটি নাম মোল্লা কী পাথর। এর কুদরথ অনেক বিপদের মুখে মোল্লা কী পাথর শরণ করলে সঙ্গে সঙ্গে সব মুর্শকিল আসান হয়ে যায়। সে রবার্টকে আর্শীবাদ করে যায় একদিন সে হবে ব্রিটিশ ভারতের কমেন্ডার-ইন-চিফ। একদিন রবার্টস, ওয়ার্ডসন তেওয়ারী ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে থাকে হরিণের সন্ধানে। তখন দেখতে পেল এক নীল গাভি আর একটি সিপাহীদের অশ্ববাহিনী। অশ্বারোহীর সংখ্যা ছিল ৫০০র অধিক। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তিনদিকে তাঁরা তিনজন আত্মরক্ষার জন্য ছুটতে থাকে। রবার্টসের মাত্র ৫০ গজ দূরে অশ্বারোহী সৈন্যদের দেখে মোল্লা কী পাথর বলে সজোরে চিৎকার করে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়

অশ্বারোহী বাহিনী। পাথরটি পাবার তিরিশ বছর পর বৃদ্ধের আশীর্বাদে সে হিন্দুস্থানের লাটপদ অলংকৃত করে। 'ছায়াবাহিনীটিতে' অতিলৌকিক রস পরিবেশন করেছেন গল্পকার। প্রমথনাথের 'মড়্' ছোটগল্পটি সিপাহী বিদ্রোহ অবলম্বনে লেখা। সিপাহী বিদ্রোহোত্তর হিন্দুস্থানের ছবিটিকে গল্পকার অসামান্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। এই বিদ্রোহের ফলে দলত্যাগী সিপাহীরা আশ্রয় নিয়েছিল তরাই ও নেপালে। ইংরেজ সৈন্যরা বিক্ষিপ্তভাবে চলে গিয়েছিল ভারতের চারদিকে। দুইপক্ষই এই যুদ্ধে দেখিয়েছিল চরম বর্বরতা।

'রুথ' গল্পটিতে সিপাহী বিদ্রোহের ফলশ্রুতি হিসাবে সমগ্র ভারত আলোড়িত হয়েছে। মানব হৃদয়ের দ্বৈতরূপের ঘটেছে বহিঃপ্রকাশ। বহু প্রাণ ঝরে গেছে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে। আবার তরুণ-তরুণীর হৃদয়ে রাখী বন্ধন যেন রোমান্টিক প্রেমের উজ্জ্বলতা বহন করে এনেছে। গল্পটিতে এক ইংরেজ রমণীর সঙ্গে এক মুসলমান যুবকের প্রেমের উন্মেষ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মিলনাত্মক পরিণতিতে এক চিত্তাকর্ষক ছোটগল্পের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। মিস মাটিন ডেল ইংরেজদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মনসুরের গৃহে আশ্রিত হয়ে একদিন সেখান থেকে মুক্তিলাভের প্রত্যাশায় গোপনে বিশ্বস্ত গোপালের বাঁশির ভিতরে একটি কাগজে মাটিন ডেল নামটি লিখে পাঠিয়ে দেয়। রবার্টস, প্রবিন ও ওয়াটসন নামে দায়িত্বপ্রাপ্ত ইংরেজ সেনাবাহিনীর কাছে কাগজটি পেয়ে কোম্পানির সেনাবাহিনী সংগঠিতভাবে সীতাপুরে আক্রমণ চালায়। সেখানকার লোকরা তাদের বাড়িঘর ছেড়ে আশ্রয় নেয় ভুট্টাখেতে। সেখান থেকে উদ্‌ভ্রান্ত আলুলায়িত কুন্তলা মাটিন ডেলকে পেয়ে তাঁকে ইংরেজ ক্যান্টন্‌মেন্টে পৌঁছে দিতে ইচ্ছুক হয়। মনসুরকে ধরে আনা হয় আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে। এমতাবস্তায় মাটিন ডেলের প্রেমানুরাগের প্রকাশ ঘটে মনসুরের বাঁধন খুলে দেবার অনুরোধে। একজন ইংরেজ রমণীর অধঃপতন ও বিকৃত রুচি ইংরেজ সৈন্যত্রয়কে ব্যথিত করে। মিস মাটিন ডেল মনসুরের হৃদয়ে পত্নীরূঁপে অবস্থান করলেন। আলোচ্য গল্পে প্রমথনাথ খ্রিষ্টান ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের ছবি এঁকে সর্বসংস্কারমুক্ত মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রমথনাথ বিশী সিপাহী বিদ্রোহী ঘটিত 'নানাসাহেব' ছোটগল্পটি রচনার সময় কিছুটা স্বাধীনতা অবলম্বন করেছেন। তবে ঐতিহাসিক পরিবেশ রচনার ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য। পেশোয়া রাজ নানাসাহেব ইতিহাসখ্যাত এক কিংবদন্তী পুরুষ এবং সিপাহী বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে নানাসাহেব আজিমুল্লা খাঁ ও জুবেদি বিবি ইংরেজদের হাতে ধরা দেয়নি। ইংরেজ কোম্পানির পক্ষ থেকে নানাসাহেবকে গ্রেপ্তারের জন্য পরোয়ানা জারি হয়েছে এবং প্রচুর অর্থমূল্য ঘোষিত হয়েছে। ভারতের প্রদেশে প্রদেশে নানাকে গ্রেপ্তারের জন্য চলেছে অনুসন্ধান। ইতিমধ্যে গুপ্তচর ও বিলেত থেকে আনা নানা বিশেষজ্ঞরা কানপুরে এসেছেন। সন্দেহভাজন সহস্র সহস্র ধৃত ব্যক্তিদের শনাক্তকরণের দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছে ঈশাকখাঁর উপর। যুবক, বৃদ্ধ, সাধুসন্ন্যাসী, পীর ফকির শিক্ষকদের ধরে এনে কানপুর শহরের নিকটবর্তী পাঁচ সাতটি বড় বড় বাড়িতে আটকে রেখে সপ্তাহে তিনদিন চলত আসল নানার শনাক্তকরণের কাজ। জেলার, জেনারেল সিভিল সার্জেন্ট,

ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারদের উপস্থিতিতে শনাক্তকরণ চলত। সে সময় উত্তরভারত হয়েছিল দুর্ভিক্ষ কবলিত। গৃহস্থ ঘরে অন্ন সমস্যা এবং ভিক্ষুকদের ভিক্ষা সমস্যা ছিল তৎকালীন সমাজের বাস্তব সমস্যা। দুর্ভিক্ষের তাড়নায় বৃহত্তর জনসমষ্টি প্রত্যেকে নানা সেজে কোম্পানির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছে ধরা দিতে আগ্রহী। মামুদের হোটেলে সাহেবি পোশাক পড়া দুইজনকে দেখা যায় তারা হলেন পলাতক ছদ্মবেশী আসামী আজিমুল্লা খাঁ এবং বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের অন্যতম নায়িকা জুবেদী বিবি। ছদ্মবেশী ঈশাকের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে এই দুই আগন্তুক আজিমুল্লা খাঁ ও জুবেদীবিবি। তারা ঈশাকের পরিচয় জানতে চাইলে ঈশাক মৃদুস্বরে জানায় যে তিনি নানাসাহেব। এই ছোটগল্পটির কাহিনি বিন্যাসে নাটকীয়তা লেখকের অসামান্য দক্ষতার পরিচায়ক।

মানবেতর চরিত্র নিয়ে লিখিত প্রমথনাথ বিশীর ' মৌলাবক্স' ছোটগল্পটি অসাধারণ সৃষ্টি। বাদশা বাহাদুর শার পাটহাতি 'মৌলাবক্সে'র মাহুত করিম খাঁ আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। সিপাহী বিদ্রোহোত্তর রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে কোম্পানির ফৌজ দিল্লি অধিকার করে বাদশা বাহাদুর শাহকে সপরিবারে বন্দী করে লালকেল্লা দখল করে। তারপর থেকে বাদশার মাহুত করিম খাঁ বহুচেষ্টা করেও 'মৌলবক্স' কে খাওয়াতে পারেনি। বাদশার সকরুণ পরিণতিতে ঝর্ণাধারার মত মৌলাবক্সের দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা বর্ষিত হল। করিম, বিবি করিমন মৌলাবক্সকে বিক্রয় করবার প্রস্তাব উত্থাপন করলে করিম উত্তেজিত হয়। পরে বাধ্য হয়ে কোম্পানির ক্যাপেট সন্ডাসের কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে যে বাহাদুর শাহের মাহুত পাটহাতটি না খেয়েই মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়ছে। এর হাত থেকে রক্ষার জন্য কোম্পানি বাহাদুরের কাছে হাতিকে বিক্রি করতে আগ্রহী। সন্ডাস বিস্মিত হয়ে দেখল হাতিটি শুধু কাঁদছে। করিম জানাল বাদশার শোকেই মৌলবীর এই করুণ পরিণতি। বাদশার পাটহাতিটি নিলামে বিক্রয়ের ডাক দিলে কোনো ক্রেতা না পেয়ে সন্ডাস হরকিষাণকে পঞ্চাশ থেকে একশ টাকায় কিনে নেয়। এসময় সন্ডাস করিম খাঁকে জানায় হাতিটিকে হরকিষাণের হাতে তুলে দিতে। পিলখানায় গিয়ে করিম হাতিটির গায়ে চাপড় মেরে জানাল ঃ 'যা বাচ্চা এই বেণের সঙ্গে যা এতদিন ছিলি বাদশার পাটহাতি এবার হলি বেনের মুটে যা'। এই কথা শুনে হাতিটি ক্ষুধা, ক্ষোভ অভিমান ও দুঃখে বিকট চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণটাও গেল বেরিয়ে। তখন তার কঙ্কালসার বিরাট দেহটি লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তাকে আর বেণের মুটে হতে হয়নি। বাদশার পাটহাতির পদ বজায় রেখে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। প্রমথনাথ 'মৌলাবক্স' নামের হাতিটির মধ্যে মানবিক চেতনা আরোপ করে শিল্প কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রমথনাথ বিশীর ইতিহাসআশ্রিত একটি সার্থক ছোটগল্প 'বাহাদুর শা-র বুলবুলি'। ঐতিহাসিক ঘটনার অনুসরণে লিখিত ছোটগল্পটির মাধ্যমে মোগল সাম্রাজ্যের অনিবার্য পতনের সময় বুলবুলি পাখিটি ও বাহাদুর শাহ এর করুণ পরিণতির সঙ্গে সমব্যাথী হয়েছে তার উজ্জ্বল প্রতিফলন ঘটেছে আলোচ্য ছোটগল্পে। হিন্দুস্থানের শেষ বাদশার নিত্যসঙ্গী ছিল একটি ছোট্ট বুলবুল পাখি। এ যেন বুলবুল-ই-হাজার দস্তান। পাখিটি

বাদশাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে। বাদশার অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনাকালে বাদশা জানিয়েছে তার কাছে গজলের চেয়ে অনেক প্রিয় বুলবুলটি। ডালিম গাছে বসে যখন সে সময় বাদশার মন মহলের উপর মহল পেরিয়ে যেত। যেদিন জবান বখ্‌ত ঘুড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে ভুলক্রমে বুলবুলির বাসায় আঘাত লেগে গেলে পাখিটি আর্তনাদ করে সে সময় বাদশা তার লিখিত চিঠিখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। বাহাদুর শাহকে একাধিকবার প্রেরণা জুগিয়েছিল এই ছোট্ট পাখিটি। সিপাহীদের সঙ্গে বাদশার আলোচনাকালে আকস্মিকভাবে পাখিটিকে বাদশা কাঁধের ওপরে দেখতে পেয়ে মেরে বাচ্চা, মেরে বাচ্চা বলে গায়ে হাত বুলিয়ে আলোচনা বন্ধ করে পাখিটিকে নিয়ে স্থান ত্যাগ করে। যেদিন কোম্পানি ফৌজ আক্রমণ করেছিল লালকেল্লায় সে সময় তিনি দিল্লি পরিত্যাগ করলে হয়তো বেঁচে যেতেন। প্রথম অবস্থায় পুরনো শলা দিয়ে তৈরি একটি সোনার খাঁচায় পাখিটিকে বন্দী করে যাত্রা করতে চেয়েছেন সেদিন থেকে পাখিটি বাদশার এই করুণ অবস্থা থেকে বুলবুলিটি আর শিস্ দেয়নি, খাদ্যও খায়নি। আসলে পাখিটি তার ইঙ্গিতে বাদশাকে দিল্লি ছেড়ে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। যখন বাদশা দিল্লিতে থাকবে এটা স্থির করেছে তখন শুরু হল পাখিটির গান বাদশা তখন তন্ময় হয়ে শোনে সেই শিস্‌ধ্বনি এবং গেয়ে ওঠে গজল গান। কামানের আওয়াজ কাছাকাছি এলেও বুলবুলকে নিয়ে বাদশা ছাড়তে পারেনি শাহজাহানাবাদ। প্রমথনাথ মানবেতর একটি পাখিকে নিয়ে বাহাদুর শাহের জীবনের কাহিনী নিপুণ ভাবে তুলে ধরেছেন।

সিপাহী বিদ্রোহের কাহিনী অবলম্বনে নানাসাহেবকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে বিভিন্ন গল্প তন্মধ্যে 'অভিশাপ' ছোটগল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নানাসাহেব দীর্ঘ বছর তিব্বতে কাটিয়ে এসেছেন। স্বদেশে তাঁকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। কারও মতে তিনি হয়তো বেঁচে নেই। এদিকে কোম্পানিতে শাসন প্রতির্ষ্ঠিত হয়েছে । নানাসাহেব এবারে সশরীরে ধরা দেবার জন্য উৎসাহী। গভীর অনুশোচনায় বিধ্বস্ত হয়ে তার মনে পড়েছে স্ত্রীকে হত্যার ঘটনা বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের কথা এবং সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্বদানের কথা। পরিশেষে নানা ধরা দিলেন তাকে লকআপে আটকে রাখা হল। কিন্তু পুলিশ সুপারের কাছে কোম্পানির হুকুমে নানাকে কঠোর দণ্ড না দিয়ে মুক্তি দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ বলে বিবেচিত হয় কেননা নানাসাহেব ধরা দিয়েছে একথা প্রচার হলে দেশে উত্তেজনা দেখা দিতে পারে। নানাসাহেব বুঝতে পারেনি যে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে। এরপর লকআপ থেকে নানাকে ছেড়ে দেওয়া হল। ইতিমধ্যে হাটে বাজারে একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। একটি পাগল নিজেকে নানা বলে দাবি করেছে তখন অনেকে তাকে জোচ্চর বলে আখ্যা দেয় এবং শ্রদ্ধা জানায় আসল নানাকে। ছেলেরা দল বেঁধে নানাকে উদ্দেশ্য করে ছড়াগান ধরে, কেউ ধুলো ছিটিয়ে দেয়। নানাকে শেষ পর্বে এরূপ দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে।

"নানা এবারে শহরের প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে+ কেহ তাহাকে গ্রেফতার করিল না, কেহ স্বীকার করিল না—এমনকি অধিকাংশ লোক একবার তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।"[২৫]

নানাকে ইতিমধ্যে, অনেকে ভুলেই গেছে এবং তার প্রতি উপেক্ষা অবজ্ঞা রঙ্গ ব্যঙ্গর ফলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে মনে করে সে একাকী পথ অনুসরণ করে চলতে থাকে। তাকে উদ্দেশ্য করে পিশাচী যে অভিশাপ দিয়েছিল তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল।

প্রমথনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পটি ঐতিহাসিক। গল্পটিতে সিপাহী বিদ্রোহোত্তর নানাসাহেবের জীবন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কোম্পানি আধিপত্য ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পেশোয়ারাজ নানাসাহেব পলাতক আসামী। তিনি আশ্রয় নিয়েছেন নেপালে। পরনে তাঁর গৈরিক বসন হাতে কমন্ডলু মাথায় জটা। শৈব এই সন্ন্যাসীটির মধ্যে লোকনায়কের সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে। প্রতি বছর শত সহস্র সন্ন্যাসীদের সঙ্গে পশুপতি নাথের মন্দিরে শিব চতুর্দশী তিথিতে এসে নানাসাহেব দেখা করে রত্নহার দেখে প্রলুব্ধরাজা লক্ষাধিক টাকায় হারটি কিনে নিতে আগ্রহী হয়। কাশীবাঈ অর্থের পরিবর্তে দুটি গ্রামের বসতি স্থাপন করেন এবং প্রতীক্ষায় থাকেন শিবরাত্রি তিথিতে নানার আগমন প্রত্যাশায়। এমনিভাবে বর্ষে বর্ষে নানাসাহেব দেখা দিয়ে যেতেন পত্নী কাশীবাঈ বা সুন্দরীবাঈ এর সঙ্গে। বলাবাহুল্য এই দুটি নাম ছিল নানার অত্যন্ত প্রিয় পত্নীর। প্রিয়তমা পত্নীর সঙ্গে নানার কথোপকথনে অতীত স্মৃতির সূত্রে এসে যায় বিবি ঘরের হত্যাকাণ্ডের কথা। নায়ক নানার প্রতি পত্নীর অশ্রদ্ধা জেগেছিল সন্দেহ নেই। এই অভিযোগে নানাকে গ্রেপ্তারের জন্য কোম্পানি ঘোষণা করে পুরস্কার স্বরূপ পঞ্চাশ হাজার টাকা। নানা দেশের স্বার্থে এই কাজে উদ্বুদ্ধ হলেও তাঁর মনে জেগেছিল পাপবোধ। পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁকে পেতেই হবে। ইতিমধ্যে আজিমুল্লা খাঁ ও জুবেদা বিবির সাথে পরিচয় হল নানাসাহেবের। পত্নীর কাছ থেকে ফিরে আসে কাকুবাঈয়ের গৃহে। সেখানে জুবেদা বিবিকে দেখতে পেয়ে নানাসাহেব উত্তেজিত হয়। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এই বিবিই তাঁর পত্নীকে জানিয়েছেন অতীতের কলঙ্কিত কাহিনি। সেজন্য ক্রুদ্ধ হয়ে জুবেদা বিবিকে হত্যার জন্য ত্রিশূলদন্ড সবেগে নিক্ষেপ করে কিন্তু লক্ষ্য ভ্রষ্ট ত্রিশূলটি বিদ্ধ হয় কাকুবাঈয়ের বক্ষে। এমতাবস্থায় নানা শিশুর মতো কাকুবাঈয়ের কাছে মাথা রেখে জানায় এ প্রায়শ্চিত্ত কাকুবাঈয়ের নয় তার নিজের। উত্তেজিত জুবেদা বিবি নানাকে দিয়ে যায় অভিশাপ। নানাকে সে বলে তাকে ভুলে যাবে সকলে। গ্রেপ্তার করবার আবেদন জানালেও কোম্পানির কেউই তার দিকে তাকাবে না ফিরে। সমাজে সে হবে উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত ও মিথ্যাবাদী এটাই হবে তাঁর সর্বশেষ প্রায়শ্চিত্ত। জুবেদার অভিশাপে পরদিন পত্নীহারা নানা মৃত পত্নীর মৃতদেহ নিয়ে চলে যায় অন্যত্র।

প্রমথনাথ বিশীর 'রক্তের জের' ছোটগল্পটি ইতিহাসকেন্দ্রিক। সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃত তথ্য আলোচ্য ছোটগল্পটি পাঠে উদ্‌ঘাটিত হয়। রক্তের জের এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে, জন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে, পিতা থেকে পুত্রে সংক্রামিত হয়। এমনি একটি কাহিনী আবর্তিত হয়েছে এই গল্পে। হুইলার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কোম্পানির রেজিমেন্টের দফাদার সফর আলীকে অভিযুক্ত করেছিল জেনারেল নীল। নির্দোষ সফর আলী কোরান স্পর্শ করে জানিয়েছিল সে হুইলারকে হত্যা করেনি। তবুও সফরকে একটি গাছের ডালে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। নীলের নির্দেশে সফরের ফাঁসি দেখতে এসেছিল নেটিভরা যাতে

তারা ভবিষ্যতে সতর্ক হয়। সেই সুযোগ সফর আলী উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করে জানিয়েছে সে নির্দোষ এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে নতজানু হয়ে আল্লাকে জানিয়েছে রক্তের বদলে রক্ত না পাওয়া অবদি যেন বেহস্তে তাঁর শান্তি না হয়। ইতিমধ্যে পুত্র মজর আলী হয়ে উঠেছে বলিষ্ঠ যুবক। চাকরিতে সে নিযুক্ত হয়েছে মেজর নীলের বডিগার্ড হিসেবে। সে এক ফকিরের কাছ থেকে সফর আলীর অন্তিম অভিপ্রায়যুক্ত কাগজটি পায়। একদিকে মেজর নীল ছিল তার স্নেহভাজন অন্যদিকে পিতার অন্তিম অভিপ্রায়টুকু রক্ষা ও পিতৃইচ্ছা এই দুই কঠিন পরীক্ষা তার সামনে। এক সুন্দরী মেয়ে আমিনার সঙ্গে প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হয় মজর আলী। জব্বলপুরে একটি ছবির দোকানে সে দেখতে পেল একজন আসামী মাচার উপর দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে কি যেন বলছে। দোকানদার ব্যাখ্যা করল ছবিটির প্রকৃত তাৎপর্য। একথা শুনে শুনে মজর আলীর মনে প্রত্যয় জন্মায় এই আসামীই তার পিতা। দোকানিটি জানাল মজর আলী নামে এক বেইমান আছে যে বাপের শেষ আশা পূরণ করতে পারেনি। এই সংবাদ শুনে আমিনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পরদিন সকালে মজর আলী মেজর নীলকে গুলিবদ্ধ করে হত্যা করে। হত্যার অভিযোগে লেপেলে গ্রীফিল মজরকে ফাঁসি গাছে ঝুলিয়ে দেয়। আবার মেজর নীলের পুত্র হত্যার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এভাবেই একবিন্দু রক্তপাতের জন্য কত ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হতে পারে আলোচ্য ছোটগল্পটিতে সে ইঙ্গিত রয়েছে সর্বত্র।

'আগম্-ই-গন্না-বেগম্' ছোটগল্পটি প্রমথনাথের অসাধারণ সৃষ্টি। গল্পটির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে গন্না-বেগম্ চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে। এই চরিত্রটির জীবনের করুণ কাহিনী এবং তার প্রতি সমবেদনা আলোচ্য ছোটগল্পটির বিষয়। নূরাবাদ শহরে একটি সাজানো ফুলের বাগানের ভেতরে একটি কবর ছিল। কবরটির পাথরের গায়ে লেখা আছে ফার্সি হরফে 'আগম্-ই-গন্না-বেগম্' অর্থাৎ গন্না-বেগমের জন্য একটু চোখের জল ফেলুন। প্রতি বছর শীতকালে কোনো এক দিনে দুঃখিনী গন্না-বেগমের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানতে বহু পীর ফকির বাউল, দরবেশের দল চারণ কবি ও নানা বৃত্তিধারী লোক বৃহত্তর মেলায় জমায়েত হয় তার প্রতি সমবেদনা জানবার জন্য। গন্না-বেগম ছিলেন একজন বিখ্যাত মহিলা কবি। এই দুঃখিনী মহিলা কবির উদ্দেশে সেলাম জানাতে এসে বহু কবি ফার্সী কবিতা পাঠ করে শুনিয়ে যায় বেদনা দীর্ণ কণ্ঠে তাঁর দুঃখের কাহিনি। মৃত্যুর বহুকাল পরেও এই দুঃখিনী কবির প্রতি চোখের জল ফেলে যায় বহু অনুরাগিরা। তার মা ছিল এক পেশাদার নাচনেওয়ালি। যেমনি তার ছিল কবিত্ব শক্তি তেমনি তার রূপ। তার বাবা ছিলেন একজন সুপ্রতিষ্ঠিত দিল্লির বাদশার অধীনস্থ চাকুরে। গন্না-বেগম শৈশবকাল থেকেই ছিলেন অপার সৌন্দর্যের অধিকারী। তার রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। একদিকে অযোধ্যার নবার সুজাউদৌল্লা ও উজীর ইমাদ-উল-মুলক দুজনে গন্না-বেগমের পাণিপ্রার্থী হয়। আন্তরিকভাবে তার মা নবাবের সঙ্গে বিয়ে দিতে আগ্রহী হয়ে মেয়েকে নিয়ে যেদিন আগ্রা থেকে লক্ষ্ণৌয়ের পথে যাচ্ছিলেন সে সময় জাঠ সর্দার জবাহীর সিং গন্নাকে জোর

করে কেড়ে নেয়। সেখানে থেকে পালিয়ে এসে গন্নাকে সুজাউদ্দৌল্লার বাঁদি মনোনীত করে। নবাবের হারেমে থেকে গন্না শোকে দুঃখে বিষপান করে বাঁদি জীবন থেকে মুক্ত হল। তখন নূরাবাদের কবরে শায়িত রাখা হল গন্না-বেগমকে। গন্না-বেগমের সঙ্গে তার খেলার সঙ্গী আবদুস সামাদের গভীর প্রেম তাদের কাব্য রচনায় প্রেরণা যুগিয়েছে। তারা দু'জনে ছিল বিখ্যাত কবি। গন্না-বেগম যখন ছাদের ওপরে বসে সন্ধ্যাবেলা গজল গাইত আর মাঝরাতে শুনতে পেত সুমধুর কণ্ঠশিল্পী সামাদের স্বরচিত গজল গান। পাথরে চাপা পড়া ঝর্ণা ধারার মতো তাদের প্রেম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত কিন্তু প্রতিনায়কদের কথা ভেবে এই প্রেম চোখের জলবিন্দুতে উদ্বেল হয়ে যেত। যেদিন গন্না-বেগম ও তার মা জবাহীর সিং কর্তৃক অপহৃত হল, আবদুল সামাদ বাধা দিতে গিয়ে তলোয়ারের আঘাতে তার কপালে অঙ্কিত হল আঘাতের তিলক। দেশে দেশে পরিভ্রমণ করবার পর যেদিন সামাদ সংবাদ পেল গন্না-বেগম শায়িত নূরবাদের কবরে তার ব্যর্থ প্রেমের উপহারস্বরূপ 'তলোয়ারের তিলক' কাব্য গ্রন্থটি থেকে আবৃত্তি করল তার ব্যর্থ জীবনের অমৃত গরলে মেশানো অপূর্ব প্রেম কাহিনি। প্রতিটি স্তবকে শোকময় প্রেম গাঁথায় শুধু বার বার লেখা আছে একটি নাম আগম্-ই-গন্না-বেগম, আগম্-ই-গন্না-বেগম। ছোটগল্পকার প্রমথনাথ বিশী এই দুই রোমান্টিক বিরহী ও বিরহিনীর জীবনের করুণ রাগিণী ও তাদের মনস্তাত্ত্বিক দিক্‌টি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন আলোচ্য গল্পে।

মানবেতর প্রাণীকে নিয়ে লিখিত প্রমথনাথ বিশীর 'তিন হাসি' ছোটগল্পটি অনন্য সাধারণ। এই গল্পের বিষয় হল একটি কাকাতুয়া পাখি। যার সঙ্গে রণনীতির এক বিরাট সম্বন্ধ। বিশেষত কানপুরের ইতিহাস ধারার গতি নির্ণয়ে কাকাতুয়াটির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে ঠিক রোমের রাজধানী রক্ষার ক্ষেত্রে কয়েকটি রাজহাঁসের গুরুত্ব যতটা ছিল। গল্পের শুরুতে দানিয়েল নামে এক ইহুদি ছিল চতুর ব্যবসায়ী। কানপুর শহরে মামুদের হোটেল ছিল নিরপেক্ষ। যখন যে পক্ষের জয় অবশ্যম্ভাবী মনে করত তখন সে পক্ষের ঝান্ডা তার দোকানে দিত উড়িয়ে। একজন খদ্দের হোটেলের দেনা পরিশোধ করতে না পেরে তার বদলে তাকে একটি কাকাতুয়া পাখিটি দিয়েছিল। অদ্ভুত ছিল তার হাসি। যখন দানিয়েলের হোটেলে রণনীতি নির্ধারিত হত সে সময় কাকাতুয়ার রহস্যময় অদৃষ্টের মতো ধ্বনির লহরি শোনা যেত 'হাঃ হাঃ হাঃ', 'হাঃ হাঃ হাঃ',। বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের আগে আজিমুল্লা খাঁ ও জুবেদী বিবি নানাসাহেবকে হত্যার প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ করবার সময় কাকাতুয়া এরূপ রহস্যময় হাসি দিয়ে ঘটনার গতিকে ত্বরান্বিত করেছে। আবার মিস্টার রস্টক ও স্যার কোলিন যে সময় এই হোটেলে বসে একটি হিন্দু মন্দির ভাঙবার ষড়যন্ত্র করছিল সে সময়ও তারা শুনতে পেয়েছিল কাকাতুয়ার কণ্ঠমিশ্রিত বিদ্রূপের হাসি। এই হাসি অলক্ষ্যে থেকে তাদের উৎসাহিত করেছে। আবার কোম্পানি শাসনে প্রজাদের দুরবস্থা দেখতে গিয়ে প্রজারা যখন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে সে সময় রাসেল জানিয়েছিল' বাহুবলের সাহায্যে ইংরেজ শাসন তারা অব্যাহত রাখবে। ঠিক সেই মুহূর্তে কাকাতুয়ার রহস্যময় তীক্ষ্ণ কর্কশ হাসি হাঃ হাঃ হাঃ। হাঃ হাঃ হাঃ। উচ্চারণ করে তাদের রণনীতিকে

জানাচ্ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন। আলোচ্য গল্পে প্রমথনাথ কাকাতুয়ার তিন হাসি ইতিহাসের গতিকে কতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে তার উল্লেখযোগ্য বর্ণনা দিয়েছেন।

প্রমথনাথ বিশীর 'নাদির শার পরাজয়' ছোটগল্পটি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। গল্পটির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে নাদির শার পরাজয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ইরানের বাদশা নাদির শা পরাজিত ও বন্দী করেছেন হিন্দুস্থানের বাদশা মহম্মদ শাকে। এই সংবাদ রটে গেছে দিল্লির লালকেল্লা পর্যন্ত। বিজয়ী নাদির শা ইরানি ঘোড়ার পিঠে চেপে প্রবেশ করলেন দিল্লিতে। বাদশা তাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং আশ্রয় নিলেন দেওয়ানি খাসের নিকটবর্তী মহলে। আর মহম্মদ শা আশ্রয় নিলেন বুরুজের দেউড়িতে। আসলে দিল্লির বাদশা বশ্যতা স্বীকার করেছে ইরানি বাদশার কাছে। মহম্মদ শার হাতি ও ঘোড়া রাখবার আস্তাবলের হেড সহিস বড়ে মিঞা দিল্লির বাদ্শার একান্ত অনুগত গুণগ্রাহী এবং বাদশার বীরত্বের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে আস্থাশীল। স্ত্রী নসিবন বিবির সঙ্গে বড়ে মিঞার বয়সের ব্যবধান বিস্তর এ জন্য কখনো কখনো নসিবন বড়ে মিঞাকে ব্যঙ্গে র সুরে কথা বলত। বাদশাহের পরাজয়ে পথের দুধারে সহস্র সহস্র নরনারী বাদশাকে উদ্দেশ্য করে জানিয়েছে সমবেদনা। সমগ্র শহর ব্যাপী বিরাজ করছে নিস্তব্ধতা। কিন্তু বড়ে মিঞা কখনো ভাবতে পারেনি বাদশাহ্ যুদ্ধে পরাজিত হতে পারে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বাদশা যুদ্ধে গেলে জয় হবে অনিবার্য। নসিবন বিবি তাকে বহুবার বলেও তার মনে বিশ্বাসযোগ্যতা আনাতে পারেনি। বহুবছর থেকে বড়ে মিঞা দেখে এসেছে বিজয়োৎসব ও বিজয় পতাকা। এই বিজয়োৎসব উপলক্ষে সে সুদৃশ্য পোশাকে এগিয়ে যাচ্ছিল লালকেল্লার দিকে, শুনতে পেল কামানের গর্জন ও নাকাড়ার ধ্বনি। হঠাৎ এক ইরানি সৈন্যের বন্দুকের গুঁতো খেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে ফিরে এল তার আস্তাবলে। জয়ের আনন্দে নসিবনের কাছে খেতে চেয়ে যখন শুনল প্রতিটি গৃহে আজ অরন্ধন দিবস প্রত্যেকেই শোকস্তব্ধ। এই দুঃখ সংবাদ বড়ে মিঞা বিশ্বাস না করে রাতের অন্ধকারে এগিয়ে চলেছে মোতি মসজিদের দিকে। মসজিদে প্রবেশ করে আল্লার কাছে কেঁদে কেঁদে জানতে চেয়েছিল যে বাদশার জয় হয়েছে বাদশার হার হয়নি, নতজানু হয়ে বারবার যখন মাথা কুটছিল একটা কঠিন পাথরে তখন সামনে দেখতে পেল এক শ্মশ্রুমান মধ্যবয়স্ক পুরুষ। বড়ে মিঞা তখন তার দুই পা জড়িয়ে ধরে বলে উঠল শাহেন শা, জাঁহাপনা, বাদশা আল্লার মতো যেন নিজমুখে বলে যায় তার জয়সংবাদ। প্রত্যুত্তরে বাদশা জানালেন যে তিনি নাদির শাহের কাছে পরাজয় বরণ করেছেন ঠিকই কিন্তু বড়ে মিঞার সঙ্গে কথোপকথনে বুঝলেন জয় হয়েছে তারই। তারপর বাদশা দ্রুতবেগে চলে গেলেন মসজিদ থেকে বরুজের দিকে। আলোচ্য গল্পে ছোটগল্পকার বড়ে মিঞার দৃষ্টিতে নাদির শাহের জয়কে পরাজয়রূপে এবং মহম্মদ শাহর পরাজয়কে জয়রূপে দেখিয়েছেন। বড়ে মিঞার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে লেখক সুকৌশলে উপস্থাপিত করেছেন।

প্রমথনাথ বিশীর 'দর্শনী' ছোটগল্পটি ঐতিহাসিক রসযুক্ত। গল্পের ভৌগোলিক পটভূমি লালকেল্লার তিরপলিয়া দেউড়িতে অবস্থিত একটি কারাকক্ষ। অন্ধকার কারাগারে বন্দীজীবন

কাটাচ্ছেন অন্ধ ফারুকশিয়ার। তৎকালীন দিল্লির রাজতন্ত্রে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা শাসনযন্ত্রের কলকাঠি নাড়ত, তাদের অভিপ্রায় ও অভিসন্ধি মতো বাদশা মসনদে বসত অর্থাৎ বাদশাহের ভাগ্য নির্ধারিত হত এদের অদৃশ্য অঙ্গুলি নির্দেশে। কিংমেকার পদবিধারী সৈয়দ ভ্রাতৃযুগল অলক্ষ্যে থেকে কলকাঠি নেড়ে দিল্লির সিংহাসনের পালাবদল ঘটিয়ে রাজতন্ত্রের ঐশ্বর্যকে ও ক্ষমতাকে রাখত করায়ত্ত করে। এমনিভাবে ফারুকশিয়ারকে তাদের নির্দেশে গ্রেপ্তার হতে হয়েছিল। বন্দী দিল্লির বাদশার রাজভোগের পরিবর্তে মিলত পোড়া রুটি আর জলের ভাঁড় এবং রাজ পোশাকের পরিবর্তে ছিন্নবস্ত্র। সে শুনতে পেত না রঙমহলের নর্তকীদের নৃত্যের ও গানের লহরী। একাধিক বেগম থাকা সত্ত্বেও বাদশার প্রণয়ী জুলেখা ছিল বাদশার একান্ত আপনার জন। জুলেখা কারগারে বন্দী বাদশার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে উৎসাহী হয়ে পাহারাদারকে শেষ সম্বল হিরের আংটি দিয়ে কারাগারে প্রবেশের অনুমতি পেয়ে বাদশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। অন্ধকার কারাগৃহে জুলেখাকে পেয়ে ফারুকশিয়ার উল্লসিত হয়ে তাকে সবলে জড়িয়ে ধরে এবং সর্বাঙ্গমণ্ডিত করে দেয় চুম্বনে চুম্বনে। তারপর তাকে কোলে বসিয়ে সুখ দুঃখের কথা ব্যক্ত করে। বাদশা বন্দী হয়েছিল বলেই জুলেখার প্রতি তার প্রেম হয়েছিল আরও গভীর। বাদশা জানায় আশাবাদের সুর। হয়তো সে আবার ফিরে পাবে তার বাদশাহী। ইসলামি আইনে, অন্ধের রাজত্ব করবার অধিকার নেই, তবুও ফারুকশিয়ার পুরোপুরি অন্ধ নন-ক্ষীণ দৃষ্টি শক্তি ছিল তার নেত্রপটে। যাবার বেলায় শেষ সম্বলরূপে জুলেখা বাদশাকে দিয়ে যায় চুলের খোঁপার কাঁটা। কাঁটাটি পেয়ে বাদশা প্রিয়তমার পুরোনো স্মৃতি স্মরণ করে কাঁটাটি কখনো বুকে কখনো হাতের মুঠোয় কখনো পকেটে রেখেছেন। কখনো বা ফার্সি ভাষায় দেয়ালের কাছে কাঁটার আঁচড়ে লিখেছেন প্রেমের কবিতা। ধীরে ধীরে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে কারাকক্ষে গর্জন করে ওঠেন, আর চার দেওয়ালে করেন পদাঘাত। তারপর একসময় সবলে কাঁটাটি চালিয়ে দেন তার চোখে। দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে উন্মাদের মতো তিনি বলে যান একসঙ্গে সে লাভ করেছে বাদশা আর বেগম।

প্রমথনাথের 'অ্যাক্সিডেন্ট' ছোটগল্পটি অতিলৌকিক শ্রেণিভুক্ত যার বিষয় স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের যোগসূত্র। গল্পকথক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন মমিনপুরের এক বন্ধু রজতের জন্মদিনে। তার জন্মসময় ছিল সন্ধ্যা ছ'টা তিপ্পান্ন মিনিট। ঘটনাধারা যখন ঘটেছিল সে সময় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে ব্ল্যাক্ আউট ও বোমাতঙ্ক ১৯৪৩ সালের ঐতিহাসিক পটভূমি, যখন পথে পথে মিলিটারি লরির নিত্য আনাগোনা। গল্পকার দু'দিন আগে সংবাদপত্রে দেখেন এক মিলিটারি ট্রাকের সঙ্গে ট্যাক্সির সংঘর্ষে ট্যাক্সিটি চূর্ণবিচূর্ণ হতে। মৃত ব্যক্তির ছবিটি প্রকাশিত হয়েছিল কাগজে, গল্পকথক আমন্ত্রণ রক্ষার জন্য ট্যাক্সি ঠিক করে যাচ্ছিলেন। ড্রাইভার সংক্ষিপ্ত পথ ধরে দ্রুতবেগে গাড়ি নিয়ে ছুটে চলছে। ঘুমের ঘোরে মিলিটারি লরি দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে আসছে ট্যাক্সির দিকে। বোমাতঙ্কের ফলে প্রতিটি গাড়ির হেডলাইট বেশিরভাগ অংশ কালো রঙে ঢাকা। সেখানে এক বৃহত্তর উজ্জ্বলতর আলোক বিন্দুযুক্ত লরিটি মুখোমুখী হয়, সাংঘাতিক সংঘর্ষে গল্পকথকের গাড়িখানা ওলট পালট

হয়ে পড়ে গিয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় এবং প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে। ঠিক সেই সময়েই ড্রাইভার গল্পকথককে ধাক্কা দিয়ে জানিয়েছে হাজরার মোড়ে গাড়ি পৌঁছে গেছে সামনে মমিনপুর। ড্রাইভারের ডাকে লেখক জেগে উঠে দেখলেন সামনেই মমিনপুরে। ছোটগল্পকার প্রমথনাথ আলোচ্য গল্পে দেখিয়েছেন সংবাদপত্রের বাস্তব ঘটনা স্বপ্নযোগে গল্পকথকের মনকে কিভাবে আলোড়িত করে। স্বপ্ন ও বাস্তবের সার্থক নিদর্শন আলোচ্য ছোটগল্পটি।

কথাসাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশীর 'সত্য মিথ্যা কথা' ছোটগল্পটি ব্যঙ্গধর্মী। গল্পটিতে নাগরিক সভ্যতার ত্রুটিপূর্ণ দিক আলোচিত হয়েছে। গল্পটির স্থান নির্বাচিত হয়েছে রেডিয়ো সেন্টারের ব্রডকাস্টিং রুম। সেখানকার রেডিয়ো অফিসার হলেন মিঃ দাস এবং রেডিয়ো শিল্পী মিস্ বর্দ্ধন। এক ডাক্তারের চিকিৎসার নামে ব্যবসায়ী মানসিকতার কথা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে আলোচ্য গল্পে। ছদ্মবেশী ডাক্তারগণ সময় মতো ডিস্‌পেনসারিতে বসত না, বাড়িতে থাকত তারা নিদ্রামগ্ন। কখনও তারা মহিলার পোশাক পরে অপরের বাড়ির সামনে আবর্জনা ফেলেন রোগব্যাধি বাড়ানোর জন্য। এতে তাদের লাভের অঙ্ক বেড়ে যাবে। ব্যাধির ঘটকালিতে এরা সব সিদ্ধহস্ত। এরূপ ছদ্মবেশী ডাক্তারদের মতো নাগরিক জীবনের মানুষেরা ট্রামে বাসে উচ্চকণ্ঠে পারিবারিক আলোচনা করে বিড়ির ধোঁয়া নিরীহ যাত্রীর দিকে ছাড়ে, রেলের ও সিনেমার টিকিট কাটতে গিয়ে হাতাহাতি করতে গিয়ে প্রাণ হারায়। নাগরিক চরিত্র আজও অনেকটা গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। এরূপ অপ্রকৃতস্থ চরিত্রের প্রতি গল্পকার শাণিত ব্যঙ্গ নিক্ষেপ করেছেন।

প্রমথনাথ বিশীর 'কল্কি' গল্পটি পুরাণ স্মৃতি বিজড়িত বিধাতার নির্দেশে বিশ্বকর্মা সৃষ্টি করেছেন অপার সৌন্দর্যমণ্ডিত বিশ্ব। মানুষ হল এ বিশ্বের অন্যতম ভোক্তা। নন্দন বনে ছড়িয়ে রয়েছে বিপুল সৌন্দর্যরাশি। পুরুষ-ও নারীরা উভয়েই এই ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ। বিশ্বকর্মা নরনারীদের সচেতন করে দিয়ে বললেন তারা যেন নন্দনবনের উত্তর প্রান্তে না যায়। কিন্তু দেখা গেল কৌতূহলী নারীরা একদিন উত্তরের দিকে পৌঁছলে অলক্ষ্যে থেকে কণ্ঠস্বর শ্রবণ শক্তি হারায়। অদৃশ্য ব্যক্তির উৎসাহে বৃহৎ আকার নল ও চক্র সমন্বিত অদ্ভুত দর্শন কালোবস্তু স্পর্শ করে। বলাবহুল্য এই অদ্ভুত অদৃশ্য ব্যক্তিটি হলেন কল্কি অবতার। তাকে স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠলো দেবতার আসন। বিশ্বকর্মা গিয়ে দেখলেন নর ও নারীরা অবমাননা করেছে তাঁর নিষেধাজ্ঞা। বিধাতার নির্দেশে বিশ্বকর্মা নরনারীদের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নন্দন বন থেকে পাঠিয়ে দিলেন পৃথিবীতে। যেখানে জরামৃত্যু রোগ শোক জর্জরিত দারিদ্র ও ঐশ্বর্যের ক্রীতদাসরূপে অক্লান্ত শ্রম করে সেই পাপ থেকে পাবে মুক্তি। কোটি কোটি বছর ধরে জন্ম জন্মান্তর লাভ করবে এবং অপরাধের মাত্রা বেড়ে গেলে মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটবে। সেই মহাপুরুষ হলেন কল্কি। নন্দনবন থেকে সেই কালোবস্তুটি নিয়ে নরনারীরা ফিরে এলো পৃথিবীতে।

"পুরুষ শুধাইল—বস্তুটির কী নাম?
সেই ব্যক্তি বলিল—যন্ত্র।

— তোমার কী নাম?

সে ব্যক্তি বলিল—শয়তান।

এই বলিয়া সে অদৃশ্য হইয়া গেল।"[২৬]

সেই কালো বস্তুটি হল যন্ত্র। যন্ত্রসভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে রচিত হল শ্রেণিগত ব্যবধান, পারস্পরিক প্রতিযোগিতা এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার অদম্য কৌশল। ছোট গল্পকার যন্ত্রসভ্যতার কুফল আলোচ্য গল্পে দেখিয়েছেন।

প্রমথনাথ বিশী রঙ্গব্যঙ্গমূলক 'একটি ঠোঁটের ইতিহাস' আলোচ্য গল্পে আকাট মন্ডলের দুর্ভাগ্য বর্ণিত হয়েছে। আকাট মন্ডলের ঠোঁটের বিদ্রূপের হাসিটি তাঁর জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছে। তার হাসিটিকে লক্ষ্য করে শিষ্যরা গুরুনামে তৈরি করেছে হাসিয়া বাবার মঠ। ছোটগল্পকার অনেকটা আশাবাদী এজন্য যে বাঙালিরা আকাট মন্ডলকে চিরদিন স্মরণ করে রাখবে।

প্রমথন্নাথ বিশী 'মাত্রাজ্ঞান' ছোটগল্পে বিভিন্ন সভ্যতার মাত্রাজ্ঞান প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে চীন ও ভারতীয় আদর্শ ইউরোপীয় সভ্যতার চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। ইউরোপীয় সভ্যতা মাত্রাজ্ঞানের অভাবের জন্য সৌন্দর্যের চেয়ে প্রাচুর্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে দেশে বিদেশে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে লুঠতরাজের ভূমিকা পালন করেছে এজন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতা বলে তারা বিবেচিত হতে পারেনি। গল্পের নায়কের চীনা বন্ধু ও প্র. না. বি. এই তিন বন্ধুর সংলাপে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাচুর্যের চেয়ে সৌন্দর্যের গুরুত্ব অনেক বেশি। সৌন্দর্য হল মাত্রজ্ঞান যা ভাষার ক্ষেত্রে ছন্দ এবং জীবনের ক্ষেত্রে সংযম হিসেবে বিবেচিত। দোকানের মুক্তার প্রাচুর্য—সেই মুক্তা যদি সুন্দরীর কানে শোভিত হয় তাও হল সৌন্দর্য। সিংহাসনে আসীন রাণীকে তার সহস্র সখীর চেয়েও অনেক সুন্দর দেখায়। মাত্রাবোধের অভাবে প্রলোভন ও ছলনার আশ্রয়গ্রহণ অসংগত। কাজেই মাত্রাজ্ঞানযুক্ত সৌন্দর্য চেতনা গ্রহণযোগ্য তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ভারত ও চীন।

'ইংল্যাণ্ডকে স্বাধীনতা দানের চেষ্টা' ছোটগল্পটি প্র. না. বি. র যুক্তিধর্মী ও বুদ্ধিবাদ নির্ভর ছোটগল্প। গল্পের নায়ক প্র. না. বি ও এক ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের স্বাধীনতা প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। গল্পে দেখানো হয়েছে ইংল্যাণ্ডের স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে নতুন শাসনতন্ত্রের খসড়া। ইংল্যাণ্ডের স্বাধীনতা পায়নি তারা যন্ত্রের অধীন বলে। গান্ধির অহিংস নীতি তাদের কাছে মূল্যহীন। বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে ইংল্যাণ্ডের সভ্যতার বিকাশ ঘটলেও তারা হারিয়ে ফেলেছে মানবতাবোধ। ফলে সেই দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি শাসনযন্ত্র ছিল অচল। লেখকের মতে ইংল্যাণ্ড যেখানে আত্মশাসনে ব্যর্থ নিজের দেশে ডেকে এনেছে বিশৃঙ্খলা সেক্ষেত্রে তাদের অন্যদেশ শাসন করবার রাজনৈতিক অধিকার নেই। অনিবার্য বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষার পথনির্দেশ দিতে গিয়ে প্র. না. বি বলেছেন যত শীঘ্র সম্ভব ভারতের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের বন্ধন ছিন্ন করা। গল্পটিতে বিজ্ঞান চেতনার সঙ্গে যন্ত্রসভ্যতার কুফল পরোক্ষভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রমথনাথের স্বদেশ চেতনার

প্রতিফলন ঘটেছে আলোচ্য ছোটগল্পে।

ছোটগল্পকার প্রমথনাথ বিশীর 'টেনিস কোর্টের কাণ্ড' ছোটগল্পটি অসাধারণ সৃষ্টি। গল্পে নায়ক রজত সমৃদ্ধশালী ঘরের পুত্র। সর্বোপরি সে একজন ভালো চাকুরে। কিন্তু সে বিয়ে করে নি। কেবলমাত্র অফিস ও টেনিস নিয়েই সে ব্যস্ত। সুন্দরী প্রেমিকার কথা সে ভাবে নি। বালিগঞ্জ পার্কের এক বিশাল বাড়ির মালিক শ্রীমতি রেবা রায়। সে শিক্ষিতা প্রাপ্তবয়স্কা ও ধনশালী কিন্তু তার কোনো অভিভাবক নেই। অনেকে শ্রীমতী রেবাকে প্রেম নিবেদন করে ভগ্ন হৃদয়ে ফিরেছে। সেই মেয়েটির সঙ্গে রজতের দেখা হয় নি তা নয়, ব্যর্থতার স্মৃতি তার মনে উদয় হলেও যে দিন বন্ধুরা রজতকে রেবার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছে সে সময় রেবার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ঢাকাই ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি ও কাশ্মিরি শাল পরেছে। এই সাজে বন্ধুরা রজতের একটি ছবিও তুলে রেখেছে। রজত টেনিস খেলায় দক্ষ। টেনিস ক্লাবে তার নিত্য যাওয়া আসা। একদিন রেবা সশরীরে টেনিস ক্লাবে উপস্থিত হয়ে রজতের রোমাঞ্চকর খেলার আনন্দ উপভোগ করে। সেদিনই রজতের প্রতি রেবার পূর্বরাগের সূত্রপাত হয়েছিল। আসলে মেয়েরা পুরুষের ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষকে কামনা করে। তাই মূল্যবান সাজ পোশাকে সুসজ্জিত রজতের সৌম্য সুন্দর মুখখানির চেয়ে টেনিস খেলার অতিসাধারণ সাদা কেডস্ সাদা সার্ট ও কালো কোট পরিহিত খেলোয়াড়ি পোশাক যার মধ্যে রজতের ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়ে উঠেছে সেটাই তার কাছে বেশি আকাঙ্ক্ষিত। রজত দেখল যে মেয়েটিকে মূল্যবান পোশাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি সে আকৃষ্ট হয়েছে অতিসাধারণ পোশাকে। কাজেই ধন প্রাচুর্যের চেয়ে প্রতিভা ও যোগ্যতার মূল্য রেবার কাছে ছিল অনেক বেশি।

প্রমথনাথ বিশীর 'প্র-না-বি-র সঙ্গে ইন্টারভিউ' ছোটগল্পের বিষয় আমেরিকান অধ্যাপক বন্ধুর সঙ্গে প্র-না-বির তাত্ত্বিক আলোচনা। প্র-না-বির ছিল শিকারের শখ। তার ঘরে ঝুলানো রয়েছে অনেক পশুর চামড়া। ব্যঙ্গ শিল্পী প্রমথনাথ কলম দিয়ে মানুষ শিকার করেন এবং বন্দুক দিয়ে ভালুক শিকার করেন। একজন বড় লেখক যে শিকারি হতে পারেন আমেরিকান বন্ধুর তা ছিল অজ্ঞাত। প্রসঙ্গক্রমে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে তিনি মনে করেন দান্তে, শেক্সপীয়র ও গ্যাটেকে।

তাঁর মতে প্রাণস্তর, বুদ্ধি স্তর ও আত্মা স্তর এই তিনটি স্তরের মধ্যে বুদ্ধি ও আত্মাস্তরের গুরুত্ব বেশি। এছাড়া প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে জীবনের পরিপূর্ণতা আসতে পারে প্রকৃতিবাদ তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু পশ্চিমী সভ্যতা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন বলে তাদের জীবন শান্তিহীন এবং যান্ত্রিক। প্র-না-বি আলোচ্য গল্পে ভারতীয় শিল্প ও ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

প্রমথনাথ বিশীর 'প্র-না-বি র সঙ্গে কথোপকথন' ছোটগল্পে সাহিত্য সমালোচনার দিকটি আলোচিত হয়েছে। জনৈক ভদ্রলোক বহু অনুসন্ধানের পর জগদ্বিখ্যাত লেখক প্র-না-বি র সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য এসেছিলেন। সেদিন একটি ভালুক শিকার করে প্রমথনাথ

ফিরেছেন তার গৃহে। লোকটির সঙ্গে আলোচনাক্রমে জানা যায় তারা দুজনেই সমকাজে যুক্ত। উভয়ে সাহিত্য বিষয়ে আলোচনায় উৎসাহী হয়ে পড়ে। ভদ্রলোকটি জানতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথের পর শ্রেষ্ঠ কবি কে তার পরিচয়। প্র-না-বি উত্তরে জানালেন নজরুল ইসলাম ও মোহিতলাল। কিন্তু তারা কেউই গ্রেট পোয়েটের মর্যাদাসম্পন্ন নন। কেননা নজরুলের সৃষ্টিধর্মিতা আছে কিন্তু তার শিল্প জ্ঞানের বড় অভাব। মোহিতলালের শিল্প চৈতন্য আছে কিন্তু সৃষ্টিধর্মিতার অভাব। এজন্য তারা উচ্চশ্রেণির কবি হতে পারেনি। এরপর বাঙলা নাটকের প্রসঙ্গ নিয়ে কথোপকথন চলল। প্র-না-বির মতে বাঙলা নাট্য জগতে দুটি নাটক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, একটি রবি মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' আর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষ'। তার মতে বাঙলার নাট্য শিল্পের ব্যর্থতার মূলে বিদেশী নাট্যাদর্শ। বাংলা নাটক যদি স্বদেশী ভাবধারা নিয়ে উপস্থিত হত তাহলে সেটাই হত গ্রহণযোগ্য। শিল্প আদর্শের অনুসরণ বাঙলা নাটকের ভবিষ্যতকে বিনষ্ট করে দিয়েছে।

প্রমথনাথ বিশীর 'বিপত্নীক' ছোটগল্পে প্রমথনাথ বাঙালি চরিত্রের প্রতি সমালোচনা করেছেন। গল্পের ঘটনাস্থল একটি ট্রেনের কামরা। নিবারণ ও তিন বন্ধু কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের সময় নিবারণ ছিল ঘুমন্ত। নিবারণ অকালে হারিয়েছে তার সুন্দরী বধূকে। দুটো সন্তানের পিতা নিবারণের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তারা নির্ধারিত দ্বিতীয় বার নিবারণের বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেছে। সেই সঙ্গে তার বিপত্নীক গ্রহণ কতটা সমর্থনযোগ্য তা নিয়ে পত্নী বিয়োগের নৈরাশ্যে কলকাতা থেকে বাস ধরতে না পেরে সে ষ্টেশনে মূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

'গাধার আত্মকথা' ছোটগল্পটির ব্যঙ্গধর্মী। এই গল্পের উপজীব্য বিষয় শিক্ষক কিভাবে গাধায় রূপান্তরিত হয় তার এক ব্যঙ্গ কৌতুকের কাহিনী। গল্পটিতে একটি রূপকের আড়ালে গাধা তার আত্মকাহিনী বিবৃত করেছে। প্রমথনাথের দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষকসমাজের অবমাননার কাহিনী অসাধারণ দক্ষতার সাথে এখানে তুলে ধরেছেন। আলোচ্য গল্পে গাধাটি ছিল রামু ধোপার। রামুর গাধার সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাদের সংখ্যা পঞ্চাশোর্ধ্বে। গল্পে রামু হল শিক্ষায়তনের সর্বময় কর্তা। তার অধীনে পঞ্চাশ জন শিক্ষক কর্মরত। মোটামুটিভাবে গাধাগুলি দশটি দলে বিভক্ত ছিল। এক একটি দলের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন। বলাবাহুল্য গাধাটি স্কুলমাস্টারি নিয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মানবজীবন ও পশুজীবনের সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বক্তৃতাগুণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ডি. লিট. উপাধি ও নগদ এক হাজার টাকায় পুরস্কৃত হন। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তার খ্যাতির অভাব ঘটেনি। সাহিত্য রচনা করে ও শিক্ষকতা করে মনের মতো গৃহ নির্মাণও করেছেন। কিন্তু শিক্ষকতার নিত্য নীরস জীবন তাঁর কাছে ছিল অবাঞ্ছিত। লেখক গল্পে অভিশপ্ত বেদনাদায়ক শিক্ষক জীবনের মর্মান্তিক পরিচয় উপস্থাপিত করেছেন।

'শিবুর শিক্ষানবিশী' গল্পে প্রমথনাথ বিশী বঙ্গদেশীয় শিক্ষার অন্তঃসার শূন্যতাকে

বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত করেছেন। সেই সময়ের শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, পরিচালক সমিতি ও গভর্নিং বডি সকলের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। শিবু ছাত্রজীবনে লেখাপড়া না করে শিক্ষক ও প্রাইভেট টিউটরদের দাক্ষিণ্যে এবং পরীক্ষার সময় মাইক্রোফোনের ঘোষিত উত্তর শুনে খাতায় লিখে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু অঙ্ক পরীক্ষার দিনে তার শ্রবণেন্দ্রিয় বিকল হওয়ায় সন্তোষজনক ফল পায়নি। অঙ্কের খাতা পুনর্মূল্যায়ন করবার আবেদন জানিয়ে সে অর্থের বিনিময়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তারপর এভাবেই সে বি.এ. ডিগ্রি লাভ করে। এই বাঙ্গালি ছেলেটি যখন বাংলাদেশে চাকরি না পেয়ে সর্বভারতীয় পরীক্ষা দেবার জন্য দিল্লিতে গিয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং সমস্ত বিষয়ে শূন্য পেয়ে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে এসে জানায় পরীক্ষকরা বাঙ্গালি বিদ্বেষী। প্রতিযোগিতা করে বাঙ্গালিদের চাকরি পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। শিবু যখন যেখানে সেখানে ওদের বাঙ্গালি বিদ্বেষের কথা প্রচার করে নিজের জীবিকা অর্জনের সঠিক পথ নিয়ে চিন্তিত হয় তখন সে একটি পথ বেছে নিতে আগ্রহী হয়। পথ তিনটি হল যথাক্রমে সাহিত্যচর্চা, সিনেমার সিনারি লেখা ও পলিটিক্স এর ব্যবসা। আসলে সে যেভাবে বিদ্যালাভ করেছেন তাতে এই তিনটি পথ ছাড়া শিবুর অন্য কোনো গত্যন্তর নেই। শিবুর শিক্ষানবিশীর ঘটনা বাঙ্গালি সমাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গোপন বিষয়। প্রমথনাথ শিবুর দলের গোপন তথ্য প্রকাশ করে তাদের বিরাগভাজন হলেও বাস্তব সত্য ঘটনা পরিবেশন করে লেখক শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দেখতে পেয়েছেন।

প্রমথনাথ বিশীর 'টিউশন' ছোটগল্পে বাঙ্গালি শিক্ষকদের প্রতি ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষেপ করেছেন। বিশেষ করে শিক্ষক সমাজের অর্থনৈতিক দুর্দশার চিত্র আলোচ্য গল্পের মূল উপজীব্য বিষয়। উপশিক্ষকতা করতে গিয়েঁ তাদের মানসিকতা কত নিম্নস্তরে পৌঁছে যেতে পারে গল্পকার তির্যকভাষায় তার স্বরূপ আলোচ্য গল্পে উদ্‌ঘাটন করেছেন।

ব্যক্তি জীবনে ছোটগল্পকার প্রমথনাথ বিশী গবেষণাগ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাকে সম্বল করে 'সরল থিসিস্ রচনা' গল্পের অবতারণা। মূলত উচ্চশিক্ষার প্রতি লেখকের শাণিত ব্যঙ্গ আলোচ্য গল্পের বিষয়। গবেষণাগ্রন্থ রচনার প্রণালি সম্পর্কে তিনি মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি যে সূত্রগুলি আবিষ্কার করেছেন সেগুলি হল, প্রথমত থিসিস্‌টি হবে নীরস তথ্যে ভারাক্রান্ত; দ্বিতীয় নির্দেশ হল থিসিস্‌টি কখনও ছোট হবে না, আয়তনে হবে সুবৃহৎ। তৃতীয়ত ব্যক্তিগত মন্তব্যের চেয়ে সমালোচকের মন্তব্যে থিসিস্ হবে সমৃদ্ধ। একটি লাইন লিখে তার সঙ্গে তিরিশ লাইনের বিষয়টি নির্বাচিত হবে এমনই যেখানে সাধারণের সে বিষয়ের প্রতি আগ্রহ থাকবে না। সর্বশেষ সূত্রটি হল কোনভাবেই থিসিস্‌টি সুখপাঠ্য এবং সরল যাতে না হয়। গল্পটি গবেষকদের একান্ত সহায়ক।

প্রমথনাথ বিশীর 'গণক' ছোটগল্পটিতে শিক্ষকদের প্রতি ব্যঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে। শিক্ষক বলতে আমরা বুঝি সমাজ ও ছাত্রদের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ এক শ্রেণির মানুষ। বর্তমানে

সামাজিক দৃষ্টিতে যারা সম্মানজনক স্থানে বিরাজমান। আলোচ্য ছোটগল্পে শিক্ষক সমাজের খাতা দেখার বিষয়ে তারা কিভাবে কর্তব্য নিষ্ঠাকে উপেক্ষা করে অর্থের লিপ্সা ও স্বার্থপরতাকে সবার উর্ধ্বে স্থান দিতে পারেন তারই একটি বাস্তব চিত্র আমরা দেখতে পাই। শিক্ষকদের উদাসীনতায় পরীক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার নম্বর গণনা যে চরম প্রহসনে পরিণত হয় তার অসাধারণ ইঙ্গিত মেলে এই গল্পে।

'চাকরিস্তান' গল্পে ছোটগল্পকার শিক্ষকদের প্রতি অসাধারণ সহানুভূতি দেখিয়েছেন। তৎকালীন সময়ে শিক্ষকদের জীবন ছিল সমস্যাগ্রস্ত। তাদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। মাসিক বেতন তো দূরের কথা বাৎসরিক বেতনেও ছিল চরম অনিশ্চিত। কাগজে কলমে সামান্য বেতন নিয়ে অতিকষ্টে তাদের দিন অতিবাহিত করতে হত। বেসরকারি কর্তৃপক্ষের দয়াদাক্ষিণ্যে শিক্ষকদের চাকরি জুটত। আবার তারা রুষ্ট হলে শিক্ষক পদ থেকে তাদের ঘটত কর্মবিচ্যুতি। শিক্ষকদের জীবন ছিল এমনই বেদনাদায়ক ও অভিশপ্ত। কোনো দোকানদার তাদের বাকি দিতে অরাজি হত। এই শিক্ষকদের জীবনে ঘটত চরম অবমাননা, দুঃখ ও লাঞ্ছনা। তাদের, অপমৃত্যুতে সাধারণ মানুষ দুঃখবোধ না করে বরং উল্লসিত হত। এমনকি শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনের নাম করে ছাত্র ও অভিভাবকের ব্যাগ নিয়ে তাদের বাজার করে দিতে হত। অথচ শিক্ষা হল জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষক সমাজ হলেন মানুষ গড়ার কারিগর, সুতরাং যে শিক্ষকদের অন্ন বস্ত্রে সমস্যার সমাধান করা কঠিন ব্যাপার তাদের পক্ষে জাতিগঠনের আশা নিষ্ফলতার প্রতীক। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের শিক্ষক সমাজ জীবন ছিল উপেক্ষিত। বর্তমানে শিক্ষক সমাজের আর্থিক স্বচ্ছলতা এলেও তারা তাদের গুরু দায়িত্বকে সঠিকভাবে পালন করতে অনাগ্রাহী। স্বল্প বেতনের চাকরি করে জীবিকা অর্জন যেখানে অসম্ভব সেখানে স্বাধীনভাবে কৃষিকাজ করাকে তারা মেনে নিতে পারে না।

প্রমথনাথ বিশীর 'উতঙ্ক' গল্পটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। শিক্ষায়তনে ছাত্রদের অহেতুক জিজ্ঞাসা করবার মানসিকতা অনেক সময় অধ্যাপকদের শিক্ষাদানে নিরুৎসাহিত করে। ছাত্রদের বৃহত্তর অংশের বাস্তববোধের অভাবে শিক্ষাদাতার মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ছোটগল্পকার অধ্যাপকদের করুণচিত্র তুলে ধরেছেন আলোচ্য গল্পে।

'অর্থপুস্তক' ছোটগল্পটি লেখকের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। গল্পের বিষয় শিক্ষাদান পদ্ধতির ত্রুটি নিয়ে আলোচনা। কোন একটি কঠিন বিষয়কে ছাত্রদের কাছে সহজভাবে উপস্থাপিত করলে ছাত্রদের কাছে তা সহজবোধ্য হয়। সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে শিক্ষককের নৈপুণ্য প্রমাণিত হয় কিন্তু এক শ্রেণির শিক্ষক একটু সহজ বিষয়কে যদি দুর্বোধ্যভাবে বিশ্লেষণ করে তাহলে ছাত্রদের বিষয়জ্ঞানের অভাব ঘটে যা প্রত্যক্ষভাবে ছাত্রদের সর্বনাশকে ডেকে আনে। এই শ্রেণির শিক্ষকদের প্রতি লেখকের বিদ্রূপ ও সমালোচনা বর্ষিত হয়েছে।

প্রমথনাথ বিশীর 'প্রফেসর রামমূর্তি' ছোটগল্পটি কৌতুক রসাশ্রিত। এই গল্পটিতে ভূতপূর্ব অধ্যাপক রামলাল চক্রবর্তী প্রফেসর রামমূর্তি নামে পরিচিত। তিনি বাঘকে বশ

করবার কৌশল আয়ত্ত করেছেন। বাঘটিকে নিয়ে সার্কাস খেলায় অংশগ্রহণ করে অর্থনৈতিক সচ্ছল হয়ে উঠেছেন। গল্পকার দেখিয়েছেন বাংলাদেশের উচ্ছৃঙ্খল ও সাহসী ছাত্ররা রামমূর্তির বশীভূত হয়েছেন। তিনি বাঘের চেয়ে বিক্রমশালী ছাত্রদের নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছেন।

প্রমথনাথ বিশীর 'চেতাবনী' ছোটগল্পটি মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ। অর্থনৈতিক ব্যবধান যখন নরনারীর প্রেমের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি হয় আবার অবস্থার পরিবর্তন সত্ত্বেও আকস্মিক ঘটনা সূত্রে সেই প্রেম কিভাবে সার্থকতা লাভ করে তার এক অনবদ্য ঘটনা আলোচ্য ছোটগল্পের বিষয়। পিতৃমাতৃহারা সহায়সম্বলহীনা সদা হাস্যময়ী বিনুনীকে ভালোবেসেছিল ধনী গৃহস্থ পরিবারের ছেলে শ্রীদাম। অপেক্ষাকৃত বিত্তহীন পরিবারের মেয়ে বলেই শ্রীদামের সঙ্গে বিনুনীর বিয়েতে আপত্তি এসেছিল। এদিকে হাটে বাজারে মাঠে ঘাটে স্কুলে টোলে সংবাদপত্রে এক সংবাদ প্রচারিত হয়ে যায় আগামী ১৫ই শ্রাবণ চেতাবনী হবে। সে তারিখে পৃথিবীতে নামবে মহাপ্রলয়। গাছপালা বাড়িঘর নদীনালা ও মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এই চেতাবনী শুধুমাত্র জোড়াদীঘি গ্রামেই নয় সমস্ত গ্রাম এবং কলকাতা শহর অবধি এর প্রভাব পড়বে। এই সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঘরে শুরু হয় হাহাকার ও ক্রন্দন ধ্বনি। বিনুনীর মুখে কিন্তু অনাবিল হাসির ঝর্ণাধারা। কেউ তার হাসির জন্য ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করলে সে জানায় মুখ গোমড়া করে বিষণ্ণ মনে থাকলেও চেতাবনীর হাত থেকে কারো নিস্তার নেই। গ্রামের গৃহস্থ মানুষেরা জোতজমা বিক্রি করে দিয়ে ভালো ভালো খাদ্য খেয়ে ও লোককে খাইয়ে সে দিনটির জন্য প্রতীক্ষারত। শাস্ত্রকাররাও জানিয়েছেন এই বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। এই সুযোগে ময়রা উচ্চমূল্যে মন্ডামিঠাই বিক্রী করে লাভবান হয়েছে। অনেক ক্রেতা স্বল্পমূল্যে স্থাবর অস্থাবর কিনে নিয়ে লাভবান হয়েছে। শ্রীদামের পিতাও তার জোতজমা অন্যান্যদের মতো বিক্রি করে দেয়। কিন্তু উক্ত তারিখ উত্তীর্ণ হবার পর সবাই যখন দেখল চেতাবনী হয়নি, তখন সর্বত্র স্বস্তিবোধ জাগ্রত হল। জমি বিক্রেতারা বিক্রীত মূল্যে জমি ফিরিয়ে নিলে শ্রীদামের পিতা শ্রীদামের সঙ্গে বিনুনীর বিবাহ দিতে আপত্তি করেনি। এই বিয়েতে ময়রা বিনামূল্যে মিষ্টি সরবরাহ করেছিল এই জন্যেই যে চেতাবনী হবে বলেই সে লাভবান হয়েছে এবং বিনুনীর বিয়ে হয়েছে।

একজন গান্ধিবাদী সৎ অফিসার পারিপার্শ্বিক চাপে ঘুষের টাকায় মোটর গাড়ি কিনেছে তারই এক কৌতুককর কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে ছোটগল্পকার প্র.না.বির 'মোটরগাড়ি' গল্পটি। যুদ্ধোত্তর যুগে ঘুষ না নিয়ে একজন অফিসারের পক্ষে মোটরগাড়ি কেনা ছিল অসম্ভব। রজতকুমার তার সততার জন্য মোটরগাড়ি কিনতে পারেনি। ঘুষ নেবার তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই এমন কী ঘুষখোর বন্ধুদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল তিক্ত। এদিকে তার স্ত্রী ব্যঙ্গ করে কলির যুধিষ্ঠির হিসেবে তাকে আখ্যা দেয়। বয়ঃকনিষ্ঠ পুত্র আবদার জানায় মোটরগাড়ি কেনার জন্য। এমনকী মোটরগাড়ি না কেনার জন্য বাড়ির ভৃত্যটিও মনিবকে উপেক্ষা করে। বন্ধুদের কাছ থেকে অবজ্ঞাসূচক বাক্য তাকে শুনতে হয়। ভি— ১৬ ক্লাবের

সদস্য রজতকুমারের হাতে একদিন ক্লাবের নতুন প্রস্তাব আসে যার বিষয় প্রতিটি মেম্বারকে মোটরগাড়ি নিয়ে ক্লাবে আসতে হবে। সেদিন ঘৃণায় লজ্জায় নিজেকে মূল্যহীন মনে করে। তাঁর সাধুতার জন্য অফিসে উপেক্ষিত, বাড়িতে ধিকৃত এবং ক্লাবে বহিষ্কার হতে হয়েছে ভেবে রজতকুমার তার ধর্ম ন্যায়, নীতি ও সততাকে জলাঞ্জলি দিয়ে বিপথে পরিচালিত হয়। সে রাতারাতি ঘুষের টাকায় মোটরগাড়ি কিনে ক্লাবে পৌঁছালে ক্লাবের সদস্যরা পৈতৃক অর্থের গাড়ি কেনার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করলে রজত জানাতে বাধ্য হয় যে সে সত্যি সত্যি ঘুষের টাকায় মোটরগাড়ি ক্রয় করেছে। এরপর থেকে স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য প্রভৃতি বাড়ির সকল সদস্যই রজতের উপর সন্তোষপ্রকাশ করে। আলোচ্য গল্পে দেখানো হয়েছে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়।

প্রমথনাথ বিশীর 'ভিক্ষুক কুকুর সংবাদ' ছোটগল্পটিতে লেখক দেখিয়েছেন বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার এক সকরুণ চিত্র। একজন ভিক্ষুকের চেয়ে ধনীগৃহের একটি কুকুরের মর্যাদা অনেক বেশি। এই প্রসঙ্গে ভিক্ষুক ও কুকুরের যুক্তিধর্মী আলোচনা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। অনেক সময় অবস্থা ও পরিচ্ছদের পরিবর্তনে জন্মান্তর ঘটে যায়। এমনি এক কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে আলোচ্য গল্পে। কুকুর ও ভিক্ষুক উভয়ের পোশাক পরিবর্তন করে, ভিক্ষুকের ছেঁড়া কাপড়ের ঝুলি ও লাঠি বিনিময় হয় কুকুরের সঙ্গে তার কুকুরের চেন ও বকলস বিনিময় হয় ভিক্ষুকের সঙ্গে। এর ফলে মনিবের যত্নে ও আরামে নকল কুকুরটি তার পোশাক পরিবর্তনে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। ফলে আসল কুকুরটি মনিবের গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়। ছোটগল্পকার আলোচ্য গল্পে ব্যক্ত করেছেন এক শ্রেণির মানুষ নিজের বিবেক ও মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে কুকুরত্ব লাভের প্রত্যাশায় ধনীর গৃহে, মন্ত্রী বাড়িতে, পারমিট অফিসে ও রাজনৈতিক আড্ডায় অংশগ্রহণ করে এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়। এই শ্রেণির পরপদলেহী মানুষদের প্রতি গল্পকার ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষেপ করেছেন।

ছোটগল্পকার প্রমথনাথ বিশীর 'সাবানের টুকরো' ছোটগল্পটিতে করুণরসের সঙ্গে বীররসের মেলবন্ধন ঘটেছে। অনেকসময় অতিসামান্য বস্তুর মধ্যে অসামান্য ফললাভ ঘটে যেতে পারে তার ঐতিহাসিক নিদর্শনের অভাব নেই। গল্পকার জানিয়েছেন কয়েকটি হাঁসের ডাকে রোমনগরী রক্ষা পেয়েছে, কয়েকটি ত্রিপল দিয়ে ঢেকে রাখা ক্লাইভের বারুদের গাড়ি ভারত সাম্রাজ্য হস্তান্তর করতে সাহায্য করেছে। কাজেই এক টুকরো সাবান মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারে এ ঘটনাও অসম্ভব নয়। গল্পের নায়ক একদিন সাবানের টুকরোয় পা ফসকে পড়ে গিয়ে কপালে আঘাত পায়। সাদা ব্যাণ্ডেজ বাঁধবার পর একদল যুবক অনুমান করে সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তার এই পরিণতি হয়। যুবকরা প্রকৃত ঘটনা না জেনে চিকিৎসকের সাহায্য নেয়। ধীরে ধীরে গল্পকথক হিরো হিসেবে পরিচিত লাভ করে। তাদের ধারণা লোকটি দাঙ্গায় কমপক্ষে দুই চারটি মুসলমানকে হত্যা করেছে। এরূপ বীরত্বের কাহিনি চারদিকে প্রকাশিত হলে তার দেশপ্রেম প্রকাশিত

হয়। তার জীবনের আকাশে ললাটের রাজতিলকটি সৌভাগ্যের সূচনা করে।

প্রমথনাথ বিশীর 'অধ্যাপক রমাপতি বাঘ' ছোটগল্পে অধ্যাপক জীবনের করুণ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। সন্ন্যাসীর অভিশাপে রমাপতি বাঘ একজন বেসরকারি কলেজের অধ্যাপক। মাত্র ১০০ টাকার বেতনের অধ্যাপনা করতে গিয়ে সাংসারিক অসচ্ছলতার কারণে তাকে টিউশনি, ছাত্রের বাড়ির বাজার, ছাত্রের পিতার মোসাহেবি করতে হয়েছে। বেতন বৃদ্ধির আবেদন জানালে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও সহকর্মীদের কাছ থেকে তাকে সহ্য করতে হয়েছে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ। তার ফল দাঁড়ালো কলেজ থেকে বহিষ্কার। ছাত্রদের তাড়া খেয়ে রমাপতি পলায়ন করে সুন্দরবনে। সেখানে সন্ন্যাসীটিকে ভক্ষণ করে। আলোচ্য গল্পে গল্পকার দেখিয়েছেন অধ্যাপক জীবনের চরম দুরবস্থা থেকে অনেকগুণে শ্রেয় হিংস্র জীবন।

প্রমথনাথ বিশীর 'ঘোগ' ছোটগল্পে বাঘ ও ঘোগকে দুই শ্রেণির মানুষরূপে দেখেছেন। গল্পে ঘোগ হল অফিসের কেরাণী শ্রেণির প্রতিনিধি, আর বাঘ হল অফিসের বড় সাহেব। বাঘ ও ঘোগ দুইজনে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণির প্রতিনিধি। বাঘের দাপটে ঘোগের জীবন দুর্বিষহ। বেঁচে থাকবার জন্য ঘোগকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত হতে হয়। একদিকে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য অন্যদিকে বিচার ব্যবস্থার প্রহসন সমাজ জীবনের কতটা বিপর্যয় ডেকে আনে তার বাস্তব দলিল হল এই গল্পটি।

প্রমথনাথ বিশীর 'গুহামুখ' ছোটগল্পে সন্ন্যাস ধর্মের তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। এক ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী সংসার-ধর্ম বর্জন করে পাহাড়ে পর্বতে শান্তির প্রত্যাশায় ঘুরে বেড়িয়েছে। একদিন বিপদসংকুল গভীর অরণ্যে ভ্রমণ করতে গিয়ে পথ হারিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল এক গুহামুখে। বিধাতার নির্দেশে দেখতে পায় এই গহ্বরে পাপী প্রবেশ করলে বের হতে পারবে না এই লেখা রয়েছে। এক জ্যোতির্ময়ী মূর্তি তাকে জানায় সন্ন্যাসী গুরুতর পাপ করেছে। জীবিকার্জনের নামে অপরের জীবিকা হরণ করবার জন্য সে হয়েছে পাপাচারী। কেননা ভিক্ষাবৃত্তি পাপেরই নামান্তর। সে সন্ন্যাসী জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে ভ্রান্তপথ অনুসরণ করেছে। সন্ন্যাসের প্রকৃত তাৎপর্য হল ন্যূনতম জীবিকার্জন। দিব্যপুরুষ নির্দেশিত পথ অনুসরণ করতে গিয়ে এক মেলায় সন্ন্যাসী বস্ত্র পরিবর্তন করে সাধারণ পোশাকে এক মুচির সহযোগিতায় আট পয়সা রোজগার করে বৃক্ষতলে বসে ফলাহার করে খুঁজে পেল আনন্দ ও শান্তি। বিশ্বপ্রবাহের অনুকূলতার ফলে সে শান্তির কোমল স্পর্শ লাভ করল। দিব্যপুরুষ তাকে জানালো তিনটি শ্রেণি নিয়ে গড়ে উঠেছে মানব সমাজ। একশ্রেণী জীবিকার্জনের বেশি আয় করে তারা তস্কর হিসেবে পরিচিত। অপর শ্রেণি জীবিকার্জনের কম আয় করে বলে তারা ভিক্ষুক শ্রেণিভূক্ত। যারা ন্যূনতম আয়ে জীবিকার্জন করে তারাই প্রকৃত সন্ন্যাসী। গল্পকার আলোচ্য গল্পে সন্ন্যাস জীবনের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন।

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কিভাবে দুটি গ্রামের সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক সহাবস্থানের মধ্যে সম্পর্কের ফাটল ধরিয়ে দেয় সেই কাহিনী আলোচ্য 'শিখ' ছোটগল্পের

বিষয়। কলকাতায় ১৬ই আগস্টের হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে সেই অভিঘাত গ্রাম্যজীবনকে প্রভাবিত করবার কাহিনী নিয়ে প্রমথনাথের 'শিখ' ছোটগল্পটি সৃষ্টি। হিন্দু অধ্যুষিত মুকুন্দপুর এবং মুসলমান অধ্যুষিত আকন্দপুর গ্রামে জনশ্রুতি প্রচারিত হয়েছে কলকাতাগামী সরকারি চাকুরে ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। হিন্দু বক্তা প্রচার করে পাঁচ হাজার মুসলমান হিন্দু পাড়া জ্বালিয়ে দিয়েছে ও অসংখ্য লোকের মৃত্যু ঘটেছে। প্রত্যক্ষদর্শীর কথা শুনে এই ঘটনা বিশ্বাস করে সহজ সরল মুকুন্দপুরের বাসিন্দারা। আবার প্রত্যক্ষদর্শী মুসলমান প্রবীণ আকন্দপুরের মুসলমান ডেলি পেসেঞ্জার জানায় হিন্দুরা মুসলমানদের উপর চালাচ্ছে গণহত্যা। এই সংবাদ শুনে হিন্দুরা ভীত ও মুসলমানরা উত্তেজিত হয়। পরস্পর দুই গ্রামের বাসিন্দারা সন্দিগ্ধচিত্ত নিয়ে অবস্থান করায় উভয়ের বিশ্বাসে আঘাত হানে। জনৈক মুকুন্দপুরের সত্যবাদী সংবাদদাতা সংবাদ পরিবেশন করে কলকাতায় হিন্দুদের বেঁচে থাকবার মূলে রয়েছে শিখদের দয়া। পঞ্চাশ জন শিখ পঞ্চাশ হাজার মুসলমানকে অতি সহজে মেরে ফেলতে পারে। এজন্য হিন্দুরা লম্বা চওড়া চেহারা যুক্ত মস্তচুল, গোঁফ দাড়ি ও হাতে লোহার বালা পরিহিত শিখকে গ্রামে এনে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেয়। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সমধর্মী চেহারা যুক্ত শিখ আনবার জন্য চাঁদা তোলে এবং সাহসী মুসলমান গণকের ছদ্মবেশে গিয়ে শিখের উপস্থিতির সত্যতা প্রমাণ করে। কলকাতায় প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ থেমে গেলে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক পুত্রের সন্ধানে মুকুন্দপুরে পৌঁছে জানতে পায় পাইঁজী বা সর্দারজী হিসেবে পরিচিত ছেলেটি প্রকৃতপক্ষে শিখ নয় এক ভদ্রলোকের বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা ছেলে। সে অপ্রকৃতিস্থের মতো বিড়বিড় করে কথা বলত প্রতিনিয়ত। একখানা ছবি দেখে তার সত্যতা প্রমাণিত হল।

প্রমথনাথ বিশীর 'চোখে আঙুল দাদা' ছোটগল্পটি কাল্পনিক হলেও এর মধ্য দিয়ে বাঙালি চরিত্রের প্রকৃতি বর্ণিত হয়েছে। যে লোকটির চোখের দৃষ্টি ছিল ছিদ্রান্বেষী অপরের খুঁত ধরাই তার স্বভাব সে চোখে আঙুল দিয়ে জগতের সবকিছুর মধ্যে ত্রুটি নির্ধারণ করে দিত। একদিন ঘটনাক্রমে বিধাতা পুরুষের সঙ্গে তার দেখা হলে সে জানাল বিশ্বসৃষ্টির সবকিছুর মধ্যে রয়েছে ভুল। প্রমাণস্বরূপ সে জানাল সুন্দর চাঁদটিতে আছে কলঙ্ক, গোলাপ ফুলের সঙ্গে আছে কাঁটা, কোকিলের স্বর সুমধুর কিন্তু গায়ের বর্ণ কালো, মানুষের সংসারে এত সুখাদ্য থাকলেও রোগব্যাধিতে পরিপূর্ণ, জিরাফের গলা দীর্ঘ কিন্তু, গণ্ডারের গলদেশ ছোট। বিধাতাপুরুষ যদি বিশ্বসৃষ্টির আগে চোখে আঙুল দাদার সঙ্গে কনসাল্ট করে নিত তাহলে সৃষ্টি হত আরো সুন্দর। একদিন বিধাতাপুরুষ তাকে কিছু মাটি দিয়ে একটি পুতুল তৈরি করতে বলেন। পুতুলটি তৈরি হলে বিধাতা পুতুলের প্রাণ সঞ্চার ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে পুতুলটি চোখে আঙুল দাদার গালে সজোরে এক চপেটাঘাত করে। পুতুলটি অভিযোগ জানায় তার হাত দুটো ছোট সে এক চোখে দেখতে পায়না কেন। বিধাতা তার দুটো লেজ যুক্ত করে দিয়েছে। এরপর বিধাতা তাকে নরকবাসের আদেশ

জানায় কেন না যেখানে অসংগতি যেখানে ভুলত্রুটি নেই আছে সন্তোষ, আছে মহত্তর সৌন্দর্যবোধ তাই স্বর্গ ও মর্ত্যে কোনো ভেদ নেই। বিধাতাপুরুষ জানাল একমাত্র গৌড়দেশে বাস তার উপযুক্ত স্থান। গৌড়দেশের বাঙালিরা শুধু বিশ্বের ভুলত্রুটি ছাড়া আর কিছুই চোখে দেখে না। অথচ বিধাতার সৃষ্টি পৃথিবী-কত সুন্দর, আনন্দময়, বৈকুণ্ঠতুল্য এরূপ সুন্দর পৃথিবীতে বাঙালিরা শুধু অপরের ত্রুটিটাই বড় করে দেখে, তারা ভুলে যায় সুন্দরকে। আলোচ্য গল্পে প্রমথনাথ বাঙলিদের স্বভাব বৈচিত্র্য সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন।

প্রমথনাথ বিশীর 'লবঙ্গীয় উন্মাদাগার' ছোটগল্পটিতে কৌতুকের আড়ালে ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। লবঙ্গদেশের এক রাজা সকল শর্মা নামে এক ইঞ্জিনিয়ারকে উন্মাদাগার তৈরির নির্দেশ দিয়ে জানালেন বদ্ধ পাগল ও মুক্ত পাগলের মধ্যে কোন শ্রেণির উন্মাদাগার তৈরি করবেন। পরে জানালেন রাজধানীতে পর্যবেক্ষণ করে যথোপযুক্ত উন্মাদাগার গঠনের উদ্যোগ নেবেন। দীর্ঘ সময় ধরে পরিভ্রমণ করে রাজ্যের সীমানার চারধারে প্রাচীর নির্মাণের কাজে লেগে গেলেন। তিনি দেখলেন দেশের সর্বত্রই শুধু পাগলের দৌরাত্ম্য। প্রকৃত সুস্থ একটি লোককেও খুঁজে পেলেন না। রাজা উন্মাদাগার দর্শনের জন্য গিয়ে দেখলেন সকল শর্মা রাজধানীটা প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। তার দৃষ্টিতে গোটা রাজধানীটাই যেন একটা গারদ, ছোটো উন্মাদাগার স্থাপন করলে তাদের থাকবার স্থানের অভাব ঘটবে। রাজা পরিদর্শন করে জানলেন রাজধানীর সকলেই পাগল। উত্তেজিত রাজা জানালেন সকল শর্মার কথানুসারে তাহলে তিনিও পাগল। তার জবাবে সকল শর্মা জানালেন কোনো সুস্থ রাজা এতগুলো পাগলের ওপর রাজত্ব করতে পারে না। রাজা পাগল বলেই তার পক্ষে সম্ভব। সকল শর্মাকে রাজ্য থেকে বিতাড়নের নির্দেশ দিয়ে রাজা বললেন দেশের পাগলটা পালিয়েছে ভালই হয়েছে। তারপর রাজা প্রাচীর ভেঙে দেবার নির্দেশ দিলেন।

'আর্টফর আর্ট সেক্' ছোটগল্পে এক চানাচুরওয়ালা বাউলের বেশে মন উদাসকরা গান গেয়ে টাকা রোজগার করত। দর্শকগণ সে পরিচয় জানত না। এই চানাচুরওয়ালা স্বল্প শিক্ষিত সুগায়ক ও কবি এই আত্মপরিচয় জানিয়ে সে দর্শকমনে সহানুভূতি জাগিয়ে রোজগারের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলত। ভাবের বৈরাগী হলেও সে প্রকৃতপক্ষে সংসারে আসক্ত ব্যক্তি। শিল্পের জন্য শিল্প সৃষ্টির মতবাদকে প্রমথনাথ সমর্থন করেননি।

উল্লেখপঞ্জী

(১) বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার—ভূদেব চৌধুরী—পৃঃ ৮৫৩

(২) শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব—ভাইফোঁটা—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২৫

(৩) বাংলা উপন্যাসের কালান্তর—ডঃ সরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ৪৫

(৪) সাহিত্য বিবেক—ডঃ বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়—পৃঃ ১৭২

(৫) তদেব—পৃঃ ১৭৪

(৬) 'কবরের তলা থেকে সংগ্রহ' আলোচনা অংশ—প্রবোধ কুমার সান্যাল—পৃঃ ৬

(৭) প্রমথনাথ বিশীর গল্পসমগ্র—রোহিণীর কী হইল?—পৃঃ ৮৬

(৮) প্রমথনাথ বিশীর গল্পসমগ্র—অতি সাধারণ ঘটনা—পৃঃ ১৯৯

(৯) গালি ও গল্প—ভাঁড়ু দত্ত—পৃঃ ১১৭

(১০) গল্প পঞ্চাশৎ—ব্রহ্মার হাসি—পৃঃ ৪২৫

(১১) প্রমথনাথ বিশীর স্বনির্বাচিত গল্প—শকুন্তলা—পৃঃ ১১৭-১১৮

(১২) প্রমথনাথ বিশীর স্বনির্বাচিত গল্প—সুতপা—পৃঃ ১০৭

(১৩) প্রমথনাথ বিশীর স্বনির্বাচিত গল্প—অসমাপ্ত কাব্য—পৃঃ ২৯

(১৪) প্রমথনাথ বিশীর গল্পসমগ্র—কাঁচি—পৃঃ ৪২

(১৫) গল্পসমগ্র-প্রমথনাথ বিশীর—পূজার রচনা—পৃঃ ১৪৪

(১৬) গল্পসমগ্র প্রমথনাথ বিশী—রাজকবি—পৃঃ ১৫৭

(১৭) গল্প পঞ্চাশৎ-প্রমথনাথ বিশী—শাপমুক্তি—পৃঃ ১২৫

(১৮) প্রমথনাথ বিশীর স্বনির্বাচিত গল্প—পেস্কারবাবু—পৃঃ ১৪৬-১৪৭

(১৯) নীরস গল্প—সঞ্চয়ন—প্রমথনাথ বিশী—ডাকিনী—পৃঃ ৩১

(২০) নীলবর্ণ শৃগাল—প্রমথনাথ বিশী—অলঙ্কার—পৃঃ ১৬৭

(২১) গল্প পঞ্চাশৎ—বিনা টিকিটের যাত্রী—পৃঃ ১৪২

(২২) নীলবর্ণ শৃগাল—অবচেতন—পৃঃ ৪

(২৩) গল্প-পঞ্চাশৎ—কালো পাখী—পৃঃ ২৮৯

(২৪) নীলবর্ণ শৃগাল—প্রমথনাথ বিশী—অদৃষ্ট সুখী—পৃঃ ১৭৮

(২৫) চাপাটি ও পদ্ম—নানাসাহেব—পৃঃ ১৭১

(২৬) প্রমথনাথ বিশীর গল্পসমগ্র—কল্কি—পৃঃ ২৩৭

চতুর্থ অধ্যায়

প্রমথনাথের ছোটগল্পের আঙ্গিক ও প্রকরণ

আঙ্গিক ও প্রকরণ সাহিত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফর্মকে বাংলায় আঙ্গিক ও প্রকরণ বলা হয়, আবার স্ট্র্যাক্‌চারের প্রতিশব্দ হল 'গঠনশিল্প' বা 'কাঠামো'। সাহিত্যের প্রতিটি শাখার আঙ্গিক প্রকরণ হল তার বহিরঙ্গ শিল্পকলা। কনটেন্ট বা বিষয়কে সুন্দরভাবে ধরে রাখে আঙ্গিক বা প্রকরণ। সাহিত্যস্রষ্ঠা তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিশীল রচনার মধ্যে বিষয়বস্তু মনে মনে কল্পনা করেন। বিষয়বস্তুর মধ্যে যে সত্য প্রকাশিত হয় তা হল থিম্ বা বক্তব্য। বিষয় ও বক্তব্যকে যে কলাকৌশলের মাধ্যম উপস্থাপন করা হয় তাই হল আঙ্গিক ও প্রকরণ। প্রকৃতপক্ষে বিষয় নির্বাচনের পর থেকেই সাহিত্য স্রষ্টা পরম আঙ্গিকের অন্বেষণ করেন সুন্দরভাবে প্রকাশের লক্ষ্যে। সঙ্গত কারণে বলা যায় ভাব এবং ভাষা অর্থাৎ প্রকাশ ভঙ্গি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ছোটগল্প সাহিত্যের এমন একটি শ্রেষ্ঠ শিল্পরূপ যা পাঠককে পৌঁছে দেয় অনুভবের জগতে। পাঠককে ভাবিয়ে তোলে, সৃষ্টি করে হৃদয়ের গভীরে এক বিশেষ আবেদন।

"প্রত্যেকটি ছোটগল্প সচেতন পাঠকের এক এক করে বিভিন্ন ভাব ও ভঙ্গির মুখাবয়ব দেখার আয়না-যে মুখাবয়ব একান্ত নির্জন, নিঃসঙ্গ আয়নার সামনে ধরা। ছোটগল্প যেমন ছোট বিষয়কে বড় করে দেখায়, তেমনি বড় বিষয়কে ছোট মাপে ধরে পাঠকের মনে ভূমিকম্পের চাপা শব্দের ধ্বনি গৌরব ঘোষণা করে।"[১]

ছোটগল্পের রূপ ও রীতির সর্বজন স্বীকৃত বৈশিষ্ট্য হলঃ

(ক) "আরম্ভের তির্যকতা ও চমৎকারিত্ব এবং প্রতীক ধর্ম, (খ) কাহিনীর ও ঘটনার একমুখিনতা, (গ) এক রুদ্ধশ্বাস মহামুহূর্ত-এ সমস্ত কিছুর দুঃসাহসিক আরোহন ও সেই সঙ্গে অবরোহনের সূচনা, (ঘ) রীতির মধ্যে লেখক ব্যক্তিত্বের ও জীবনাগ্রহের রোমান্টিক প্রকাশ, (ঙ) গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনা, (চ) ভাষা ও গদ্যভঙ্গির মধ্যে অবধারিত চিত্রকল্পকে সহজ স্বীকৃতি দান। তাই ছোটগল্পের বিষয় যেমন প্রধান, তেমনি তার প্রকরণের দায়িত্ব বুঝিবা অনেক বেশি। সাধারণ মাপের মানুষের থেকে মানুষ যদি কিছুটা বড় হয় বা বেশ কিছুটা ছোট হয় সেক্ষেত্রে তার জামার মাপের নিখুঁত রূপ কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না, গল্প ছোট হওয়ায় তার রীতির নিঁখুত অবস্থানকেও আদৌ অবহেলা করা একেবারেই দুরূহ।"[২]

অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের মতে—

" ছোটগল্প লেখকের মানসপ্রতীতি জাত একটি সংহত গদ্য কাহিনী যার একমাত্র বক্তব্য কোন ঘটনা, চরিত্র, পরিবেশ অবলম্বন করে এক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।"[৩]

আঙ্গিক ও প্রকরণের কৌশল রূপায়ণের ক্ষেত্রে ছোটগল্পকারকে ভাবতে হবে তিনি ছোটগল্পের সূচনা কোন্ স্থান থেকে করবেন এবং গল্পের উপসংহার কিভাবে টানবেন,

কোন্ কোন্ প্রধান ও অপ্রধান চরিত্র তিনি নির্বাচন করবেন, শহর, আধা শহর বা গ্রাম্য পটভূমি কোন্‌টি ব্যবহার করবেন, তিনি জীবনের কোন্ খণ্ডিত অংশ নিয়ে ঘটনার পর ঘটনা জমিয়ে তুলবেন, কোন্ চরিত্রের মুখে কি ধরনের সংলাপ প্রয়োগ করবেন, সময়ের নিরীক্ষণ বিন্দু অনুসারে কোন ঋতুতে কাহিনীর শুরু ও শেষ করবেন তা তিনি ঠিক করবেন, কাহিনীতে নাটকীয়তা সৃষ্টি এবং কতটা কাব্যময়তা এবং কতটা সরস গদ্যে তিনি লিখবেন ছোটগল্পকারকে তা ঠিক করে নিতে হবে। আবার গল্পে ভৌগোলিক পটভূমি কি হবে সেই সঙ্গে গল্পের উপস্থাপন কৌশল লেখকের জবানীতে, ফ্লাশব্যাক রীতিতে, উত্তম পুরুষের বা চিঠি লেখার ফর্মে গল্পটি লিখবেন আঙ্গিক ও প্রকরণের ক্ষেত্রে সেগুলি মূল আলোচ্য বিষয়। এইসব দিক ছোটগল্পকারকে ভাবতে হয় এই ভাবনাই হল ছোটগল্পের আঙ্গিক বা প্রকরণ।

প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পের আঙ্গিক ও প্রকরণ সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে ছোটগল্পের গঠন, বিন্যাস, ঘটনা বর্ণনা, উপস্থাপন কৌশল ও গল্পের উপাদানের আলোচনা প্রাসঙ্গিক। কাহিনীর সঙ্গে তত্ত্বের সম্পর্ক নির্ণয় সেই সঙ্গে ছোটগল্পের উপজীব্য ভাষা ও ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন কতটা ঘটেছে তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে। এছাড়া নামকরণ কতটা শিল্প সমৃদ্ধ হবে তা ছোটগল্পকারকে বিশেষভাবে নির্বাচন করতে হয়। আঙ্গিক ও প্রকরণ আলোচনায় গল্পের আয়তন নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে ছোটগল্পকারকে ভাবতে হবে তিনি ছোটগল্পে কোন্ রস পরিবেশন করবেন সেই দিকটি। সেই রস হাস্যরস বা করুণরস হতে পারে। তিনি ইতিহাস, ভূগোল ও পুরাণকে কতটা গল্পে স্থান দিয়ে মানব জীবনরসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তুলবেন সেই বিষয়টি তাঁকে ভাবতে হবে। ছোটগল্পকার তাঁর গল্পে আঙ্গিক প্রকরণে রূপ বর্ণনা, প্রবাদ প্রবচন, প্রশ্নবোধক ও না বাচক বাক্য, বিভিন্ন শব্দ কিভাবে প্রকাশ করবেন আঙ্গিক প্রকরণের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে যে প্রসঙ্গ এসে যায়। আমরা নিম্নে প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পের আঙ্গিক প্রকরণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার দিকে অগ্রসর হচ্ছি।

ঃ ছোটগল্পের নামকরণ প্রসঙ্গ ঃ

প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পের নামকরণ শিল্প সমৃদ্ধ হয়েছে সন্দেহ নেই। আঙ্গিক ও প্রকরণের ক্ষেত্রে নামকরণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আমরা জানি গল্পের নামকরণের পেছনে যে বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি হল বিষয়বস্তু ভিত্তিক, চরিত্র কেন্দ্রিক ও ব্যঞ্জনাধর্মী প্রভৃতি। অত্যন্ত সচেতনভাবে তিনি যে গল্পের নামকরণগুলি করেছেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। লেখক 'বাঁশীর সুর' ছোটগল্পে বদ্ধ জীবন থেকে মুক্তির প্রয়াস প্রকাশ করে সার্থক ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ করেছেন। অভিন্ন হৃদয় গল্পের নায়ক ও নায়িকার পরিচয় আছে 'প্রণতা' ছোটগল্পে। এই নামকরণটি ভাবধর্মী হয়েছে। 'ভাইফোঁটা' ছোটগল্পে নারী ও পুরুষের বৈপরীত্য উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে করুণ রসের আবহ সৃষ্টির গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী হয়েছে। 'জয়' গল্পে যুদ্ধ, বন্দীত্ব ও উদ্ধার কাহিনী নিয়ে জয় এর বাতাবরণ

সৃষ্টি হওয়ায় আলোচ্য গল্পটির নামকরণ শিল্পগুণ সমৃদ্ধ হতে পেরেছে। 'মাদুলী' গল্পে নায়কের আত্মপরিচয় বিধৃত হয়েছে মাদুলীর অভ্যন্তরে লিখিত পরিচয় পত্র প্রকাশে। গল্পটির নামকরণ অর্থবহ হয়ে উঠেছে। বাৎসল্য রস থেকে করুণ রস আমদানি করে 'বালির বাঁধ' ছোটগল্পটি সার্থক নামকরণ হয়েছে। রোমান্টিক নায়ক নায়িকার প্রেম এবং পরিণতিতে বিচ্ছেদ বেদনার দৃষ্টান্ত হয়ে আছে 'ফুলদানী' ছোটগল্পে। ভালোবাসার নবারুণ রঙে সাজানো ফুলদানিটি বিশেষ তাৎপর্যধর্মী হয়ে উঠেছে। 'আরোগ্যস্নান' গল্পের নামকরণটি শিল্পগুণ সমৃদ্ধ যা প্রকৃতি প্রেমের এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত। 'সাগরিকা' ছোটগল্পে প্রকৃতির কোলে প্রেমানুভূতির ঝঙ্কার এনে দিয়েছে এক নূতন স্বাদ। সেইদিক থেকে সাগরিকা অর্থাৎ সাগরপারের রোমান্টিক বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য নামকরণটি ব্যঞ্জনাধর্মী হয়েছে। 'সিন্ধবাদের অষ্টম সমুদ্রযাত্রার কাহিনী' ছোটগল্পে বাঙালির অন্তঃসার শূন্য জীবনের অসংগতির দিক গল্পের নামকরণে এনে দিয়েছে গভীর ব্যঞ্জনা। প্রমথনাথের 'যন্ত্রের বিদ্রোহ' ছোটগল্প প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে নাগরিক সভ্যতার দ্বন্দ্ব প্রকাশ করতে গিয়ে রূপকের আড়ালে কাহিনীর অবয়বকে ছোটগল্পকার শিল্পরূপ দিয়েছেন। গল্পটির নামকরণ এখানে হয়ে উঠেছে রূপকধর্মী। 'নর শার্দুল সংবাদ' ছোটগল্পে শার্দুলের জবানীতে যে মহত্বপূর্ণ দিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নামকরণগত দিক থেকে তা একটিবারের জন্য ত্রুটিযুক্ত হয়নি। 'মাধবী মাসী' ছোটগল্পটি চরিত্র কেন্দ্রিক। মাধবী মাসীর মনস্তাত্ত্বিক দিকটি লেখক সচেতনভাবে আলোকপাত করেছেন। লেখকের 'দ্বিতীয় পক্ষ' ছোটগল্পটি অতিলৌকিক আবহ সৃষ্টি করে নায়কের জীবনের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি আলোচিত হয়েছে। 'অতি সাধারণ ঘটনা' ছোটগল্পটি ঘটনাকেন্দ্রিক। 'গদাধর পণ্ডিত' ও 'পেস্কারবাবু' দুটো ছোটগল্পই চরিত্রকেন্দ্রিক নামকরণের সার্থক দৃষ্টান্ত। 'প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ' ছোটগল্পটি ঘটনাকেন্দ্রিক। 'সুতপা' করুণরসযুক্ত চরিত্র প্রধান একটি সার্থক প্রেমের গল্প। 'মাতৃভক্তি' ছোটগল্পটি বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক সার্থক নামকরণের দৃষ্টান্ত। 'স্বপ্নলব্ধ কাহিনী' ছোটগল্পে ট্র্যাজিক মহিমা অতিলৌকিক রসের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ হয়েছে। রহস্যলোকে ঘেরা 'নিশীথিনী' গল্পটির নামকরণও ব্যঞ্জনাধর্মী। 'মহেঞ্জোদড়োর পতন' ছোটগল্পটির নামকরণ ঘটনাকেন্দ্রিক। 'ধনেপাতা' গল্পের নামকরণটি বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। ঘটনাধর্মী 'গুলাব সিং এর পিস্তল' ছোটগল্পটির নামকরণ সার্থক। 'জেমি গ্রীনের আত্মকথা' ছোটগল্পে আত্মকথা বলতে গিয়ে গল্পের যে কাহিনী বিন্যাস লেখক উপস্থাপিত করেছেন নামকরণগত দিক থেকে তা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। 'থার্মোমিটার' ছোটগল্প যান্ত্রিক গোলযোগ নিয়ে লেখা, গল্পটির নামকরণ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। 'রাশিফল' ছোটগল্পে এক সাহিত্যিকের মনে সৃষ্টি হয়েছে দ্বন্দ্ব। গল্পটি সার্থকনামা সন্দেহ নেই। 'অলঙ্কার' ছোটগল্পে অলঙ্কারপ্রিয়তার পরিচয় দিয়ে বস্তুকেন্দ্রিক নামকরণটি সার্থক হয়ে উঠেছে। 'অদৃষ্ট সুখী' ছোটগল্প অন্ধত্বই যে তার জীবনে সুখের স্বর্গভূমি রচনা করে দিতে পেরেছে সে দিক থেকে বর্তমান ভোগাসক্ত জীবনের পটভূমিকায় গল্পটির নামকরণ সার্থক সন্দেহ নেই। 'অবচেতন', 'ভৌতিক চক্ষু' 'বিনা টিকিটের যাত্রী' ও 'আয়নাতে' প্রভৃতি ছোটগল্প অতিলৌকিক, এই অতিলৌকিক গল্পগুলির নামকরণগত দিক থেকে কোন অসংগতি নেই। 'মৌলাবক্স'

ছোটগল্পটি আইনের আড়ালে কৌতুকের সংমিশ্রণে অক অনবদ্য গল্পের নামকরণ। 'এলসেশিয়ান ডগ্' ছোটগল্পটি মনুষ্যেতর প্রাণীকে নিয়ে লিখিত কৌতুক রস সমৃদ্ধ সার্থকনামা ছোটগল্প। ' চোখে আঙুল দাদা' ও 'জেনুইন লুনাটিক' ছোটগল্পটির নামকরণ ব্যঞ্জনাধর্মী। 'পরী' ছোটগল্পটিতে সুকৌশলে গল্পকার বাদশাহী রমণীদের দৈন্যকে উপস্থাপন করে সার্থক নামকরণ দিয়েছেন। 'আগম্-ই-গন্না-বেগম্' ছোটগল্পে গন্না বেগমের কারুণ্য অবলম্বনে লিখিত এক সার্থকনামা ছোটগল্প। 'যমরাজের ছুটি', 'ব্ল্যাক্‌মেল', 'বাল্মীকির পুনর্জন্ম' ও 'ছেঁড়াকাঁথা ও লাখ টাকা' গল্পগুলির নামকরণে লেখকের প্রতিভার পরিচয় রয়েছে। 'বাজীকরণ' ও 'পক্ষীরাজ গাধা' ছোটগল্প দুটিতে নীতিমূলক ভাবকে লেখক উপস্থাপন করেছেন, যা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। 'গণক' গল্পটি ব্যঙ্গধর্মী হলেও সার্থক নামা ছোটগল্প। 'মানুষ ও একখানা তক্তপোষে' ছোটগল্পে সিনেমা স্টারের মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এক ব্যঞ্জনাধর্মী ছোটগল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। 'প্রফেসর রামমূর্তি' ছোটগল্পটি চরিত্র প্রধান। 'ভাঁড়ু দত্ত' ছোটগল্পে মুকুন্দরামের ভাঁড়ু দত্ত চরিত্রের নব রূপায়ণ নামকরণটি পাঠক মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। 'পরিস্থিতি' গল্পটি বিশ্বের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি উপস্থাপন করে এক সার্থক ছোটগল্পে রূপায়িত হয়েছে। প্রমথনাথ শুধুমাত্র গল্প রচয়িতা নন সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও অবাধ বিচরণ করে অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তার সাক্ষর মেলে মোট ১৮টি উপন্যাসের নামকরণে কিংবা অসংখ্য কবিতার নামকরণে। তাঁর ছোটগল্পের নামকরণে সাহিত্য রসের ব্যত্যয় ঘটেনি। মূলত গল্পকার আঙ্গিক সচেতন হয়েই গল্পগুলির সার্থক নামকরণ করেছেন। প্রমথ সাহিত্যের এটা একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

ঃ ছোটগল্পের শুরু ও সমাপ্তি ঃ

'জগবন্ধুর মোহমুক্তি' ছোটগল্পের শুরুতে প্রমথনাথ বিশী জগবন্ধুর বংশ পরিচয় এবং তার বাল্য পরিচয় দিয়েছেন। বিষ্ণুর নির্দেশ দানের মাধ্যমেই গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। প্রমথনাথ বিশীর 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' গল্পটিতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নামকরণের মাধ্যমে কিভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছেন। গল্প শেষে ব্যাঘ্ররূপী দক্ষিণ রায় জানিয়েছেন হিন্দু-মুসলিম খ্রিষ্টান মূলত তারা সকলেই মানুষ কিন্তু ধর্মভেদে ভিন্ন। 'পক্ষীরাজ গাধা' গল্পে লেখক শুরুতে দেখিয়েছেন এক গাধা ঘোড়ার প্রতি মানুষের ভালোবাসা দেখে কিভাবে বিধাতার কাছে গাধা হয়ে না থেকে ঘোড়া হওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছে। গল্প শেষে আমরা দেখতে পাই গাধা ঘোড়াতে রূপান্তরিত হলেও গাধা সর্বদাই গাধা থাকে তার বেশি কিছু নয়। 'ভগবান ও বিজ্ঞাপনদাতা' গল্পটি শুরু হয়েছে ভগবান ও এক মাসিক পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ মহাশয়ের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে। গল্পটির পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে ভগবানের অসহায়তার মাধ্যমে। 'ডাকিনী' গল্পগ্রন্থের 'ডাকিনী' গল্পটিতে লেখক হলদে কলসীর চৌধুরী বংশের অর্থের কৌলিন্য ছাড়া সরস্বতীর সঙ্গ বর্জিত ছিল গল্পের শুরুতে তা দেখিয়েছেন। এহেন বংশে কিভাব হঠাৎ সরস্বতীর

আগমন ঘটল তার সামান্য আলোচনা করেছেন। গল্পের পরিসমাপ্তিতে মল্লিকার মর্মান্তিক মৃত্যু কিভাবে বাড়ির এবং গ্রামের লোকেরা ডাকিনীর ভয় থেকে নিশ্চিত বোধ করল তা দিয়েই গল্পের পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে। 'সিন্ধুক' গল্পে পিতৃশোকের তুলনায় পিতার সিন্দুকটি পুত্রদের কাছে অধিক মূল্যবান তার ছবি দিয়ে গল্পটির শুরু। গল্পের শেষে সিন্দুকের মধ্যে উপদেশ ছাড়া অন্যকোনো ধনের সন্ধান না পাওয়ায় রামবাবুর পুত্রেরা পিতা সম্পর্কে যে মনোভাব পোষণ করেছিল তার মধ্য দিয়ে গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটে। 'নীলমণির স্বর্গলাভ' গল্পটি লেখক সাঁওতাল পরগনার জয়ন্তী নদীর ধারে পাহাড়ের কোলে মহুয়ার গন্ধে প্রকৃতির অনবদ্য রূপের ছবি দিয়ে শুরু করেছেন। নীলমণি আবার তার দলে ফিরে আসতে পেরে নিজের স্বাধীন জীবনের যে আনন্দ অনুভব করেছে তা দিয়ে গল্পের শেষ হয়েছে।

গল্পপঞ্চাশৎ গল্পগ্রন্থের 'তুক্' গল্পটি জগবন্ধুর আকস্মিক অসুস্থতার কারণ দিয়ে শুরু হয়েছে। গল্পের শেষে জগবন্ধুর অসুস্থতার কারণ আবিস্কার করে। জগবন্ধু অসুস্থ হয়েছিল কেন এবং কিভাবে সুস্থ হল তা একমাত্র সুলতা ছাড়া আর সবার কাছেই অজানা রয়ে গেল। 'পঞ্চম বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস' গল্প কাহিনীতে পঞ্চম বিশ্বযুদ্ধ কিভাবে এবং কি নিয়ে শুরু হয়েছিল সে ঘটনা দিয়ে কাহিনীর শুরু। পঞ্চম বিশ্বযুদ্ধের শেষ হবার পর সসাগরা ধরিত্রী যুদ্ধের হাত থেকে মুক্ত হয়ে অখন্ড শান্তি লাভ করল এ ইঙ্গিত দিয়েই পঞ্চম বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। 'চাচাতুয়া' গল্পের কাহিনীতে সৌদামিনী ও তার মেয়ে কুসুমের গ্রাম ছাড়ার করুণ মুহূর্ত দিয়ে শুরু। সৌদামিনী কন্যা কুসুম তার আদরের কাকাতুয়াটিকে ছেড়ে যেতে যে গভীর দুঃখ অনুভব করছিল তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। কুসুমের কৃষ্ণ নাম বলা কাকাতুয়াটি কিভাবে চাচাতুয়ায় রূপান্তরিত হয়ে আল্লা বলতে শিখল এই ঘটনা কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে আছে। 'জেনুইন লুনাটিক' গল্পে নায়ক ভানুপ্রকাশ যুদ্ধের সময় যে উপায়ে রোজগার করত যুদ্ধ শেষে সে উপায় অর্থাৎ মানুষ মারা নিষিদ্ধ হওয়াতে সে বেকার হয়ে রোজগারের ধান্ধায় পথে পথে বেড়াতে লাগল। গল্পের পরিসমাপ্তিতে লেখক পাগলের বিভিন্ন শ্রেণি বিন্যাস করে দেখিয়েছেন যে পৃথিবীতে ভানুপ্রকাশ এক শ্রেণির পাগল এইভাবেই গল্পের পরিসমাপ্তি টেনেছেন। 'বস্ত্রের বিদ্রোহ' গল্পে রজ্জু ধোপার নিজেকে রজক সম্রাট বলে প্রচারিত করবার কাহিনী দিয়ে গল্পের শুরু। গল্পের পরিসমাপ্তিতে বস্ত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে কাহিনী যেন মুহুর্তেই ফুরিয়ে যায়। 'খড়ম' গল্পে খড়মের ব্যবহার এবং আধুনিক যুগে খড়মের বিলুপ্তির কারণ দিয়ে কাহিনীর শুরু। গল্পের পরিসমাপ্তিতে খড়মের বংশ রূপে সাইনবোর্ডকে তুলে ধরা হয়েছে। 'শার্দূল' গল্পটিতে জোড়াদীঘি গ্রামে শার্দূলের কীর্তিকলাপ দিয়ে শুরু। গল্পের পরিসমাপ্তিতে ব্যাঘ্ররূপী সুরেন পোদ্দারের জোড়াদীঘি থেকে অন্তর্ধানের সাথে সাথে শার্দূলের অত্যাচারের হাত থেকে জোড়াদীঘি গ্রাম নিষ্কৃতি পায়। 'ছবি' গল্পে ছবি তোলার কাহিনী দিয়ে গল্প শুরু। অবিনাশের আনাড়ি ফটোগ্রাফারের দ্বারা তোলা ছবি কিভাবে অসামান্য হয়ে উঠল এই গল্পটিতে লেখক তা সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রমথনাথ বিশীর 'ব্ল্যাক্‌মেল' গল্পে গ্রামের জমিদারের গোমস্তা গোবর্ধন চক্রবর্তীর রাগান্বিত ভাবমূর্তি দিয়ে শুরু। গোবর্ধন কিভাবে স্বর্গে গেলেন এবং দেবতাদের বুদ্ধিকে হারিয়ে দিয়ে প্রচুর জিনিস নিয়ে মর্তে ফিরে এলেন গল্পের শেষে তা দেখানো হয়েছে। 'তিমিঙ্গিল' গল্পে পোস্টকার্ডের লিখিত অক্ষরগুলি কিভাবে মানুষের চিন্তাচেতনাকে হরণ করতে পারে তা দিয়েই গল্পটির শুরু। গল্পের পরিসমাপ্তিতে সিদ্ধিনাথের সহায়তায় কিভাবে তিনি মুক্তি পেলেন তার বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, তিনি একটি ভয়ঙ্কর জন্তু কিন্তু সেও তিমিঙ্গিলকে ভয় পায়। 'বাল্মীকির পুনর্জন্ম' গল্পে আদি কবি বাল্মীকি ব্রহ্মার অনুমতিক্রমে আধুনিক রূপ ধারণ করে মর্তে আগমন করেন এই ঘটনা দিয়ে গল্পের শুরু। এই মজাদার গল্পটির শেষে আমরা দেখতে পাই মর্ত্যমানবের তির্যক ব্যঙ্গোক্তির মাধ্যমে এবং ষাঁড়েদের দ্বারা তাড়িত হয়ে কিভাবে বাল্মীকি পুনরায় ব্রহ্মার কাছে এসে পড়লেন এই ঘটনায় গল্পের সমাপ্তি হয়েছে। ব্যাচেলারস্‌ ক্লাবের ফাউন্ডার তপনের দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে জল্পনা কল্পনার মাধ্যমে 'পুতুল' গল্পের শুরু হয়েছে। গল্পের শেষে একটি পুতুলকে নারী রূপে কল্পনা করায় তপন যে দুঃখ পেয়েছিল সে কথাই বলা হয়েছে। 'যমরাজের' ছুটি গল্পে কোনো নিয়ম না মানা মানুষ যমরাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলায় ব্রহ্মা তাকে দীর্ঘমেয়াদী ছুটিতে যাবার নির্দেশ দানের মাধ্যমে কাহিনীর আরম্ভ। গল্পের পরিশেষে মৃত্যুহীন বৃদ্ধ জরাগ্রস্থ মানুষের অনুরোধে ব্রহ্মার অনুমতিক্রমে যমরাজ আবার নিজ দায়িত্ব ফিরে পেলেন এবং বহু লোকের মৃত্যুতে মর্ত্য মানব দুঃখ প্রকাশ না করে আনন্দিত হল।

'ছেঁড়া কাঁথা ও লাখ টাকা' গল্পের লেখক ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখাটাকে অনুচিত বলে মনে করেন না এই কথা দিয়ে তিনি গল্পের কাহিনী আরম্ভ করেছেন। গল্প শেষে লেখক ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখাতে উৎসাহিত করেছেন। 'দক্ষিণরায়ের দাক্ষিণ্য' গল্পে রাম রহিমের বন্ধুত্ব দিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত ঘটেছে। গল্পের শেষে দক্ষিণ রায়ের দাক্ষিণ্যে কিভাবে রাম রহিম একসাথে মারা গেল তার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। 'ভারতীয় নৃত্য ও ভারতীয় ব্যাঘ্র' গল্পে মহাক্ষুধা ও বহু ক্ষুধা নামে দুই ব্যাঘ্র সুন্দরবনের নিকটবর্তী এক গ্রামের জলসার আসরে দূর থেকে আসা নর্তকীর ড্যান্স দেখবার জন্য রাত্রি দশটার পরে গ্রামের দিকে রওনা হওয়ার ঘটনা দিয়ে কাহিনীর শুরু। গল্পের পরিসমাপ্তিতে শশীমুখীর অদ্ভুত ভারতীয় নৃত্যে ব্যাঘ্রদ্বয় পলায়ন করল তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 'শাপমুক্তি' গল্প সাহিত্যিক অমরনাথের মর্তে আগমনের কাহিনী দিয়ে শুরু। গল্পের পরিসমাপ্তিতে সাহিত্যিক অমরনাথের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী পুত্র এবং ডাক্তার সবার পূজা সংখ্যার জন্য লেখা গল্প অমরনাথের ঘর থেকে খুঁজে পাওয়ার জন্য যে আকুলতা দেখিয়েছিল তা বর্ণনা করা হয়েছে। 'রাঘব বোয়াল' গল্পে ওঙ্কারনাথের চুরি করার সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত। কাহিনী শেষে ওঙ্কারনাথ চুরি করার সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকে কারণ সে বুঝতে পারে চুরি করতে গেলেও বিশেষ প্রতিভার প্রয়োজন। 'সিদ্ধান্ত' গল্পে প্রজাপতি ব্রহ্মা ও দেবাদিদেব মহাদেবের উপবেশনের দোদুল্যমান

অবস্থা দিয়ে কাহিনীর শুরু। গল্পের পরিসমাপ্তিতে সমবেত দেবতাদের সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান দিয়ে শেষ হয়েছে। 'পুকুর চুরি' গল্পটি ছোট্ট সুন্দর গল্প। এরোপ্লেনের কাহিনী গল্পের প্রথম অংশে রয়েছে। গল্পটি অতিরঞ্জিত তাই কাহিনী কেউ বিশ্বাস করেনি এই মতের মধ্য দিয়েই এর উপসংহার এসেছে। 'নরপশু সংবাদ' গল্পটি শনিবারের কোনো এক সন্ধ্যায় বাবুরা কিভাবে আমোদ করবে কাহিনীর প্রথমেই তা বলা হয়েছে। অন্তিম পর্যায়ে ছাগল কিভাবে রমেশের পোশাক পরিধান করে রমেশের মাংস পরিবেশনকারীদের দিয়ে তাদের ভোজন রসনাকে পরিতৃপ্ত করেছে তা বলা হয়েছে। 'শুভদৃষ্টি' গল্পটি একটা ছোট স্টেশনের একটি শীতের রাতের বর্ণনা দিয়ে শুরু। গল্পের পরিসমাপ্তিতে দেখানো হয়েছে যে গল্পটি শুনে গল্পের নায়ক রাতের সময়টা কাটিয়েছিল দিনের আলোতে সেই গল্পই একটি বাস্তব কল্পনা হিসেবে তার কাছে মনে হল সেটাই বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে। 'স্বপ্ন লব্ধ কাহিনী' গল্পটিতে লেখক পূজা সংখ্যায় লেখা দেবার জন্য লেখকদের কি অসহনীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় এই ঘটনা দিয়েই গল্পটির আরম্ভ দেখিয়েছেন এবং গল্পের সমাপ্তিতে দেখিয়েছেন তার স্বপ্নলব্ধ অলৌকিক কাহিনী তার সাহিত্যের মূলধন হিসেবে চিরকাল কিভাবে অমলিন হয়ে রইল। মহামতি রাম ফাঁসুড়ে বাংলার কোন্ অঞ্চলে জন্মেছিলেন সেই মতান্তর নিয়েই 'মহামতি রাম ফাঁসুড়ে' গল্পটির শুরু। গল্পের পরিসমাপ্তিতে লেখক রাম ফাঁসুড়েকে মহিমান্বিত করে ঘরে ঘরে তার মতো লোকের আবির্ভাব হোক এ প্রার্থনা করে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। কোলকাতা শহরে বসে ভূতকে অবিশ্বাস করলেও গ্রামীণ এলাকার লোকেরা এমনকি শহরের উচ্চশিক্ষিত লোক যে ভূতকে বিশ্বাস করে এই বর্ণনা দিয়ে 'সিন্দুক' গল্পটির শুরু। গল্পের প্রধান চরিত্র র-বাবুর সিন্দুকের অবিশ্বাস্য কাহিনী বর্ণিত। তার আট-দশ জন বন্ধু চাঁপাডাঙ্গার গ্রামে গিয়ে বিশ্বাসভাজন হয়েছে গল্প শেষে তা দেখাঁনো হয়েছে। 'কপালকুন্ডলার দেশে' গল্পটিতে নবকুমারের মতো লেখক একদিন রসুলপুরের মোহনায় এসে কিভাবে উপস্থিত হয়েছেন সে কাহিনী দিয়েই গল্পটি আরম্ভ হয়েছে। গল্পের শেষে লেখক মোহনা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় পথে দেখা ভদ্রলোকের কাছে তার বিগত রাত্রি কোথায় অতিবাহিত হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলতে না পারায় একটা দুর্ভেদ্য রহস্য প্রকাশে গল্পটির যবনিকাপাত করা হয়েছে। 'চিলারায়ের গড়' গল্পে লেখক জিওলজিক্যাল সার্ভে বিভাগের অফিসার বন্ধুদের সাথে কোচবিহারে এসে চিলারায়ের গড় রহস্যের সমাধানসূত্র প্রকাশের প্রয়াসের মধ্য দিয়েই কাহিনীর সূত্রপাত। চিলা রায়ের কামানের গর্জনে গল্পটির শেষ হয়েছে। 'নিশীথিনী' গল্পে সিংভূম জেলার আদিম পাহাড় ও অরণ্যের প্রাকৃতিক পরিবেশের অনবদ্য রূপজালের মাধ্যমে কালোপাখি পাওয়ার মধ্য দিয়ে মৃত্যুরূপী 'কালোপাখি' গল্পটির শুরু। মিনুর মৃত্যুর পর কালোপাখির অন্তর্ধানের রহস্যের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন মৃত্যু আজও রহস্যে আবৃত তা কাহিনী অংশে দেখিয়ে গল্পটি শেষ হয়েছে। 'তান্ত্রিক' গল্পটি ভবঘুরে জীবনযাত্রায় তান্ত্রিক রূপ ধারণের মধ্য দিয়ে কাহিনীর শুরু। ভবঘুরে তান্ত্রিক কিভাবে তার তান্ত্রিক জীবনের পরিবর্তে পুনরায় গৃহী জীবনে ফিরে এলেন 'তান্ত্রিক' গল্পের শেষাংশে তা দেখানো হয়েছে।

চিত্রগুপ্ত ও ব্রহ্মার কথোপকথন দিয়ে 'নহুশের অতৃপ্তি' গল্পটি শুরু। মন্নুসিং রূপী বাস কন্ডাকটরের অতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশে গল্পটি শেষ হয়েছে। গা ছমছম করা ভৌতিক পরিবেশের চিত্র বর্ণনা প্রকাশের মাধ্যমে 'অশরীরী' গল্পটি শুরু হয়েছে। লেখক কিভাবে অশরীরীর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কাহিনী শেষ হয়েছে। 'কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূলকারণ' গল্পের শুরু দ্রৌপদী ও ভানুমতীর দাসীদ্বয়ের বাদানুবাদ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মুল কারণ রূপে চিহ্নিত হয়েছে। গল্পের শেষে দেখানো হয়েছে দুর্যোধনের অনমনীয় মনোভাব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কারণ হলেও এই যুদ্ধের অন্তর্নিহিত কারণ ছিল দ্রৌপদীর যুদ্ধাভিলাষ। যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে যা প্রমাণ করা যায় না সেই বিষয়ের ওপরই আলোকপাত করা হয়েছে 'স্বপ্নাদ্য কাহিনী' গল্পের শুরুতে। গল্প শেষে অরিন্দম তার বন্ধু যতীনের কাছে চিঠির মাধ্যমে জানতে চেয়েছে বিদেহী সত্তা অপর দেহকে প্রভাবিত করে কোন মাধ্যমে। স্বামীকে পত্র দানের মধ্য দিয়েই 'সতীন' গল্পটি শুরু। রেলগাড়িতে রিজার্ভেশন বার্থ পাওয়ার সুবিধা অসুবিধা নিয়েই 'রজ্জুতে সর্প' গল্পটির আরম্ভ। লেখক তিনজন ব্যক্তিকে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক হিসেবে মনে করার ভ্রম সংশোধনের মাধ্যমে 'রজ্জুতে সর্প' গল্পটির কাহিনীর পরিসমাপ্তি হয়েছে। পুরন্দরের বই কেনার বিলাসিতার কাহিনী দিয়েই 'পুরন্দরের পুঁথি' গল্পটি শুরু। গল্প শেষে পুরন্দর দেখল রায় মহাশয়ের যে পুঁথিখানির জন্য বীভৎস মুখ দর্শন করত সেই পুঁথিখানি বিমান ডাকে পাঠিয়ে দেওয়ার পর তারা কিভাবে এই স্বপ্নদর্শন থেকে মুক্তি পেলেন তা দিয়েই গল্পটি শেষ হয়েছে। পূজোর ছুটিতে স্বাস্থ্যকর শহরে যাওয়া ও বাসার সন্ধানের মাধ্যমেই 'পাশের বাড়ি' গল্পটি শেষ হয়েছে। 'বাজীকরণ' গল্পে একটি শিশু কিভাবে একটি গাধাকে ঘোড়া বানিয়ে দিল তা দিয়েই গল্পটির শুরু। বৈজু তার ভূতপূর্ব গাধা যে কিনা বর্তমানে বিরল শ্রেণির অশ্ব হিসেবে পরিচিত সে কেনো প্রভুর দিকে একবারও ফিরে তাকায়নি এই ঘটনা প্রকাশে গল্পটির শেষ হয়েছে। 'খেলনা' গল্পে শরৎচন্দ্র ভূতের অস্তিত্ব বিষয়ক গল্প বলার ভঙ্গির উপরেই জোর দিয়েছেন তা দিয়েই গল্পটি শুরু। 'দ্বিতীয় পক্ষ' গল্পটি নববধূ নীলিমার ভূতদর্শনের মধ্য দিয়ে শুরু। গল্প শেষে নীলিমা তার মৃত সতীন শ্রীলেখার ফটোগ্রাফখানা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এর চরম পরিণতি টানা হয়েছে। 'গন্ডার' গল্পটিতে খড়্গ নাসা নামে এক গন্ডারের চামড়া গন্ডারদের মত শক্তিশালী নয় কেন এ দিয়েই গল্পের শুরু। গল্প শেষে গন্ডারের চামড়ার কি দাম তা দেখানো হয়েছে। 'ব্রহ্মার হাসি' গল্পে ভুলু কিভাবে স্বর্গে গেল সে ঘটনা নিয়ে গল্পের সূত্রপাত। গল্প শেষে হাসির মহিমার কথা বলা হয়েছে।

বিনুনীর জীবন কাহিনী দিয়ে প্রমথনাথের 'চেতাবনী' গল্পটি শুরু। শ্রীদাম ও বিনুনীর বিয়ের ঘটনার মধ্য দিয়ে চেতাবনী গল্পটি শেষ হয়েছে। 'ঘোগ' গল্পটি বাঘ ও ঘোগের মধ্যে কে বড় এই তত্ত্ব দিয়ে শুরু হয়েছে। ঘোগের থানায় প্রবেশের মধ্য দিয়ে এবং তার বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে গল্পটি শেষ হয়েছে। 'অথ কৃষ্ণার্জুন সংবাদ' গল্পটি অভিনব কৃষ্ণার্জুন সংবাদ দিয়ে লেখক কাহিনী উপস্থাপন করেছেন। নব অর্জুন কিভাবে

শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় চোরাবাজারে প্রবেশ করে ব্রিজের উন্নতি ঘটায় গল্পের শেষে তাই দেখানো হয়েছে। রাজা সকল শর্ম্মা নামে একজন ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে তার রাজ্যে একটি উন্মাদাগার তৈরি করতে আগ্রহী এই প্রস্তাব দিয়ে 'লবঙ্গীয় উন্মাদাগার' গল্পটি শুরু হয়েছে। পাগলা গারদ তৈরি করতে গিয়ে সকল শর্ম্মা কি ভাবে রাজা ও অমাত্যবর্গের কাছে পাগল হিসেবে পরিচিত হল এবং নিজের জীবন দিল এই ঘটনা দিয়ে গল্পটি শেষ করা হয়েছে। এক টুকরো সাবান মানুষের জীবনে কি ব্যাপক পরিবর্তন আনতে পারে সে ঘটনা দিয়েই 'সাবানের টুকরো' গল্পটি শুরু করা হয়েছে। এক টুকরো সাবানের শুভ্র জ্যোতি কিভাবে কাহিনীর গতি পরিবর্তন করেছিল এবং গল্প নায়কের ভাগ্যে হীরকের উজ্জ্বল দ্যুতি টেনেছিল সেখানেই গল্পটি শেষ হয়েছে। দুর্যোধন ও দুঃশাসনের কথোপকথনে 'দুঃশাসনের শাস্ত্রী' গল্পটি শুরু। বারাঙ্গনাদের দ্বারা সমাজের ভদ্রমহিলারা কিভাবে রক্ষা পেলেন এবং কেন বারাঙ্গনাদেরই অপমানিত করা হল এই ঘটনা প্রকাশের মাধ্যমে গল্পের ছেদ টানা হয়েছে। ভৌতিক ভীতির কাহিনী দিয়ে 'মানুষের' গল্পটির সূত্রপাত হয়েছে। বাঙালি ভূতেরা বাঙালিদের ভয় করে বিশেষত ভূত শিশুরা বাঙালি ভূতের কাহিনী শুনলে ঘুমিয়ে পড়ে সে কাহিনী দিয়েই গল্পটি শেষ হয়েছে। আকন্দপুর ও মুকুন্দপুর যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমান প্রধান গ্রামের কাহিনী দিয়েই 'শিখ' গল্পটির প্রারম্ভিক উপস্থাপনা করা হয়েছে। মুকুন্দপুরের গ্রামের এক হারিয়ে যাওয়া বলিষ্ঠ যুবক যে নাকি শিখ জাতিদের মতো দেখতে তাকে খোঁজার মধ্য দিয়ে গল্পটি শেষ হয়েছে।

গাধার আত্মকথা দিয়ে লেখক 'গাধার আত্মকথা' গল্পটি শুরু করেছেন। একজন সংবাদপত্রের সম্পাদক, একজন রাজনৈতিক নেতা, তৃতীয়জন সাহিত্যিক ও একজন শিক্ষক এই চার গাধার জয়ধ্বনি দিয়েই গাধার আত্মকথা শেষ হয়েছে। হরি নামে একটি বুড়ো চাকরের জীবন কাহিনী দিয়ে 'রত্নাকর' গল্পটি শুরু। দুঃখের অভিজ্ঞতায় রত্নাকর যেমন বাল্মীকি হয়েছিল হরি ডাকাত কিভাবে হরি সাধু হল এই ঘটনা প্রকাশে গল্পটির ছেদ টানা হয়েছে। বিকটজঙ্গা নামে এক বাঘের কাহিনী দিয়ে 'অধ্যাপক রমাপতি বাঘ' শুরু করা হয়েছে। অধ্যাপক বাঘ কিভাবে সন্ন্যাসীর ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত পান করতে লাগল তা দিয়েই গল্পটির শেষ। দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিনীর অসন্তোষের ফলে গৃহকর্তার কি কি অসুবিধা হতে পারে তা দিয়েই 'শিবুর শিক্ষানবিশী' গল্পটির শুরু। শিবুর দ্বারা তার দলের গোপন খবর ফাঁসের ঘটনা দিয়েই গল্পটির শেষ করা হয়েছে। 'অদৃষ্ট সুখী' গল্পে এক অন্ধ ব্যক্তির জীবনের সুখ দুঃখের কাহিনীর বর্ণনায় গল্পটি শুরু। এই গল্পের পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে অদৃষ্ট সুখীর সুখ সন্ধানের মাধ্যমে। এক সন্ন্যাসীর পশুপতিনাথ দর্শনের কাহিনীর পরিবেশনে 'গুহামুখ' গল্পটি শুরু। সন্ন্যাস কি জিনিস তা বর্ণনার মাধ্যমে গল্পটির কাহিনী শেষ হয়েছে। প্রমথনাথ বিশী 'বিপত্নীক' গল্পে ঘুমের চমকপ্রদ বর্ণনা দিয়ে গল্পটি আরম্ভ করেছেন। সারারাত ট্রেনে কাটানোর পর সকালে এক কাপ চা পানের ইচ্ছা প্রকাশে বিপত্নীক গল্পটি শেষ হয়েছে। 'এ্যাক্সিডেন্ট' গল্পটি নায়কের ট্যাক্সিতে আরোহন দিয়ে শুরু। গল্প শেষে গাড়িটি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলেও আরোহী কিভাবে টংফুল্ল হয়ে উঠলেন

এরূপ অভিব্যক্তি দিয়ে 'চারজন মানুষ ও একখানা তক্তপোষ' গল্পটির শুরু। গল্প শেষে তিনজন মেঝেতে কিভাবে সুখনিদ্রায় মগ্ন এই ঘটনা দেখানো হয়েছে। বিশ্বকর্মার শিল্প কাহিনী নিয়ে 'একটি ঠোটের ইতিহাস' গল্পটি শুরু। বিধাতা পুরুষ যে নিরপেক্ষ বিচার করেন কাহিনীর শেষাংশে তা বর্ণিত হয়েছে। 'প্র.-না.-বি র সঙ্গে কথোপকথন' গল্পটি প্র. ন. বি-র সাথে আলাপ আলোচনা দিয়ে আরম্ভ। গল্প শেষে প্র. না. বি-র ভ্রান্ত ধারণা উপনীত হয়েছে। 'সত্য মিথ্যা কথা' গল্পটি কোনো রেডিও স্টেশনের ব্রডকাস্টিং রুমের বর্ণনা দিয়ে শুরু। ডাক্তার ও পুলিন বাবুর কথোপকথনের মাধ্যমে গল্পটি শেষ হয়েছে। দেবরাজ ইন্দ্র ও মহাদেবের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে 'নতুন বজ্র' গল্পটির সূত্রপাত। ইন্দ্র সম্পাদকের হাড়ে নতুন বজ্র তৈরি করে দৈত্যদের ধ্বংস করে পুনরায় স্বর্গের রাজা হলেন এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সম্পাদকের মূর্তি স্বর্গের এক কোণে স্থাপন করেন এর মধ্য দিয়েই গল্পের ইতি টানা হয়েছে। রজতরঞ্জনের জীবনে বিপ্লবে আগমন দিয়ে 'টেনিস কোর্টের' কাণ্ড গল্পটির শুভারম্ভ হয়েছে। টেনিস কোর্টের পোশাক পরিধানে রজতরঞ্জনের ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছিল যা রেবা রায়কে মুগ্ধ করে তা দিয়েই গল্পটির সমাপ্তি টানা হয়েছে। 'কল্কি' গল্পের শুরুতেই দেখানো হয়েছে সৃষ্টির শুরুতে বিশ্ব এবং বিধাতা কিভাবে শূন্যতার মধ্যে অবস্থান করেছিলেন। গল্পের শেষে দেখানো হয়েছে মানুষ কিভাবে শয়তানের বুদ্ধি নিয়ে পৃথিবীতে শয়তানকে এনেছে সে ঘটনা।

'প্র. না. বি-র সঙ্গে ইন্টারভিউ' গল্পে প্র. না. বি. যে একজন শিকারি সে বিষয় বিবৃত করবার ঘটনা দিয়ে গল্পটি শুরু। গল্প শেষে লেখক তার দুই আমেরিকান বন্ধু প্র. না. বি. সে লেখক, পাগল না বিদূষক এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করতে পারার পরিচয় দিয়ে গল্পটি শেষ করা হয়েছে। প্র. না. বি-র ইংলন্ডকে স্বাধীনতা দানের খসড়া রচনার মাধ্যমে 'ইংল্যান্ডকে স্বাধীনতা দানের চেষ্টা' গল্পটি শুরু। প্র. না. বি-র রচনায় ইংলন্ডের শাসনতান্ত্রিক স্বাধীনতা দানের প্রচেষ্টার মাধ্যমে গল্পের শেষ হয়েছে। 'মাত্রাজ্ঞান' গল্পে লেখক একজন চীন দেশীয় ভদ্র লোকের সঙ্গে প্র. না. বি-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে যান তা দিয়েই গল্পটি শুরু। লেখক স্বদেশীয় প্রাচুর্যের মর্যাদা রক্ষা করবার সতর্কবাণী দিয়ে গল্পটি শেষ করেছেন। 'ন-ন-লৌ-বি-লি' ছোটগল্পে একটি বিজ্ঞানী দেবলোকে কিভাবে আলোড়ন ঘটিয়েছে সেই বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছে। মন্দাকিনীর হাতে খিচুড়ি খেয়ে সকলের ভালো ঘুম হয়েছে এই দিয়েই গল্প শেষ করা হয়েছে। 'যন্ত্রের বিদ্রোহ' গল্পে যন্ত্রগুলো অর্থাৎ হাওড়া স্টেশনের ইঞ্জিনগুলো হঠাৎ ক্ষেপে ওঠার ঘটনায় গল্পটির আরম্ভ। গল্প শেষে দেখানো হয়েছে যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াও মানুষ সুখ শান্তিতে বসবাস করতে পারে। 'ঋণজাতক' গল্পে মহারাজ বিম্বিসারের আমন্ত্রণে ভগবান বুদ্ধের শ্রাবস্তীপুরের আগমনের ঘটনায় কাহিনী শুরু। ভগবান বুদ্ধ কিভাবে গৌতমীকে বাস্তবের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন এই ঘটনার বর্ণনায় গল্পের সমাপ্তি হয়েছে। 'চিত্রগুপ্তের রিপোর্ট' গল্পে ব্রহ্মার কানে গুজব ছড়ানোর ঘটনা দিয়ে গল্পের আরম্ভ এবং কে বা কারা তার পকেট মেরেছিল এই ঘটনা প্রকাশে গল্পটির শেষ। সিন্ধবাদের অষ্টম সমুদ্রযাত্রার কাহিনী দিয়ে 'সিন্ধবাদের অষ্টম সমুদ্র যাত্রা' গল্পের

শুরু। গল্প শেষে দেখানো হয়েছে মেয়েদের সমবেতভাবে দুঃখ প্রকাশ। 'নর শার্দূল সংবাদ' গল্পে লেখক কমলাকান্তের মতো আফিং-এর নেশা না করলেও এই অদ্ভুত কাহিনী কিভাবে ঘটল তা দিয়েই কাহিনীর সূত্রপাত। ব্যাঘ্র কর্তৃক মানুষের আঘাত প্রাপ্তির মধ্য দিয়েই গল্পের শেষ হয়েছে। রাজকুমার সিদ্ধার্থের সংসার ত্যাগের কাহিনী দিয়েই 'নির্বাণ' গল্পটির শুরু। গল্প শেষে দেখানো হয়েছে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করে নাম ভাঁড়িয়ে দক্ষিণ অঞ্চলের সিনেমার অভিনেতা হয়েছেন। রানুর সঙ্গে রজত রায়ের বিবাহের বাক্দানের মধ্য দিয়েই 'বাগদত্তা' গল্পটি শুরু। রজতের বাঘ শিকারের রহস্য রানুর কাছে প্রকাশিত হওয়ার মধ্য দিয়েই গল্পটির সমাপ্তি। গ্রামের একমাত্র ঢোলক বাদক নগেন হাঁড়ির অবিরাম ঢোল বাজানোর মধ্য দিয়ে 'নগেন হাঁড়ির ঢোল' গল্পটির শুরু। নগেন ঢুলির চিরতরে ঢোল বাজানোর পরিসমাপ্তি দিয়ে গল্পের শেষ হয়েছে। মৃত্যু রহস্যের জটিলতা দিয়েই 'অশরীরী' গল্পটি শুরু। গল্প শেষে দেখানো হয়েছে যদি কোনো ব্যক্তি রসিক বলে খ্যাতি লাভ করে তাহলে তার দুঃখ কেউ অনুভব করতে চায় না। 'কীটাণুতত্ত্ব' গল্পে লেখকের স্বর্গে গমনের কাহিনী দিয়ে শুরু। কীটাণুতত্ত্ব গল্পের শেষে দেখানো হয়েছে যে ক্ষুদ্র কীটাণুদেরও বিশ্বে অস্তিত্ব রয়েছে। যুদ্ধের সময় গাড়ির অনিয়মের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করে 'উল্টাগাড়ি' গল্পটি শুরু। রাজকন্যা মতীর ঐশ্বর্যের ছটা ও পর্বত কন্যা উমার নিরলঙ্কার সৌন্দর্য প্রকাশে গল্পের পরিসমাপ্তি হয়েছে। বোর্ডিং স্কুলের মেট্রন মাধবী মাসির কাহিনী দিয়ে 'মাধবী মাসী' গল্পটি শুরু। মাধবী মাসি তার যৌবনকে কোথায় ফেলে এসেছেন সেই হারানো যৌবনের স্মৃতি দিয়ে এই গল্পটির শেষ হয়েছে।

'বাঁশ ও কঞ্চি' গল্পটি একটি প্রাচীন তক্তপোষের কাহিনী দিয়ে শুরু। গল্পের শেষে দেখানো হয়েছে সমাজে একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে গোপন কথা বলা যায়। অজিত কুকুরের ছানাটি বাড়িতে নিয়ে আসার পরে গৃহপালিত বিড়ালের মনস্তত্ত্বের যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল তা 'কুকুর বিড়ালের কান্ড' গল্পের সূচনায় আছে। গল্পের শেষে সুরমার বিড়ালের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছে। 'সেই শিশুটি' গল্পের শুরুতেই দেখানো হয়েছে কৃষ্ণদয়াল বাবুর মনস্তাত্ত্বিক অস্থিরতা। গোরাকে পাদ্রীর কাছে ফেরত না দিয়ে আনন্দময়ী একরকম জোর করে নিজের কোলে টেনে নিলেন এই ঘটনা বর্ণনায় গল্পটির শেষ। 'জেমি গ্রীনের আত্মকথা'র শুরুতে আছে একটি মনোরম ও চিত্তাকর্ষক গল্প। জেমি গ্রীন মৃত্যুকালে মহম্মদ আলি খাঁ প্রদত্ত যাদু আংটিটি তার পুত্রকে কেন দিয়ে যান এই ঘটনা প্রকাশে গল্পটি শেষ হয়েছে। যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালের ফৌজি বাহিনীর বন্দুকের তীব্র আওয়াজের সঙ্গে কোকিলের ডাকের সম্পর্ক স্থাপনে 'কোকিল' গল্পটির শুরু। গল্প শেষে বিয়ুস তার স্ত্রীর লেদার কেসটি পাওয়ার ঘটনা এবং কোকিলের কুহু কুহু ধ্বনিতে গল্পের শেষ। জেনারেল হ্যাবলকের কানপুর পুনরুদ্ধারের কাহিনী দিয়ে 'ছিন্ন দলিল' গল্পটির শুরু। 'ছিন্ন দলিল' গল্পের শেষে আমরা দেখতে পাই মুখুজ্জেমশাই এর তীব্র মানসিক যন্ত্রণা। গুলাপ সিং স্বগ্রাম কানপুরে ফিরে আসার ঘটনা দিয়ে 'গুলাব সিং এর পিস্তল' গল্পটি শুরু। গুলাপ সিং এর পিস্তলের দ্বারা কিভাবে সাহেবের পুত্র মারা গেল এই প্রশ্ন

দিয়ে গুলাপ সিং এর পিস্তল গল্পটি শেষ হয়েছে। 'ছায়া বাহিনী' গল্পটি ১৮৫৭ সালের মে মাসে সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা দিয়ে শুরু। মোল্লা কি পাথরের চমকপ্রদ শক্তি প্রকাশের কাহিনী দিয়েই এই গল্পটির সমাপ্তি টানা হয়েছে। মিসেস অর ও মা দলিনের কথোপকথনের মাধ্যমে 'মড' গল্পটি শুরু। ওয়াজেদ আলী তার যাবতীয় দুঃখ ভুলে দূরে একটি বৃক্ষের নীচে শালিক পাখিদের ঝগড়ার কৌতুক অনুভব প্রকাশে গল্পের যবনিকা নেমে এসেছে। 'রুথ' গল্পটি লেফটেনান্ট রবার্কস এর সঙ্গে একটি যুবকের কথোপকথন দিয়ে শুরু। গল্প শেষে দেখানো হয়েছে একদল ফিরিঙ্গি রমণীকে নিয়ে মনসুর গ্রামে ফিরে এলে তাদের কি দুর্দশা হয়েছিল তার বর্ণনা আছে। 'নানাসাহেব' গল্পে সিপাহী বিদ্রোহের শেষে এই বিদ্রোহের প্রধান নেতা নানাসাহেবের ধরা না পড়ার কাহিনী দিয়ে গল্পটি শুরু। গল্প শেষে আজিমুল্লা খাঁ ও জুবেদী বিবির কাছে কিভাবে নিজের পরিচয় প্রদান করলেন তা দেখানো হয়েছে। 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পটি নেপালের দক্ষিণাঞ্চলে ভারত সীমান্তের কাছে একটি ছোট্টগ্রামের কাহিনী দিয়ে শুরু। কাহিনী শেষে নানাসাহেব স্বহস্তে তার পত্নীকে কিভাবে হত্যা করলেন তা দেখানো হয়েছে। 'রক্তের জের' গল্পটি ইতিহাস রচনার কাহিনী দিয়ে শুরু করা হয়েছে। নানাসাহেবের কাহিনী সত্য কি মিথ্যা এই ভাবনা প্রকাশে গল্পটি শেষ হয়েছে। 'অভিশাপ' গল্পটি প্রকৃত নানাসাহেব কে এই প্রশ্ন দিয়েই গল্পটির শুরু। নানা সাহেবের বিষণ্ণতা ও জগৎ সংসারের প্রতি উদাসীনতার কাহিনী দিয়ে গল্পের যবনিকা নেমে এসেছে।

বৃদ্ধ ঔরঙ্গজেবের ক্লান্ত ও মুমূর্ষু চিত্র অবস্থার বর্ণনায় 'রাজা কি রাখাল' গল্পটি শুরু। গল্পের শেষে বাদশাহ আলমগীর এক বৃদ্ধার কাছ থেকে কিভাবে চরম সত্যের সন্ধান পেলেন অর্থাৎ বাঘ ভাল্লুকের চেয়েও নবাব বাদশাহের ঘোড়সওয়ার অনেক বেশি ভয়ঙ্কর এই উক্তি দিয়ে কাহিনী শেষ হয়েছে। 'পরী' গল্পের শুরুতেই মাংস রান্নার ম-ম গন্ধের কথা বলা হয়েছে। বাদশার হারেমের উপবাসী শাহজাদিরা। ক্ষুধার তাড়নায় তৈরি মাংস কিভাবে চুরি করে নিয়ে গেল এবং তাদেরকে পরী মনে করে ছেলের দলের তাকিয়ে থাকার দৃশ্য দিয়েই কাহিনীর শেষ। 'কোতলে আম' গল্পে নূরবানু কিভাবে চাঁদনি চকের দৃশ্য ছাদে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন তা দিয়েই গল্পটির আরম্ভ। নূরবানু ও নাদিরশার কথোপকথনে গল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। লালাকেল্লার এক অন্ধকার কারাকক্ষে অন্ধ ফারুকশিয়ারের বন্দী জীবনযাত্রার কাহিনী প্রকাশে গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে। গোয়ালিয়ারের নুরবাদ গ্রামের আগম-ই-গন্না বেগমের বাবার করুণ কাহিনী প্রকাশে 'আগম-ই-গন্না বেগম' গল্পের শুরু এবং এক পাখির কর্কশ শব্দ প্রকাশের মাধ্যমে এই গল্পটির পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে। 'বেগম শমরুর তোষাখানা' গল্পটি বেগম শমরুর একাকী বাগান ভ্রমণের বৃত্তান্ত দিয়ে শুরু হয়েছে। গল্প শেষে দেখানো হয়েছে এক সময়ে যে স্থানে মহানগর ছিল সন্ধ্যাকালেই সেখানে দেখা গেল জনসমুদ্র। সেকেন্দর শার এশিয়া মাইনর অতিক্রম করে হিন্দুস্থানে প্রবেশের ঘটনায় 'মহালগ্ন' গল্পটির শুরু। সেকেন্দর শার ঘোড়া কিভাবে এক গোপন রাস্তা খুঁজে পেল সে কাহিনী দিয়েই গল্পটির ইতি টানা হয়েছে। 'অসমাপ্ত কাব্য' গল্পটি হূণ বিজয়ী যুবরাজ কুমার গুপ্তের সঙ্গে পিতা বিক্রমাদিত্যের সাক্ষাৎকারের ঘটনা দিয়ে শুরু হয়েছে। গল্প শেষ

হয়েছে কালিদাসের নির্বাসন দিয়ে। কাশ্মীরের শ্রীনগর শহরের চকে প্রাতঃকালের প্রাত্যহিক বাজারের কাহিনী দিয়েই 'ধনে পাতা' গল্পটি শুরু। গল্প শেষে অনশনরত গৌড়ীয় ছাত্রদের সর্বপ্রকার দাবি দাওয়া কাশ্মীরের রাজা মেনে নিলেও গৌড়ীয় ছাত্রগণ গৌড়ের প্রশংসা ও কাশ্মীরের নিন্দা প্রকাশে স্বদেশের অভিমুখে যাত্রা করে তা দিয়েই কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে। হিন্দুস্থানের বাদশা মহম্মদ শা ইরানি বাদশা নাদিরশা কর্তৃক কিভাবে পরাজিত ও বন্দী হয়েছে তা দিয়েই 'নাদির শার পরাজয়' গল্পটি শুরু। বাদশার পরাজয় ঘটতে পারে এ সহজ সরল সত্যটা বড়ে মিঞা মানতে পারেনি তাই সে মসজিদে গিয়ে আল্লার কাছে এবং পরে বাদশার কাছে জানতে চেয়েছে নাদির শা পরাজিত হয়েছে না বাদশা পরাজিত হয়েছে, এই সংবাদ জানবার আকাঙ্ক্ষায় গল্পটি শেষ হয়েছে। বাদশার পিলখানার হেড মাহুত করিম খাঁ আর তার বিবি করিমনের ঝগড়ার বর্ণনা দিয়ে 'মৌলাবক্স' গল্পটি শুরু। বাদশার পাট হাতি মৌলাবক্স কিভাবে বাদশাহিয়ানা বজায় রাখল সে ঘটনা প্রকাশে গল্পটি শেষ হয়েছে। 'বাহাদুর শার বুলবুলি' গল্পটি বাহাদুর শার প্রিয় বুলবুলির কাহিনী দিয়েই শুরু। গল্পের শেষে দেখানো হয়েছে যে, বাদশা তার শত্রু পক্ষের কামানের গর্জনকে উপেক্ষা করে কিভাবে এক বুলবুল পাখিকে নিয়ে মগ্ন হয়ে রইলেন সে কাহিনীর বর্ণনা।

নীলবর্ণ শৃগাল গল্পগ্রন্থের প্রথম ছোটগল্প 'অবচেতন'। এই গল্পের শুরু হয়েছে এক অত্যাশ্চর্য কাহিনী দিয়ে। গল্পটির শ বাবুর সঙ্গে ডিভিশনাল রেঞ্জার মিস্টার শ্রীবাস্তবের সঙ্গে কথোপকথনে শুরু এবং শেষ হয়েছে বুধন সিং এর চাপা গলার সংলাপে। সংলাপটি হল "সাহাবকো ইধার আনা হাম মানা কর দিয়ে থে।" 'সেকেন্দার শার প্রত্যাবর্তন' গল্পের প্রারম্ভে আমরা দেখি সেকেন্দার শার ভারত ত্যাগের প্রসঙ্গ। সুদীর্ঘ গল্পটির মূল বিষয় ছিল তার ভারত ছাড়ার বিবরণ। গল্পের শেষ হয়েছে পেসেভম্ সার লিখিত গ্রন্থের তথ্য অনুযায়ী সেকেন্দার শার অকস্মাৎ ভারত ত্যাগের বিবরণ দিয়ে। 'সেই সন্ন্যাসীটির কি হইল' ছোট গল্পটির শুরু হয়েছে রাজপুত্র সিদ্ধার্থের এক অভিজ্ঞতার পরিণাম স্বরূপ সংসার ত্যাগের বিবরণ দিয়ে। গল্পটির শেষে সন্ন্যাসীটির দ্বাদশ শূন্য পূরণের আদেশ দিয়ে। 'ভৌতিক চক্ষু' ছোটগল্প শুরু হয়েছে ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ারের জন্ ফস্টারের বালিকা কন্যাকে কেন্দ্র করে ইংল্যাণ্ড তথা ইউরোপের শিক্ষিত সমাজে যে ভয়াবহ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল তার বর্ণনা দিয়ে। গল্পটির শেষ হয়েছে সোফিয়ার প্রাণহীন দেহ তার পিতার কোলে শায়িত হওয়ার ঘটনা প্রকাশে। 'খেলনা' গল্পটির প্রারম্ভে আছে ভূতের গল্প। যে গল্পের রাজা ভূত প্রসঙ্গে বিনয়বাবুকে গল্প বলার অনুরোধ করে। গল্পটি শেষ হয়েছে শ্রাবণ রাত্রির দুর্যোগময়ী ঘনান্ধকারের বিবরণ দিয়ে। 'ফাঁসি গাছ' গল্পে গল্পটি শুরু হয়েছে কিংবদন্তীযুক্ত ফাঁসি গাছের নিখুঁত বর্ণনায়। গল্প শেষে আমরা দেখি মনস্তাত্ত্বিক ও বীর রসের বিবরণ। 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে' গল্পে ৭৪৭ নম্বর আসামী হাজির হ্যায় এই প্রশ্নসূচক কথা দিয়ে গল্প শুরু এবং শেষে চিত্রগুপ্ত চাপরাশিকে জানিয়েছে যে সেদিনকার মত বিচার শেষ নথিপত্রগুলো ভালো করে তুলে রাখতে। 'গোল্ড ইঞ্জেকসন্' গল্পটি শুরু হয়েছে পাশের ঘরে সহধর্মিণীর করুণ আর্তনাদ ধ্বনিতে। গল্প শেষ হয়েছে রোগীর স্থান ত্যাগের ঘটনায়। 'রামায়ণের নূতন ভাষ্য' ছোটগল্পের শুরু অভিরামবাবুর প্রশংসাসূচক বর্ণনা

উপস্থাপনে। গল্প শেষ হয়েছে হনুমানের লেজ ঘোরার ঘটনায়। আলোচ্য গল্প শেষে রামায়ণের দুটি লাইন সংযোজিত হয়েছে। 'যক্ষের প্রত্যাবর্তন' ছোটগল্পের শুরু হয়েছে যুদ্ধের প্রস্তুতি দিয়ে এবং সমাপ্তি ঘটেছে মেঘদূতম্ রচয়িতা কালিদাসের কাব্যের প্রসঙ্গ দিয়ে। 'মহেঞ্জদড়োর পতন' ছোটগল্পের শুরুতে সিন্ধু নদের তীরের বর্ণনাটি তথ্যবহ হয়ে উঠেছে। গল্পের শেষে সর্বত্র এক তরল অন্ধকারের আবহ পরিব্যক্ত হয়েছে। 'ছিন্ন দলিল' ছোটগল্পের শুরু হয়েছে জেনারেল হ্যাবলকের সৈন্যদল কর্তৃক কানপুর পুনরাধিকারের ঘটনা নিয়ে। 'সুতপা' ছোট গল্পটিতে সুতপার রূপ ও গুণের প্রসঙ্গ ও সুতপার বিয়ের প্রসঙ্গ দিয়ে গল্পের শুরু অথচ গল্পের শেষে আমরা দেখি করুণ সুরের মূর্চ্ছনা। রমাকে রক্ষা করতে গিয়ে সে নিজে আত্মঘাতী হয়েছে। 'শকুন্তলা' ছোটগল্পটিতে অতীশ ও মালতীর বিবাহ বাসরের অনবদ্য বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছে। গল্পের শেষে দুই নায়ক নায়িকার শকুন্তলার মতো ভাবনা দিয়েই পরিসমাপ্তি ঘটেছে। 'অতি সাধারণ ঘটনা' ছোট গল্পে একটি বাঁশ নির্মিত বন্ধুর পথ দিয়ে এগিয়ে যাবার চিত্র এবং গল্প শেষে একটি চিঠি উপস্থাপিত হয়েছে।

ঃ মৃত্যু চেতনা ঃ

'গুলাব সিং এর পিস্তল' গল্পে একটি অভিশপ্ত পিস্তলের দ্বারা মৃত্যু রহস্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। গুলাব সিং-এর কাছে একটি পিস্তল ছিল। সেই পিস্তলটি কানপুরের ম্যাজিস্ট্রেট কিনে নিয়েছিলেন। তিনি বিলেত থেকে পার্কার নামে ইংরেজকে চিঠি লিখেছিলেন নিম্নরূপভাবে—"একদিন সন্ধ্যাবেলায় ফিরে দেখি আমার ছোট ছেলে গুলি বিদ্ধ অবস্থায় বাগানে পড়ে আছে পাশে পিস্তলটি।"[৪] তার পুত্রের মৃত্যুতে তিনি শোকাহত হয়ে পড়েছিলেন।

'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পে নানাসাহেব জুবেদীকে হত্যা করতে গিয়ে নিজের স্ত্রীকে ত্রিশূল চালিয়ে হত্যা করলেন। যেমন—"শয়তানী এই নাও বলিয়া সবেগে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ত্রিশূল দন্ড চালনা করিল। ঠিক সেই মুহূর্তে কাশীবাঈ সম্বিত ফিরিয়া পাইল এবং কি কর কি কর বলিয়া অগ্রসর হইয়া গেল। নানার লক্ষ্যভ্রষ্ট ত্রিশূল কাশীবাঈ এর বক্ষ বিদ্ধ করিল।

হতবুদ্ধি নানা ত্রিশূলবিদ্ধ পত্নীর বুকের উপর পড়িয়া চিৎকার করিয়া উঠিল কাকুবাঈ কাকুবাঈ। নানা জুবেদী বিবিকে আয়ত্তের মধ্যে পেয়েও তাকে ধরবার চেষ্টা না করে মৃত পত্নীর পদপ্রান্তে পড়ে রইলেন।"[৫]

'রক্তের জের' গল্পে পিতার কথা রাখতে গিয়ে মজর আলী তার প্রিয় প্রভু মেজর নীলকে গুলি করে হত্যা করে। এমন হত্যাকান্ডে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল সবাই ভেবেছিল মজর আলী উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। বাস্তবে মজর আলী তার রক্তের দাম দিতে গিয়ে এই মৃত্যু ঘটিয়েছে।

'অভিশাপ' গল্পে নানাসাহেব কিভাবে তার পত্নী কাশীবাঈকে স্বহস্তে হত্যা করেছিল লেখক

তার বর্ণনা করেছেন নিম্নলিখিভাবে— " সেদিন শেষ রাতে যখন সে পত্নীর মৃতদেহ স্কন্ধে ধানগড়ের কুটির ত্যাগ করিল, দুধগঙ্গার নির্জন তীরে তাহার দাহ সমাধি করিল, তখন ভাবিয়াছিল আর কি, এখন বাঘ ভাল্লুকের হাতে প্রাণটা গেলেই হয়।"[৬] এখানে আমরা দেখতে পাই বাঘ ও ভাল্লুক যে কাজটা করতে পারেনি সন্ন্যাসী তা করতে পেরেছিল।

খেলাকে ঘিরে মাঠের দর্শক ও খেলোয়াড়দের মধ্যে গোলমাল হয় ও অনেক সময় লোকের মৃত্যু ঘটে এরূপ ঘটনা প্রমথনাথ বিশীর 'লবঙ্গীয় উন্মাদাগার' ছোটগল্পটিতে আছে। এখানে রেফারির মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছে। খেলা চলাকালীন একদল দর্শক মাঠে ঢুকে প্রচন্ড প্রহার করে রেফারিকে হত্যা করে। পরদিন সংবাদপত্রে এই ঘটনাটি প্রকাশিত হয়। রেফারিকে মারতে গিয়ে সেইদিন আরও শতাধিক লোক মারা গিয়েছিল। এই মৃত্যু দৃশ্যগুলি নিদারুণ মর্মান্তিক।

'সাবানের টুকরো' গল্পে আমারা দেখতে পাই হিন্দু-মুসলিমের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কিভাবে সাধারণ মানুষ তার শিকার হয়ে পড়ে তারই দৃশ্য। হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার পরপরেই এক ছাতা মেরামতকারী মুসলমান হিন্দু পল্লীতে আসে তারই মৃত্যু কাহিনীর বর্ণনা আলোচ্য গল্পে দেখানো হয়েছে ঃ

"অমনি চারদিক হইতে থান ইট তাহার মাথায় বর্ষিত হইতে লাগিল। নোয়াখালির সহিত ইট বর্ষণের সম্বন্ধে বুঝিবার আগেই লোকটি পিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তাহার মস্তিষ্কের খানিকটা অংশ ফুটপাতের উপরে পড়িয়া বারকয়েক শিহরিয়া উঠিল। একজন প্রবীণ বলিল, ও জাতই এমন যে মরেও মরে না।"[৭]

'অশরীরী' গল্পটি শুরু হয়েছে পর পর কয়েকটি মৃত্যু দিয়ে "অল্প দিনের মধ্যে পরপর কয়েকটি মৃত্যুতে আমাদের বাড়িতে একটি অনৈসর্গিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হইল। প্রথমে মারা গেল বাড়ির একটি ছোট ছেলে, খেলা করিবার সময় ছাদ হইতে পড়িয়া। সেই ঘটনায় বালকের মাতা এমন অভিভুত হইয়া পড়িল যে, সে শয্যা গ্রহণ করিল। সেই শয্যা আর সে ছাড়িল না মৃত্যু আসিয়া শোকাতুরার সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়া দিল। এই দুটি মৃত্যুর মধ্যে দেড় মাস কালেরও ব্যবধান নয়। তৃতীয় মৃত্যুটি আরও আকস্মিক। তখন বর্ষাকাল। বিদ্যুতের তারে কোথায় কি ত্রুটি হইয়াছিল, কেহ জানিত না। বাড়ির একটি বয়স্ক বালক সুইচ্ টিপিতে গিয়া প্রাণ হারাইল, সেই ঘরটিতে অপর কেহ ছিল না, কেহ তাহাকে সাহায্য করিবার অবকাশও পাইল না। চতুর্থ বা শেষ মৃত্যুটি ঘটিল বাড়ির একটি চাকরের। অনেক দিনের পুরানো চাকর, আমাদের পরিবারের স্বাঙ্গীভূত প্রায় হইয়া গিয়াছে। রাতের বেলায় সুস্থ শরীরে সে শুইয়াছিল, ভোরবেলায় দেখা গেল তাহার দেহ প্রাণহীন।"[৮]

'ডাকিনী' গল্পে মল্লিকার মৃত্যু কাহিনী আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে এই সমাজে নারীর স্থান কোথায়। এই মৃত্যু দৃশ্যটি লেখক অসাধারণ সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। লেখক মল্লিকার মৃত্যু কাহিনীর বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন—"আবার বাতাস উঠিয়াছে, সুপারি নারিকেলের মাথাগুলির কি হায় হায় হাহাকার। দূরের গাছের মাথা, অদূরের গাছের মাথা, নিকটের গাছের মাথা, পায়ের তলাকার গাছের মাথা এবং শেষে মল্লিকার আঁচল বাতাসে

উড়িতে লাগিল। দূরের বাতাস কাছে আসিয়া পড়িয়াছে—আর বিলম্ব নয়। তাঁবুর উচ্চতম প্রান্তে জাদুকরের মেয়েটা অনেকক্ষণ হইল দুলিতেছেন—এবারে লাফাইয়া পড়িবে—আর বিলম্ব নয়...ওর আগেই....

মল্লিকা চিলেকোঠার ছাদে উঠিয়া একবার পৃথিবীটা নিরীক্ষণ করিয়া লইল এবং পরক্ষণেই মাগো রব করিয়া অতি নিম্নে গুড়নদী লক্ষ্য করিয়া ঝাঁপ দিল।"[৯] ডাকিনী অপবাদে মল্লিকার মৃত্যু মর্মান্তিক।

'বেগম শমরুর তোষাখানা' গল্পে আমরা দেখতে পাই প্রেমের ক্ষেত্রে হিংসা মানুষকে কতখানি নিম্নপর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। বেগম শমরু তরুণী জুবেদীকে তার প্রেমের শত্রু ভেবে নির্মমভাবে হত্যা করে। লেখকের বর্ণনায়—"সেই ক্ষীণ আলোয় ভ্যালর দেখতে পায় শূন্য ঘরের রিক্ত মেঝের ওপরে নতজানু হয়ে মাথা নীচু করে মরে পড়ে আছে জুবেদী।"[১০]

'বাল্মীকির পুনর্জন্ম' গল্পে সাহিত্য সম্মেলনে মৃত সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্যে যে শোক প্রস্তাব নেওয়া হয়ে থাকে সেই জাতীয় বর্ণনা আমরা এখানে পাই। যেমন— "দেশের যে যেখানে গত দশ বছরের মধ্যে মরিয়াছিল তাহাদের জন্য শোক প্রকাশ করা হইল।"[১১]

'যমরাজের ছুটি' গল্পে দেখানো হয়েছে পৃথিবীতে যদি মৃত্যু না থাকত তাহলে কি ভয়াবহ অবস্থা দেখা দিত। মৃত্যুহীন পৃথিবীর বৃদ্ধ লোকেরা ভগবানের আশীর্বাদে পুনরায় আনন্দের সঙ্গে মৃত্যুকে ডেকে আনে মর্ত্যধামে। যেমন—"পৃথিবীতে ভয়াবহ মহামারী, মন্বন্তর, ভূকম্পন, বন্যা প্রভৃতি শুরু হইয়াছে। দলে দলে লোক বলিতেছে—আঃ বাঁচিয়া গেলাম পৃথিবী মানবহীন হইতে চলিল। মানুষ মরিয়া বাঁচিল।"[১২]

'শাপমুক্তি' গল্পে দেখানো হয়েছে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক কিভাবে সম্পাদকের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মৃত্যুকে বরণ করেন। এই গল্পে আমরা দেখতে পাই একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক পূজাসংখ্যায় লেখা দেবার জন্য সারারাত ঘুমাতে পারেনি। সকালে স্নানের ঘরে ঢুকেই সাহিত্যিক মহাশয় চিরনিদ্রায় ডুবে গেলেন। এক সাহিত্যিকের এই মৃত্যু বর্তমান সমাজের এক করুণ ছবি লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন।

'শুভদৃষ্টি' গল্পে বিবাহ বাসরে শুভদৃষ্টির সময়ে হঠাৎ আলোগুলো গেল নিভে। আলো নিভে যাবার আগে বর নববধূর মুখের ঘোমটা কেউ সরিয়ে দিলে বর তার মধ্যে পাশের গ্রামের নমিতার মুখ দেখতে পেল। হঠাৎ বাসর ঘরে নূতন বউ অসুস্থ হয়ে মারা গেল। লেখকের লেখনীতে এই রহস্যঘন মৃত্যুদৃশ্য পাঠক মনে আলোড়ন তোলে। "তাদের গ্রামে ঢুকতে গিয়ে সংবাদ পেলাম নমিতার মৃত্যু হয়েছে ঠিক যে সময় কমলার মৃত্যু হয়েছিল সেই সময়েই নমিতা মারা গিয়েছে। তখন মনে হল—শুভদৃষ্টির দেখা আমার চোখে ভুল মাত্র নয়, নমিতা আমাকে দেখা দিতে গিয়েছিল।"[১৩]

'স্বপ্নলব্ধ কাহিনী' গল্পে দেখানো হয়েছে মৃত্যুর পরেও মৃত ব্যক্তির প্রিয়জনের নিকট আগমনের ঘটনা। লেখক এক অজানা স্টেশনে স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে

হঠাৎ একটি স্মৃতিফলক দেখতে পান তার বর্ণনা অনবদ্য নিঁখুত সুন্দরভাবে কাহিনীতে ধরা পড়েছে। যেমন—"আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, চোখ অন্ধকার হইয়া আসিল শ্বেত পাথরে কালো অক্ষরগুলো ধূর্জটির প্রমথকুলের মত চোখে নাচিতে লাগিল—"ইন্দিরা রায় মৃত্যু ২৮ শে অগ্রহায়ণ, ফুলশয্যার রাত্রি।" তাহার পাশের স্তম্ভটিতে লিখিত— "ফণীন্দ্র রায়, মৃত্যু ২৮ শে অগ্রহায়ণ, ফুলশয্যার রাত্রি। লেখকের মনে হল ইন্দিরার মৃত্যুর কাহিনী লোক সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করবার কথা। লেখক লিখেছেন— "হয়তো ইন্দিরা শান্তি পাইল, যখন বাসায় ফিরিলাম, শরতের নৈশ আকাশ ইন্দিরার অশ্রুজলে ছাইয়া গিয়াছে কত অশ্রু নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, ইন্দিরার অশ্রুর ভাস্বরতায় চিরকাল তাহা জ্বলিতে থাকিবে।"[১৪]

'কালোপাখী' গল্পে মৃত্যু রহস্যের এক মনস্তাত্ত্বিক দিক আলোচিত হয়েছে।— "কালোপাখীটার সঙ্গে কোন অজ্ঞেয় সূত্রে নিশ্চয় মিনুর মৃত্যু জড়িত।"[১৫] আবার ঝুমঝুমির মৃত্যুর পর সেই রহস্য জনক কালোপাখীটিকে আর দেখা যায়নি। মানুষের জীবন মৃত্যু রহস্যসূত্রে গ্রথিত। সেই রুদ্ধ রহস্যদ্বারে আঘাত করা ছাড়া মানুষের কিছু নেই এই সত্য গল্পে দেখানো হয়েছে।

'তান্ত্রিক' গল্পে যারা প্রকৃত তান্ত্রিক তারা অপরের মৃত্যুকে ঠেকাতে গিয়ে নিজের ঘরেই মৃত্যুকে ডেকে আনেন। এরকমই একটি মৃত্যু চিত্র এখানে দেখানো হয়েছে। তান্ত্রিক মহানন্দ ঠাকুর যদুনাথ বাবুর বাড়ির শান্তি স্বস্ত্যয়ন করলেন যাতে তারা দীর্ঘজীবী হয়। কিন্তু তিনি গৃহে ফিরে এসে শুনলেন স্বস্ত্যয়নের শেষ রাতে তার স্ত্রী ও পুত্র ওলাউঠায় মারা গেছেন।

'কোতলে আম' গল্পে নাদির শার ভারত আক্রমণের সময় তার সঙ্গীরা যে নারকীয় হত্যালীলা চালিয়েছিল তাতে বহুলোকের মৃত্যু হয়েছিল। লেখকের ভাষায়— "রক্ত পিচ্ছিল পথে আততায়ী পদাতিক ক্ষণে ক্ষণে স্খলিত পদ হতে থাকল, চাঁদনী চকের নহরের জলের ধারা রক্তে স্ফীত হয়ে দুকূল ভাসিয়েছিল।"[১৬] প্রমথনাথের ছোটগল্পের মৃত্যুচেতনা প্রকাশে শিল্পগুণের পরিচয় বহন করে।

ঃ ইতিহাস চেতনা ঃ

প্রমথনাথ তাঁর ছোটগল্পে ভৌগোলিক পটভূমি ও ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপন করে গল্পের সাহিত্যমূল্যকে বাড়িয়ে তুলেছেন। তাঁর ভাষাশৈলীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইতিহাস ও ভূগোল চেতনার অনুষঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। নিম্নে প্রমথনাথের ইতিহাস ও ভূগোল চেতনার কিছু দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল ঃ

কুমার গুপ্ত, স্কন্ধ গুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি রাজাদের মহিমা কীর্তিত হয়েছে।

হূণ বিজয় সংগ্রাম কাহিনী অসমাপ্ত কাব্য ছোটগল্পে বর্ণিত যা ইতিহাস চেতনার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

ইতিহাসে শেরশাহ ও হুমায়ুনের লড়াই এর প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে প্রমথনাথের ছোটগল্পে।

'তিমিঙ্গিল' গল্পে হিটলার মুসোলিনীর আক্রমণের প্রসঙ্গ এবং ভারতের বৃটিশ শাসনের উল্লেখ আছে যা ইতিহাস চেতনার দৃষ্টান্ত।

হারুন অল রসিদ, আকবর, ধর্মবীর অশোক ও গান্ধিজির চীর পরিধান ইতিহাস চেতনার দৃষ্টান্ত।

ঃ ভূগোল চেতনা ঃ

সুবর্ণরেখা নদী, মাঠ ও পাহাড় ভূগোল চেতনার সাক্ষ্য বহন করে।

'বেগম শমরুর তোষাখানা' গল্পে তামাম হিন্দুস্থানের ভৌগোলিক মানচিত্র দেখানো হয়েছে।

'তুক্' গল্পে বাংলাদেশ, গ্রিস্, ওড়িশা, রোম, দাক্ষিণাত্য, খাজুরাহ, ইলোরা ও এলিফান্টা প্রভৃতি স্থান থেকে আগত শিল্পীদের প্রসঙ্গ এসেছে।

'পঞ্চম বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস' ছোটগল্পে লন্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, প্যারিস, মস্কো, সাংহাই, টোকিও, কলকাতা ও দিল্লি প্রভৃতি শহরের প্রসঙ্গ এসেছে।

'যার জুড়ি ভারতবর্ষে পাবেনা, এক মধ্য আফ্রিকার অরণ্যে গেলে তার দোসর পাবে।' এখানে ভূগোল চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

কোলকাতা থেকে সাতারামপুর পঞ্চকোট পাহাড় মুরাডি স্টেশন থেকে পঞ্চকোট যাবার পথ নির্দেশ আছে।

'নিশীথিনী' গল্পে সিংভূমের পাহাড়, আদিম অরণ্য ও নরসিংগড়ের ভৌগোলিক বিবরণ উপস্থিত।

'কপালকুন্ডলার দেশে' ছোট গল্পে সুবর্ণরেখা ও রসুলপুর নদী, গিরসিংহের চূড়া, নদী উপত্যকা ও সমুদ্রতীরের বর্ণনা আছে।

'অসমাপ্ত কাব্য' ছোট গল্পে উজ্জয়িনী নগরের ভৌগোলিক বিবরণ আছে।

'মহেঞ্জোদড়োর পতন' গল্পে সিন্ধু নদীর তীরের ভৌগোলিক বিবরণ আছে।

ঃ পুরাণ চেতনা ঃ

প্রমথনাথ বিশী প্রাচীন ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। বিভিন্ন পুরাণ ও শাস্ত্রগ্রন্থের অনুরাগী পাঠক তিনি। তাঁর কথাসাহিত্যে বহুভাবে বহুস্থানে পুরাণের অনুষঙ্গ এসেছ। ভারতীয় পুরাণের উপকরণে পৌরাণিক নাম, পৌরাণিক চরিত্র বিশেষ করে রামায়ণ ও মহাভারতের বহু প্রসঙ্গ তাঁর ছোটগল্পে স্থান পেয়েছে। মিথ কাহিনীকে ছোটগল্পে স্থান দিয়ে পুরাণ অনুরাগী পাঠকের কাছে তিনি একান্ত প্রিয় হতে পেরেছেন। প্রমথনাথ মিথ কাহিনীর যথাযথ উপস্থাপন করেছেন। 'কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূল কারণ' ছোটগল্পে দুর্যোধন, ভানুমতী, দ্রৌপদী, যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র রূপকের আড়ালে গল্পকার তুলে ধরেছেন। গল্পে ইন্দ্রলোক থেকে ব্রহ্মালোকের প্রসঙ্গ এসেছে। 'নূতন বস্ত্র' ছোট গল্পে মহাদেব ও ইন্দ্র এবং 'সিদ্ধান্ত' ছোটগল্পে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের কথা স্থান পেয়েছে।

'উল্টা গাড়ি' ছোট গল্পে মিথের সার্থক ব্যবহার নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ ১) "সুভদ্রা হরণের

সময়ে অর্জুন যেমন বল্গাটি সুভদ্রার হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, আমি তেমনি কল্পনার হাতেই ছাড়িয়া দিয়া উদ্দাম গতিতে মনোরথ ছুটাইয়া চলিয়াছি।"[১৭]

'চিত্রগুপ্তের রিপোর্ট' গল্পে ব্রহ্মা ও চিত্রগুপ্তের অনুষঙ্গ। 'খড়ম' ছোটগল্প থেকে পুরাণ চেতনার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে: " বেচারা শকুন্তলা গালে হাত দিয়ে নিমীলিত চক্ষু হয়ে দুষ্মন্তের কথা ভাবছিল। এমন সময়ে সেখানে সেই তপোবনে অকস্মাৎ দুর্বাসা মুনি এসে উপস্থিত। শকুন্তলার মন তখন দুষ্মন্তের রাজপ্রাসাদের কক্ষে কক্ষে অনুসন্ধান রত। দুর্বাসা ভাবলেন যে শকুন্তলা তাকে অবজ্ঞা করল, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে শাপ দিলেন।"[১৮] গল্পে পুরাণের কচ্ ও দেবযানীর বিদায় অভিশাপ প্রসঙ্গ এসেছে। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মহাদেব, বিষ্ণু ও চন্দ্র প্রভৃতি দেবতাকে রূপকের আড়ালে ব্ল্যাক্‌মেল গল্পে গল্পকার তুলে ধরেছেন।

'বাল্মীকির পুনর্জন্ম' গল্পে বাল্মীকি ও ব্রহ্মার কথোপকথন আছে।

'ছেঁড়া কাঁথা ও লাখ টাকা' ছোট গল্প থেকে পুরাণ চেতনার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল—

" শ্রেষ্ঠ বীর অর্জুন বৃহন্নলার ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকার প্রসঙ্গ, রামচন্দ্রের জীবনের বারো আনাই বল্কল পরিহিত অবস্থার কাহিনী, বংশী বিলাসী কৃষ্ণের বাঁশরী খসিয়া পড়িয়া তাহার হস্তে সুদর্শন চক্র আবিষ্কৃত হইল। সাধনমার্গের শ্রেষ্ঠ পথিক মহাদেব ছিন্নবাস পড়িয়া অন্নপূর্ণার নিকট হাত পাতেন।"[১৯] এখানে অর্জুন, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, মহাদেব ও অন্নপূর্ণার প্রসঙ্গ পুরাণ চেতনার সার্থক দৃষ্টান্ত।

ঃ আয়তন-বিন্যাস ঃ

'চাপাটি ও পদ্ম' গল্প গ্রন্থে—গল্প সংখ্যা ১২ টি। সিপাহী বিদ্রোহের কাহিনী অবলম্বনে লিখিত গল্প গ্রন্থটি শ্রীপ্রতুল চন্দ্র গুপ্তের করকমলে লেখক অর্পণ করেছেন।

'চাপাটি ও পদ্ম' গল্পগ্রন্থে 'সেই শিশুটি' গল্পটিকে লেখক চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমভাগে চার পৃষ্ঠা, দ্বিতীয়ভাগে তিন পৃষ্ঠা, তৃতীয়ভাগে তিন পৃষ্ঠা, চতুর্থভাগে সাত পৃষ্ঠা। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৭।

'জেমি গ্রীনের আত্মকথা' ছোট গল্পটিও চারটি অংশে বিভক্ত। গল্পটির প্রথম পৃষ্ঠায় প্রমথনাথ গল্পের ভূমিকা এক পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। এটি গল্পের প্রথম অংশ। দ্বিতীয় অংশে গল্পটি কথারম্ভ দিয়ে শুরু করেছেন। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা তিন। তৃতীয় অংশে পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩ এবং চতুর্থ অংশে পৃষ্ঠা দুই। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৯।

'কোকিল' গল্পটির আয়তন পূর্ববর্তী দুটি গল্পের তুলনায় কিছুটা ছোট। গল্পটির পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮ (আট)।

'ছিন্ন দলিল' গল্পটিকে দুটি অংশে শুরু থেকে সমাপ্তির অংশ টেনেছেন। প্রথম অংশে ৮ পৃষ্ঠা। দ্বিতীয় অংশে ১০ পৃষ্ঠা। মোট ১৮ পৃষ্ঠার গল্প।

'গুলাব সিংয়ের পিস্তল' গল্পটি তিনটি অংশে লিখিত। গল্পটি আট পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। প্রথম অংশে ও দ্বিতীয় অংশের পৃষ্ঠা সংখ্যা চার, তৃতীয় অংশে ৪ (চার) টি। 'ছায়াবাহিনী' গল্পটি সাত পৃষ্ঠার গল্প। প্রথম অংশটির পৃষ্ঠা সংখ্যা তিন। দ্বিতীয় অংশের পৃষ্ঠা চার। 'মড' গল্পটি

সাতটি অংশে বিভক্ত। পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৬। প্রথম অংশ তিন, দ্বিতীয় এক, তৃতীয় তিন, চতুর্থ দুই, পঞ্চম পাঁচ মোট পৃষ্ঠা - ১৭। 'নানাসাহেব' গল্পটি দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটি আট পৃষ্ঠায়, দ্বিতীয় অংশটি ছয় পৃষ্ঠা। মোট পৃঃ-১৪। 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পটি তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা সাত। তৃতীয় অংশের পৃষ্ঠা চার। মোট ১৮ পৃষ্ঠার গল্প। 'রক্তের জের' গল্পটিতে কোনো ভাগ নেই। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫। 'অভিশাপ' গল্পটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১। প্র.না.বি. অমনোনীত গল্প গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন শ্রীসুমথনাথ ঘোষের করকমলে। গ্রন্থটির গল্প সংখ্যা ১৬ টি। 'জগবন্ধুর মোহমুক্তি' গল্পটির পৃষ্ঠা সংখ্যা দশ। 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' গল্পটি সাত পৃষ্ঠার। পক্ষিরাজ গাধা—চার পৃষ্ঠার গল্প। 'ভগবান কি বিজ্ঞাপন দাতা' পৃষ্ঠা সংখ্যা পাঁচ। 'শাপে বর' পৃষ্ঠা সংখ্যা আট। গল্পটি পাঁচটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে পৃষ্ঠা এক, দ্বিতীয় অংশে দুই, তৃতীয় অংশে দুই, চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কেও দুই। প্রমথনাথ বিশীর 'গল্প পঞ্চাশৎ' গল্প গ্রন্থের 'মহামতি রাম ফাঁসুড়ে' গল্পটি ৬৯ পৃষ্ঠা জুড়ে কাহিনী পল্লবিত হয়েছে। শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা ও সিদ্ধি এই চারটি অংশে বিন্যস্ত ছোট গল্পটির আয়তন উপন্যাসোপম হলেও এটি ছোটগল্প শ্রেণিভুক্ত। গল্পটিতে আমরা লক্ষ্য করি ঐক্যের লক্ষণ। প্রমথনাথের 'ডাকিনী গল্প' গ্রন্থের 'ডাকিনী' গল্পের কাহিনী দানা বেঁধেছে ৩১ পৃঃ জুড়ে। মোট ৬ টি ভাগে বিন্যস্ত 'ডাকিনী' গল্পটি প্রমথনাথের দ্বিতীয় বৃহত্তম ছোট গল্প হিসেবে পরিচিত। 'নীলমণির স্বর্গলাভ' ছোট গল্পটি ১১ পৃষ্ঠা জুড়ে লিখেছেন। 'নীরস-গল্পসঞ্চয়নের' 'ন-ন-নৌ-ব-লী' গল্পটি তিনটি অংশে বিভক্ত। গল্পটির আয়তন মাঝারি মাপের। ১১ পৃষ্ঠার গল্প। 'যন্ত্রের বিদ্রোহ' গল্পটিও তিনটি অংশে বিভক্ত হয়েছে। তার পৃষ্ঠা সংখ্যা পাঁচ। এটিও ছোট আকারের গল্প। চারটি অংশে বিভক্ত 'ঋণ জাতক' গল্পটি পাঁচ পাতা জুড়ে বিস্তার লাভ করেছে। 'চিত্রগুপ্তের রিপোর্ট' এর পৃষ্ঠা সংখ্যা পাঁচ। এটিও অপেক্ষাকৃত ছোট গল্প। 'সিন্ধবাদের অষ্টম সমুদ্র যাত্রা' ছোট গল্পটি তিন ভাগে বিভক্ত। এর পৃঃ সংখ্যা-৯। 'নর-শার্দুল সংবাদ' গল্পটি পাঁচ পৃষ্ঠায় লেখা। 'নির্বাণ' গল্পটি চারটি অংশে বিভক্ত। এর পৃঃ-৮। 'বাঘদত্তা' ছোট গল্পটি পাঁচ পৃষ্ঠার। 'নগেন হাঁড়ির ঢোল' ছোট গল্পটি তিনটি অংশে বিভক্ত। ছোট গল্পটি নয় পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। 'অশরীরী' গল্পটি আয়তনে অত্যন্ত ছোট। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা পাঁচ। 'কীটাণুতত্ত্ব' ছোট গল্পটি পাঁচ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে। 'উল্টাগাড়ি' গল্পটি বারো পৃষ্ঠার। 'মাধবী মাসী' ছোটগল্পটি তিনটি অংশে বিভক্ত। এর পৃষ্ঠা - ৮। 'বাঁশ ও কঞ্চি' গল্পটি ছোট আয়তনের, এর পৃষ্ঠা - ৫। 'কুকুর বিড়ালের কান্ড', ছোটগল্পটি তিনটি অংশে বিভক্ত গল্পটির আয়তন সাত পৃষ্ঠার। 'নীল-বর্ণ-শৃগাল' শ্রীবিমল চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের করকমলে উৎসর্গ করেছেন লেখক। নীল-বর্ণ-শৃগাল গল্পগ্রন্থের 'অবচেতন' ছোটগল্পটি পাঁচটি তারকা চিহ্ন দিয়ে লেখক বিভাগ গুলি তুলে ধরেছেন। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১।

'সেকেন্দরশার প্রত্যাবর্তন' ছোটগল্পটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। আঠারো পৃষ্ঠায় এর কাহিনী বিস্তার লাভ করেছে। 'সেই সন্ন্যাসীটির কি হইল' ছোটগল্পটি ১৫ পৃষ্ঠায় লেখা পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। 'ভৌতিক চক্ষু' ছোট গল্পটি তিনটি উপপরিচ্ছদে বিন্যস্ত, নয়

পৃষ্ঠার ছোট গল্প। 'খেলনা' গল্পটি ছয় পৃষ্ঠার। 'ফাঁসি-গাছ' ছোট গল্পটি পাঁচ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে। 'বিনা টিকিটের যাত্রী' ছোট গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটেছে ১১ পৃষ্ঠায়। 'আয়নাতে' ছোট গল্পটি ১১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে। 'চিলা রায়ের গড়' ১৩ পৃষ্ঠায় লেখা একটি অনবদ্য ছোট গল্প। 'পাশের বাড়ি' গল্পটি ১১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে। 'সাহিত্যে-তেজি-মন্দি' ছোটগল্পটি চারটি স্বল্পায়তন ভাগে বিভক্ত। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছয়। 'সংস্কৃতি' ছোট গল্পটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তকারে লিখিত। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা তিন। 'জামার মাপে মানুষ' পাঁচপৃষ্ঠায় লিখিত ছোটগল্প। 'থার্মোমিটার' ছোটগল্পটি সংক্ষিপ্ত চার পৃষ্ঠায় লেখা ছোটগল্প। 'রামায়ণের নূতন ভাষ্য' ছোট গল্পের পৃষ্ঠা সংখ্যা পাঁচ। 'রাশিফল' গল্পটিও অত্যন্ত ছোট। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা চার। 'অলংকার' ছোট গল্পটি পাঁচ পৃষ্ঠার ছোট আকারের গল্প। 'অদৃষ্টসুখী' ছোট গল্পটি নয় পৃষ্ঠায় লেখা অসাধারণ সুন্দর একটি কাহিনী।

ঃ বাক্য বিন্যাস ঃ

প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পের বাক্যগুলি বিভিন্ন মাপের ছোট, মাঝারি ও বড় ধরনের। 'আরোগ্য স্নান' ছোটগল্প থেকে একটি বড় বাক্য প্রদত্ত হল ঃ

"দারুণ গ্রীষ্মের দুপুর বেলায় যখন সকলে গায়ের কৃত্রিম আবরণ খুলিয়া ফেলিয়া চামড়াখানি পর্যন্ত খুলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তখন সে তার ঘাড়ের-কাছে-তেলে-মলিন হাতের কাছে সুতা-বাহির-করা প্রাচীন আল্‌পাকার কোট্‌টি গায়ে দিয়ে গম্ভীরভাবে বসিয়া ইংরাজি গ্রামার পড়িত। যদি জিজ্ঞাসা কর এই ব্যবহারের অর্থ কী—তবে প্রবীণ বৈজ্ঞানিকের মতো সে পেন্সিলটি নাড়িয়া উত্তর দিবে যে বাহিরের তাপের সাহিত শরীরের আভ্যন্তরীণ তাপের সমতা না করিয়া চলিলে উৎকট্‌ ব্যাধি-বিশেষ জন্মাইবার আশঙ্কা আছে।"[২০]

বাক্যটির ভাব বা অর্থকে বোঝাতে ও উচ্চারণের সুবিধার্থে বাগ্‌যন্ত্রের বিরামের বিশেষ প্রয়োজন। এখানে একটি কমা, একটি বিস্ময়বোধক চিহ্ন, একটি ড্যাস বা দীর্ঘ যুক্ত চিহ্ন, ছয়টি হাইফেন বা সংযোগ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। বাক্যের শেষে ভাবের পূর্ণতা এসেছে দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদের মাধ্যমে। নিম্নে একটি মাঝারি ধরনের বাক্য প্রদত্ত হলঃ

"নগেন হাঁড়ির ঢোলের অবিরাম বাজনায় গাঁয়ের লোকে বিরক্ত হইলেও এই সব নানা কারণে সকলে চুপ করিয়া ছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন অতি তুচ্ছ কারণে বিবাদ বাধিয়া উঠিল।"[২১]

মাঝারি বাক্যটিতে একটি কমা চিহ্নের পর দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ বসছে।

নিম্নোক্ত সংলাপ দুটিতে ছোট বাক্যের সংখ্যা প্রচুর। সংলাপ দুটি নিম্নে প্রদত্ত হল—

"পুরোহিত। তা হ'লে বলতে হবে, লোকটার শক্তি আছে।

দেবভট্ট। শক্তি না শক্তু! মাথা আর মুন্ডু! ওর পিছনে রয়েছে সেই ডাকিনীর ছায়া।

পুরোহিত। ডাকিনী? কে?

দেবভট্ট। শিলাবতী!

পুরোহিত। এ কি অনার্য উক্তি! আর্যা শিলাবতী মহাকালের প্রধানা দেবদাসী।

দেবভট্ট। দেবদাসী! বলুন দৈত্যদাসী! ডাকিনী, নাগিনী, পাপিনী, তাপিনী! রাজসভা ও রাজদেবালয়ের মধ্যে আপনার গতিবিধি। নগরের লোক ওদের নিয়ে কি বলাবলি করে, তা আপনি জানেন না!”[২২]

এই সংলাপ অংশে বাক্য সংখ্যা কুড়িটি। প্রতিটি বাক্যই ছোট। পাঁচটি কমা, একটি ও পাঁচটি বিস্ময় সূচক বাক্য, দুটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। বাক্যগুলি ছোট ছোট হলেও ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হয়নি। আর একটি সংলাপের দৃষ্টান্ত ঃ”

—এমন বিপদ কেন ঘটিল? বন্যা?

—না।

—অগ্নি?

—না।

—ভূমিকম্প?

—তবে কি শত্রু?

—এবারে ঠিক অনুমান করিয়াছ।

—কিন্তু তাহাদের কি সৈন্য ও অস্ত্র ছিল না?

—ছিল বৈকি।

—তবে?”[২৩]

উপরোক্ত সংলাপ অংশে এগারোটি বাক্য, সাতটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন, চারটি পূর্ণচ্ছেদ এবং প্রতিটি বাক্যের আগে ড্যাস বা দীর্ঘযুক্ত চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। বাক্যগুলি ছোট হলেও ভাবপ্রকাশক সন্দেহ নেই।

ঃ উপমা ঃ

ছোটগল্পে সাহিত্যের উপকরণ হিসাবে উপমার ব্যবহার প্রচলিত। ছোটগল্পে সার্থক উপমা প্রয়োগ প্রসাদগুণের পরিচায়ক। তুলনার আলোকে উপমাগুলিকে অনেক সমালোচক সাহিত্যে একটা দুর্বল লক্ষণ ভেবে মন্তব্য করলেও বিশিষ্ট কথাশিল্পীরা কথা সাহিত্যে উপমার সার্থক ব্যবহার করেছেন। আমরা জানি চরিত্র বিকাশের ক্ষেত্রে, পরিস্থিতি বর্ণনায়, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, লোক জীবনাশ্রয়ী ও পুরাণাশ্রিত উপমার ব্যবহার ছোটগল্পের চমৎকারিত্ব এনে দেয়। নিসর্গাশ্রিত উপমা, প্রাণীবাচক উপমা ও বস্তু বাচক উপমার ব্যবহার বলতে গেলে সব ছোট গল্পকারই সার্থক ভাবে করেছেন। নিম্নে এরূপ কয়েকটি উপমার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল ঃ

‘অসমাপ্ত কাব্যে’ ছোটগল্পে গল্পকার কালিদাসের সঙ্গে সাগরবিস্তৃত হিমালয়ের তুলনা করেছেন। মহাকবি কালিদাসকে উদ্দেশ্য করে উপমাটি শিলাবতীর বক্তব্যে পরিস্ফুট হয়েছে। ‘বিপত্নীক’ ছোটগল্পে ‘ মেঘলা রাতে কুয়াশায় দিক্ ভ্রান্ত নাবিকের মতো’ মুখের ভাব উপমাটি সার্থক। ‘প্র.না.বি-র সঙ্গে ইন্টারভিউ’ ছোটগল্পে “ঝিঁ ঝিঁ ডাকা দুপুরের করুণ কাকলি ভীরু প্রকৃতির সংস্কৃত মিনতির মতো এখানকার তরুলতার স্পর্শ যেন গতি প্রবাহের নিদর্শন।”[২৪]

এরূপ কয়েকটি সার্থক উপমার দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হল।

"এমন সময় অদূরে আম্রকুঞ্জ হইতে কোকিলের ডাক শ্রুত হইল—কু-উ, কু-উ। ঐ ধ্বনি যেন রশ্মি ফেলিয়া নিস্তব্ধতার তলা সন্ধান করিতেছে—কু-উ, কু-উ।"[২৫]

কোকিলের ডাকের সঙ্গে নিস্তব্ধতার অনুষঙ্গ উপজীব্য হয়ে উঠেছে আলোচ্য উপমাটিতে।

"শুভ্রশয্যায় শুভ্রতরা রমণী - যেন রজনীগন্ধার বনে মূর্চ্ছিত জ্যোৎস্না। এই মল্লিকাই কি ডাকিনী?"[২৬]

আলোচ্য কবিতায় মল্লিকার রূপ লাবণ্যের তুলনাটি অনবদ্য।

"বিনুনির কচি কণ্ঠের হাসি, জ্বলন্ত অগ্নি কুন্ডের শিখাসমূহের মধ্যবর্তিনী জানকীর মত।"[২৭]

উপমাটিতে বিনুনির দুঃখের হাসির সঙ্গে সীতার অগ্নি পরীক্ষাকালে জ্বলন্ত অগ্নি শিখার তুলনাটি সার্থক।

"দাড়িমের দানার মতই চোখের জলে শুভ্র রক্তের আভাসে রঙ্গীন দুঃসহ সংবাদ।"[২৮]

আলোচ্য অংশে দুঃসংবাদের সঙ্গে দাড়িমের দানার মতো উপমা প্রয়োগে লেখকের মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়।

"সেই সাবানের শুভ্র কিরণ আমার জীবনাকাশে সৌভাগ্যের শুক্লাশশীর মত উজ্জ্বল হইয়া আছে।"[২৯]

সৌভাগ্যের শুক্লাশশীর সঙ্গে সাবানের শুভ্র কিরণের তুলনাটি অনবদ্য।

"বুকটা বাদশাহি সড়কের মত চওড়া, গর্দান শাহি বুরুজের মত বলিষ্ঠ, হাতদুখানা লালকেল্লার লাহরী দর্জার মত সরল—আর সব শুদ্ধ মানুষটা নকড়্খানার মত উন্নত।"[৩০]

নাসির খাঁর চেহারার বর্ণনা করতে গিয়ে লেখকের উপমাগুলি জীবন্ত হতে পেরেছে।

"বড়মিঞার চোখে পড়ল দূরে জুমা মসজিদের মিনারের চূড়ার সঙ্গে আটকে আছে মেঘ কাটা ঘুড়ির মত মস্ত পূর্ণিমার চাঁদখানা।"[৩১]

মসজিদ মিনারের সঙ্গে পূর্ণিমার চাঁদের উপমাটি অনবদ্য।

"এমন অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে আমি ইতিপূর্বে আর দেখি নাই, যেন ক্ষীর সমুদ্রের চাঁচি। যেমন শুভ্র তেমনি সুকুমার।"[৩২] একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ক্ষীর সমুদ্রের তুলনাটি নিঃসন্দেহে সার্থক।

"মেয়েদের মন জলের মত, অনায়াসে পরস্পরে মিশিয়া যায়। পুরুষেরা যেন জল জমা বরফ, পরস্পরের স্পর্শে ঠোকাঠুকি লাগিয়া কেবলই সংঘাত বাধাইতে থাকে।"[৩৩]

নারী ও পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক বৈপরীত্য বোঝাতে আলোচ্য উপমাটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে।

"দোতালায় উঠিয়া প্রতিমা দেখিতে পাইল, একটি জলচৌকির উপরে সিন্দুর লিপ্ত কি দুইটি বস্তু রাধাকৃষ্ণের মত পরস্পর প্যাঁচ কষিয়া দন্ডায়মান।"[৩৪]

রাধাকৃষ্ণের দাঁড়ানোর সঙ্গে রক্তবর্ণ দুটি বস্তুর তুলনা লেখকের শিল্পসিদ্ধির পরিচায়ক।

ঃ চরিত্র প্রতিনিধি ঃ

প্রমথনাথের ছোটগল্প চরিত্র চিত্রশালা। বিভিন্ন চরিত্র প্রতিনিধি তার গল্পে স্থান পেয়েছে। আমরা তাঁর বিভিন্ন গল্প থেকে শ্রেণি চরিত্র বিশ্লেষণ করছি ঃ

'বেগম শমরুর তোষাখানা' ছোট গল্পে এক জার্মান জেনারেল যার প্রকৃত নাম রাইন হার্ট তিনি ছিলেন একজন জায়গিরদার। এই গল্পে সিপাহশালার চরিত্র জেনারেল টমাস ও ভ্যালর। 'তুক্' ছোট গল্পে মাধুরী নামে একজন গৃহস্থ বধূর চরিত্র আমরা পাই। অন্য দিকে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট ডাক্তার গিরিধারী বক্সী, এম ডি, (ইউ. এস. এ.) মূলত তিনি মানসিক বাতিকগ্রস্থ পাগলামি ও উন্মাদ রোগীদের চিকিৎসা করেন। আলোচ্য গল্পে এই ধরনের এক ধনী জমিদারকে আমরা দেখতে পাই। 'জেনুইন লুনাটিক ছোটগল্পে এক পাগল চরিত্রের প্রতিনিধি ভানু। 'বস্ত্রের বিদ্রোহ' ছোটগল্পে রজক সম্রাট রঞ্জু ধোপার প্রসঙ্গ এছাড়া সৈন্য, অফিসার, কেরানি, ভন্ড, সন্ন্যাসী, পুরুত ঠাকুর, গাঁটকাটা চোর, ছ্যাঁচর প্রভৃতি চরিত্র স্থান পেয়েছে। 'শার্দুল' ছোটগল্পে পাঁঠার মাংসপ্রিয় জোড়াদীঘি গ্রামের সুরেন পোদ্দার এবং জমিদারের গোমস্তা অবিনাশ চরিত্রটি জীবন্ত এবং গ্রামের নরেন চক্রবর্তী প্রাণী তত্ত্বে এম.এ. পাশ করে গবেষণা করছে। এই গবেষক চরিত্র ও পিওন চরিত্র ছোট গল্পটিতে স্থান পেয়েছে। 'ছবি' ছোটগল্পে মাস্টার মশাই ও খ্যাতনামা গ্রন্থকার চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। 'দ্বিতীয় পক্ষ' ছোটগল্পে অন্নদাপ্রসাদের দুই স্ত্রী প্রয়াত শ্রীলেখা এবং দ্বিতীয় স্ত্রী হল নববধূ নীলিমা। 'বাজীকরণ' ছোটগল্পে একটি শিশু চরিত্র মুখ্য স্থান গ্রহণ করেছে। 'পুরন্দরের পুঁথি' ছোটগল্প বই পাগল পুরন্দর চরিত্র। 'শাশুড়ি' ছোট গল্পে শিক্ষয়িত্রী মণিমালা ও অফিসের কর্মচারী অরিন্দম। 'অশরীরী' গল্পে দারোয়ানজি চরিত্র। 'তান্ত্রিক' ছোটগল্পে কলকাতার ভদ্রলোক যদুপতি বাবু এবং রক্তাম্বর রুদ্রাক্ষমালা ও নরকপাল হাতে এবং রক্ত চন্দন তিলক পরিহিত তান্ত্রিক মহানন্দ ঠাকুর। 'কালোপাখী' গল্পে একটি ছোট্ট মেয়ে মিনু। 'রাঘব বোয়াল' গল্পে চোর চরিত্রের প্রতিনিধি হল ওঙ্কারনাথ। চাঁপাডাঙ্গায় নবাবের ফৌজদার মহামতি রামফাঁসুড়ে এক ভন্ড তপস্বীর কাহিনী। 'ইয়াসিন শর্মা অ্যান্ড কোং' ছোটগল্পে হিন্দু ব্যবসায়ী গোপাল টুপি ও চাদর বিক্রেতা। ইয়াসিন ফেজ ও লুঙ্গি বিক্রেতা। ইয়াসিন সংখ্যালঘু শ্রেণির প্রতিনিধি এবং গোপাল সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণির প্রতিনিধি। 'শাপমুক্তি' ছোটগল্পে দারোয়ান চরিত্র এবং সাহিত্যিক অমরনাথ চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

'পুতুল' ছোটগল্পে ক্লাবের সেক্রেটারি রমেশ। 'শুভদৃষ্টি' গল্পে বঙ্কুবিহারী চরিত্র। 'তিমিঙ্গিল' ছোটগল্পে ঋণগ্রহীতা শিবনাথ। 'ব্ল্যাক্‌মেল' ছোটগল্পে মহাজন চরিত্র গোবর্ধন। 'রাজা কি রাখাল' ছোটগল্পে একজন বৃদ্ধ চরিত্র ও ফকির স্থান পেয়েছে। 'পরী' ছোটগল্পে বড়ে মিঞা একজন দক্ষ কৌতুক রসিক, যে লালকেল্লার আস্তাবলে একসময়ে ঘোড়া নিয়ে দিন কাটিয়েছিল, মোগলদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে হারিয়েছে তার চাকরী। 'পরী' গল্পের পরীরূপী বাদশা হারেমের বুভুক্ষু শাহজাদীরা বড়ে মিঞার গোস্তের হান্ডা নিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করেছিল। এরূপ মোগল হারেমের অসংখ্য নারীরা মোঘল সাম্রাজ্যের পতনকালে রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ত ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রত্যাশায়। 'কোতলে আম' ছোটগল্পে লেখক নাদির শাহ, উজির ও বাঁদি চরিত্রটি এনেছেন। নুরবাঈ বাদশাহর বাঁদি হিসেবে পরিচিত। এছাড়া বেগম ও বাদশা চরিত্রও দুর্লভ নয় তার ছোটগল্পে। ফকরুন্নিসা যোধপুরী বেগম, বাদশাহ রফিউপ সারজাৎ বাহাদুর শাহ, জহোন্দর শাহ, ফারুকশিয়র,

সেনাপতি নিজাম উদ্দীন আলি খাঁ, রাজা রতন চাঁদ ও ভকতমাল প্রভৃতি চরিত্র তাঁর ছোট গল্পে আমরা দেখি। 'আগম-ই-গন্না বেগম' ছোট গল্পে গন্না বেগম ছিলেন মহিলা কবি দুঃখ ছিল তার ভাগ্য লিপি। আলোচ্য গল্পে দিল্লির বাদশাহ উজির ইশদ্-উল্-মুলক, বদউনী সামন্ত ও অযোধ্যার নবার মুজাদৌলাকে সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। এছাড়া জাঠ সর্দার জবাহির সিং, অসংখ্য চারণ কবিদের সাহিত্যে তিনি স্থান দিয়েছেন। প্রমথনাথ 'তিনহাসি' ছোটগল্পে কানপুর শহরে হোটেল ব্যবসায়ী মামুদ চরিত্রকে এনেছেন। ইংরেজ পক্ষের সেনাপতি কলিন ক্যাম্ববেল চরিত্র এই গল্পে স্থান পেয়েছে। 'বেগম শমরুর তোষাখানা' ছোটগল্পে শরাব প্রিয় মাতাল শমরু চরিত্র। 'ধনে পাতা' গল্পে স্থান পেয়েছে রাজপুত্র ভিক্ষুক চরিত্র। শ্রীনগর শহরে গৌড়ীয় ছাত্রাবাসের শিক্ষক নাগানন্দ স্বামী যিনি পান্ডিত্য ও প্রতিভার জন্য সর্বজনশ্রদ্ধেয়। তিনি তার ছোটগল্পে ছাত্রকে কাহিনী বিন্যাসের সঙ্গে যুক্ত রেখেছেন। নরেন্দ্র ও বীরেন্দ্র গৌড়ীয় বিদ্যার্থী শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছে। 'নাদির শা'র পরাজয়' ছোটগল্পে হিন্দুস্থানের বাদশা মহম্মদ শাহ, ইরানের বাদশা নাদির শাহ, আমীর ঈশাক খাঁ ও জাবিদ খাঁ চরিত্র স্থান পেয়েছে। ' মৌলাবক্স' ছোটগল্পে হেড মাহুত করিম খাঁ চরিত্রকে এনেছেন। 'বাহাদুর শার বুলবুলি' ছোটগল্পে বাদশা বাহাদুর শাহ সঙ্গীত প্রসিদ্ধ উর্দ্দু কবি রজ্জোক, গজল রচিয়তা গালিব, জ্যোতিষী হীরানন্দ পণ্ডিত প্রভৃতি চরিত্র স্থান পেয়েছে। সিপাহীদের সর্দার হিসেবে আমরা পাই কুল্লিস খাঁকে, সিপাহীশালার মহম্মদ বখ্ত খাঁ চরিত্রকে ছোটগল্পে স্থান দিয়েছেন। 'অসমাপ্ত কাব্য' ছোটগল্পে যুবরাজ কুমার গুপ্ত, রাজপুরোহিত, রাজরাণী শিলাবতী ও মহাকবি কালিদাস চরিত্র স্থান পেয়েছে। 'যক্ষের প্রত্যাবর্তন' গল্পে ঋষি কুমার উদ্দালক মুনিকে এনেছেন। মহেঞ্জোদড়োর পতন-এ পূর্তসচিব, সেনাধ্যক্ষ, গুপ্তচর, নগরপ্রধান, পথাধ্যক্ষ, অরণ্যাধিপতি, শকটাধ্যক্ষ প্রভৃতি চরিত্রকে নিয়ে ছোটগল্পের কাহিনী আবর্ত্তিত হয়েছে। ঢুলি চরিত্র হিসেবে এসেছে নগেন হাড়ি। 'সুতপা' গল্পে প্রেমিক প্রেমিকা হিসেবে মিহির ও সুতপাকে আমরা পেয়েছি। চন্দনী নামে কাজের ঝিকে তিনি গল্পে স্থান দিয়েছেন। প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্প যেন অজস্র চরিত্র চিত্রশালা। দুই দম্পতি অতীশ ও মালতীকে আমরা পাই 'শকুন্তলা' ছোটগল্পে। 'অতি সাধারণ ঘটনা' ছোটগল্পে অতি সাধারণ মাপের মানুষ অমিত ও সুমিতাকে আমরা পাই যারা দুজনেই প্রেমিক প্রেমিকা। জজের পেশকার রতনমণি নাজির, আদালতের কর্মচারী, সেরেস্তাদার, উকিল, মুহুরি, মুন্সেফের পেশকার, কেরানি, চাকর, ঘুষখোর, জজসাহেব ও চাপরাশি চরিত্রকে তিনি সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। পণ্ডিত মশাই গদাধর, জমিদারের তল্পিবাহক নরেশচন্দ্র, দর্জি হানিফ মিএগ, ব্যবসায়ী নিবারণ বাবু জ্যোতিষ ও জীবন বীমার দালাল রমেশ বাবু প্রভৃতি চরিত্র বাস্তবোচিত।

'অদৃষ্টসুখী' ছোটগল্পে অন্ধ অদৃষ্ট সুখী তার পত্নী মাতা পুত্র আত্মীয় স্বজন ভৃত্য ও প্রতিবেশী প্রভৃতি চরিত্রের মুখে লেখক যে কথাগুলি দিয়েছেন তা বাস্তবতার আলোকে বিচার্য। 'অলঙ্কার' ছোটগল্পে বাড়ির সর্বময় কর্ত্রী যমুনা ছিল অলঙ্কার প্রিয় গৃহস্থ রমণী। প্রতি বছর বিজয়া দশমীর দিনে সিন্দুক খুলে অলঙ্কারের উপর শান্তিজল ছিটিয়ে তার নারী

জন্ম ধন্য মনে করত। তার স্বামী নরেশের অর্থনৈতিক দুর্দিনেও সে স্বর্ণালঙ্কার হাতছাড়া করতে দেয়নি। তার মতে অলঙ্কার স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। 'রাশিফল' ছোটগল্পে জ্যোতিষীর সহায় ডাক্তার, মহাজন, ব্যবসায়ী, নেতা, মন্ত্রী, প্রত্যেকেই জ্যোতিষের গণনাকে সত্য বলে মেনে নিত। দুই সাহিত্যিকের আবার রাশিফলের প্রতি বিশ্বাস নেই। 'রামায়ণের নূতন ভাষ্য' ছোটগল্পে অভিরামবাবু যে ভাষ্য দিয়েছেন তা তার নিজে পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। 'গোল্ড ইঞ্জেক্সন' ছোটগল্পে ডাক্তার চরিত্র ও রোগীকে আমরা পাই। 'থার্মোমিটার' ছোটগল্পে ডাক্তার চ্যাটার্জী ও ডাক্তার বোস এবং গৃহকর্তা যদুবাবুর ছেলের জ্বর সম্পর্কে বিকল থার্মোমিটার যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তা আলোচিত হয়েছে। 'জামার মাপে মানুষ' ছোটগল্পে রায়বাবুর দারোয়ান ও মৃগী রোগী মৃগাক্ষী চরিত্রদ্বয়ের আচার আচরণ আমাদের চেনা জগৎ থেকে নেওয়া। 'সংস্কৃতি' ছোটগল্পে ক্লাবের সভ্যদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। 'সাহিত্যে তেজি মন্দা' ছোটগল্পে এক করণিক অনিরুদ্ধ চরিত্রকে আমরা পাই। 'পাশের বাড়ি' ছোটগল্পে বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। 'আয়না' ছোটগল্পে স্কুলমাস্টার অরুণকে আমরা পাই। 'ভৌতিক চক্ষু' ছোটগল্পে মিস্টার জন ফস্টার ও ডাক্তার মেরিগোল্ড এই দুই চরিত্রে বিজ্ঞানমনস্কতার পেছনে অতিলৌকিক প্রসঙ্গ এসে গেছে। কন্যা সোফিয়ার মৃত্যু ঘটনার পিছনে এক অদৃশ্য শক্তি কাজ করেছে। 'সেই সন্ন্যাসীটির কি হইল' ছোটগল্পে চীর জিনধারী এক ভোগাসক্ত সন্ন্যাসীর জীবন চিত্র আমরা খুঁজে পাই। 'সেকেন্দার শার প্রত্যাবর্তন' ছোটগল্পে সম্রাট সেকেন্দার শা ও গ্রিক দেশ থেকে আগত সেলুকাস চরিত্রকে আমরা দেখতে পাই। প্রমথনাথ বিশীর 'টেনিস কোর্টের কাহিনী' ছোটগল্পে সুন্দরী শিক্ষিতা প্রাপ্ত বয়স্কা ধনী ও অভিভাবকহীনা রেবা রায়কে আমরা দেখি। তেমনি ধনী পুত্র রজতরঞ্জন ছোটগল্পে স্থান পেয়েছে। 'কল্কি' ছোটগল্পে বিশ্বকর্মা চরিত্রটি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া। কবি মুকুন্দের ভাঁড়ু দত্ত অবলম্বনে লেখা প্রমথনাথের ভাঁড়ু দত্ত চরিত্রটি অনবদ্য। 'ভাঁড়ু দত্ত' গল্পের সার্থক চরিত্র এটি। ট্যাক্সির ড্রাইভার ও সাবজজ নিবারণ বাবু প্রভৃতি চরিত্র লেখকের অনবদ্য সৃষ্টি। এটি অ্যাক্সিডেন্ট গল্পের চরিত্র। পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেট বিঠলজীও কৈতরাম, জেলার মেজর নীল, বিচারক, দোকানদার, জেনারেল উট্রাম, কোম্পানির চর, সিপাহী বিদ্রোহের নেতা নানা সাহেব পলাতক আসামী, কোম্পানির ফৌজ, থানাদার মর্দান আলী, ম্যাজিস্ট্রেট টাকার সাহেব, রাজভক্ত পাজা, বদ্যিনাথ মুখুজ্জে, সিভিল সার্ভিস দপ্তরভুক্ত চাকুরে প্যালিসার ইঞ্জিনিয়ার ডিস, গোয়েন্দা জেমি গ্রীন, জমাদার ও হোটেলওয়ালা প্রভৃতি চরিত্র সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছে।

ঃ নাট্যগুণ ঃ

প্রমথনাথ বিশী তাঁর ছোটগল্পে নাট্যরস আমদানি করবার জন্য বিভিন্ন চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এছাড়া পাঠক মনে হৃদয়গত উৎকণ্ঠা সঞ্চারে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। নাট্যগুণ সম্পন্ন ছোটগল্পের কাহিনী গ্রন্থনে নাটকীয়

আকস্মিকতা পাঠকদের ভাবিয়ে তোলে। তাঁর ছোটগল্পে নাটকীয় ক্লাইমেক্স ও অ্যান্টিক্লাইমেক্স লক্ষ্য করি। কাহিনীর গতিকে ত্বরান্বিত করতে তিনি দক্ষ। ছোটগল্পে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য নাটকীয় চমক যা পাঠক মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। অনেক গল্পে কাব্যরস যুক্ত নাট্যভঙ্গি ও বর্ণাঢ্য বর্ণনা এবং গীতি প্রবাহ ঘটনাকে অনেকটা গতিময় করে তোলে। গল্পকারগণ গল্পের আঙ্গিকে ঘটনা বহুলতা ছাড়াও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন। প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পে আপাত সারল্যের আড়ালে জটিল জীবন জিজ্ঞাসার উপস্থিতি নাটকীয়তার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তাঁর গল্পগুলোতে নাট্যগুণের অভাব নেই। তবে সব ছোটগল্পই যে নাট্যগুণ সমৃদ্ধ তা নয় অনেক গল্পে কাব্যগুণের সমাবেশ ঘটেছে। নাটকীয় ছোটগল্প রচনায় প্রমথনাথের বিশিষ্টতার অভাব নেই। রাজশাহী, শান্তিনিকেতন, কলকাতা ও দিল্লি প্রভৃতি স্থান থেকে তিনি যে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তার শিল্পরূপ হল ছোটগল্পগুলি। বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াকে তিনি বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে নাটকীয় দ্বন্দ্বে উপস্থাপিত করেছেন তাই বলে তাঁর গল্পে রসহানি ঘটেনি। প্রমথনাথ বহু ছোটগল্পে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অসংগতির বিরুদ্ধে ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষেপ করতে গিয়ে তিনি শুধু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণকেই বেছে নেননি বরং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পরিবর্তে ঘটনাবহুল ছোটগল্পের জন্ম দিয়েছেন। তাঁর ছোটগল্পে নাটকীয় বেগ সঞ্চার করতে গিয়ে কখনো প্রাচীন মূল্যবোধকে উপেক্ষা করেননি। বিশেষ করে বাঙালি জীবনের ঈর্ষা, স্বার্থপরতা নিয়ে ছোট ছোট সংঘাত বা বিরোধকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। হৃদয়বৃত্তির নাটকীয় সংঘাত, পত্নী প্রেম, সন্তান বাৎসল্যকে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর ছোটগল্পে একদিকে রয়েছে দুর্নিবার প্রেমের আবেদন, ঘাত প্রতিঘাত এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার বাণীরূপ। বিভিন্ন চরিত্রের দ্বৈতরূপ নাটকীয়তার মাধ্যমে তিনি পরিবেশন করেছেন। কিন্তু তাঁর নাটকীয় রসসৃষ্টি অন্তরায় হয়নি। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বকে নাটকীয় রসে সমৃদ্ধ করেছেন। বিভিন্ন সমস্যাকে উপস্থাপিত করে এক বিশেষ নাটকীয় কৌশলের সহায়তায় গল্পগুলি পরিণতির স্তরে পৌঁছে গেছে। জীবনের মূল্যবোধ ও জীবন সম্পর্ককে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। যা নাটকীয় তাৎপর্য দিতে পেরেছে।

'বেগম শমরুর তোষাখানা' ছোটগল্পে শমরু ও জুবেদির অন্তর্দ্বন্দ্ব; 'তুক' ছোটগল্পে জগন্নাথ ও মাধুরীর দাম্পত্য জীবনের ঘাত প্রতিঘাত; 'চাচাতুয়া' ছোটগল্পে নৈমুদ্দিন গফুরের নাটকীয় সংলাপ ও চাচাতুয়া পাখিটিকে নিয়ে তাদের পরিকল্পনা; 'জেনুইন লুনাটিক' ছোটগল্পে ভানুপ্রকাশের পাগলা গারদে প্রবেশের নাটকীয় চমক; 'শার্দূল' ছোটগল্পে সুরেন পোদ্দারের গোপন অভিলাষ এবং নরেন চক্রবর্তীর সক্রিয়তা, সুরেনের স্বরূপ ফাঁসের ঘটনা, নাটকীয় উৎকণ্ঠা; 'ছবি' ছোটগল্পে কৃষ্ণার ছবিকে নিয়ে নাটকীয় গতির পরিবর্তন; 'ব্ল্যাক্‌মেল' ছোটগল্পে সিদ্ধিনাথের রহস্য উদ্‌ঘাটন নাটকীয় চমক; 'বাল্মীকির পুনর্জন্ম' ছোটগল্পে বনমালী ও রমাকান্তের নাট্যধর্মী সংলাপ; 'পুতুল' ছোটগল্পে রমেশের ৬৬ নং বাড়ি ভাড়া নিয়ে উৎকণ্ঠা নাট্যধর্মী।

'যমরাজের ছুটি' ছোটগল্পে নবীনচন্দ্রের জন্মমৃত্যু ধারণা সম্পর্কে নাটকীয় দ্বন্দ্ব; 'দক্ষিণ

রায়ের দাক্ষিণ্য' ছোটগল্পে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাদের মৃত্যু ঘটনা; 'ভারতীয় নৃত্য ও ভারতীয় ব্যাঘ্র' ছোটগল্পে মহাক্ষুধার শশমুখীকে পাওয়ার অদম্য আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের কৌশল নাটকের চমক সৃষ্টি করেছে, 'শাপমুক্তি' ছোটগল্পে অমরনাথের অন্তর্দ্বন্দ্ব; 'রাঘব বোয়াল' ছোটগল্পে চুরি বিষয়ে ওঙ্কারনাথের দৃষ্টিভঙ্গি; ইয়াসিন শর্মা অ্যান্ড কোং ছোটগল্পে ইয়াসিন ও গোপালের গ্রামত্যাগ গল্পটির টার্নিং পয়েন্ট এবং তাদের পোশাক বদল বিশেষ নাটকীয়তার সৃষ্টি করেছে; 'সিদ্ধান্ত' ছোটগল্পে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশের নাটকীয় সংলাপ; 'পুকুর চুরি' ছোটগল্পে পুকুরচুরিকে কেন্দ্র করে রহস্যের জাল বিস্তার, নরপশু সংবাদ ছোটগল্পে মানুষ ও ছাগের সংঘাত নাট্যরস সৃষ্টি করেছে। 'শুভ দৃষ্টি' ছোটগল্পে বিবাহকে কেন্দ্র করে শুভদৃষ্টির বিনিময় সংক্রান্ত ঘটনায় নাটকীয় আকস্মিকতা; 'স্বপ্নলব্ধ কাহিনী' ছোটগল্পে স্বপ্ন দর্শনের মধ্যে নাটকীয় গতির পরিবর্তন; 'মহামতি রাম ফাঁসুড়ে' ছোটগল্পে রাম ফাঁসুড়ের শিক্ষাদীক্ষা, সাধনা ও সিদ্ধি বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, রামলোচন চক্রবর্তীর ফাঁসুড়ে বৃত্তি গ্রহণে নাট্যোৎকণ্ঠার সঞ্চার করেছে; 'নিশীথিনী' ছোটগল্পে প্রকাশ ও গুপ্তের মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনে নাট্যরস জমে উঠেছে; 'কালোপাখি' ছোটগল্পে কালোপাখির আকস্মিক আবির্ভাবে মিনুর মৃত্যু এবং একই পথ বেয়ে ঝুমঝুমির অকাল বিয়োগের ঘটনায় গল্প কথক ও মিস্টার রায়ের মনস্তাত্ত্বিক দিক নাটকীয়তার সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে; 'তান্ত্রিক' ছোটগল্পে মহানন্দ ঠাকুরের সঙ্গে যদুবাবুর সম্পর্কে নাট্যরস জমে উঠেছে, 'নহুষের অতৃপ্তি' ছোটগল্পে মন্নুসিং এর নাটকীয় প্রস্থান বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে; 'কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূল কারণ' ছোটগল্পে বিন্তি ও সরলার স্বার্থপরতা; 'শাশুড়ি' ছোটগল্পে অরিন্দম ও নিরুপমার সঙ্গে মোটরগাড়ি কেনাকে কেন্দ্র করে কলহ নাট্যরসের সঞ্চার করেছে; 'স্বপাদ্য কাহিনী' ছোটগল্পে যতীনের উদ্দেশ্যে লেখা অরিন্দমের চিঠিখানিতে নাটকীয় দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটেছে; সতীন ছোটগল্পে কমলকে উদ্দেশ্য করে নৃপেন্দ্রের লেখা চিঠি এবং স্ত্রীর ডায়েরি অংশে এক রহস্য উদঘাটিত হয়েছে; 'রজ্জুতে সর্প' গল্পে দুজন স্থূল ব্যক্তির সঙ্গে একজন রোগালোকের বিতর্কে নাট্যরসের সঞ্চার ঘটেছে; 'পুরন্দরের পুঁথি' ছোটগল্পে পুরন্দরের সঙ্গে রায় মশায়ের একটি বইকে নিয়ে ভৌতিক রস নাটকীয়তার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে; 'পাশের বাড়ি' ছোটগল্পে একজন দারোগার আকস্মিক আবির্ভাবে প্রফুল্ল ও নরেনের ভাবনা নাট্যদ্বন্দ্বের সঞ্চার করেছে; 'বশীকরণ' ছোটগল্পে বৈজুর গাধাকে নিয়ে লিখিত কাহিনীতে নাট্যরসের আমদানি ঘটেছে; 'দ্বিতীয় পক্ষ' ছোটগল্পে অন্নদা প্রসাদের দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী নীলিমার মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ এবং শ্রীলেখার অশরীরী আত্মার আবির্ভাবে ভৌতিক আবহ সৃষ্টিতে নাট্যরস জমে উঠেছে; 'গন্ডার' ছোটগল্পে গনেশ ও হেডমাস্টারের বিতর্কে নাটকীয় দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে; 'ব্রহ্মার হাসি' ছোটগল্পে ব্রহ্মার সঙ্গে ভুলুর সংলাপ নাট্যগুণ সমৃদ্ধ; 'ভাঁড়ু দত্ত' ছোটগল্পে গল্প কথকের সঙ্গে ভাঁড়ু দত্তের বাক্ বিনিময়ে নাট্যরসের সঞ্চার ঘটেছে; 'মাত্রাজ্ঞান' ছোটগল্পে চীনা বন্ধুর সঙ্গে গল্প কথকের যুক্তিবাদী আলোচনা নাট্যরস সৃষ্টি করেছে। 'ইংলন্ডকে স্বাধীনতা দানের চেষ্টা' গল্পের নায়ক লেখক স্বয়ং। তিনি যে রাজনৈতিক মতবাদকে উপস্থাপন করেছেন উভয়ের সংলাপে নাট্যরসের

সংযোজন ঘটেছে; প্র.না.বি-র সঙ্গে এক বন্ধুর দার্শনিক বিতর্কের মধ্যে দিয়ে যা নাট্যরস সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে; 'কল্কি' ছোটগল্পে পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক বিরোধে কাহিনীর নাটকীয় শিল্পরস সৃষ্টি করেছে, রজত রায়ের আকাঙ্ক্ষিত রেবা রায়ের প্রতি প্রেম নিবেদন এবং রজতের প্রেমে ব্যর্থতা নাটকীয়তার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে 'টেনিস কোর্টের কান্ড' ছোটগল্পে; 'সত্যমিথ্যা কথা' ছোটগল্পে মিঃ দাস, গিরিজাবাবু, ডাক্তার ও পুলিশবন্ধুর সত্য ও মিথ্যাকে নিয়ে গল্প কাহিনীতে নাট্যরসের সন্ধান মেলে; 'একটি ঠোঁটের ইতিহাস' ছোটগল্পে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য ক্রোধ কুটিলতা নাট্যরসের আমদানি করেছে; 'হাতুড়ি' ছোটগল্পে রাজনৈতিক দলের লিডারের বক্তৃতায় নাট্যরস উপস্থাপিত হয়েছে; 'গোষ্পদ' ছোটগল্পে অমলেন্দুর সঙ্গে এক মুসলমান চাষির কথোপকথন এবং মিঞার গরুর পা যুক্ত অশরীরী আত্মা দর্শন কাহিনীতে নাট্যরসের সঞ্চার ঘটিয়েছে; 'বিপত্নীক' গল্পে সরু গলা ও মোটা গলা নামে দুই ব্যক্তির সঙ্গে চায়ের উমেদার নিবারণের সংলাপ নাট্যরস সৃষ্টি করেছে।

'ন-ন-লৌ-ব-লি' ছোটগল্পে নন্দন নরকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একজন প্রধান কর্মসচিবের বিজ্ঞাপন অনুসারে এক লক্ষ আবেদন প্রার্থীর মধ্যে সিলেকশ্‌ন কমিটি সচ্চরিত্র পরিশ্রমী এবং কম বেতন নিয়ে কাজে নিযুক্ত হয় কিভাবে ঘুষখোর সমাজে সৎলোক ঘুষের শিকার হয়েছে সেই ঘটনার নাট্যরস বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে; 'ঋণজাতক' ছোটগল্পে বুদ্ধদেবের সঙ্গে গৌতমীর উত্তর প্রত্যুত্তরে শ্বেত শস্য সংগ্রহ নিয়ে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, সন্তানের প্রাণ ভিক্ষার পরিবর্তে পুত্রের সৎকারের জন্য উদ্যোগ নিঃসন্দেহে নাট্যরসযুক্ত; 'চিত্রগুপ্তের রিপোর্ট' ছোটগল্পে রিপোর্ট প্রকাশের ঘটনা নাটকীয় উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছে। 'সিন্ধবাদের অষ্টম সমুদ্র যাত্রার কাহিনী' ছোটগল্পে গল্প কথকের সঙ্গে প্রশ্নকর্তার বিবিধ বিষয়ে বিশেষত মৈত্রী, স্বাধীনতা, সত্য, সংবাদপত্র, কবিতা, মনুষ্যত্ব, বিশ্বপ্রেম, রাজনীতি, ধর্ম প্রভৃতি প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তরে নাট্যরস জমে উঠেছে; 'নির্ব্বাণ' ছোটগল্পে রাজপুত্রের সঙ্গে সারথির কথোপকথন এবং ঘটনা প্রবাহ নাট্যরসের সঞ্চার করেছে; সারথির সিনেমা কোম্পানিতে যোগ দেওয়া এবং ফিল্মস্টার হবার স্বপ্ন দেখায় নাটকীয় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে; একটি বাঘকে মেরে ফেলার ঘটনা অবলম্বনে রজত ও রানুর উদ্যোগে বা প্রচেষ্টা নাটকীয়তার সংকেত পরিবেশিত হয়েছে, 'নগেন হাঁড়ীর ঢোল' ছোটগল্পে সামান্য অর্থে যে ঢোলটিকে চামড়া দিয়ে আচ্ছাদন করে জমিদারের নাতির অন্নপ্রাশনে নগেন ঢোল বাজাবার অনুশীলন করত অথচ তারকনাথ বাবুর জমিদারি নিলামে উঠলে ঘোষক হিসেবে চাপরাশি ও পেয়াদার নির্দেশকে অমান্য করে এবং ঢোল তল্লাশীর সময়ে চামড়াহীন ও পালকহীন নগেন হাঁড়ির ঢোল অকেজো হয়ে পড়ে থাকে, গল্পটিতে নাটকীয় আকস্মিকতার আমদানি হয়েছে; 'নীলমণির স্বর্গলাভ' ছোটগল্পে নীলমণি নামক এক ভালুকের জীবনে স্বর্গলাভের আস্বাদ গ্রহণ নাট্যরস যুক্ত, 'একগজ মার্কিন ও এক চামচ চা' গল্পে গৃহিনীর ঋণের প্রসঙ্গ নাট্যগুণ সমৃদ্ধ; 'ডাকিনী' ছোটগল্পে শশাঙ্কের স্ত্রী মল্লিকার গুড় নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ নাট্যরস সৃষ্টি করেছে; 'বাঁশ ও কঞ্চি'

ছোটগল্পে নায়েব সরকার কর্তৃক জমিদারি প্রথার বিলুপ্তির আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলার ঘটনা নাট্যরসযুক্ত। রজ্জুর নায়েবের পৌষমাস ও জমিদারের সর্বনাশ ঘটেছে, গল্পে জমিদার রমেশের অবক্ষয় নাট্যরস সমৃদ্ধ। 'মাধবী মাসী' ছোটগল্পে বালবিধবা মাধবী একটি গার্লস হোস্টেলের পরিচারিকা। বৈধব্য জীবন যন্ত্রণাকে সে প্রশমিত করত ছাত্রীদের চুল বেঁধে ও সেলাইয়ের কাজ করে। বিনতা নামে এক ছাত্রীর সঙ্গে গড়ে উঠেছিল মাধবী মাসির সুসম্পর্ক। প্রতিবছর বিনতার বিবাহ বার্ষিকীতে উপহার স্বরূপ একটি জামা পাঠিয়ে দিত। যেদিন আকস্মিকভাবে বিনতার স্নেহধন্যা মেয়ে মমতা শিক্ষা সুত্রে আকস্মিকভাবে হোস্টেলে আবির্ভাব ঘটেছিল সে মুহূর্তে মাধবী মাসির বয়স সম্পর্কে ধারণা পাল্টে গেল। অতীত হারানো জীবন ও যৌবন শূন্যতায় ভরে গেল, মাধবী মাসির মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন অপূর্ব নাট্যরসের পরিচায়ক; 'উল্টোগাড়ি' ছোটগল্পে আমরা দেখি অমল সপ্তদশী মেয়ে মঞ্জুলাকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিল। দীর্ঘ দশ বছর বাদে অমল যখন অণিমাকে বিয়ে করে কোলকাতায় সংসার জীবন পালন করছে রেল স্টেশনের প্রতীক্ষালয়ে মঞ্জুলা পরিবেশিত খিচুড়ি খেতে খেতে দেখল মঞ্জুলার বয়স ২৭ এর উর্ধ্বে চেহারায় নেমে এসেছে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ। গল্পের নায়কের সে সময় শারীরিক বিবর্তনের স্পষ্ট রূপরেখা প্রকাশিত হল। ঘটনাটি মনস্তাত্ত্বিক হলেও এর মধ্যে নাট্য রসের অভাব নেই। মানবজীবনে শ্রেষ্ঠ হলেও তার উৎস যে নগণ্য কীট বর্ণনাধর্মী 'কীটাণুতত্ত্ব' গল্পটিতে গল্পকার সার্থকভাবে নাট্যরস পরিবেশন করেছেন; অতিলৌকিক শ্রেণির 'অশরীরী' ছোটগল্পে চার চারটি মৃত্যু ঘটনা নাটকীয় আকস্মিকতার সৃষ্টি করেছে।

ঃ উপস্থাপন কৌশল ঃ

প্রমথনাথের গল্পের উপস্থাপনরীতি বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন—

১। গল্পের মধ্যে গল্প বলার রীতি;

২। আত্ম জৈবনিক পদ্ধতি যেখানে বক্তা নিজে একটি চরিত্র;

৩। চিঠি পত্র বা ডায়েরির আকারে গল্প রচনা পদ্ধতি;

৪। বর্ণনার মাধ্যমে গল্প বলার রীতি;

৫। সংলাপের মাধ্যমে গল্প বলার রীতি;

৬। গল্পের ফ্ল্যাশব্যাক রীতিতে গল্পের কাহিনী বর্তমানে শুরু হয়ে ঘটনাসূত্রে অতীতে চলে যায় এবং গল্পের শেষ পর্যায়ে আবার বর্তমানে ফিরে আসে।

ছোটগল্পের আঙ্গিক প্রকরণে প্রমথনাথ বিশী উত্তমপুরুষের দৃষ্টিকোণ যুক্ত অনেক গল্প লিখেছেন। বেশ কিছু গল্পে উত্তমপুরুষের নামহীনতার পরিচয় আছে এর ফলে গল্প কথকের মধ্য দিয়ে পাঠক নিজেকে অনেকটা খুঁজে নেয়। কথকের সঙ্গে সহজেই আত্মবোধ জেগে ওঠে। পাঠক আপন সত্তার সঙ্গে রহস্যের সন্ধান পান। অনেক সময় আমি জবানীতে চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়। 'ঋণজাতক' গল্পে উত্তমপুরুষের উপস্থাপন কৌশল লেখক সার্থক ভাবে প্রয়োগ করেছেন।

"রমণীর নাম [illegible] গৌতমী; সে বলিল আমি অতি দুঃখী; আপনার খ্যাতি শুনিয়া বহুদূর হইতে আসিয়াছি; সব লোকে বলে আপনি সিদ্ধ পুরুষ, অসাধ্য সাধন করিতে পারেন—আমার একমাত্র পুত্র আজ মৃত, দয়া করিয়া আপনি তাকে বাঁচাইয়া দিন।"[৩৫]

—এখানে গৌতমীর আর্তি উত্তম পুরুষের জবানীতে গল্পকার উপস্থাপন করেছেন।

'যন্ত্রের বিদ্রোহ' ছোটগল্প উত্তমপুরুষের জবানীতে উপস্থাপিত হয়েছে—

"আজ দরকারের সময় আপনারা আমাকে আত্মীয় বলিয়া কাছে ডাকিতেছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত আপনারা আমাকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছেন—কলের সমাজে এতদিন আমি ছিলাম হরিজন।"[৩৬] আলোচ্য অংশে অন্যের অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে গল্প কথকের প্রতিবাদী চেতনা প্রকাশিত হয়েছে।

'কীটাণুতত্ত্ব' ছোটগল্পটিতে কথক উত্তমপুরুষের জবানীতে আত্ম পরিচয় দিয়েছেন। যেমন "আমি সত্যই স্বর্গে গিয়াছিলাম—ব্যক্তিগত সুখের আশায় নয়, নিতান্ত পরার্থপর ভাবে।....আমরা ক্লাবের সভ্যরা স্বর্গের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিল। ফলে আমাকে স্বর্গে যাইতে হইল।"[৩৭]

—গল্প কথক প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার অসংগতি আমির জবানীতে উপস্থাপন করেছেন।

'চোখে আঙ্গুল দাদা' ছোটগল্পে আছে উত্তমপুরুষের জবানী।

'বিনা টিকিটের যাত্রী' ছোটগল্পে গল্প কথক উত্তমপুরুষে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন নিম্নলিখিত ভাবে "—শুনুন মশাই, শুনুন আপনার বয়স হয়েছে বুঝতে পারবেন—এরা সব ছেলে ছোকরা, আমাদের মত বুড়োর কথা বিশ্বাস করে না।"[৩৮]

এখানে গল্পকথক যাত্রীটি অতিলৌকিক জগৎ থেকে আমদানি করা। প্রমথনাথ বিশী সার্থকভাবে এক রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে যাত্রীর কঁথা উত্তমপুরুষে উপস্থাপন করে ভৌতিক রস সৃষ্টি করেছেন।

'চারজন মানুষ ও একখানা তক্তপোষ' ছোটগল্পে আমি-র জবানীতে লিখিত অংশটি বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে নিম্নোক্ত অংশে—

"আমি বলিলাম—আমি একজন মানুষ। বাঁচাইবার পক্ষে ইহাই কি যথেষ্ট নয়।

তাহারা বলিল—আমরা সবাই তো মানুষ। কেবল আইনে বাধে বলিয়া পরস্পরকে মারিয়া ফেলিতেছে না—সদয় বিধাতা আইনের নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া তোমাকে যখন মারিবার ব্যবস্থাই করিয়াছেন—তখন তোমাকে আমরা বাঁচাইতে যাইব কেন?

আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বলিলাম—আমি শিক্ষক।"[৩৯]

উত্তম পুরুষের নিরীক্ষণ বিন্দুতে নিম্নোক্ত সংলাপ অংশটি শিল্পগুণ সমৃদ্ধ ঃ

"আমি কত নারী হত্যা করেছি শুনেছ তো?

না হয় আর একটা বেশি করবে।

সংবাদদাতা তবে নারী?

বিচলিত কাশীবাঈ বলিল; আমি নিজের কথা ভাবছি।"[৪০]

প্রমথনাথের ছোটগল্প নানা রকম পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে। এক বা একাধিক পদ্ধতির

আশ্রয়ে গল্পের ঘটনা গল্পকার পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। বর্ণনার মাধ্যমে কিংবা সংলাপ আকারে গল্প বলার রীতি আমরা লক্ষ্য করি প্রমথনাথের অনেক গল্পে। গল্পে দুই বন্ধুর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে কাহিনী ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছে পরিণতির দিকে। 'অবচেতন' গল্পে গল্পকথক লেখক। তিনি স বাবুর মুখে শোনা এক অত্যাশ্চর্য কাহিনী পরিবেশনে সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। 'রাশিফল' ছোটগল্পটির কাহিনীতে পরিবেশিত হয়েছে তিন বন্ধু মিলে এক জ্যোতিষের ভাগ্য গণনা গল্পটিতে একজন পরিচিত মনীষী অভিরামবাবুর সঙ্গে কথাবার্তায় গল্পের ঘটনা আবর্তিত হয়েছে। 'সংস্কৃতি ছোটগল্পটি গল্পকারের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। ট্রামের দুই যাত্রীর সঙ্গে উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। 'পাশের বাড়ি' ছোটগল্পের পল্লব বিস্তারিত হয়েছে দুই বন্ধু প্রফুল্ল ও নরেনের কথোপকথন দিয়ে। 'চিলা রায়ের গড়' ছোটগল্পের নায়ক স্বয়ং, বন্ধু অরবিন্দ ও প্রবোধকে নিয়ে চিলারায় ও নীলধ্বজের রাজকীয় বীরত্বের কাহিনী অত্যন্ত নিপুণভাবে পরিবেশিত হয়েছে। 'আয়নাতে' ছোটগল্পটিতেও লেখকের স্বয়ং উপস্থিতি, অরুণ ও লেখকের কথা প্রসঙ্গে গল্পের কাহিনী এগিয়ে গেছে। গল্পটি অনেকটা বৈঠকি রীতিতে বিন্যস্ত। 'বিনা টিকিটের যাত্রী' গল্পেও লেখকের স্বয়ং উপস্থিতি বন্ধুবর প্রবোধের সঙ্গে কথা সূত্রে গল্পের কাহিনী পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে গেছে। 'ফাঁসিগাছ' ছোটগল্পে গল্প কথক লেখক নিজে। এক মনস্তাত্ত্বিক বিষয় আলোচ্য গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। 'খেলনা' গল্পটিতে অনাদি ও গদাধর দুই পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে লেখকের সংলাপ গল্প পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। 'ইংলন্ডকে স্বাধীনতা দানের চেষ্টা' ছোটগল্পে প্রমথনাথ বিশী ও তার সঙ্গী ইংরেজ বন্ধুকে নিয়ে গল্পরস উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। 'প্রনাবির সঙ্গে ইন্টারভিউ' গল্পের নায়ক গল্পকার প্রমথনাথ বিশী এক আমেরিকান বন্ধুর সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবন দর্শন সার্থকভাবে উপস্থাপন করেছেন। 'প্রনাবির সঙ্গে কথোপকথন' ছোটগল্পটি বৈঠকি রীতিতে লেখা। গল্পের নায়ক লেখক স্বয়ং। 'হাতুড়ি' ছোটগল্পের ভৌগোলিক পটভূমি বনগাঁ স্টেশন। বন্ধুর জন্য প্রতীক্ষারত লেখকের সঙ্গে স্টেশনে অপেক্ষামান ট্রেন যাত্রীর কথোপকথনের মাধ্যমে গল্পের ঘটনাধারা আবর্তিত হয়েছে। 'এ্যাক্সিডেন্ট' গল্পটি এক বন্ধুর সঙ্গে ট্যাক্সি যোগে ভ্রমণ করতে গিয়ে দুই বন্ধুর মনস্তাত্ত্বিক দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। 'রত্নাকর' ছোটগল্পে হরি নামে এক বৃদ্ধ চাকরের সঙ্গে লেখকের গল্প উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। 'গাধার আত্মহত্যা' গল্পে লেখক ও রামুর সঙ্গে কথোপকথনের গল্পের ঘটনার বিবর্তিত হয়েছে। 'ভগবান কি বাঙালি' গল্পে পাঠকের সঙ্গে গল্পকারের গল্পের বিষয় ভাবনা আবর্তিত হয়েছে।

প্রথাবদ্ধ কাহিনী ও ঘটনা নির্ভর আঙ্গিকের পরিবর্তে প্রমথনাথের বহু গল্পে কাহিনীর উপস্থাপক, টীকা ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকার রূপে লেখকের উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি।

চিঠিপত্র বা ডায়েরি আকারে কিছু ছোটগল্প প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন। গল্পগুলির পুরোটাই একটা চিঠি ও ডায়েরি আকারে। 'স্বপ্নাদ্য কাহিনী' ছোটগল্পটি মূলত সম্পূর্ণরূপে একটি চিঠি। চিঠি লেখার নিয়ম অনুসরণে গল্পের শুরু হয়েছে। গল্পের শুরুতে প্রিয় যতীন

বলে সম্বোধন করা হয়েছে গল্পের শেষে 'ইতি ব্যাকুলভাবে অপেক্ষামান অরিন্দম' বলে শেষ হয়েছে। অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে গল্পটির অবতারণা। সতীন ছোটগল্পটির দুটি প্রথম অংশে রয়েছে স্বামীর পত্র। কমলকে উদ্দেশ্য করে নৃপেনের লেখা তিন পৃষ্ঠার এক চিঠিতে গল্পের কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। আলোচ্য গল্পের দ্বিতীয় অংশে স্ত্রীর ডায়েরি নামে গল্পরস পল্লবিত হয়েছে।

প্রমথনাথ বিশী বর্ণনাত্মক রীতিতে ছোটগল্প লিখেছেন। এরূপ ছোটগল্পের সার্থক নিদর্শন 'সাহিত্যের তেজী মন্দা' নামক ছোটগল্পটি। 'পাশের বাড়ি' ছোটগল্পের প্রথম দুটি অনুচ্ছেদে বর্ণনাত্মক রীতির সার্থক প্রয়োগ আমরা লক্ষ্য করি। 'ভৌতিক চক্ষু' ছোটগল্পটির বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে বর্ণনাত্মক রীতির অনুসরণ। 'শিবুর শিক্ষানবিশী' ছোটগল্পে সংলাপ অংশ খুবই কম কিন্তু বর্ণনার অংশের প্রাধান্য। 'গাধার আত্মহত্যা' ছোটগল্পটির মধ্যে রয়েছে বর্ণনাত্মক ভঙ্গি। 'ভগবান কি বাঙালি' ছোটগল্পেটি পুরোপুরি বর্ণনাত্মক রীতিতে লেখা। 'গণ্ডার' ছোটগল্পে বর্ণনার অংশই সিংহভাগ অধিকার করে আছে। 'অশরীরী' ছোটগল্পে বর্ণনার অংশই বেশি। 'কপালকুণ্ডলার দেশে' ছোটগল্পে বর্ণনা মূলক রীতিরই প্রাধান্য। 'বাহাদুর শার বুলবুলি' ছোটগল্পটি পুরোপুরি বর্ণনাত্মক রীতিতে লেখা। 'মৌলাবক্স' বর্ণনাত্মক রীতিতে লেখা। 'আগম্-ই-গন্না বেগম্' পুরোপুরি বর্ণনাত্মক রীতির গল্প। 'প্রাণান্তকর' ছোটগল্পটি বর্ণনা ধর্মী। 'পেশকার বাবু' ছোটগল্পে বর্ণনাত্মক রীতির উৎকৃষ্ট উদাহরণ। 'ছেঁড়া কাঁথা ও লাখ টাকা' ছোটগল্পটি পুরোপুরি বর্ণনাত্মক রীতিতে লেখা।

প্রমথনাথ বিশীর লেখা ছোটগল্পে সংলাপ ধর্মিতার অভাব নেই, কিছু কিছু গল্পে পুরোপুরি সংলাপ রীতির প্রাধান্য। 'ছাপ-সন্দেশ' ছোটগল্পটিতে বর্ণনার অংশে নেই। সেখানে শুধু সংলাপের মাধ্যমে গল্পের কাহিনী এগিয়ে গেছে। 'পশু শিক্ষালয়' ছোটগল্পটি সংলাপধর্মী। 'গঙ্গার ইলিশ' ছোটগল্পে রয়েছে সংলাপের প্রাধান্য। 'শকুন্তলা' ছোটগল্প সংলাপধর্মিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। 'যক্ষের প্রত্যাবর্তন' ছোটগল্পে শুরু করে শেষ অবধি সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনী পল্লবিত হয়েছে। 'অসমাপ্ত কাব্য' ছোটগল্পটি সংলাপধর্মী। 'নূতন বস্ত্র', 'সত্য মিথ্যা কথা' গল্পদুটি পুরোপুরি সংলাপ আকারে লেখা। 'রক্তের জের' ছোটগল্পে বর্ণনা অংশের চেয়ে সংলাপ অংশের প্রাধান্য। 'প্রায়শ্চিত্ত' ছোটগল্পে সংলাপধর্মী বৈশিষ্ট্যের অভাব নেই। 'রুথ' ছোটগল্পটি পুরোপুরি সংলাপধর্মী। 'ছিন্ন দলিল' ও 'কোকিল' ছোটগল্প দুটি সংলাপ রীতির সার্থক উদাহরণ। 'সেই শিশুটি' ছোটগল্পে সংলাপধর্মিতার পরিচয় আছে। 'ধনেপাতা' ছোটগল্পটির সিংহভাগ সংলাপ আকারে উপস্থাপিত হয়েছে। 'দর্শনী' ও 'রাজা কি রাখাল' ছোটগল্পদ্বয় সংলাপধর্মী। 'শাপমুক্তি' ছোটগল্প সংলাপ আকারে লেখা। 'পুতুল', 'বাল্মীকির পুনর্জন্ম' ছোটগল্পদ্বয় সংলাপরীতিতে লেখা। 'ছবি' ও 'ব্ল্যাক্‌মেল' গল্পদুটি সংলাপধর্মী। 'মানুষের গল্প', 'লবঙ্গীয় ও উন্মাদাগার', 'চোখে আঙুলদাদা', 'মোটর গাড়ি', 'ভিক্ষুক কুকুর সংবাদ' প্রভৃতি ছোটগল্পগুলিতে শুধু সংলাপের প্রাধান্য। 'থার্মোমিটার', 'আয়নাতে' প্রভৃতি ছোট গল্পে সংলাপ রীতির প্রাধান্য রয়েছে।

'মাধবী মাসী' ছোটগল্পটি ফ্লাশব্যাক রীতিতে লেখা। 'ভৌতিক চক্ষু', 'অধ্যাপক রমাপতি

বাঘ', 'সাবানের টুকরো' ছোটগল্প দুটি ফ্লাশব্যাক রীতিতে লেখা। 'সেই শিশুটি' ছোটগল্প ফ্লাশব্যাক রীতিতে লেখা। 'মহেঞ্জোদড়োর পতন' ছোটগল্পটি ফ্লাশব্যাক রীতিতে লেখা।

ঃ শব্দ প্রয়োগ কৌশল ঃ

প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পে দেশী শব্দের সার্থক প্রয়োগে শব্দ ভান্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত দেশী শব্দ নিম্নে প্রদত্ত হল। যেমন—ডিঙ্গা, চুলা, তোতলা, ঢিল, খুঁটি, ডাঁসা, ডাগরডোগর, ঝিলিক, ঝড়, ঝাপ্সা, সুড়কি, খোঁপা, খাঁচা, খোঁজ, ঢেউ, ঢোল প্রভৃতি।

বাংলায় প্রচলিত তৎসম শব্দের প্রয়োগ প্রমথনাথের ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ করেছে সন্দেহ নেই। যেমন—দেব, নদী, দুহিতা, রাত্রি, সন্ধ্যা, মিথ্যা, সত্য, বাম পয়োধর, জ্যোৎস্না চিক্কন, নীলাম্বরী, জ্যোতিষ্কজাল, ইন্দ্রধনু, দেশমাতৃকা, শ্রদ্ধা, বীণানিনাদ, কৃষ্ণকায়, অশ্রুপ্লাবিত, সমুদ্র ফেন সুকুমার তনু প্রভৃতি।

ছোটগল্পে নতুন শব্দ বা এপিটোনের ব্যবহার শব্দভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। যেমন—তৌল, সদ্যপক্ষোদ্‌ভিন্ন, স্রকচন্দন, ইদ্রিমিদ্রিভাব, খাব্‌সুরত, বৃটিশার, খাল্‌ক, যাম ঘোষের, দেখন-হাসি, অধোগতি-পন্থী, ছুটন, বিল্বৎটন, স্বর্গযাত্রী, গন্ডারমাসি, খোট্টা, মেড়ো, উড়ে, নেড়ে প্রভৃতি।

তদ্ভব—মাটি, কাঠের, পুঁথি, কাঁটা, মাঝে, চাঁদ, কাঁদিত, চোখের, বাছা, বুড়া, কাঁচা, মাথা, সাপ প্রভৃতি।

প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পে ধন্যাত্মক শব্দের সার্থক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন—খন্‌খন্‌, ফিসফিস, উসুখুসু, উড়উড়, দুরুদুরু, গম্‌গম্‌, ছম্‌ছম্‌, হাহি, ঢাকঢাক, নচ্‌নচ্‌ প্রভৃতি।

প্রমথনাথ বিশী বিভিন্ন ছোটগল্পে আরবি শব্দের সার্থক প্রয়োগ করেছেন। যেমন—তাজ্জব, কলম, জেলা, কিতাব, কেচ্ছা, আক্কেল, নবাব, জবাব, জল্লাদ, হাওয়া, ওজোর, নজর, হুকা, জমা, বিদায়, মোক্ষম, দফা, আতর, আদালত, আইন, আয়েশ ইত্যাদি।

ছোটগল্পে বিদেশী ফারসি শব্দের সার্থক ব্যবহার আছে প্রমথনাথের অসংখ্য ছোটগল্পে। গল্প কাহিনীতে অসংখ্য ঐতিহাসিক উপাদান স্থান পেয়েছে। লেখক মোঘল যুগের ফার্সি ভাষাকে সার্থকভাবে স্থান দিয়েছেন তৎকালীন মোঘল ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলবার জন্য। যেমন—সিন্দুক, দুরবীন, জোর, পদ্মা, শহর, কামান, রেশম, জাহাজ, খেলনা, তোপ, বন্দুক, খুব, পেয়ালা, মজুর, আন্দাজ, জমি, হপ্তা, উকিল, বেশি, নগদ, কম, খরচ কুপন কার্তুজ, চাপরাশি প্রভৃতি।

প্রমথনাথের ছোটগল্পে তুর্কি শব্দের অভাব নেই। যেমন—বিবি, ঠাকুর, চাকু, বাহাদুর, বোচকা, কাঁচি, উর্দু, বেগম, গালিচা, তকমা, চিঠি, আলখাল্লা, কুলি, মুচলেকা, উজবুগ, দারোগা, কাবু, বাবা, প্রভৃতি।

পর্তুগিজ শব্দ প্রমথনাথের ছোটগল্পে স্থান পেয়ে শব্দের পরিধিকে বাড়িয়ে তুলেছে।

যেমন— বেহালা, বরগা, গরাদ, নিলাম, গুদাম, গির্জা, বোতল, তামাক, চাবি, কামিজ, কেরানি প্রভৃতি।

কিছু কিছু গল্পে ইংরেজি শব্দ সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন— পোর্ট, আর্দালি, জজ, শমন, সিনেমা, লণ্ঠন, লাট, ইস্টিশান, টিকিট, ফটো, টেরামাইসিন, থার্মোমিটার, পেনিসিলিন, পলিটিক্স প্রভৃতি।

ছোটগল্পে প্রশ্নবোধক বাক্যগুলি ভাষার সৌরভকে বাড়িয়ে তুলেছে। এরূপ সার্থক বাক্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল ঃ

"মুক্তি? নানা কে? সিপাহী বিদ্রোহের নেতা কে? বিবি ঘরের হত্যাকারী কে?"[৪১]

প্রশ্নবোধক এই বাক্যগুলির গভীর বিন্যাস ব্যক্ত হয়েছে।

"লন্ডন ও এডিনবরায়? তোমার বন্ধু?"[৪২]

আলোচনার সূত্রধরে এই প্রশ্নবোধক বাক্য প্রশ্নকর্তার মনে চমক সৃষ্টি করেছে।

"হুজুর যুদ্ধে যাচ্ছি বলেই সত্য সত্যই যে লড়াই করতে হবে এমন কথা বাপের কোন্ সুপুত্র ভেবেছিল?"[৪৩]

আলোচ্য প্রশ্নবোধক বাক্যে বক্তার প্রতিবাদী চেতনা প্রকাশ পেয়েছে।

"ওয়াজেদ আলি বলিয়াছিল, কেন এখানে থাকলে ক্ষতি কি?

আমাদের যদি মেরে ফেলে?"[৪৪]

প্রশ্নবোধক বাক্যটিতে প্রকাশিত হয়েছে এক ভীতিকর পরিবেশ।

"কি মিঞা, কোথায় যাবে?

নশরৎ পুর। আপনি?"[৪৫]

পরস্পর দুজনের প্রশ্নোত্তর পর্ব আলোচ্য বাক্যে প্রকাশিত হয়েছে।

"পুরুষটি বলিল—পৃথিবী! সে আবার কি? সে কোথায়?"[৪৬]

এক অনাগত রহস্য উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে আলোচ্য বাক্যটি ব্যঞ্জনা বহন করেছে।

"ডাক্তার—কেন? আপনি তাদের অপমান করেছেন, তাদের জন্মগত অধিকারের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য করছেন, তারা চুপ করে থাকবে?"[৪৭]

প্রতিবাদী চেতনা আলোচ্য প্রশ্নবোধক সংলাপ অংশে উচ্চারিত।

"বেগম শমরুর তোষাখানার নাম শোন নি?"[৪৮]

প্রশ্নকর্তা এক নতুন প্রশ্নের উপস্থাপন করেছেন আলোচ্য প্রশ্নবোধক বাক্যে।

"হত্যা করার অর্থ কি? দুগ্ধ হইতে নবনীকে পৃথক করার মত হৃদয় হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করা—এই তো?"[৪৯]

"একবার মনে হইল ইনিই কি তিনি অর্থাৎ পঞ্চকোটের তান্ত্রিক প্রবর?"[৫০]

ব্যক্তি পরিচয় নির্ণয়ে আলোচ্য প্রশ্নবোধক বাক্যটি সার্থক।

"সম্পূর্ণকে সম্পূর্ণতর করিবার উপায় কি? রোহিত মৎসকে টানিলে কি তিনি মৎস্যে পরিণত হইবে?"[৫১]

এক কঠিন প্রশ্ন এই বাক্যে প্রকাশিত হয়েছে।

"কালিদাস বলিল—অগৌরবের স্মৃতি কে কীর্তন করিতে চায়?"[৫২]

বক্তার প্রশ্নবোধক বাক্যে এক গভীর জীবন জিজ্ঞাসা প্রকাশিত হয়েছে।

"রমা বলে—সুতপা দি, তুমি বিয়ে করো না কেন?"[৫৩]

এক মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন আলোচনা বাক্যে প্রকাশিত।

"আমাদের রতনমণি বাবু কি ঘুষ লইতেন?"[৫৪]

বক্তার চরিত্র রহস্য উদ্‌ঘাটনে আলোচ্য প্রশ্নবোধক বাক্যটি তাৎপর্যপূর্ণ।

"নরেশ বলিল—কিন্তু এত হাঙ্গামা করবার দরকার ছিল কি?"[৫৫]

প্রশ্নবোধক বাক্য আলোচ্য অংশে প্রদত্ত হয়েছে।

প্রমথনাথ ছোটগল্পে অব্যয় ব্যবহার করে ভাষার সৌরভকে বাড়িয়ে তুলেছেন। না বাচক বাক্য অর্থাৎ না, নাই, নেই, নয়, নি ইত্যাদি বাক্য ব্যবহারে ভাষার ঐশ্বর্যকে লেখক নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল ঃ—

"সাহস কি তোর একচেটিয়া না কি?"[৫৬]

"তুমিই বা চলে গেলে না কেন?"[৫৭]

"তারপরে বলে, এখন তামাশা রাখ, বিবিগুলোকে খুন না করতে পারা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।"[৫৮]

"রমণী এতক্ষণে ভীত হইয়াছে, বলিল—না, না, সে হইবে না, আজ রাত্রে আমি কিছুতেই নগরের দিকে যাইব না।"[৫৯]

"এই সরল সহজ অতিস্পষ্ট সত্যটা কিছুতেই তার মনে এল না।"[৬০]

"আপনি তো কাউকে জানাতে চান না।"[৬১]

"কেউ কাউকে রাজগীর ছেড়ে দিতে রাজি নয়। একবার তো মন্ত্রী হবার লোক খুঁজে পাওয়া যায় না।"[৬২]

"না, না প্রভু আপনাকে নয়, এই কথাগুলো তখন তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলাম।"[৬৩]

"ফস্টার বলিল—আর উহাকে ছাড়া রাখা উচিৎ নয়।"[৬৪]

"ওটা না ভূতের বাড়ি?"[৬৫]

"তাহার অভাবে আর যে হানিই হোক, অঙ্গহানি কখনোই হয় না।"[৬৬]

"এসব এমন কথা যার প্রমাণ নাই, অনুমানও বলা চলে না;"[৬৭]

"....না. ...না.......আমি বাইরে যাবো না....."[৬৮]

"না থাক, আর দরকার নেই।"[৬৯]

"শুনতে পেলাম না কেন?"[৭০]

"আমি পাখী ছাড়ব না।"[৭১]

"সকলের দেহ আছে কিন্তু কারও মাথা নেই! শোভাযাত্রার মাথা থাকলে বিদ্রোহ তেমন জমে না।"[৭২]

"অত সুখ সইবে না।"[৭৩]

সবপুরুষ তাদের অঙ্গে পশুচর্মের আচ্ছাদন, পৃষ্ঠে তৃণ স্কন্ধ লগ্ন ধনুক, দক্ষিণ হাতে দীর্ঘ বর্শা। বামহাতে বলগা; আর সকলকে ম্লান করিয়া দিতে পারে দেহের এমন জ্যোতির্ময় কান্তি, বর্ণ গৌর, প্রশান্ত ললাট, তীক্ষ্ম নাসিকা, দীর্ঘপ্রলম্বিত কেশ, মুখমণ্ডল গুম্ফাশ্মশ্রুহীন।"[৯১] আলোচ্য বর্ণনা অংশে অশ্বারোহী সেনাদের সামরিক সাজে সুসজ্জিত করে তাঁদের বর্ণনা অর্থাৎ দেহের কান্তি, বর্ণ ললাট, নাসিকা, কেশ, মুখের বর্ণনাটি লেখকের কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

'তান্ত্রিক' গল্পে তান্ত্রিক বংশোদ্ভুত মহানন্দ ঠাকুরের অবয়ব বর্ণনা ঃ—

"লোকটি অত্যন্ত কৃশ, মুখের মধ্যে একটিও দাঁত নাই, নাক ও চোখ দুটিকে বাদ দিলে মুখমন্ডলের আগাগোড়াই সারিসারি বলি চিহ্নে পূর্ণ। আর এমন উন্নত নাসা ও উজ্জ্বল চোখ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। তার পরনে রক্তাম্বর গলায় কয়েক ছড়া ছোটবড় রুদ্রাক্ষ মালা, ললাটে রক্ত চন্দনের তিলক।"[৯২] প্রমথনাথের কলমে তান্ত্রিক এর সামগ্রিক চেহারাটি নিপুণভাবে তুলে ধরে গল্পটিতে একটি ভৌতিক পরিমন্ডল সৃষ্টির দক্ষতা প্রদর্শিত হয়েছে।

শমিতার রূপের বর্ণনা ঃ—

"অমিত দেখছিল সকালবেলার স্থলপদ্মের পাপড়ির মত শাড়িখানা পড়ে শমিতা ঘরে ফিরছে, গ্রীষ্মের দুপুর তখন আড়াইটে, রৌদ্রের তাপে গাল দুটি তপ্ত আভা, কপালে অযাচিত চূর্ণ-কুন্তল নানা বিচিত্র রেখায় লিপ্ত, কণ্ঠে স্বেদ বিন্দুর মুক্তার পাঁতি, চোখের কোণে ঈষৎ রক্তিমা।"[৯৩] লেখক এক বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশে শমিতা নামে এক মেয়ের সর্বাঙ্গে বিবর্ণ রূপের বর্ণনা দিয়েছেন।

ঃ বর্ণনা অংশ ঃ

গল্প মহালগ্ন গল্পের গুহার বর্ণনা "আলোতে গুহার ভিতরটা প্রকাশ পাইল, মাঝারি আকারের গুহা, নীচের পাথর সমতল, তার উপরে খান দুই কম্বল, একটি জল পাত্র, পাশে কিছু ফলমূল—আর কোথাও কিছু নাই।"[৯৪] ছোটগল্পকার প্রমথনাথ গুহার যে বর্ণনাটি তুলে ধরেছেন মনে হয় এটি কোনো কল্পিত গুহার চিত্র নয় বাস্তবের মাটি থেকে তুলে আনা গুহার বর্ণনাটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

"ঝুড়ির মধ্যে স্নিগ্ধ চিক্কন গঙ্গাব ইলিশগুলি চক্রাকারে সজ্জিত, ছোট, বড়, মাঝারি; কোনোটা বা তৃতীয়ার চন্দ্রকলা, কোনোটা বা চতুর্থীর, কোনোটা বা পঞ্চমীর, কোনোটা বা ষষ্ঠীর।"[৯৫] প্রমথনাথের বর্ণনাভঙ্গি অসাধারণ। ধ্বনি সামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দ প্রয়োগে বিশেষ লেখক দক্ষ। তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'গঙ্গার ইলিশ' ছোটগল্পে বিভিন্ন মাপের ইলিশের বর্ণনা।

'শকুন্তলা' গল্পে শরৎ প্রকৃতির বর্ণনা ঃ

"...শরৎকালের মাঝামাঝি বৃষ্টিবাদল কাটিয়া গিয়াছে—অথচ শীতের প্রভাব এখনো পড়ে নাই—ঘাসের ডগায় ডগায় শিশিরবিন্দু ঝলমল করা সকাল বেলা; দিগন্তে কুয়াশার ছোপ লাগিয়াছে—অথচ আকাশের নির্মল নীলে স্বচ্ছতম মেঘের অন্যতম চিহ্নও নাই!

নিখিল প্রকৃতি সদ্য-খনিত কুমারী সরসীর মতো কূলে কূলে পূর্ণ—এখনও তাহাতে প্রথম কলসটিও ডুবানো হয় নাই।"[৯৬] আলোচ্য ছোটগল্পে শরৎ এর সুন্দর সকালে প্রভাতের শিশির বিন্দু ও কুয়াশার নিখুঁত বর্ণনাটি লেখকের প্রকৃতি চেতনার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

উজ্জয়িনীর বর্ণনা ঃ "উজ্জয়িনী সুবৃহৎ নগর, তৎকালীন ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহৎ নগর। উজ্জয়িনীর একদিকে শিপ্রা নদী, তিনদিকে প্রাচীরে বেষ্টিত, মাঝে মাঝে বিরাট সব সিংহদ্বার। প্রাচীরের বাহিরে কতকদূর পর্যন্ত উচ্চ প্রান্তর, তারপর শস্যক্ষেত্র।"[৯৭] ইতিহাস প্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী নগরীর নিখুঁত বর্ণনা লেখকের কলমে চিত্রায়িত হয়েছে। এখানকার সিংহদুয়ার নদী প্রান্তর ও শস্যক্ষেত্র বেষ্টিত যে প্রকৃতির চিত্রটি 'অসমাপ্ত কাব্য' ছোটগল্পে স্থান পেয়েছে তা নিঃসন্দেহে অনবদ্য।

ঃ আপ্তপূর্ণ বাক্য ও প্রবাদ প্রবচন ঃ

প্রমথনাথ বিশী বিভিন্ন ছোটগল্পে পান্ডিত্যপূর্ণ বাক্য, সর্বজন স্বীকৃত শাণিত উজ্জ্বল বাগ্ ভঙ্গিমার সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত ভাব প্রকাশ করে ছোটগল্পের সাহিত্য মূল্য বাড়িয়ে তুলেছেন। প্রাচীনকাল থেকে এই ধরনের সুভাষণ সাহিত্যে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে এসেছে। কালের বিচারে ভাবগর্ভ ব্যঞ্জনা ও জীবন ভাবনায় প্রবাদ বাক্যগুলি পাঠক মনে স্থায়ী আসন অধিকার করে আছে। নিঃসন্দেহে এই ধরনের প্রবাদ বাক্যগুলি পাঠে পাঠকের মনোযোগ প্রসারিত হয় যে প্রবাদ বাক্যগুলির আবেদন চিরন্তন। গল্পের ঘটনা বিন্যাসে ও চরিত্রের ক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে পান্ডিত্য পূর্ণ প্রবাদধর্মী আপ্তপূর্ণ বাক্যগুলো গল্পের গঠনকে দৃঢ় পিনদ্ধ করেছে। কথা সাহিত্যে এই ধারার পূর্বসূরি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র, শরৎ পরবর্তী আধুনিক কথা সাহিত্যিকগণ সুভাষণকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রমথনাথের ছোটগল্পে এরূপ দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

"সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রাচুর্যের চির-বিরোধ।"[৯৮]

সৌন্দর্য ও প্রাচুর্য যে বিপরীত ধর্মী তা বোঝাতে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

"সৌন্দর্যের রহস্য মাত্রাজ্ঞান"[৯৯]—প্রকৃত সৌন্দর্যের স্বরূপ প্রকাশে প্রবাদটি সার্থক।

"গান্ধীবাদ হচ্ছে অহিংসার চরম, আর আনবিক বোমা হিংসার চরম।"[১০০]

হিংসা ও অহিংসা এই দুইয়ের পার্থক্য বোঝাতে প্রবাদটির সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

"কৌতূহল নারী চরিত্রের ধর্ম।"[১০১]

নারী মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যায় আলোচ্য প্রবাদটি সার্থক।

"মেয়েরা পৌরুষকে কামনা করে।"[১০২]

নারী চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে প্রবাদটি শিল্প সার্থক।

"দুঃখ দুর্বিষহ, নৈরাশ্য অসহ্য।"[১০৩]

"সুখ দৃষ্টির উপর নির্ভর করে না।"[১০৪]

দৃষ্টিহীন ব্যক্তিও সুখী হতে পারে এই অর্থে আলোচ্য প্রবাদটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

"স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি সতীত্ব ও অলঙ্কার।"[১০৫]

নারী চরিত্রের তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণে পান্ডিত্যপূর্ণ বাক্যটি সার্থক।

"গৃহিনী গৃহমুচ্যতে।"[১০৬]

বাসগৃহে গৃহিনীর আধিপত্য বিশ্লেষণে প্রবাদটি তাৎপর্যপূর্ণ।

"আত্মানাং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি।"[১০৭]

ধন প্রাচুর্য মানুষকে রক্ষা করে, এই অর্থে সংস্কৃত প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

"যথাপূর্বং যথাপরম্।"[১০৮]

আগে ও পরে কোনো বিবর্তন নেই বোঝাতে আলোচ্য প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

"তপস্যার কঠোরতা কিছু নয়, আবার বিলাসময় জীবনও কিছু নয়, এই দুইয়ের মধ্যবর্তী পথটাই জীবন সার্থকতার পথ।"[১০৯]

তপস্যা ও ভোগের মাঝামাঝি জীবন কাম্য বোঝাতে এই প্রবাদটি সার্থক।

"মেয়েদের শক্তি কণ্ঠে।"[১১০]

নারী শক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণে আলোচ্য উদ্ধৃতিটি প্রমথনাথের সার্থক সৃষ্টি।

"মিষ্টান্ন ইতরে জনা।"[১১১]

মিষ্টিভাষীদের প্রতি ব্যঙ্গ করে লেখা প্রবাদটি সার্থক।

"পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় অপরাধ নির্বুদ্ধিতা—স্মার্টনেস বা ফ্লেভারনেসের অভাব।"[১১২]

বুদ্ধিহীনের শক্তিহীনতার পরিচয় বোঝাতে আলোচ্য প্রবাদটি প্রমথনাথের সার্থক সৃষ্টি।

"কবি প্রেমিক ও চোরেরা রাত্রিকাল পছন্দ করে।"[১১৩]

ভাবুক, স্বপ্নবিলাসী ও অসৎরা তিমিরকে পছন্দ করে এই অর্থে প্রবাদটি সার্থক।

"বিধাতা পৃথিবীর খবর রাখেন না বলিয়াই পৃথিবীতে এত অনাচার।"[১১৪]

সৃষ্টিকর্তার প্রতি ব্যঙ্গ প্রকাশে এই উদ্ধৃতিটি অর্থবহ।

"ব্যবসা আর বেদান্ত—ও দুটো বড় কঠিন জিনিস।"[১১৫]

ধনলাভ ও জ্ঞানলাভ দুটিই তপস্যার ফল।

"শিল্পেই পূর্ণতা—পূর্ণতাই শান্তি।"[১১৬]

জীবনের জন্য শিল্প পূর্ণতা আনে একথা বোঝাতে আলোচ্য প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

"বাঘে যখন ধান খায় আর ডাক্তারে যখন ভগবানের নাম উচ্চারণ করে, তখন বুঝতে হবে সর্বনাশের আর অধিক বিলম্ব নেই।"[১১৭]

এক বিশেষ সংকটকালের বর্ণনায় আলোচ্য প্রবাদটি সার্থক।

"শিল্পীর কৌশলে মূর্তি জীবন্তবৎ।"[১১৮]

জীবনের সঙ্গে শিল্পের যোগস্থাপনে এই প্রবাদটি সার্থক।

"আত্মান্তর থেকে সৃষ্টি হয়েছে তার ধর্ম এবং শিল্প। এই জন্যই ধর্ম এবং শিল্প মূলত এক।"[১১৯]

ধর্মের সঙ্গে শিল্পের সম্বন্ধ প্রকাশে প্রবাদটি তাৎপর্যপূর্ণ।

"কিন্তু হিংসার পরীক্ষা আর মানুষের ইতিহাসের দীর্ঘতা সমান।"[১২০]

হিংসামুক্ত পৃথিবী কামনায় প্রবাদটি সার্থক।

"মৌনং সম্মতি লক্ষণম্।"[১২১]

এটি বহু প্রচলিত সংস্কৃত প্রবাদ। মৌনতাই যে সম্মতির প্রকাশ এটি বোঝাতে প্রমথনাথ আলোচ্য প্রবাদটি উপযুক্ত স্থানে প্রয়োগ করেছেন।

"পশুদের সকলের অপরের দ্রব্যে সমান অধিকার।"[১২২]

পশু সমাজে সম অধিকার বোঝাতে আলোচ্য প্রবাদটির সার্থক ব্যবহার হয়েছে।

"হ্রাস-বৃদ্ধি, উত্থান-পতন, জীবন ও মৃত্যু, প্রকৃতির নিয়ম।"[১২৩]

প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য নিরুপণের ক্ষেত্রে আলোচ্য প্রবাদটি সার্থক।

"মহৎকাব্যের ধর্মই এই যে, কাব্য পাঠ শেষ না হইয়া গেলে তাহার মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় না। কবি বীজবপন করে, রসিকচিত্ত তাহাকে রসবোধের দ্বারা লালন করিয়া বনস্পতিতে পরিণত করে।"[১২৪]

সহৃদয় সংবাদী পাঠক মহৎ কাব্য থেকে সাহিত্য রস আস্বাদন করে এটি বোঝাতে আলোচ্য উদ্ধৃতিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

"মহৎ সৌন্দর্যের মহৎ অবলম্বন।"[১২৫]

সৌন্দর্যতত্ত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটনে আলোচ্য উদ্ধৃতিটি তাৎপর্যপূর্ণ।

"ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বহন করে।"[১২৬]

ঈশ্বরের আশীর্বাদ সৌভাগ্য সুচক। এই সত্য কথাটি লেখক আলোচ্য উদ্ধৃতিটি অর্থবহ।

"জীর্ণবস্ত্র জীর্ণ দেহের মত নয়, জীর্ণ মানবতার সামিল।"[১২৯]

মানবতার অবক্ষয়ের স্বরূপ উদঘাটনে আলোচ্য পান্ডিত্যপূর্ণ বাক্যটি সার্থক।

"খনিতেই মণি থাকে।"[১৩০]

মণি সংগ্রহ যে অনায়াস লভ্য নয় একথা বোঝাতে আলোচ্য প্রবাদটি তাৎপর্যপূর্ণ।

"প্রয়োজনের তাগিদ হইতে আবিষ্কারের উদ্ভব।"[১৩১]

সৃষ্টির উদ্দেশ্য বোঝাতে আলোচ্য প্রবাদটি প্রমথনাথের সফল সৃষ্টি।

"অনন্ত ঐশ্বর্য, কল্পনাতীত সুখ।"[১৩২]

সুখের সঙ্গে ঐশ্বর্য সম্পর্কযুক্ত এই অর্থে পূর্ণ প্রবাদটি অনবদ্য।

"চর্মের দৃঢ়তাতেই মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব।"[১৩৩]

মানী ব্যক্তির মান রক্ষাতেই মনুষ্যত্বের বহিঃপ্রকাশ, এই অর্থ বোঝাতে ব্যঙ্গধর্মী বাক্যটি সার্থক।

"পুরুষ দুই জাতের। এক জাতের পুরুষ আছে যারা মেয়েদের হৃদয়ে আগুনের জোয়ার জাগিয়ে দিয়ে চলে যায়। দেওয়া তাদের স্বভাব নয়। অন্য জাতের পুরুষ চাঁদের মত পৃথিবীকে আবর্তন করে, ক্রমে তারা পৃথিবীরই এক দূরবিসর্পী অংশে পরিণত হয়, তাদের স্নিগ্ধ আলোকে পৃথিবীর অন্ধকার দূর করে।"[১৩৪]

পুরুষের শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে যারা হৃদয়বান তাঁরা মহান, হৃদয়হীন পুরুষ স্বার্থপর। এই অর্থ বোঝাতে প্রমথনাথের আলোচ্য বাক্যগুলি তাৎপর্যপূর্ণ।

"কাব্যের প্রাণ ব্যঞ্জনায়।"[১৩৫]

কাব্যের প্রাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আলোচ্য উদ্ধৃতিটি অভিনবত্বের দাবি রাখে।

"মেয়েদের যথার্থ সৌন্দর্য প্রকাশ পায় পিছন থেকে দেখায়।"[১৩৬]

প্রকৃত সুন্দরী নারী দুর্লভ এই সত্য বোঝাতে আলোচ্য প্রবাদটি সার্থক।

"যার নাই অন্য গতি তার আছে বারাণসী।"[১৩৭]

পুণ্যতীর্থভূমি অনেকের কাছে শান্তির পথনির্দেশ। প্রমথনাথের আলোচ্য প্রবাদটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

"সুতিকাগৃহের ভূমিষ্ঠ শিশুর ক্রন্দন না শুনিলে, যাহারা জন্ম ব্যাপারটাকে কল্পনা করিতে অসমর্থ, তাহারা উত্তম সমাজের জীব হইতে পারে, কিন্তু কাব্যে সমালোচনার অধিকারী নয়।"[১৩৮]

একমাত্র বাস্তববাদীরাই প্রকৃত অর্থে সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ যোগ্য একথা বোঝাতে আলোচ্য পান্ডিত্যপূর্ণ উদ্ধৃতিটি সার্থক।

"হৃদয়কে নাড়া দিতে পারে অনেক রমণী কিন্তু যার আবেগ কল্পনা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়, তাকে নাড়া দেয় এমন নারী দুর্লভ।"[১৩৯]

সেই নারী প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী যে কল্পনার স্বর্গ পথ রচনা করতে পারে এই তাৎপর্যপূর্ণ উদ্ধৃতিটি সার্থক।

"খাঁটি জিনিস হয়রে মাটি নেশার পরমাদে।"[১৪০]

বিপথগামিতা সুন্দরের মধ্যে বিভীষিকা ডেকে আনে। এটি বোঝাতে প্রমথনাথের আলোচ্য উদ্ধৃতিটি প্রশংসার দাবি রাখে।

বলতে গেলে প্রমথনাথের প্রবাদ বাক্যগুলো সংগ্রহ করলে একটি বাংলা উদ্ধৃতিকোষ গ্রন্থ রচিত হতে পারে। তিনি তাঁর কথাসাহিত্যে। কিছু প্রবাদ বাক্য সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরাজি প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছেন। তাঁর সৃষ্ট মৌলিক প্রবাদ প্রবচন ও পান্ডিত্যপূর্ণ বাক্যগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

প্রমথনাথ বিশীর অসংখ্য ছোটগল্পে ছড়া, ধাঁধা সার্থকভাবে ব্যবহার করে ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন। যে ছড়া গুলি রসাবেদন অনবদ্য এবং কবি হিসাবে প্রমথনাথের পরিচায়ক, তাঁর আশ্চর্য সুন্দর ছড়াগুলি শিশুমনের উপযোগী। প্রমথনাথ শিশুদের মন স্পর্শ করবার জন্য সহজ সরল ভাষায় যে ছড়াগুলি ছোটগল্পে সংযোজন করেছেন সেখানে নেই কোনো রাজনীতি, ধর্ম ও দর্শনের জটিল বিষয়। প্রমথনাথের ছোটগল্পে প্রকাশ ভঙ্গিতে ছড়া ও ধাঁধার সংযোজন শিশু মনে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

প্রমথনাথের 'নূতন বজ্র' ছোটগল্পে সংযোজিত হয়েছে নিম্নোক্ত ছড়াটি—

"যতদিন প্রাণ আছে চলিতে পারি
ফেলিব সবারে গণিতে পারি
যত দেশ আছে বিকোতে পারি

যত ছেলে আছে বকাতে পারি
দেশের জন্য ঠকাতে পারি
ক্রমে হবে মোর ওজন ভারী
তবে আর কি বা চাই
পরানের সাধ তাই।"[১৪১]

ছড়াটিতে ভাবের সঙ্গে ছন্দের মিল এনে ছোট ছোট টুকরো ইমেজ অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। ছড়াগুলিতে ধ্বনিশ্রী ও শ্রুতিসুখ সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নোক্ত ছড়াটি প্রমথনাথের অনবদ্য সৃষ্টি—

"টা-টা
দেব সোনার বাটা
উঠছে না ওর পাটা
মিছামিছি চাঁটা।"[১৪২]

বিশেষণ প্রয়োগ করে ছড়াটির কাব্য সৌন্দর্য শিশুদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হতে পেরেছে। ছড়াটির বর্ণনা ভঙ্গিটিও অনবদ্য।

শিশু মনের উপযোগী নিম্নলিখিত ধাঁধাগুলি ছোটগল্পে অভিনবত্ব এনেছে। যেমন—

"কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে
কাঠার কুড়বা কাঠায় লিজ্জে
কাঠায় কাঠায় ধুল পরিমাণ
বিষ গড়া হয় কাঠার প্রমাণ
গন্ডা বাকি থাকে যদি কাঠা মেলে পর
ষোল দিনে পুরে তারে সারা গন্ডাধর।"[১৪৩]

ভারতীয় পুরাণ ও প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি ছোটদের শ্রদ্ধা চিরকাল। ভাষার কারিগর প্রমথনাথ বিশীর শিশু মনের উপযোগী নিম্নোক্ত ছড়া দুটি শিশুদের মুখে মুখে উচ্চারিত হত। চাচাতুয়া পাখিটির সুমিষ্ট কণ্ঠে গাওয়া ছড়া দুটিও শিল্প সমৃদ্ধ সন্দেহ নেই। রাধাকৃষ্ণ বলরে ভাই ও আল্লাতাল্লা বল মিঞা এই ছড়া দুটি শিশুদের একান্ত প্রিয়।

'দর্শনী' ছোটগল্পের ছড়াটিও অনবদ্যঃ
"চুলের কাঁটায় ফুলের কাঁটায় প্রভেদ গেল ঘুচি,
উঠল ফুটে প্রেমের গুলাপ হৃদয় রক্তরুচি।"[১৪৪]

'শার্দূল' ছোটগল্পটি শিল্প সার্থক হতে পেরেছে সুরেনের পাঁঠা চুরির রহস্য উদ্‌ঘাটনের পর। অত্যন্ত সহজ সরল ছন্দে সুরেনের জীবনে অনিবার্য ট্রাজেডি নিম্নোক্ত ছড়ার মাধ্যমে লেখক প্রকাশ করেছেন যা শিশু মনে গভীর ছাপ এঁকে দেয়। মনোরম ভঙ্গিতে মজা সৃষ্টির কৌশলের অভাব প্রমথনাথের ছিল না। ছড়াটি নিম্নে প্রদত্ত হল।—

"তুই দাঁত বাঁধালি কি যাবি?
জল হাওয়া কি চিবাবি?

বাঁধানো দাঁত বিক্রি কর;
পাঁঠা কিনে আনগে ঘর
সে পাঁঠা তুই কেমনে খাবি,
কি দিয়ে তুই দাঁত বাঁধাবি
পাঁঠার মত পাঁঠা গেল
দাঁতের মত দাঁত,
সুরেন কুপোকাৎ।"[১৪৫]
রামপ্রসাদী সুরে গুনগুন করে গান ধরে সুরেন—
"ওরে, থাকতে গাঁয়ে পাঁঠা খাসি
মোর বাঁধন দাঁত রয় উপোসী?
এমনি করে চিবিয়ে হাড়
জোড়াদীঘি করব উজাড়।
এই বুঝেছি তত্ত্বসার।
আমি চাইনি কাশী
থাকতে গাঁয়ে পাঁঠা খাসি।"[১৪৬]

ছড়া গানটিতে লেখক পরিবেশন করেছেন নির্মল হাস্য রস। বলা বাহুল্য এই হাসি শুধুমাত্র শিশুদের জন্যই নয় সর্বস্তরের মানুষের মনে হাস্যরস সৃষ্টি হয়। সাহিত্য সমালোচক আশা গঙ্গোপাধ্যায় 'শিশু সাহিত্যের তত্ত্ব' প্রসঙ্গে লিখেছেন "যথার্থ শিশুসাহিত্য বলিতে তাহাই বুঝিব, যাহা সর্ব বয়সের নর-নারীর কাছেই একটি রসাস্বাদ আনিয়া দেয়, বয়সের পার্থক্য অনুসারে আস্বাদনের ব্যাপারে কিছু বিভিন্নতা ঘটিতে পারে—কিন্তু শিল্প গুণ তাহাতে থাকিবে।"[১৪৭]

প্রমথনাথের 'ছিন্ন দলিল' ছোটগল্পে হিন্দি ও ইংরাজি মিশ্র ভাষায় লেখা ছড়াটি অনবদ্য সন্দেহ নেইঃ

"ইওর অনার সেভ আস্
হামলোক্ লেবার হ্যায়
শালালোগ হাম লোগকো এক দম মার ডালা
ওয়ান মান্থ ইন্ দিস্ হাউস নো ফুড, নো স্লিপ।"[১৪৮]

এছাড়া 'ন-ন-লৌ-ব-লি', 'পেশকার বাবু', 'সেকান্দার শার প্রত্যাবর্তন', 'রামায়ণের নূতন ভাষ্য' প্রভৃতি ছোটগল্পের কবিতাগুলিও ছোটগল্পের আঙ্গিক বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে।

প্রমথনাথ ছিলেন গজল প্রিয়। গজল গানগুলি তিনি তাঁর ছোটগল্পে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। এরূপ দুটি গান একটি বুলবুলির কণ্ঠে গাওয়া অন্যটি বাহাদুর খাঁর কণ্ঠসঙ্গীত 'বাহাদুর শার বুলবুলি' ছোটগল্পটিকে শিল্পগুণ সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

বুলবুলির গাওয়া গজল গান—
"আনার কলির শরাব পিয়ে

উঠল ডেকে বুলবুলি
সুরের রেশে উঠল জেগে
ঘুমিয়ে পড়া ফুলগুলি।
নিদমহলে খুলল চাবি
পরাণে আজ রঙ বাতাবি,
অলোক পরী ওড়না খুলে
বেড়ায় ঘুরে চুলবুলি।"[১৪৯]

এরূপ আর একটি গজল বাদশা বাহাদুর শার কণ্ঠে আমরা শুনতে পাই—

"সোনার খাঁচায় কিসের লোভে
ঢুকবে বল শায়ের পাখী
সুরের নেশায় মাতাল যারা
তাদের আবার দুঃখটা কি?
অলোক বসন বুনছে যারা,
রামধনুকে ধুনছে যারা
চাঁদের কাপাস এই দুনিয়ায়
তাদের আবার অভাবটা কি!"[১৫০]

প্রমথনাথ ইংরেজি বাংলা মিশ্রিত বাক্য পরিবেশনে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। নিম্নোক্ত সংলাপ অংশটি তার সার্থক পরিচয় বহন করেঃ

"ডাক্তার—কিন্তু মিঃ দাস, লোকে আপনাকে পাগল বলবে, কারণ আপনি hopless minority- তে—

বাঙালি এখনও মনে মনে গ্রাম্য, ইহাই বাঙালির 'ব্যাক-টু-ভিলেজ'।"[১৫১]

রোগীরা পারফেক্টলি নর্ম্যাল হয়েছে। ইলেকটোর লুন্যাসিগাখের রিডিং।"[১৫২]

"আরে তুম কিধার যাতা?

এ কোথায় চলল?

Where are you going to?"[১৫৩]

একই বক্তব্য হিন্দি, বাংলা, ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। ছোটগল্পের ভাষাগত বৈচিত্র্য প্রকাশে প্রমথনাথের প্রতিভা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়

আধুনিক কথাসাহিত্যিকগণ তাদের সাহিত্যে হিন্দি ভাষার সার্থক সংযোজন ঘটিয়েছেন। বাংলা ছোটগল্পে হিন্দি সংলাপগুলো যে চরিত্রের মুখে দিয়েছেন তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে সার্থক সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন—হিন্দি ভাষার সংলাপ ঃ

"তুম ক্যা কর রাহা হ্যাঁয়। আভি ঘুমকে চলো।

"..... বেরেলি কি বাজার মে পানী গিরারে—আউর লাঠি গিরারে।"

(বেরেলির সঙ্গীতে)

নেহি, নেহি মুখার্জি-উখার্জি কিসিকো হাম জানতা নেহি। আভি ভাগো।"[১৫৪]

দারোয়ানজির ভোজপুরী ভাষা সার্থকভাবে 'লেখক' ছোটগল্পে ব্যবহার করেছেন—

"কিধার যা রহে হেঁ সাহাব?
ঘুমনে কে লায়েক জায়গা হ্যাঁয় খাস লেকিন উধার মৎ যাইয়ে হুজুর।
উধার মৎ যাইয়ে সাহেব।
একঠো পাগলা আদমি আয়া হ্যাঁয়।"[১৫৫]

এরূপ আরও একাধিক হিন্দি সংলাপ প্রদত্ত হল ঃ

"রামদীন বলিল, হুজুর, কোচম্যান লোক নেহি আয়া হ্যাঁয়।"
—কেঁও?
—মালুম নেহি হুজুর। শুনতা শহরমে হল্লা হো রহা হ্যাঁয়।
—হল্লা! কিস্‌কা হল্লা?
— কেয়া জানতা হুজুর। সিপাহী লোক হল্লা কিয়া থা।"[১৫৬]

"দুনিয়াতো এক আজব চিড়িয়াখানা হ্যাঁয়। ঔর গোড় উসমে বন্দর কা মোকামা সীয়ারাম। সীয়ারাম।"[১৫৭]

"কুর্ণিশ পেশবা সাহেব, বাঁদিকো বিদায় দিজিয়ে।"[১৫৮]

সাহিত্যে অশ্লীল ভাষা অনেক সময় সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়। চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশে অশ্লীল ভাষা শিল্পগুণের পরিচয় বহন করে। এরূপ দু-একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলে ধরছি ঃ

যুযুধানোদ্বয়ের কলহঃ
"—তবে রে শালা!
আয় না হারামজাদা।"[১৫৯]

"আজ শালার দুঃশাসনের রক্ত পান করব।"[১৬০]

"তবে রে শালা, ঠকিয়ে পয়সা আদায় করতে এসেছ।"[১৬১]

বিভিন্ন ছোটগল্প থেকে সংগৃহীত এই সংলাপগুলো ছোটগল্পের রসহানি ঘটায়নি বরং শিল্প সার্থক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে সন্দেহ নেই।

প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পের আঙ্গিক ও প্রকরণ কৌশল নিঃসন্দেহে রসোত্তীর্ণ ছোটগল্পে পরিণত করেছেন। প্রকাশ কৌশলগত বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে প্রমথনাথের সাফল্য প্রশংসনীয় একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

উল্লেখপঞ্জী

(১) বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ—বীরেন্দ্র দত্ত—পৃঃ ৭১৮

(২) তদেব—পৃঃ ৬

(৩) সাহিত্য প্রকরণ—হীরেন চট্টোপাধ্যায়—পৃঃ ২২৯

(৪) চাপাটি ও পদ্ম - গুলাব সিংয়ের পিস্তল—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৮২

(৫) চাপাটি ও পদ্ম - প্রায়শ্চিত্ত—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১০৩

(৬) চাপাটি ও পদ্ম - অভিশাপ—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৪২

(৭) প্র. না. বি-র নিকৃষ্ট গল্প - সাবানের টুকরো—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২১

(৮) নীরস গল্প সঞ্চয়ন - অশরীরী—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৭৭

(৯) নীরস গল্প সঞ্চয়ন - ডাকিনী—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৪৫

(১০) গল্প পঞ্চাশৎ - বেগম শমরুর তোষাখানা—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৫৩

(১১) গল্প পঞ্চাশৎ - বাল্মীকির পুনর্জন্ম—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২৭

(১২) গল্প পঞ্চাশৎ - যমরাজের ছুটি— প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৮০

(১৩) অশরীরী - শুভদৃষ্টি—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২৭

(১৪) অশরীরী - স্বপ্নলব্ধ কাহিনী—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৫২

(১৫) অশরীরী - কালো পাখী—প্রমথননাথ বিশী—পৃঃ ৩৭

(১৬) অনেক আগে অনেক দূরে - কোতলে আম—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২৫

(১৭) নীরস গল্প সঞ্চয়ন - উল্টা গাড়ী—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৪৭

(১৮) প্র. না. বি.-র নিকৃষ্টতর গল্প - খড়ম—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৬২

(১৯) প্র. না. বি-র নিকৃষ্টতর গল্প - ছেঁড়াকাঁথা ও লাখ টাকা—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৩৪

(২০) গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড - আরোগ্য স্নান—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৪৯

(২১) নীরস গল্প সঞ্চয়ন - নগেন হাঁড়ির ঢোল—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৭২

(২২) স্বনির্বাচিত গল্প - অসমাপ্ত কাব্য—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৭

(২৩) স্বনির্বাচিত গল্প - মহেন-জো-দড়োর পতন—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৪১

(২৪) গালি ও গল্প - প্র. না. বি-র সঙ্গে ইন্টারভিউ—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৭৭

(২৫) চাপাটি ও পদ্ম - কোকিল—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৩৭

(২৬) ডাকিনী - ডাকিনী—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২৩

(২৭) প্র. না. বি-র নিকৃষ্টগল্প - চেতাবনী—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৩

(২৮) অনেক আগে অনেক দূরে - দর্শনী—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৪৪

(২৯) প্র. না. বি-র নিকৃষ্টগল্প - সাবানের টুকরো—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৯

(৩০) অনেক আগে অনেক দূরে - কোতলে আম—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২৮

(৩১) অনেক আগে অনেক দূরে - পরী—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১০

(৩২) গল্প পঞ্চাশৎ - স্বপ্নলব্ধ কাহিনী—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৬০

(৩৩) যা হলে হতে পারতো - রক্তাতঙ্ক—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১২৬
(৩৪) তদেব - রক্তাতঙ্ক—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১২৬
(৩৫) নীরস গল্প সঞ্চয়ন - ঋণজাতক—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৭
(৩৬) নীরস গল্প সঞ্চয়ন - যন্ত্রের বিদ্রোহ—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১১৫
(৩৭) নীরস গল্প সঞ্চয়ণ - কীটাণুতত্ত্ব—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৫৭
(৩৮) গল্প পঞ্চাশৎ - বিনা টিকিটের যাত্রী—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৮৪
(৩৯) গালি ও গল্প - চারজন মানুষ ও একখানা তক্তপোষ—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৮৯
(৪০) চাপাটি ও পদ্ম - প্রায়শ্চিত্ত—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৩০
(৪১) চাপাটি ও পদ্ম - নানাসাহেব—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৬৯
(৪২) চাপাটি ও পদ্ম - জেমি গ্রীনের আত্মকথা—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২৪
(৪৩) প্রমথনাথ বিশীর স্বনির্বাচিত গল্প - ছিন্নদলিল—প্রমথনাথ বিশী —পৃঃ ৪৯
(৪৪) চাপাটি ও পদ্ম - মড়্—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৮১
(৪৫) নীরস গল্প সঞ্চয়ন - গোষ্পদ—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২৭১
(৪৬) নীরস গল্প সঞ্চয়ন - কল্কি—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২৮২
(৪৭) গালি ও গল্প - সত্য মিথ্যা কথা—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১০৫
(৪৮) গল্প পঞ্চাশৎ - বেগম শমরুর তোষাখানা—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১১
(৪৯) গল্প পঞ্চাশৎ - মহামতি রাম ফাঁসুড়ে—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২০৮
(৫০) গল্প পঞ্চাশৎ - তান্ত্রিক—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২৯১
(৫১) অনেক আগে অনেক দূরে - অসমাপ্ত কাব্য—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৪০
(৫২) অনেক আগে অনেক দূরে - যক্ষের প্রত্যাবর্তন—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৩৭
(৫৩) প্রমথনাথ বিশীর স্বনির্বাচিত গল্প - সুতপা—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৯৮
(৫৪) প্র. না. বি-র নিকৃষ্ট গল্প - পেশকারবাবু—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৪০
(৫৫) প্র. না. বি-র নিকৃষ্ট গল্প - গদাধর পণ্ডিত—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৫১
(৫৬) অনেক আগে অনেক দূরে - কোতলে আম—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২৮
(৫৭) অনেক আগে অনেক দূরে - দর্শনী—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৪৪
(৫৮) অনেক আগে অনেক দূরে - তিনহাসি—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৬৩
(৫৯) অনেক আগে অনেক দূরে - মহালগ্ন—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১২৯-৩০
(৬০) অনেক আগে অনেক দূরে - নাদির শা-র পরাজয়—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৯৯
(৬১) নীলবর্ণ শৃগাল - অবচেতন—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৩
(৬২) নীলবর্ণ শৃগাল - সেকেন্দার শার প্রত্যাবর্তন—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২৭
(৬৩) নীলবর্ণ শৃগাল - সেই সন্ন্যাসীটির কি হইল—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৫০
(৬৪) নীলবর্ণ শৃগাল - ভৌতিক চক্ষু—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৬২
(৬৫) নীলবর্ণ শৃগাল - পাশের বাড়ি—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১২৪
(৬৬) প্রমথনাথ বিশীর স্বনির্বাচিত গল্প - অসমাপ্ত কাব্য—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২৮

(১০১) গালি ও গল্প - কল্কি—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৯৯
(১০২) গালি ও গল্প - টেনিস কোর্টের কান্ড—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৮৯
(১০৩) গালি ও গল্প - বিপত্নীক—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৩০
(১০৪) নীলবর্ণ শৃগাল - অদৃষ্ট-সুখী—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৭১
(১০৫) নীলবর্ণ শৃগাল - অলঙ্কার—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৬৬
(১০৬) নীলবর্ণ শৃগাল - গৃহিণী গৃহমুচ্যতে—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৮০
(১০৭) নীলবর্ণ শৃগাল - গৃহিণী গৃহমুচ্যতে—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৮২
(১০৮) নীলবর্ণ শৃগাল - চিলা রায়ের গড়—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১০৫
(১০৯) নীলবর্ণ শৃগাল - সেই সন্ন্যাসীটির কি হইল—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৫১
(১১০) যা হলে হতে পারতো - রক্তাতঙ্ক—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১২৫
(১১১) যা হলে হতে পারতো - ছাপ সন্দেশ—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৪০
(১১২) শ্রীকান্তের ষষ্ঠপর্ব - সদা সত্য কথা কহিবে—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১২২
(১১৩) গল্পসমগ্র - পরিস্থিতি—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৩৩
(১১৪) নীরস গল্প সঞ্চয়ন - কীটাণুতত্ত্ব—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৫৭
(১১৫) গল্প সমগ্র - প্রফেসার রামমূর্তি—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৮০
(১১৬) গল্প সমগ্র - অতিসাধারণ ঘটনা—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৯৪
(১১৭) তদেব - তদেব—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৯৮
(১১৮) তদেব-টেনিস-কোর্টের কান্ড—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২৩৫
(১১৯) তদেব - প্র. না. বি-র সঙ্গে ইন্টারভিউ—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২৩৭
(১২০) গালি ও গল্প - ইংলন্ডকে স্বাধীনতা দানের চেষ্টা—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১০৭
(১২১) যা হলে হতে পারতো - ছাপ সন্দেশ—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৩৩
(১২২) যা হলে হতে পারতো - পশু শিক্ষালয়—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৯
(১২৩) প্র. না. বি-র স্বনির্বাচিত গল্প - মহেন-জো-দড়োর পতন—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৪০
(১২৪) প্র. না. বি-র স্বনির্বাচিত গল্প - অসমাপ্ত কাব্য—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২০
(১২৫) প্র. না. বি-র স্বনির্বাচিত গল্প - অসমাপ্ত কাব্য—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২০
(১২৬) প্র. না. বি-র স্বনির্বাচিত গল্প - পূর্ব কথা—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৩
(১২৭) গল্প পঞ্চাশৎ - তুক—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২৯
(১২৮) গল্প পঞ্চাশৎ - তুক—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৩০
(১২৯) গল্প পঞ্চাশৎ - বস্ত্রের বিদ্রোহ—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৫৯
(১৩০) গল্প পঞ্চাশৎ - ছবি—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৭৬
(১৩১) গালি ও গল্প - ইয়াসিন শর্মা এন্ড কোং—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৩৩
(১৩২) গালি ও গল্প - কল্কি—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৯৫
(১৩৩) গল্প পঞ্চাশৎ - গন্ডার—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৪১৭
(১৩৪) প্র. না. বি-র স্বনির্বাচিত গল্প - সুতপা—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৯৭

(১৩৫) প্র. না. বি-র স্বনির্বাচিত গল্প - অসমাপ্ত কাব্য—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২০
(১৩৬) গল্প পঞ্চাশৎ - সতীন—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৩৫৫
(১৩৭) চাপাটি ও পদ্ম - প্রায়শ্চিত্ত—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১২৫
(১৩৮) প্র. না. বি-র স্বনির্বাচিত গল্প - অসমাপ্ত কাব্য—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২১
(১৩৯) প্র. না. বি-র স্বনির্বাচিত গল্প - অসমাপ্ত কাব্য—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২৪
(১৪০) যা হলে হতে পারতো - এক টিন খাঁটি ঘি—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৫৬
(১৪১) গালি ও গল্প - নূতন বজ্র—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৮১
(১৪২) নীলবর্ণ শৃগাল - সেকেন্দার শা-র প্রত্যাবর্তন—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৩৭
(১৪৩) নীলবর্ণ শৃগাল - সেকেন্দার শা-র প্রত্যাবর্তন—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৩২
(১৪৪) অনেক আগে অনেক দূরে - দর্শনী—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৪৭
(১৪৫) গল্প পঞ্চাশৎ - শার্দুল—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৭২
(১৪৬) গল্প পঞ্চাশৎ - শার্দুল—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৭৩
(১৪৭) বাংলা শিশু সাহিত্য তথ্য তত্ত্ব রূপ ও বিশ্লেষণ - নবেন্দু সেন—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২
(১৪৮) প্র. না. বি-র স্বনির্বাচিত গল্প - ছিন্ন দলিল—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৬৫
(১৪৯) অনেক আগে অনেক দূরে - বাহাদুর শার বুলবুলি—প্রমথনাথ বিশী পৃঃ ২১৭
(১৫০) অনেক আগে অনেক দূরে - বাহাদুর শার বুলবুলি—প্রমথনাথ বিশী পৃঃ ২১৮
(১৫১) গালি ও গল্প - সত্য মিথ্যা কথা—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৭৬
(১৫২) যা হলে হতে পারতো - দৃষ্টিভেদে—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৯০
(১৫৩) গালি ও গল্প - এ্যাক্সিডেন্ট—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২৯
(১৫৪) নীলবর্ণ শৃগাল - জামার মাপে মানুষ—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৪৯
(১৫৫) নীলবর্ণ শৃগাল - অবচেতন—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৬৭
(১৫৬) চাপাটি ও পদ্ম - সেই শিশুটি—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৪
(১৫৭) অনেক আগে অনেক দূরে - ধনে পাতা—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৮১
(১৫৮) চাপাটি ও পদ্ম - প্রায়শ্চিত্ত—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১২৮
(১৫৯) নীলবর্ণ শৃগাল - সংস্কৃতি—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৩৪
(১৬০) যা হলে হতে পারতো - দৃষ্টিভেদে—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৯০
(১৬১) গল্প পঞ্চাশৎ - বেগম শমরুর তোষাখানা—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৫৭

পঞ্চম অধ্যায়

প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্প বনাম সমকালীন নির্বাচিত কয়েকজন লেখকের ছোটগল্প-তুলনামূলক পর্যালোচনা

একজন লেখক যখন লেখেন, সেই সময়ে তাঁর চারপাশে আরো অনেক লেখক থাকেন। প্রমথনাথ যখন ছোটগল্পকার হিসাবে আবির্ভূত হন তখন লেখকদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ছোটগল্পকার হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পরশুরাম, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এর পাশাপাশি 'কল্লোল' পর্বের লেখকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ লেখকের কথা স্মরণযোগ্য। তাছাড়া গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, সৈয়দ মুজতবা আলীর মতো লেখকও আছেন—যাঁরা এককভাবে ছোটগল্প রচনার ব্রতী ছিলেন। বস্তুত, প্রমথনাথ এমন এক সময় ছোটগল্পকার হিসেবে আবির্ভূত হন যখন রবীন্দ্র - প্রভাতকুমার পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পের ধারা উপরোক্ত লেখকদের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

উপরোক্ত কয়েকজন লেখকের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনাসূত্রে বাংলা ছোটগল্পের গতিপ্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রমথনাথের ছোটগল্পের মৌলিকতা পর্যালোচনা করাই হবে এই অধ্যায়ের লক্ষ্য।

প্রমথনাথ বিশী ও পরশুরামের ছোটগল্পের তুলনামূলক আলোচনা

প্রমথনাথ বিশী ও পরশুরাম ওরফে রাজশেখর বসু দুইজন রবীন্দ্রযুগের শিল্পী। দুজন শিল্পী বাংলা ছোটগল্পের জগতে ব্যঙ্গ কৌতুকাশ্রয়ী গল্প লিখে বিশিষ্টতা অর্জন করতে পেরেছেন। প্রমথনাথ ও পরশুরাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত কাল পরে মূল্যবোধ ও শিল্পরূপের যে বিবর্তন ঘটেছিল আপন অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা তার মর্মোদ্‌ঘাটন করেছেন দুইজন শিল্পী ভাবাবেগে বিশ্বাসী না হয়ে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের আমদানি করেছেন বলা বাহুল্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় যে হাস্যরসের ধারাকে ছোটগল্পের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন পরশুরাম ও প্রমথনাথ বিশী তাকে পরিপুষ্ট করে তুলেছেন।

প্রমথনাথ বিশী রঙ্গব্যঙ্গ ও কৌতুকধর্মী ছোটগল্প লিখলেও তিনি ঐতিহাসিক, অতিলৌকিক, গভীর জীবনবোধ, রাজনীতি ও শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ছোটগল্প লিখে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রমথনাথের মতো বিচিত্রধর্মী সাহিত্য স্রষ্টা হিসাবে হাসির গল্পের সম্রাট পরশুরামও ছোটগল্পের জগতে বিশেষ পরিচিত।

প্রমথনাথের গল্পগ্রন্থ সর্বমোট একুশটি। গ্রন্থগুলিতে তিন শতাধিক ছোটগল্প স্থান

পেয়েছে। পরশুরামের নয়টি গল্প গ্রন্থে মোট গল্প সংখ্যা সাতানব্বইটি। তাঁর গল্পের বর্গীকরণ আমরা নিম্নলিখিত ভাবে করতে পারি।

'ক' সাধু, গুরু ভবিষ্যৎ-বক্তা প্রভৃতি ঃ 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', 'বিরিঞ্চি বাবা', 'গুরুবিদায়', 'ভবতোষ ঠাকুর', প্রাচীন কথা (দ্বিতীয় গল্প) গণৎকার, 'চোর' প্রভৃতি ছোটগল্প।

'খ' নরনারীর বিচিত্র সম্পর্ক প্রেম বিবাহ প্রভৃতি ঃ 'ভুষন্ডীর মাঠে', 'চিকিৎসা সংকট', 'লম্বকর্ণ', 'হনুমানের স্বপ্ন', 'পুনর্মিলন', 'ধুস্তরী মায়া', 'পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী', 'নিকষিত হেম', 'তিলোত্তমা', 'জটাধরের বিপদ', 'রাজমহিষী', 'অদল বদল', 'চমৎকুমারী', 'যশোমতী' ও 'বুলবুলিস্তান' প্রভৃতি ছোটগল্প।

'গ' সাহিত্যাদর্শ ও সাহিত্যিক ঃ 'কচিসংবাদ', 'প্রেমচক্র', 'বটেশ্বরের অবদান', 'আতার পায়েস', 'নীলকণ্ঠ', 'জয়রাম জয়ন্তী', 'গুণীসাহেব', 'কাশীনাথের জন্মান্তর' ও 'চাঙ্গায়নী সুধা', 'দ্বান্দ্বিক কবিতা' ও 'দুই সিংহ' প্রভৃতি ছোটগল্প।

'ঘ' আদর্শমানুষ ও মানবধর্ম ঃ 'জারবিল', 'অটলবাবুর অন্তিম চিন্তা', 'ভবতোষ ঠাকুর', 'নির্মোক নৃত্য', 'সত্যসন্ধ বিনায়ক', 'মহেশের মহাযাত্রা', 'ভূষণ পাল' ও 'দশকরণের বানপ্রস্থ' প্রভৃতি।

'ঙ' কল্প-বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ ঃ 'অমানুষ জাতির কথা', 'গগন চটি' ও 'মাঙ্গলিক' প্রভৃতি ছোটগল্প।

'চ' রাজনীতি - সমাজনীতি - অর্থনীতি বিষয়ক ঃ 'রামরাজ্য', 'উলট পুরাণ', 'পরশপাথর', 'সাড়ে সাত লাখ', 'বদন চৌধুরীর শোকসভা' ও 'সিদ্ধিনাথের প্রলাপ' প্রভৃতি ছোটগল্প।

'ছ' পুরাতন মুসলমানী বিষয় ঃ 'গুলবনিস্তান' ও 'উপেক্ষিত' প্রভৃতি ছোটগল্প।

'জ' পুরাণ বিষয়ক ঃ 'হনুমানের স্বপ্ন', 'প্রেমচক্র', 'জাবালি ভারতের ঝুমঝুমি', 'ভীমগীতা', 'স্মৃতিকথা', 'নির্মোকনৃত্য', 'যযাতির জরা', 'ডমরুপণ্ডিত', 'গন্ধমাদন বৈঠক' ও 'অগস্তদ্বার' প্রভৃতি ছোটগল্প।

'ঝ' জড় পদার্থ কেন্দ্রিক ঃ 'একগুঁয়ে বার্তা' ও 'পরশপাথর' প্রভৃতি ছোটগল্প।

'ঞ' পশু ও পাখি বিষয়ক ঃ 'গুরুবিদায়', 'লক্ষ্মীর বাহন', 'লম্বকর্ণ', 'দক্ষিণ রায়', 'রাজমহিষী', 'জয়হরির জেব্রা' ও 'নবলাল' প্রভৃতি ছোটগল্প।

'ট' রূপান্তর - মানুষে পশুতে পুরুষে - নারীতে ইত্যাদি ঃ 'নিকষিত হেম', 'অদল বদল', 'ধস্তুরী মায়া', 'লম্বকর্ণ', 'দক্ষিণ রায়' ও 'কামরূপিণী' প্রভৃতি ছোটগল্প।

'ঠ' অন্যান্য আজগুবি বিষয় ঃ 'পরশপাথর', 'দক্ষিণ রায়', 'চিরঞ্জীব', 'উলটপুরাণ', 'ধুস্তুরী মায়া', 'ষষ্ঠীর কৃপা', 'অদলবদল' প্রভৃতি ছোটগল্প।

'ড' ভুত ও অতিলৌকিক বিষয় ঃ 'মহেশের মহাযাত্রা', 'ভুষন্ডীর মাঠে', 'বদন চৌধুরীর শোকসভা', 'জটাধর বক্সী' ও 'শিবামুখী চিমটে' প্রভৃতি।

পরশুরামের লেখা ছোট গল্পগ্রন্থগুলি যথাক্রমে—গড্ডলিকা প্রথম প্রকাশ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ (গল্পসংগ্রহ), 'কজ্জলী' প্রথম প্রকাশ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ (গল্পসংগ্রহ), 'হনুমানের স্বপ্ন'

প্রথম প্রকাশ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ (গল্পসংগ্রহ), 'গল্পকল্প' প্রথম প্রকাশ ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ (গল্পসংগ্রহ), 'ধুস্তুরী মায়া' প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ (গল্পসংগ্রহ), 'কৃষ্ণকলি' প্রথম প্রকাশ ১৩৬০ বঙ্গাব্দ (গল্পসংগ্রহ), 'নীলতারা' প্রথম প্রকাশ ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ (গল্পসংগ্রহ), 'আনন্দীবাঈ' প্রথম প্রকাশ ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ (গল্পসংগ্রহ) 'চমৎকুমারী' প্রথম প্রকাশ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ (গল্পসংগ্রহ)

প্রমথনাথ বিশীর গল্পগ্রন্থগুলি যথাক্রমে ঃ

'শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব' (১৯৩৬), 'শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব' (১৯৪৫), 'গল্পের মতো' (১৯৪৫), 'গালি ও গল্প' (১৯৪৫), 'ডাকিনী' (১৯৪৫), 'ব্রহ্মার হাসি' (১৯৪৮), 'অশরীরী', 'ধনেপাতা', 'চাপাটি ও পদ্ম' (১৯৫৫), 'নীলবর্ণ শৃগাল' (১৯৫৫), 'অলৌকিক' (১৯৫৭) 'এলার্জি' (১৯৫৮), 'অনেক আগে অনেক দূরে', 'যা হলে হতে পারতো (১৯৬২) ও 'সমুচিত শিক্ষা' প্রভৃতি।

পরশুরামের ছোটগল্পে নর নারীর বিচিত্র সম্পর্ক ব্যঙ্গ ও কৌতুক রসের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। তাঁর দাম্পত্য জীবনের সমস্যা অর্থাৎ মান অভিমান মূলক ছোটগল্প 'লম্বকর্ণ', পত্নীর দীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কিত সমস্যা 'গুরু বিদায়' ছোটগল্প, পরিণত বয়সের প্রেম ও মধুর চিত্র 'বরনারী বরণ' ছোটগল্পে, তরুণ তরুণীর রোমাণ্টিক প্রেমমূলক ছোটগল্প 'চিঠি বাজি', 'জয়হরির জেব্রা'। কৌতুক রস যুক্ত ও বিলিতি প্রেমের গল্প 'স্বয়ম্বরা' ভুতের গল্প 'ভুষণ্ডীর মাঠে'। বিবাহিত জীবনের রোমান্টিক প্রেমের গল্প 'ধুস্তুরী মায়া' ও আনন্দীবাঈ'। নারী পুরুষের চিত্তে দুর্বলতা মূলক ছোটগল্প 'যযাতিব জরা', পরিণত বয়সের প্রণয় স্মৃতি যশোমতী, পৌরাণিক চরিত্রে প্রেম ভাবনামূলক ছোটগল্প ' রেবতীর পতি লাভ', ' প্রেমচক্র' ও 'হনুমানের স্বপ্ন' বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। এছাড়া তৎকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যামূলক ছোটগল্প 'দক্ষিণ রায়', পরাধীন জাতির দুর্বলতা মূলক ছোটগল্প 'উলট পুরাণ', রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক ছোটগল্প 'গগনচর্চি', 'মাঙ্গলিক', 'গন্ধমাদন', 'বৈঠক', 'তিন বিধাতা', জাতীয় রাজনৈতিক ভাবনামূলক ছোটগল্প 'সত্যসন্ধবিনায়ক', 'ভীমগীতা', 'শোনাকথা' পরশুরামের অনবদ্য সৃষ্টি। পরশুরাম স্বাধীনতা উত্তরকালের সমাজ জীবনের দুর্নীতি ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে সেই গল্পগুলোতে কৌতুকের আড়ালে ব্যঙ্গধর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে।

প্রমথনাথের ছোটগল্পের বিষয় বৈচিত্র্য তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। লেখকের মধ্যবিত্ত সংসারে সংগ্রাম ও পরাজয় মূলক 'অতি সাধারণ ঘটনা', 'চেতাবনী' ছোটগল্পে প্রকৃতির সহায়তায় প্রেমের সার্থকতা, 'প্রত্যাবর্তন' গল্পে নিঃস্বার্থ প্রেম, নায়ক নায়িকার প্রেমের স্মৃতি মূলক ছোটগল্প 'ছবি' 'মাধবী মাসী', 'উল্টাগাড়ী', এছাড়া 'শকুন্তলা', 'সুতপা' প্রভৃতি প্রেমের গল্প প্রমথনাথের সার্থক সৃষ্টি।

প্রমথনাথের সাহিত্য বিষয়ক 'কপালকুণ্ডলার দেশে', ' রোহিণীর কি হইল', জি. বি. এস ও প্র না বি', 'ভাঁড়ু দত্ত' প্রভৃতি ছোটগল্প সার্থক সৃষ্টি। পুরাণ কাহিনী ও চরিত্রকে

তিনি যুগধর্মের সাথে সঙ্গতি রেখে নূতন ভাবে বিন্যস্ত করেছেন। তাঁর 'কল্কি', 'ব্রহ্মার হাসি', 'উলটপুরাণ', 'যমরাজের ছুটি', 'রামায়ণের নতুন ভাষ্য' প্রভৃতি ছোটগল্প পুরাণ বিষয়ক।

প্রমথনাথ ঐতিহাসিক ছোটগল্প রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'মহেঞ্জোদড়োর পতন' ছোটগল্পে মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতার ধ্বংসের কারণ লেখক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। 'রাজা কি রাখাল' ছোটগল্পে ঔরঙ্গজেবের দৈন্যতা প্রকাশিত হয়েছে। 'মহালগ্ন' ছোটগল্পে চন্দ্রগুপ্তের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও গ্রিক রমণীর সঙ্গে মধুর প্রেম বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া 'নানাসাহেব', 'রক্তের জের' প্রভৃতি তাঁর সার্থক ছোটগল্প।

প্রমথনাথ অতিলৌকিক ও ভুতের গল্পগুলি সুন্দর ভাবে পরিবেশন করেছেন। 'কালোপাখি', 'তান্ত্রিক', 'পুরন্দরের পুঁথি' ছোট গল্পে অলৌকিক ঘটনা ও পরিমন্ডল সৃষ্টি করে রস সমৃদ্ধ গল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন। প্রমথনাথের 'গদাধর পণ্ডিত', 'টিউশন', 'ধনেপাতা', 'রাজকবি', 'পরিস্থিতি', 'সাহিত্যের তেজিমন্দা', 'হাতুড়ি', 'ভেজিটেবল বোম্', 'গঙ্গার ইলিশ' প্রভৃতি ছোটগল্পে ব্যঙ্গ ও কৌতুক রস উপস্থাপিত হয়েছে। মূলত তিনি মিষ্টি জাতীয় রসের সঙ্গে কিছুটা ঝালের স্বাদ যোগ করে গল্পগুলোকে রস সমৃদ্ধ করতে পেরেছেন।

পরশুরাম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন—"পরশুরাম চরিত্রাঙ্কনে অসাধারণ দক্ষ ছিলেন একথা তাঁর গল্পের ছোট ছোট অপ্রধান চরিত্রগুলি সম্পর্কে সত্য।"[১]

নির্মল হাস্যরসিক শিল্পী পরশুরাম তাঁর কাহিনী বিন্যাসে, চরিত্র সৃষ্টিতে ও চরিত্র উপযোগী সংলাপ নৈপুণ্যে কিংবদন্তি স্বরূপ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সঙ্গত কারণে বলেছেন— "পরিমার্জিত কৌতুকে, চরিত্র চিত্রণ নৈপুণ্যে এবং বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে তিনি (পরশুরাম) একাধারে বাঙালির জেরোম. কে. জেরোম এবং স্টিফেন লিকক।"[২]

শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় তাঁর হাস্যরস সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন— "রাজশেখরবাবুর হাস্যরসের মধ্যে একটা স্বতঃউৎসারিত প্রাচুর্য ও অনাবিল বিশুদ্ধি আছে। তাঁহার রসিকতাও! প্রবাহ বুদ্ধিতে বজ্রক্রীড়ায় ঘোলাটে হয় নাই, সূর্য করোজ্জ্বল নির্ঝরের ন্যায় সহজ সাবলীল নৃত্যভঙ্গে হাসির ঝিকিমিকি ছড়াইতে ছড়াইতে বহিয়া চলিয়াছে।"[৩]

পরশুরামের হাস্যরসের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"হাস্যকৌতুককে ক্লাসিক পর্যায়ে তুলে ধরার গৌরব তাঁর (পরশুরাম) প্রাপ্য।"[৪]

প্রমথনাথ বিশী ও পরশুরামের ছোটগল্পের আঙ্গিক প্রসঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। ছোটগল্পে কাহিনী, চরিত্র, ভাষা, সংলাপ, গল্পের শুরু ও শেষ, নাট্যগুণ, উপমা, শব্দবিন্যাস, বর্ণনাভঙ্গি ও প্রকৃতি বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হল—

দুইজন শিল্পীর ছোটগল্পের নামকরণ শিল্পগুণের পরিচায়ক। যেমন—'গড্ডলিকা', 'হনুমানের স্বপ্ন', 'ভুষন্ডীর মাঠে', 'জটাধরের বিপদ', 'উলট পুরাণ', 'বিরিঞ্চিবাবা' প্রভৃতি

পরশুরামের সার্থক নামা ছোটগল্প। প্রমথনাথ বিশী চরিত্র প্রধান, ব্যঞ্জনাধর্মী বিষয় ও ভাবকে কেন্দ্র করে অসংখ্য সার্থক নামা ছোটগল্প লিখেছেন যেমন—'ওলট পালট পুরাণ', 'শ্রীভগবানকে চাই', 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে', 'চোখে আঙ্গুল দাদা', 'ভগবান কি বাঙালি', 'ভেজিটেবল বোম্', 'ভগবান কি বিজ্ঞাপন দাতা', 'এক দুই দরজা', 'কোই বাৎ নেহী' প্রভৃতি ছোটগল্পের নামকরণ শিল্প সমৃদ্ধ সন্দেহে নেই।

প্রমথনাথ বিশী ও পরশুরামের ছোটগল্পের প্রারম্ভ ও সমাপ্তি অংশটি তুলনা করা যেতে পারে। প্রমথনাথ বিশীর 'ভগবান কি বাঙালি' গল্পটি শুরু হয়েছে লেখক কতটা বাঙালি ছিলেন তার বর্ণনা দিয়ে এবং গল্প শেষে বাঙালির মহিমা প্রকাশিত হয়েছে। প্রমথনাথ বিশীর "ভিক্ষুক কুকুর সংবাদ" গল্পে লেখক ধনী বাড়ীর দরজায় কুকুর বাঁধার রহস্য দিয়ে কাহিনী শুরু করেছেন। লেখক মানুষের জীবনের মূল্য কুকুরের থেকেও স্বল্প সে সম্পর্কে আক্ষেপ করে কাহিনী শেষ করেছেন। প্রমথনাথ বিশীর "চোখে আঙুল দাদা" গল্পটিতে কিভাবে পিতৃদত্ত নাম ভুলে গিয়ে চোখে আঙুল দাদা নামে পরিচিত হল তা দিয়েই গল্পটি শুরু। বিধাতা পুরুষ চোখে আঙুল দাদাকে গৌড়ে স্থায়ী বসবাসের অনুমতিদানের মধ্য দিয়ে গল্পটির ইতি টানা হয়েছে।

পরশুরামের 'গণৎকার' ছোটগল্প শুরু হয়েছে জ্যোতিষীর কাছ থেকে লেখকের পাওনা টাকা আদায়ের ঘটনায়। 'জয়হরির জেব্রা' ছোটগল্পের শুরু নায়িকা রেতসী চালাদারের ক্ষিপ্ত মেজাজ ও জয়হরির আর্ট পরিকল্পনা দিয়ে এবং গল্প শেষে জয়হরির চিড়িয়াখানার প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। 'গামানুষ জাতির কথা' ছোটগল্পে ইঁদুরের মনুষ্য প্রাপ্তির প্রসঙ্গ গল্পের শুরুতে উপস্থাপিত হয়েছে, গল্প শেষে পরশুরাম রাজনৈতিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়ে শেষ করেছেন।

পরশুরামের ছোটগল্পে সাধু চলিত ভাষার ব্যবহার আছে। মহেশের 'মহাযাত্রা' ছোটগল্পে চলিত ভাষার পাশাপাশি সাধু ভাষার সার্থক ব্যবহার নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ "কেদার চাটুজ্জ্যে বলিলেন—বংশলোচন বাবুর বৈঠকখানায় গল্প চলিতেছিল তাহার শালা নগেন বলিল।"[৫]

সংলাপ অংশে চলিত ভাষা—"মহাদেব বলিলেন—আড়ে ছাড় ছাড়—লাগে, মাইরি এখন ইয়ারকি ভাল লাগে না—চারদিকে আগুন ছেড়ে দাও বলছি। এই সব দেখে নটরাজ চঞ্চল হয়েছেন, প্রলয় নাচন নাচবার জন্য ডান পা বাড়িয়েছেন, তা থেকেই এই রুদ্রচটি গগনতলে ঘাম পড়েছে।"[৬]

প্রমথনাথ বিশী ছোটগল্পে সাধুরীতির প্রয়োগের একটি দৃষ্টান্ত, ' ভেজিটেবল বোম' ছোটগল্প থেকে প্রদত্ত হল—"কি! কথাগুলি বিশ্বাস হইল না? তা হইবে কেন। আমার যে বৈদেশিক ডিগ্রি নাই, আমার যে টাকাকড়ি নাই, আমার যে মুরুব্বি নাই। কি, ইহাকে প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিলে?"[৭]

"সংলাপ অংশে চলিত রীতির প্রয়োগ।

"কি হে, ঘুমোলে নাকি?

রমেশ বলিল—কী যে বল রামদা এমন কবিতা শুনলে স্বয়ং কুলকুন্ডলিনী জেগে ওঠেন, আর আমরা ঘুমোব? রাম দা বলিলেন—ওয়ান্ডারফুল?"[৮]

পরশুরামের ছোটগল্পে নর-নারীর চেহারা সাজসজ্জা ও পোশাকের বর্ণনার ক্ষেত্রে ভাষা হয়ে উঠেছে তাৎপর্যপূর্ণ যেমন "একটি প্রকান্ড বেড়াল এল, ধপধপে সাদা গা, মাথার লোম কালো, মাঝে সরু সিঁথি, ল্যাজে সারি সারি চুড়ির মতোন দাগ।"[৯] গল্পের প্রয়োজনে বেড়ালের সরু সিঁথি ও চুড়ির প্রসঙ্গে নারীত্বের ধর্ম বজায় রেখেছে।

" লোকটির বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন, লম্বা, রোগা ফরসা, মাথায় কাঁচা পাকা চুল, সযত্নে সিঁথি কাটা, মৌলনা আব্দুল কালাম আজাদের মতোন গোঁফ দাড়ি, পরনে মিহি ধুতি, গরদের পাঞ্জাবী আর উড়ুনি, হাতে রূপোবাঁধানো লাঠি।"[১০] পরশুরামের কলমে ব্যক্তিটির শৌখিনতা প্রকাশ পেয়েছেন। সেই সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

"বেশ হৃষ্ট পুষ্ট ছাগল কুচকুচে নধর কালো দেহ, বড় বড় লটপটে কানের ওপর কচি পটলের মতো দুটি শিং বাহির হইয়াছে। বয়স বেশি নয়, এখনও অজাত শ্মশ্রু।"[১১] আলোচ্য গল্পে লম্বকর্ণ ছাগলের ছবিটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

"তিনকড়ি বাবুর ষাট বৎসর, ক্ষীণদেহ, দাড়ি কামানো, শীর্ণ গোঁফ—এ তামাকের ধোঁয়ায় পাকা খেজুরের রং ধরিয়াছে—কথা কহিবার সময় আরশোলার দাঁড়ার মতো নড়ে।"[১২] আলোচ্য বর্ণনা অংশে তিনকড়ির স্বভাবকে আরশোলার দাঁড়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পে বিভিন্ন চরিত্রের দৈহিক ও বেশভূষার বিবরণ আছে। যেমন—'পরী' ছোটগল্পে বড়ে মিঞার অবয়ব লেখক বর্ণনা দিয়েছেন। এক হান্ডার গোস্ত রান্না কালে বড়ে মিঞার চেহারার বর্ণনাটি জীবন্ত ঃ "তাঁর রূপোলী লম্বা দাড়ি, পাকা চুল, সারা মুখে অজস্র বলি চিহ্ন।"[১৩]

"কচি বয়স সিঁথায় সিঁদুর মুখে কচি ডাবের শ্যামল সৌকুমার্য এবং অনবদ্য স্নিগ্ধ রমণীয় একটি নিটোলতা, শ্যামল বাংলার শ্যামা বালিকা।"[১৪]

প্রমথনাথ গল্পের সংলাপ গুলিতে ভাষায় বৈচিত্র্য এনেছেন। চরিত্রানুযায়ী ভাষা ব্যবহার করতে গিয়ে হিন্দি বাংলা ও ইংরেজি ভাষার ব্যবহার করেছেন। "তেওয়ারী, রামচরণ, পাকড়ো,ভাগ যাতা। জোরসে পাকড়ো, বহুৎ কিয়া, বহুৎ আচ্ছা! এক দম হিঁয়াপর লে আও, I Shall see the culprit 'সত্য-তেওয়ারী-হুজুর একটা কুরসি দেগা?

মিঃ দাস - কুর্সি! কিসকো দেগা?

তেওয়ারী - আওরাৎ হ্যায়। উসকো লিয়ে।"[১৫]

পরশুরামের ছোটগল্পের সংলাপের ভাষা আরোও জীবন্ত। চরিত্র অনুযায়ী সংলাপে ব্যঙ্গ কৌতুকের ভাব সৃষ্টিতে তিনি নিপুণ। হিন্দি, বাংলা, ভোজপুরি, উর্দু ও বাংলা ভাষার তিনি সার্থক প্রয়োগ করেছেন। যেমন—

"ফেকু পাঁড়ে—বিরিঞ্চিবাবা বাবাজী খোঁড়াই আসে তাঁর জনেট ভি নাই, জটা ভি নাই। তিনি মাছ ভি খান, বকরির গোস্ত ভি খান।

কারিয়া পিরেত—বহুত লাগি বরমদেও জী।

গন্ডেরীরাম—বহুত বাঙ্গালীর সঙ্গে হামি মিলামিলা করি, বাংলা কিতাব ভি অন্‌হেকে পড়েছি, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ অউর ভি সব।"[১৬]

প্রমথনাথের ছোটগল্পে একটি উর্দু ও বাংলা সংলাপের ব্যবহারে মুসলমানি মেজাজ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন—"যাহার বেন আনা হাম মানা কর দিয়ে যে।

বছিরদ্দি—আরে বাবু মশায় যে সব দিন ধ্যান কমনে চলে গেছে মা ঠাকুরোণ বেহেস্তে পাওয়া ইস্তক মোদের বাবু সাহেবের জানভা কলেজায় নেই।

কোফ্‌তা খাঁ—বিসমিল্লাহ্। একথা আর কেও বলিলে এই মুহূর্তে তাহাকে কোতল করিতাম। কিন্তু তুমি আমার দিল গিরিফতার করিয়াছ। এবারকার মতো মাফ করিলাম।"[১৭] উপরোক্ত সংলাপে উর্দু ভাষার সঙ্গে পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণ ও দেশী শব্দের মিশ্রণে হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে।

প্রমথনাথের ছোটগল্পে নিম্নস্তরের ভাষাভাষী মানুষদের ঝগড়া কোন্দল নানা কৌশলে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—"দুর মাগী আমি হলেম গিয়ে কিনা তোর বাপের শালা।"[১৮]

"খড়কাঠ দড়ি সবই মাগ্নি। সব শালা চোর। মন্ত্রী থেকে মজুর অবধি সব শালা চোর। গফুর বলিল—বা জান দ্যাশ না, মুল্লক। মুদ্দি গর্জন করিল চুপকর শালা।"[১৯]

পাশাপাশি পরশুরামের ছোটগল্পে তর্ক বিতর্ক কলহ প্রকাশের ক্ষেত্রে দক্ষতা পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। নিম্ন শ্রেণির চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে মান্য ব্যক্তিদের নিম্ন স্তরের ঝগড়া বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। তাঁর নিদর্শন নিম্নে প্রদত্ত হল। সংলাপটিতে নায়ক নায়িকার বাজি বেশ জমে উঠেছে ঃ "উদ্ভব ও স্পন্দছন্দা (উদ্ভব) বয়সও ভাড়াতে চাইয়া ঠিক পঁয়ত্রিশ তোমার কত? বাইশ উল্লু বিয়াল্লিশ। স্পন্দছন্দা চেঁচিয়ে বললেন বাইশ। আরও চেঁচিয়ে টেবিলে কিল মেরে উদ্ভব বললেন, বেয়াল্লিশ।"[২০]

পেতনিদের কলহ—"পেত্নী আমার সোয়ামী তোকে কেন দেব লা? শাঁকচুন্নী আমার বুড়ী, ও যে তোর নাতির বয়সী। পেত্নী, আহা আমার কনে বউ গা।"[২১]

পরিশেষে বলা যায় প্রমথনাথ বিশী ও পরশুরাম দুইজনে ছোটগল্পে হাসির মালা গাঁথতে গিয়ে জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছে। দুই জন লেখকের গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল। ব্যঙ্গধর্মী পরশুরামের মতো প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পের ব্যঙ্গ আছে সন্দেহ নেই। ব্যঙ্গের আড়ালে তিনি যে হাস্যরসের অবতারণা করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ বলা যেতে পারে। দুইজন বিচিত্রধর্মী প্রতিভার অধিকারী। কাহিনি বয়নে, চরিত্র সৃষ্টিতে ও ভাষাবিন্যাসে দুইজন সমধর্মী ছোটগল্পকার না হলেও অনেক ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান।

প্রমথনাথ বিশী ও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের তুলনা

প্রমথনাথ বিশী এবং বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় একই যুগের দুই দিকপাল। দুজনেই হাসির গল্প লেখক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রমথনাথের হাসির গল্পের পেছনে হুল বা খোঁচা

থাকে। কিন্তু বিভূতিভূষণের হাসির গল্প মধুর মতোনই মধুর। চরিত্রগুলিকে নিয়ে তিনি নির্মল তামাসা করেছেন। চরিত্রগুলি তাঁর প্রিয় ও আপনজন। দুজনে অভিজ্ঞতার শিল্পী। তবে প্রমথনাথের ছোটগল্পগুলো বেশির ভাগ বঙ্গদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিহারে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কাটিয়েছেন বলেই বিশেষ করে দ্বারভাঙ্গা মজঃফ্‌রপুর সমাজের লোকজনই তাঁর সবচেয়ে আপনজন। আবার বাংলাদেশের শিবপুর অঞ্চলের কিছু বিশিষ্ট প্রকৃতির মানুষ এবং কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের ছোটখাটো ভ্রান্তি, অসঙ্গতি ও আতিশয্যের মধ্যে তিনি কৌতুকের অনেক উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা তাঁর ছোটগল্পে অভাব নেই। তাঁর লেখনীতে বাৎসল্য রস উপচে পড়েছে। শিশুরাও যে বড়দের সঙ্গে মিলে মিশে স্বতন্ত্র জগৎ রচনা করে তা বিভূতিভূষণের লেখনীতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শিশুজগতের বিচিত্র ছবি তাদের মনের সূক্ষ্ম ও জটিল রহস্য যেভাবে তাঁর ছোটগল্পে শিল্পরূপ লাভ করেছে তা শুধু শিশুদেরই উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় নয়, বড়দেরও সুখপাঠ্য। রানু পর্যায়ের গল্প, গনশা, ঘোঁৎনা প্রভৃতি বরযাত্রীদলকে নিয়ে লেখা গল্প এবং দৈনন্দিন গল্পমালা ও শৈলেনের বাল্য প্রসঙ্গের গল্পগুলি অনবদ্য। 'পনুর চিঠি' ও 'এই জনৎ-ই ওদের চোখ' গল্পসংকলন দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাইরের সমস্ত আবরণের আড়ালে তার কচিকাঁচা সাঁচা শিশু মনটি সযত্নে সরলতা ও বিশ্বাস্যতা নিয়ে বেঁচেছিল। বিভূতিভূষণের 'শিশুসাহিত্য' নামক ছোটগল্পে লেখকের সাফল্য অবিসংবাদিত। শিশুচরিত্রগুলি যেন ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা ও আত্মীয় স্বজনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য 'রানুর' প্রথম ভাগের 'দাঁতের আলো-র' ছবি, মুইয়া ও বাবুল, 'বাদল' গল্পের বাদল, রেখা ও আতা ও তেজারতি গল্পের কোঁদন ও বাবু, স্বয়ংবরার ডলি ও 'মাসি' গল্পের মিষ্টু এরা সবাই বিভূতিভূষণের ভাইপো ও ভাইঝি। 'মাসি' গল্পের তুলতুল লেখকের ভাই মণিভূষণের শ্যালিকা। গল্পের বক্তা মেজকাকা লেখক স্বয়ং। ভাইপো ও ভাইঝিদের সঙ্গে সঙ্গে দাদা ও ভাইরাও মাঝে মাঝে গল্পে এসে গেছে। অর্থাৎ চরিত্রগুলি বেশিরভাগই বাস্তব।

শিশুদের আশা আকাঙ্ক্ষা, ভাল ও মন্দ লাগা, গর্ব, ঈর্ষা, অনুকরণ, প্রবৃত্তি অকপট বিশ্বাস প্রবণতা সমস্ত কিছুর মধ্যে এক সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য আছে। রানুর প্রথম ভাগে মেজকাকা যখন বিরসবদনে বলেন আড়াইটা বছর গিয়েছে, তাহার মধ্যে রানু অজ আমের পাতা শেষ করিয়া অচল অধমের পাতায় আসিয়া অচল হইয়া বসিয়াছে। ব্যাপারটি করুণ রসে আর্দ্র হয়ে উঠেছে হাসির হাল্‌কা হাওয়ায় চোখের জলের আবেদন হৃদয় মর্মে তীরের মতো বিধেঁছে। এছাড়া পারিবারিক রসের ছোটগল্পে শিশু মনস্তাত্ত্বিক দিকটি উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় বেশ উপভোগ্য হয়েছে। পরিবার পরিজন, গৃহভৃত্য এগুলোকে নিয়ে সৃষ্ট ছোটগল্পগুলো সহজ সুন্দর, সরস ও সতেজ।

প্রমথনাথ শিশু সাহিত্য নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাননি। আধুনিক যুগযন্ত্রণার ত্রুটিপূর্ণ দিককে এবং ইতিহাস রসের সাথে মানবরসের হর-গৌরী মিলনের ও অতিলৌকিক রসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন।

বিভূতিভূষণের গল্পগুলিতে ছটি সাধারণ উপাদান আছে—(ক) অল্পশিক্ষিত এবং দেহে মনে অপরিণত কিশোরী বধূ, (খ) দাম্পত্য জীবনে - প্রেম এখানে বিবাহিত সামাজিক নীতি চেতনা মেনেই। (গ) বিবাহ বাসনা, (ঘ) অসম ও অসম্ভাবিত প্রেম, (ঙ) শিশুজীবনের যথেচ্ছাব্রত আর তার অলৌকিক জগৎ, (চ) বিচিত্র লোক চরিত্র, তন্মধ্যে 'শ্যামলরাণী', 'জালিয়াত' গল্পে কিশোরী বধূর ভাবাবেগ প্রাধান্য পেয়েছে। প্রেম যেখানে বিবাহিত ও বিশ্বস্ত ও সামাজিক নীতি চেতনার দৃষ্টান্ত এরূপ ছোটগল্প 'নবোড়ার পত্র', 'কলতলার কাব্য', 'অকাল বোধন', 'খাঁটির মর্যাদা', 'পৃথ্বীরাজ', 'গজভুক্ত', 'হারজিত' ও 'বিপন্ন' এই শ্রেণির গল্পের দৃষ্টান্ত। বিবাহবাসনা যে সব গল্পগুলিতে প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে সেগুলি হল—'বরযাত্রী', 'স্বয়ংবরা', 'বিয়ের ফুল' ও 'নোংরা' প্রভৃতি। দাম্পত্য জীবনের মধুময় আকর্ষণ এই পর্বের গল্পগুলোর বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে অসম্ভাবিত ও অসম প্রেমের সার্থক ছোটগল্প হল 'প্রশ্ন', 'আশা', 'তাপস', 'বর্ষায়' গল্পগুলি। যে গল্পগুলোতে উপেক্ষিত হয়েছে সমাজ বাস্তবতা, আবার অলৌকিক জগতের পর্যায়ভুক্ত 'বাদল', 'দাঁতের আলো', 'মুনীচোরা' গল্পে। তাঁর ছোটগল্পে লোকচরিত্র অবলম্বনে বয়স্ক মানুষের নানা চরিত্রের রসোজ্জ্বল প্রতিমূর্তি প্রস্ফুটিত হয়েছে। 'রংলাল', 'মধুলিড', 'ভূমিকম্প', 'মুরারি গুপ্তের ঠিকাদারী', 'কর্মৈ হবিষা বিধেন', 'একরাত্র', 'ঐকালার দাদা', 'শোক সংবাদ', 'শিক্ষা সংকট' ও 'দ্রব্যগুণ' প্রভৃতি গল্প এই শ্রেণিভুক্ত।

তাঁর গল্পে কিশোরী বধূ, প্রেমিক দম্পতি, যৌথ পরিবারের বাঙালির বিলীয়মান জীবনের ছবি ধরা পড়েছে। মূলত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পের প্রধান বিষয় হতাশা, অপরিণত প্রীতি, নিজস্ব আদর্শ বোধ, উৎকট ঝোঁক, খেয়ালিপনা, নরনারীর যৌনজীবনের স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়ে হাস্যরস কোথাও কোমল মৃদু কোথাও বা ফল্গুধারার মতো অন্তঃসলিলা।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের নামকরণগুলো শিল্প কুশলতার পরিচয় বহন করে। আঙ্গিক প্রকরণে তাঁর প্রতিভার পরিচয় সুস্পষ্ট। তাঁর ছোটগল্পের কাহিনীগুলো কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত। কোনো গল্পের কাহিনীর শুরুতে ও শেষ বাক্যের ব্যঞ্জনা তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। কিছু কিছু গল্পে রূপকধর্ম বিশেষ করে গল্পের উপরিভাগের এক অর্থ অর্থাৎ বাচ্যার্থ, তার সমান ও সমান্তরাল আর একটি ব্যঙ্গার্থ চলমান। গল্পের উপস্থাপন রীতি, গল্পের সিচুয়েশন, কাব্যগুণ, নাট্যগুণ, চরিত্র নির্মাণ, সংলাপ নৈপুণ্যে লেখকের মুন্সিয়ানার পরিচয় আমরা খুঁজে পাই। তিনি যেন সাধারণ মানুষের হাসি অশ্রু দুই একটি মুক্তো বিন্দু সচেতন ভাবে পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ঘটনা বিন্যাস করেছেন।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের ভাষা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে বিষয়বস্তু অনুসারে তিনি ভাষা বিন্যাস করেছেন। হাস্যরস উপস্থাপন করতে গিয়ে কোনো কোনো গল্পে মর্মান্তিক শ্লেষ প্রাধান্য পেয়েছে। 'শারদীয়' গল্পের থেকে দুটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছি। জমিদার সনাতন রায়ের নববধূকে পিতৃগৃহের স্মৃতি মুছে ফেলতে নিম্নোক্ত সংলাপটি

কারুণ্য রসসিক্ত "আমি নিজেই যে মায়ের বাপের বাড়ির পথ আটকে রেখেছি পুরুত মশাই। একটু দর্প হয়েছিল। মেয়েকে কেড়ে নিতে চেয়েছিলাম তার বাপের কাছ থেকে। ....বুঝতে পারিনি পুরুত মশাই, কোন মায়ের বুকের ব্যথা যে কোন মায়ের বুকে বাজবে, অতটা আন্দাজ করতে পারিনি....অপরাধ হয়ে গেছে।"[২২]

বিভূতিভূষণ 'বসন্ত' গল্পে বিহারের পটভূমিকার ভোজপুরী গান (ভাষা) ব্যবহার করেছেন। যেমন—

"ওহো, ফাগুনাকে রাতিয়ামে পিয়া
কাঁহ্মা হো
ফাগুনাকে রাতিয়ামে পিয়ারা - আ -আ -আ...."[২৩]

কুইট ইণ্ডিয়া ছোটগল্পে দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রাজপুত বরপক্ষীয়দের দ্বন্দ্বে অধিকার সচেতন Miss Gress-এর মানসিক চিন্তাধারা পরিবর্তনের সরস বর্ণনা আছে। June মাসের অসহ্য গরমে বাজনাদাররা ঢাক ঢোল ছাড়াই বাজনা বাজাতে শুরু করলে বড়কর্তা পীড়িত হয়ে বলেছেন—"বাজনায় ঢাক নেই, বিয়েতে তো তাহলে কনে না থাকলেও চলে।" এর পরে এই দলের বাজনাদাররা ট্রেনের ছাদে উঠে বাজনা বাজাতে আরম্ভ করে। এখানে বাজনা, ঢাল ঢোল প্রভৃতি দেশীয় শব্দ ছোটগল্পকার সার্থক ভাবে ব্যবহার করেছেন।

বিভূতিভূষণ তাঁর ছোটগল্পের মৈথিলি ভাষার সঙ্গে নৈকট্য অনুভব করেছেন ও অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন "আর শুধু মৈথিল ভাষা শোনাও তো সঙ্গীত শোনাই। বাংলার সহোদররা,—ঐরকম নরম, ঐরকম মিষ্টি, শুধু সহোদররাই নয় সংস্কৃত মায়ের যমজ মেয়ে দুটি, এক মুখ, এক চোখ, এক গড়ন, এক চলন।"[২৪]

প্রমথনাথ বিশী তাঁর ছোটগল্পে হিন্দি ও বাংলা ছাড়াও হিন্দি ও ইংরাজির যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। স্থানে স্থানে তিনি ভদ্রেতর ভাষা ব্যবহার করেছেন। 'গুলাব সিং এর পিস্তল' ছোটগল্পে--

"আও শালা, বাদশা, আলমগীর কা.....রঞ্জিত সিং কা......."[২৫]

'রক্তের জের' ছোট গল্পে নানা সাহেবের প্রতি কৌতুক করে ছেলের দল নানার গায়ে ধুলো দিয়ে গান ধরে—

"হোলি হায় হোলি হায়
নানা সাহেব খানা খায়"[২৬]

'রুথ' গল্পের তিনি ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করেছেন। প্রবীণ আপন মনে বলে উঠল—

"Ruth, whensick for home,
She stood in tears amid the alien corn."

প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পে নিসর্গ চেতনা যতটা চরিত্রের বিশ্লেষণে মূর্ত হয়ে উঠেছে বিভূতিভূষণের ছোটগল্পে প্রকৃতি চিত্রণ ততটা জীবন্ত হয়ে ওঠেনি।

প্রমথনাথ বিশী ও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় দুজনেই বাস্তব সচেতন শিল্পী। কর্মসূত্রে

ও অভিজ্ঞতা সূত্রে দুজনের ছোটগল্পই সমাজবাস্তবতার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। প্রমথনাথ বিশী তৎকালীন রাজনৈতিক ত্রুটি বিচ্যুতিকে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী দিয়ে আঘাত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে অন্যায়, বৈষম্য, অত্যাচার—এর বিরুদ্ধে তিনি সমাজ জীবনের শুভ প্রয়াসের লক্ষ্যে লেখনী ধারণ করেছেন। ঠিক তার পাশাপাশি বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে সমাজ মনস্কতার পরিচয় থাকলেও প্রমথনাথ বিশীর মতো সমাজ বিদ্রোহাত্মক ছোটগল্প রচনা করেননি।

ছোটগল্পকার হিসাবে বাংলা সাহিত্যে তাঁরা স্বনামধন্য। তুলনাগত দিক থেকে প্রমথনাথ বিশী ও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সমধর্মী নয়।

ঃ তুলনার আলোকে প্রমথনাথ বিশী ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ঃ

প্রমথনাথ বিশী ও শরদিন্দু দুজনেই সমবয়সী। একই সময়ে দুজনেই সাহিত্য রচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বসুমতী', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' ও 'শনিবারের চিঠি' এই চারটি পত্রিকাতে বিপুল সাহিত্য সম্ভার প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কল্লোল কালের কথাসাহিত্যিক হলেও কল্লোলের স্পর্শ থেকে তিনি ছিলেন মুক্ত। প্রমথনাথ বিশীর লেখা ছোটগল্প—'শান্তিনিকেতন', 'প্রবাসী', 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'বঙ্গশ্রী', 'শনিবারের চিঠি' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছে। তবে দু'জনেরই সাহিত্যচর্চার মিলন ক্ষেত্র ছিল 'প্রবাসী', 'আনন্দবাজার', 'দেশ' ও 'শনিবারের চিঠিকে' কেন্দ্র করে।

শরদিন্দু ও প্রমথনাথ বিশীর মধ্যে সাদৃশ্য যথেষ্ট। ঐতিহাসিক গল্প ও অতিপ্রাকৃত রসের গল্পের প্রতি দু'জনেরই আকর্ষণ ছিল সমান। ব্যঙ্গ কবিতা, ব্যঙ্গ রসের গল্প, রোমান্টিক গল্প, ঐতিহাসিক গল্প ও ভুতের গল্প রচনায় দুজনেই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে ডিটেক্‌টিভ গল্প রচনায় শরদিন্দুর সাফল্য অবিসংবাদিত। শরদিন্দুর 'ব্যোমকেশ সিরিজ'—এর ছোটগল্পগুলোতে লেখকের আত্মকৃতি 'ব্যোমকেশ চরিত্র'। কনান ডয়ালে—এর শার্লক হোমস্—এর সার্থক সৃষ্টি করেছেন সত্যান্বেষী 'ব্যোমকেশ বক্সী' চরিত্র। বাস্তবিক পক্ষে এগুলো গোয়েন্দা গল্প নয়। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার সমাধান এবং মানব জীবন রহস্য উন্মোচন লেখকের প্রধান উদ্দেশ্যে। এই পর্যায়ের ছোটগল্পে বেশির ভাগ চুরি, ডাকাতি ও খুনের রহস্য অপেক্ষা জীবন রহস্য উদ্‌ঘাটন ছিল লেখকের অন্যতম লক্ষ্য। ব্যোমকেশ ও তাঁর সহযোগী চরিত্র অজিত পাঠকের ভালবাসা পেয়েছে। এই পর্যায়ের ছোটগল্পগুলি হল ঃ— 'অর্থমনর্থম', 'চোরাবালি', 'দুর্গ রহস্য', 'চিড়িয়াখানা', 'আদিম রিপু', 'মগ্ন মৈনাক', 'অদৃশ্য ত্রিকোণ', 'কহেন কবি কালিদাস'। এছাড়া তাঁর 'চিত্রচোর', 'বহ্নি পতঙ্গ', 'রক্তের দাগ' ও 'বেণী সংহার' ছোটগল্পগুলি বিশেষ জনপ্রিয়। অন্যদিকে প্রমথনাথ বিশী এধরনের ডিটেক্‌টিভ গল্প রচনায় উৎসাহী ছিলেন না।

শরদিন্দুর ভুতের গল্পগুলি বিশেষ আকর্ষণীয়। ভুতের গল্প লেখায় তিনি সিদ্ধহস্ত। 'রক্তখদ্যোত', 'অশরীরী', 'প্রেতপুরী', 'সবুজ চশমা', 'দেহান্তর', 'মালকোষ', 'টিকটিকির

ডিম', 'অন্ধকার', 'মরণভোমরা', 'বহুরূপী', 'প্রতিধ্বনি', 'ভূত-ভবিষ্যৎ', 'দেখা হবে', 'শূন্য শুধু শূন্য নয়', 'মধুমালতী', 'নীলকর', 'কালো সোনার গল্প' ও 'প্রত্ন কেতকী' গল্পগুলি সুখপাঠ্য একাধিকবার পাঠ করতে ইচ্ছা করে। ভৌতিক গল্প রস অত্যন্ত নিপুণ ভাবে উপস্থাপন করেছেন ছোটগল্পকার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্যদিকে প্রমথনাথ বিশী ডিটেক্‌টিভ গল্প লেখেননি। তাঁর ভুতের গল্পে বাস্তবলোক থেকে ভৌতিকলোকে যাতায়াতের পথ সুগম করে দিয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও স্বপ্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে ছোটগল্পকার প্রমথনাথ বিশী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'কপালকুন্ডলার দেশে', 'চিলারায়ের গড়', 'নিশীথিনী', 'কালো পাখি', 'তান্ত্রিক', 'অশরীরী', 'বিনা টিকিটের যাত্রী', 'ভৌতিক চক্ষু', 'পুরন্দরের পুঁথি', 'পাশের বাড়ি', 'খেলনা', 'দ্বিতীয় পক্ষ' প্রভৃতি গল্পে তাঁর ছোটগল্পের গঠন সেই সঙ্গে গা ছমছম করা লৌকিক পরিবেশ সৃষ্টি যা বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করেনি। এই ধরনের ছোটগল্প রচনায় প্রমথনাথ সফল শিল্পী সন্দেহ নেই।

অন্যদিকে শরদিন্দুর কৌতুক রসাশ্রিত গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সংযোজন। গল্পের আয়তন ছোট আকারের হলেও এর আবেদন অনেকটা গভীর। হাল্‌কা হাসির মেজাজ নিয়ে বিশুদ্ধ কৌতুক রস পরিবেশনে শরদিন্দু সার্থক ছোটগল্পকার হিসেবে পরিচিত হয়ে আছেন। এই পর্যায়ের ছোটগল্পগুলি যথাক্রমে 'কর্তার কীর্তি', 'তিমিঙ্গিল', 'ভেনডেট', 'আদিম নৃত্য', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'তন্দ্রাহরণ', 'কুতুব শীর্ষে', 'নাইট ক্লাব', 'আরব সাগরের রসিকতা', 'ঝি', 'অসমাপ্ত', 'ভুতের চন্দ্রবিন্দু' ও 'আদায় কাঁচকলায়' প্রভৃতি গল্প এই শ্রেণিভূক্ত। প্রমথনাথের কৌতুক রসাত্মক গল্পগুলিও বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই গল্পগুলোতে প্রমথনাথের বাগ্‌ বৈদগ্ধ্য ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গতির্যক ভাষণের প্রাধান্য থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে গল্পরস জমিয়ে তুলবার কৌশলগত ত্রুটি এই পর্যায়ের ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'থার্মোমিটার', 'অদৃষ্টসুখী', 'রাশিফল', 'এলার্জি', 'অ্যালসেসিয়ান ডগ্‌', 'কৃষ্ণনারায়ণ সংবাদ', 'পকেটমারের প্রতিকার', '১৪৪ ধারা', 'ফ্যামিলি প্ল্যানিং', 'একগজ মার্কিন' ও 'এক চামচ চিনি', 'গরুমারা চেলা', 'চেতাবনী', 'সাবানের টুকরো', 'শিখ', 'চাচাতুয়া', 'শার্দূল', 'তিমিঙ্গিল', 'পুতুল', 'রাঘব বোয়াল', 'পুকুর চুরি', 'ছাপ সন্দেশ', 'দর্জ্জি ও প্রেম', 'নহুষের অতৃপ্তি', 'কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূলকারণ', 'ভগবান ও বিজ্ঞাপন দাতা', 'রজ্জুতে সর্প', 'বাইশ বছর', 'অটোগ্রাফ', 'বাগদত্তা', 'ভেজিটেবল বোম', 'উতঙ্ক', 'গণক', 'মারণযজ্ঞ', 'গঙ্গার ইলিশ' ও 'পূজাসংখ্যা' প্রভৃতি গল্পে কৌতুকরস লেখক সুকৌশলে আমদানি করেছেন।

প্রমথনাথ বিশী ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় দু'জনেই ঐতিহাসিক ছোটগল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত। শরদিন্দুর ঐতিহাসিক গল্পগুলো পাঠে পাঠকের দেহ, মন ও হৃদয় ধর্মের প্রসার ঘটে। তাঁর ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টিতে প্রাণসঞ্চার করে। মোট ২২ টি ঐতিহাসিক ছোটগল্প লিখে শরদিন্দু পাঠক মনে স্থায়ী আসন অধিকার করে আছেন। গল্পগুলি যথাক্রমে—

'জাতিস্মর', 'চুয়াচন্দন', 'বিষকন্যা' গল্পগ্রন্থে সংকলিত এই তিনটি গল্পগ্রন্থে তাঁর ১৭ টি গল্প স্থান পেয়েছে, বাকি ৫ টি গল্প সাদা পৃথিবী, গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। মূলত হিন্দুবৌদ্ধযুগ থেকে শুরু করে ভারত ইতিহাসের মুসলিম যুগের কাহিনী এ গল্পগুলোতে স্থান পেয়েছে। সুলতানি আমলের আলাউদ্দিন খিলজীর বিষয়ে শঙ্খকঙ্কণ ও রেবা-রেধসি, ছত্রপতি শিবাজীকে কেন্দ্র করে পাখির বাচ্চা, শাহ্ সুজার সময়ে তক্ত মোবারক, আর্য আগমনের প্রারম্ভে প্রাগ্‌জ্যোতিষ, মিশরীয় ইতিহাস অবলম্বনে আদিম ছোটগল্প রচিত। জাতিস্মর গল্পগ্রন্থের মৃৎপ্রদীপ গল্পটি চন্দ্রগুপ্ত চন্দ্রবর্মা ও সমুদ্রগুপ্ত—এর দিগ্বিজয় কাহিনী মূল উপজীব্য। রক্তসন্ধ্যা গল্পটি ভাস্কোদাগামার আমলে গোয়া নগরের কাহিনী মূল উপজীব্য। ঐতিহাসিক কল্পনা গল্পগ্রন্থন কৌশল আর যাদুময়ী ভাষার সাহায্যে শরদিন্দু অনায়াসে পাঠককে পৌঁছে দেন সুদূর অতীতে। অতীতাচারী ছোটগল্পকার শরদিন্দু সাহিত্যগুরু হিসাবে বেছে নিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্রকে।

প্রমথনাথ বিশীর ইতিহাসাশ্রিত গল্পগ্রন্থ 'ধনেপাতা', 'চাপাটি ও পদ্ম' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'মহেঞ্জোদড়োর পতন', 'অসমাপ্ত কাব্য', 'ধনেপাতা', 'গুলাব সিং এর পিস্তল', 'ছায়াবাহিনী', 'মড', 'রুথ', 'নানাসাহেব', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'রক্তের জের', 'জেমী গ্রীনের আত্মকথা', 'কোকিল', 'ছিন্নদলিল' প্রভৃতি ঐতিহাসিক ছোটগল্পে লেখকের সাফল্য প্রশংসনীয়। চাপাটি ও পদ্ম গ্রন্থের গল্পগুলি সিপাহিবিদ্রোহ জনিত ঘটনা মূল উপজীব্য। ইংরেজ চরিত্র অবলম্বনে জেমি গ্রীনের আত্মকথা, রুথ ও মড গল্পত্রয় রচিত। নানাসাহেবকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে ইতিহাসাশ্রিত কয়েকটি গল্প। গল্পগুলি যথাক্রমে - 'নানাসাহেব', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'অভিশাপ' ও 'রক্তের জের' প্রভৃতি।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামাজিক গল্পগ্রন্থগুলি যথাক্রমে বুমেরাং (১৩৪৫), কাঁচামিঠে (১৩৪৯), কালকূট (১৩৫১), দন্তরুচি (১৩৫২), পঞ্চভূত (১৩৫২), গোপন কথা (১৩৫২) , সাদা পৃথিবী (১৩৫৫), কানু কহে রাই (১৩৬২), আলোর নেশা (১৩৬৫), মায়া কুরুঙ্গি (১৩৬৮), এমন দিনে (১৩৬৯), রঙিন নিমেষ (১৩৭২) প্রভৃতি। আলোচ্য গ্রন্থের গল্পগুলোতে লেখক সামাজিক প্রেক্ষাপটে কাহিনী বিন্যাস করেছেন।

প্রমথনাথ বিশী তাঁর সামাজিক ছোটগল্পগুলোতে সামাজিক কুসংস্কার ও অনাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছেন। উতঙ্ক, অর্থপুস্তক, গণক, শিবুর শিক্ষানবিশী, গদাধর পণ্ডিত, ভাঁড়ু দত্ত, পরিস্থিতি, কাঁচি, পূজার রচনা, রাজকবি, নর-শার্দূল সংবাদ, বাল্মীকির পুনর্জন্ম, শাপেবর, রক্তাক্ষ, ফ্যামিলি প্ল্যানিং প্রভৃতি গল্পে লেখকের সমাজ চেতনার পরিচয় সুপষ্ট।

প্রমথনাথ বিশী ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় দু'জনে প্রেমের গল্প লিখেছেন। শরদিন্দুর প্রেমের গল্পগুলো সরস ও উপভোগ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়কালে যখন মূল্যবোধের অবক্ষয়, হতাশা সমাজ জীবনকে ঘিরে রেখেছিল যে সময়কালে শরদিন্দুর ছোটগল্পগুলো যেন ঘরের গুমোট আবহাওয়ায় একঝলক মুক্তির হাওয়া। ক্ষণিকের জন্য হলেও জটিল

সমাজ জীবনে প্রেম মনস্তত্ত্বের যে গল্পগুলো লেখক আমাদের উপহার দিয়েছেন তা শুধু তৎকালীন সময়ের জন্য আবেদন সৃষ্টি করেনি, সে আবেদন যেন চিরন্তন বা চিরকালের - আজও সে গল্পগুলো পাঠকমনকে আলোড়িত করে।

প্রমথনাথ বিশী প্রেমের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে একান্ত অনুরাগী। তাঁর কথা সাহিত্যে বিশেষত উপন্যাসের পাতায় বিনয়, কঙ্কণ, বিমল, ফুল্লরা, জীবনলাল ও রুমালী, তুলসী প্রভৃতি নায়ক নায়িকা চরিত্রের ত্রিভুজ প্রেমের উপস্থাপনায় লেখকের মুন্সিয়ানার পরিচয় আছে। তবে প্রমথনাথ বিশীর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কাহিনীর উপসংহারে প্রেমের মধুর মিলনের কঙ্কন-কিঙ্কিনী বাজিয়ে তোলেননি, বরং তার বেশিরভাগ গল্পগুলো যেন বিয়োগান্তক পরিণতির সাক্ষ্য বহন করে। অন্যদিকে ব্যঙ্গশিল্পী প্রমথনাথের তীক্ষ্ম কলমে প্রেমের রোমান্টিক অনুভূতি উপস্থাপিত না হয়ে, সেখানে যেন এক বিরহের সুরমূর্চ্ছনা সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে শরদিন্দুর প্রেমের গল্পগুলি মধুর মিলনে পর্যবসিত হয়েছে। এখানে দুই শিল্পীর প্রেম ভাবনার বৈপরীত্য। শরদিন্দুর ভল্লু সর্দার বা বিদ্রোহী ছোটগল্পে নর-নারীর প্রেমাকর্ষণ প্রাধান্য পেয়েছে। স্বখাত সলিলে ছোটগল্পে লেখক অসামাজিক প্রেমকে সামাজিক মর্যাদা দিতে পেরেছেন সুকৌশলে। এছাড়া প্রেমের বিচিত্র রূপ প্রকাশিত হয়েছে কিছু গল্পে; তবে বিশুদ্ধ প্রেমের গল্প হিসাবে পাঠক মানসে আজও সমাদৃত যে ছোটগল্পগুলো তন্মধ্যে হাসিকান্না, রোমান্স, গোপন কথা, অপরিচিতা, ভাগ্যবন্ত, মেঘদূত, যুধিষ্ঠিরের স্বর্গ, অষ্টমে মঙ্গল, কানু কহে রাই, ঘড়িদাসের গুপ্তকথা, এমন দিনে, পতিতার পত্র, সুত-মিত-রমণী, গোদাবরী, কালস্রোত, বুড়ো-বুড়ি দুজনাতে, রমণীয় মন ও প্রেম প্রভৃতি। পাশাপাশি প্রমথনাথের শকুন্তলা গল্পে অতীশ ও মালতীর প্রেম সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে বেদনা বিধুর পর্যায়ে পৌঁছেছে। সুতপা গল্পে সুতপা এক প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার স্বপ্ন দেখত সেই প্রণয়ী একদিন ভালবেসেছে রমা নামে অন্য এক মেয়েকে। তখন সুতপা আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে ছিল রমার চেয়েও তাঁর ভালবাসা অনেক উর্ধ্বে। উল্টাগাড়ি, মাধবী মাসি, ছবি, অতিসাধারণ ঘটনা, চেতাবনী, প্রত্যাবর্তন, ডাকিনী প্রভৃতি গল্পে প্রেম ভাবনা প্রমথনাথ নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন।

প্রমথনাথ তাঁর ছোটগল্পগুলোতে শুধুমাত্র বিবরণের আশ্রয় নেননি। বিশেষত তাঁর ব্যঙ্গধর্মী সংলাপ ও কৌতুক ধর্মী সংলাপ আলাদা স্বাদ এনে দিয়েছে। তাঁর কিছু গল্প ঘটনা নির্ভর আবার কোনগুলি চরিত্রধর্মী। গল্পের আবহ সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা প্রশংসাতীত। গল্পের কাহিনীর সঙ্গে চরিত্রের কার্যকারণ সূত্র রক্ষিত হয়েছে। ক্লাইমেক্স অত্যন্ত নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর গল্পের কোনো কোনো ভাষা সুগভীর ব্যঞ্জনা বহন করে। তিনি সাধুভাষা বর্ণনা অংশে এবং চলিত ভাষা সংলাপ অংশে ব্যবহার করেছেন এবং দেশী বিদেশী ভাষার সংযোজন ঘটিয়েছেন। প্রমথনাথের একগজ মার্কিন ও এক চামচ চা ছোটগল্প থেকে সংলাপ অংশ প্রদত্ত হল—

"লোকটা কি অন্তর্যামী নাকি! আমি পুঁই ডাটা খাই, লেখা পড়া জানি এবং ভদ্রলোকের

ছেলে, এসব গুহ্য কথা জানিল কেমন করিয়া?

আমি বলিলাম—মশাই, সব কথাই তো বুঝলাম কিন্তু এখন মার্কিন না নিয়ে বাড়ী ফিরি কি উপায়ে?

লোকটি হাসিয়া বলিল - ওঃ গিন্নি বুঝি রাগ করবেন?

- নাঃ আর সন্দেহ নেই যে লোকটি অন্তর্যামী। সম্ভবত শাপভ্রষ্ট কোন দেবতা।"[২৮]

আলোচ্য অংশে গল্পকার লেক মার্কেটের রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। 'নগেন হাঁড়ির ঢোল' ছোটগল্পে চাপরাশি সকালে বিকালে দুপুরে হাটে বাজারে পথে সর্বদা সর্বত্র ঢোলের শব্দ শুনে বিরক্ত হয়ে নগেনকে বিপর্যস্ত করবার জন্য—

"চাপরাশি গর্জন করিয়া বলিল—নে ঢোল কাঁধে নে।

নগেন অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে বলিল—ঢোল তো আমার নেই।

পেয়াদার হুকুমে দু'তিনজন ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। খুঁজিয়া দেখিতে হইবে কোথায় ঢোল আছে।

অবশেষে একজন মাচার দিকে তাকাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—এই যে! পেয়েছি। সে ঢোলটা টানিয়া বাহির করিল। কিন্তু একি সবাই অবাক হইয়া গেল এ যে চামড়া কাটা, খোল ফাটা, পালক ছেড়া। কাঠ, চামড়া আর পালকের একটা স্তুপ। এই কি নগেনের বহু সাধের ঢোল।" [২৯] গল্পটিতে হাস্যরসের আড়ালে ব্যঙ্গের সুর প্রতিধ্বনিত। গল্পের শেষে নগেনের জীবনের কারুণ্য উপস্থাপিত। কিন্তু তার অন্তঃস্থলে পাঠক মনে এক কৌতুক বোধের সঞ্চার ঘটে।

অন্যদিকে শরদিন্দুর ছোটগল্পে নাটকীয়তার প্রাধান্য, গল্পের ঘটনার অগ্রগতি, ভাষার ব্যঞ্জনা, ক্লাইমেক্স ও অ্যান্টিক্লাইমেক্স, সার্থক সংলাপ ও গল্পের Starting ও Finishing শিল্প সম্মত। স্বাধীনতার রস ছোটগল্পটি শেষ করেছেন চারবাক্যে—"চায়ের দোকানের ছোকরার আক্ষেপ মনে পড়ল। ভদ্দর লোকের সইল না হে। নতুন স্বাধীনতার রস বড়ই উগ্র! নবগোপালবাবু সহ্য করতে পারেন নাই এখন আমাদের সহ্য হইলে হয়।" [৩০] এই গল্পের অন্তর্গূঢ় ইঙ্গিত শরদিন্দু যেভাবে দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে সার্থক শিল্পগুণের পরিচায়ক।

'চুয়াচন্দন' গল্প থেকে শরদিন্দু ছোটগল্পের স্টাইল তুলে ধরছি—"চুয়ার মনে আবার ভয় প্রবেশ করিল। সম্মুখে সমস্ত দিন পড়িয়া আছে। কি জানি কি হয়! সে ভয় কাতর চক্ষু দুইটি তুলিয়া বলিল, যাচ্ছ? '-কিন্তু-'

'কোন ভয় নেই চুয়া।'

'কিন্তু—যদি বিঘ্ন হয়—যদি—একটা জিনিস দিতে পারবে?'

'কি?'

'একটু বিষ। যদি কিছু বিঘ্ন হয়—'[৩১] সরল ভাষায় চন্দন দাসের অন্তরের খেদোক্তি ছোটগল্পকার শরদিন্দু সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন।

পরিশেষে বলা যায় দু'জন ছোটগল্পকারই ছোটগল্প রচনায় বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয়

দিয়েছেন। দুজনেই হাস্যরসকে গল্পে আমদানি করেছেন। এই দুই লেখক সমসাময়িক কালে ছোটগল্প রচনা করলেও তারা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। একই তিমিঙ্গিল নামে দু'জনে ছোটগল্প লিখলেও প্রকাশভঙ্গি ও বিষয় ও উপস্থাপন কৌশল সমধর্মী একথা বলা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন জীবন দর্শন ভিন্ন লেখকের কলমে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেখা দেয়।

ঃ প্রমথনাথ বিশী ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের তুলনামূলক পর্যালোচনা ঃ

প্রমথনাথ বিশী ও প্রেমেন্দ্র মিত্র দুইজনেই বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট ছোটগল্পকার। বয়সে তিন বছরের কনিষ্ঠ প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পের তুলনামূলক পর্যালোচনা করাই আমার এই অধ্যায়ের লক্ষ্য। প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলা সাহিত্যে আর্বিভূত হয়েছিলেন প্রবাসী, কল্লোল, বিজলী, কালিকমল ও যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। যুগধর্ম প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে আক্ষরিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পগুলি কল্লোল, কথাসাহিত্য, আনন্দবাজার, যুগান্তর, শান্তিনিকেতন প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের অস্থির অবস্থায় সার্থক ছোটগল্পকার। মূলত যুগ যন্ত্রণাকে আশ্রয় করে তিনি নীলকণ্ঠ হতে চেয়েছেন। তাঁর ছোটগল্পে সেই যুগ যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি থাকলেও তিনি হতে পেরেছেন সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমে্র পূজারী। সমকালীন জীবনের কাঁটা ও ফুল, অমৃত ও গরল আকণ্ঠ পান করে প্রেমেন্দ্র মিত্র হয়ে উঠেছিলেন বাস্তববাদী ছোটগল্পকার। তৎকালীন সময়ের অন্ধকারময় জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটনে তিনি সদা ব্যস্ত। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তিনি দেখেছেন ঘৃণ্যতা, মায়ের চোখের সকরুণ অশ্রুধারা' তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তিনি সহানুভুতির সঙ্গে গলিত কুষ্ঠ রোগীর আর্তনাদ শুনেছেন। লোভ, লালসা, নিষ্ঠুরতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, নারীর ব্যভিচার, হিংসা, ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তনাদ, অহংকার, বিকলাঙ্গ মানুষের আর্তনাদ, রুগ্ন পচাগলা মানুষের কঙ্কালের ছবি দেখেছেন এবং সেখানে থেকে উত্তীর্ণ হয়ে পরম সুন্দরের জয়গান করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র নাগরিক জীবনের অন্যতম রূপকার। তাঁর ছোটগল্পে জটিল মনস্তত্ত্ব, ধনবন্টন বৈষম্য, দাম্পত্য প্রেমের মধ্যে একটা ব্যবধান, মানবিক সম্পর্কের মধ্যে কপটতা, প্রেমের হীনতা, উচ্চবিত্তের মধ্যে প্রেমের ব্যাপারে সুসম্পর্কের অভাব তাঁর ছোটগল্পের বিষয়।

প্রমথনাথের ছোটগল্পে বিচিত্রধর্মী সে বৈচিত্র্য আমরা লক্ষ্য করি রঙ্গব্যঙ্গ, কৌতুক রসযুক্ত, জীবনবোধযুক্ত, ঐতিহাসিক, অতিপ্রাকৃত, পুরাণকেন্দ্রিক, রূপকধর্মী, সাহিত্য বিষয়ক, শিক্ষা বিষয়ক, রাজনৈতিক বিষয়ক, সামাজিক কুসংস্কার, অনাচার বিষয়ক ও প্রেম মূলক ছোটগল্পে। প্রমথনাথের গণক, গাধার আত্মকথা, শিবুর শিক্ষানবিশী, টিউশন, চাকরি স্থান, প্রফেসর রামমূর্তি, অর্থ পুস্তক, উতঙ্ক, গদাধর পণ্ডিত প্রভৃতি ব্যঙ্গধর্মী ছোটগল্প। সাহিত্য বিষয়ক তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে ভাঁড়ু দত্ত, শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব, চিত্রগুপ্তের অ্যাড্‌ভেঞ্চার, পরিস্থিতি, কাঁচি, পূজার রচনা, রাজকবি, সাপেবর, বাল্মীকির পুনর্জন্ম, সাহিত্যের তেজিমন্দ,

নতুন বস্ত্র, নরশার্দুল সংবাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রমথনাথের রাজনীতি বিষয়ক ছোটগল্প ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যানিং, সিন্ধবাদের অষ্টম সমুদ্রযাত্রার কাহিনী, শ্রীভগবানকে চাই, হাতুড়ি, রক্তাতঙ্ক ও রক্তবর্ণ শৃগাল প্রভৃতি ছোটগল্প। প্রমথনাথের বিশুদ্ধ কৌতুক রসযুক্ত শুভ্র সুন্দর ছোটগল্পের সংখ্যা অজস্র—থার্মোমিটার, বাঘদন্তা, গঙ্গার ইলিশ, বাইশ বছর, অদৃষ্ট সুখী, রাশিফল, কৃষ্ণ নারায়ণ সংবাদ ও চাচাতুয়া প্রভৃতি কৌতুক রসযুক্ত ছোটগল্প, কিন্তু এতে কিছুটা ব্যঙ্গের সুর প্রাধান্য পেয়েছে। প্রমথনাথের মহালগ্ন, মহেঞ্জোদড়োর পতন, ধনেপাতা, ছিন্নমুকুল, রক্তের জের, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি ছোটগল্পে ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে জীবন রস যুক্ত হয়েছে। চিলা রায়ের গড়, স্বপ্নাদ্য কাহিনী, অশরীরী, কপালকুন্ডলার দেশে, দ্বিতীয় পক্ষ, শুভদৃষ্টি, অবচেতন, পাশের বাড়ি প্রভৃতি অতিলৌকিক ছোটগল্পে লেখকের বিচিত্রমুখী প্রতিভার পরিচয় আছে। প্রমথনাথের রূপক ও নীতিমূলক ছোটগল্প সিংহ চর্মাবৃত গর্দভ, উলাট পালট পুরাণ, টিকি, জামার মাপে মানুষ, বাজিকরণ প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। প্রমথনাথের সার্থক প্রেমের গল্প শকুন্তলা, সুতপা, অতি সাধারণ ঘটনা, চেতাবনী, প্রত্যাবর্তন, ছবিও মাধবী মাসী প্রভৃতি। তাঁর সার্থক প্রেমের ছোটগল্পে রোমান্টিক প্রেমের ঘাত প্রতিঘাত বর্ণিত হয়েছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঐতিহাসিক, অতিলৌকিক ও ব্যঙ্গধর্মী ছোটগল্প লেখেননি। তাঁর গল্পের বিষয় নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের ব্যর্থতা ও আদর্শচ্যুতি। শুধু কেরাণি, পুন্নাম, ভবিষ্যতের ভার ও বেনামি বন্দর প্রভৃতি ছোটগল্পে মানুষদের প্রতি লেখকদের সহানুভুতি প্রদর্শিত হয়েছে। বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে ছোটগল্পে ক্ষুধাতুর পতিতা জীবনের যন্ত্রণা স্থান পেয়েছে। মহানগর ছোটগল্প শহর জীবনের হিংস্রতা, জটিলতা ও নিষ্ঠুরতা—বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে লেখক তুলে ধরেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র দাম্পত্য জীবনের ছোটগল্প লিখেছেন। প্রমথনাথের মতো তাঁর ছোটগল্পে সুখী সুন্দর দাম্পত্য জীবনের ছবি নেই। 'শৃঙ্খল' ও 'হয়তো' প্রভৃতি ছোটগল্প তার সার্থক প্রমাণ।

প্রমথনাথ তাঁর ছোটগল্পে পরকীয়া প্রেমকে স্থান দেননি। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র পরকীয়া প্রেম মূলক ছোটগল্প লিখে সাফল্যের স্তরে উন্নীত হয়েছেন। তাঁর পরকীয়া প্রেমমূলক স্টোভ, জনৈক কাপুরুষের কাহিনী, ভস্মশেষ প্রভৃতি ছোটগল্পে ত্রিভুজ প্রেমের চিত্র আছে। জীবনের রহস্য সন্ধানে প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন সিদ্ধহস্ত। প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবন জটিলতা ও রহস্য উন্মোচনমূলক ছোটগল্প, কালোজল, সাপ, নিরুদ্দেশ, বিদেশিনী, বাঘ প্রভৃতি ছোটগল্প বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে।

প্রমথনাথ ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে কাহিনীর সঙ্গে চরিত্রের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের চরিত্রগুলি বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত। খুব কাছ থেকে দেখা ছোটগল্পের চরিত্রগুলি সার্থক ভাবে প্রেমেন্দ্র মিত্র রূপায়িত করেছেন। ভবিষ্যতের ভার ছোটগল্পে বাংলা স্কুলের হেড পণ্ডিত, থার্ড মাস্টার, ফোর্থ মাস্টার এবং টুলু, চপলা, অনামিকা, সুব্রত যামিনী, নিরঞ্জন, মাধুরী, রতন ও লাবণ্য প্রভৃতি সার্থক চরিত্র।

প্রমথনাথের ছোটগল্পের চরিত্রগুলো কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। রাধারাণী, কুন্দনন্দিনী, মল্লিকা, রতনমণি, অমরনাথ, জগবন্ধু ও শিব প্রভৃতি চরিত্রগুলো প্রমথনাথের কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাবনার স্বরূপগত পার্থক্য ও মিল কতটা তা আলোচনা করা যেতে পারে। 'শৃঙ্খল' প্রেমের গল্প কিন্তু এই প্রেম পরিণতিতে বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। গল্পের পরিণতিতে ভূপতি ও বিনতি উভয়ে উভয়ের কাছে ঘৃণার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। হয়তো ছোটগল্পে মহিম ও লাবণ্য উভয়েই উভয়কে ভালোবেসেছে। কিন্তু তারা ভালোবাসার যথার্থ মূল্য দিতে পেরেছে কি? প্রেমেন্দ্র মিত্রের ষ্টোভ ছোটগল্পে ত্রিভুজ প্রেম গড়ে উঠেছে শশীভূষণ 'মল্লিকা' ও বাসন্তীকে ঘিরে। তেমনি 'ভস্মশেষ' ছোটগল্পে ত্রিভুজ প্রেম গড়ে উঠেছে অমরেশ ডাক্তার, সুরমা ও জগদীশ এই তিন চরিত্র মিলে। সুরমা বিবাহিতা তাঁর স্বামী জগদীশ। অথচ পরস্ত্রীকে ঘিরে অমরেশের হৃদয়ে জ্বলে উঠেছিল যে আগুন তা ছাই হয়ে গেল যেদিন জগদীশ ও সুরমার জীবন বৃত্তে অমরেশের স্থান হল এতটুকু। প্রেমেন্দ্র মিত্র যে ছোটগল্পগুলি লিখেছিলেন তার মধ্যে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব প্রাধান্য পেয়েছে। নায়ক নায়িকার প্রেম মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ রূপকার হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

পাশাপাশি প্রমথনাথের প্রেমের গল্পে রোমান্টিক বাতাবরণ তৈরি হয়েছে সন্দেহ নেই। সুতপা, অতিসাধারণ ঘটনা ও 'প্রত্যাবর্তন' ছোটগল্পে গল্পকার প্রেম বিষয়ক সার্থক ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে সফল হতে পেরেছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাষা চিত্রধর্মী ও কাব্যধর্মী। তার কাব্যধর্মী ভাষার দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলে ধরছি ঃ

"পথের ধার গাছগুলি ঝড়ের তাড়নায় অসহায় বন্দীর মতো মাটির শৃঙ্খল ছিঁড়িবার জন্য যে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। পথের ধারে গ্যাস আলোগুলি কেমন নিস্প্রভ হইয়া গিয়াছে—সমস্ত মানব জাতির আলোর সঙ্গে, কেন জানি না, তাহার একটি উপমা বারবার মনে আসিতে চায়।"[৩২]

কবিত্বহীন, আবেগহীন ভাষা সৃষ্টিতেও প্রেমেন্দ্র মিত্র দক্ষ। যেমন—'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' ছোটগল্পের কবিত্বহীন ভাষা গল্পটিকে সার্থক করে তুলেছে ঃ

"নে তবে!—এই মুহূর্তেও অদ্ভুত পরিহাসের সুরে রাঙা বৌদি বললেন, আড়াল দেবার জন্যে একটা নলচে এখনোও আছে কেমন— সেটা রাখবার চেষ্টাও করতে হবে। এ ঝক্কিটা তাই একা আমায় নিতে দিলেই পারতিস্।"[৩৩]

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সার্থক উপমার দৃষ্টান্ত—স্বপ্নের বুদবুদ ক্ষণিকের জন্য জীবনের জগতে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গেছে। এখানে মনের আকাশ চেতনার শেষ অন্তরীণ। উপমা যুক্ত শব্দগুলির ব্যবহার লক্ষণীয়। এছাড়া আরো কতগুলো বাক্য তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মনের আকাশে একটু করে কুয়াশা জমছে কি না আপনি টের পাবেন না। 'স্বপ্নের বুদবুদ'

ও 'মনের আকাশ' সার্থক উপমার দৃষ্টান্ত। পাশাপাশি একটি সমাসোক্তি অলঙ্কারের সার্থক উদাহরণ তুলে ধরছি ঃ "তারই পাশে বেশ বিশালায়তন একটি জীর্ণ অট্টালিকা, ভাঙা ছাঁদ, ধসে পড়া দেওয়াল ও চক্ষুহীন কোটরের মতো পাল্লাহীন জানালা নিয়ে চাঁদের বিরুদ্ধে দুর্গ প্রাকারের মতো দাঁড়িয়ে আছে।" আলোচ্য সমাসোক্তি অলঙ্কারে পাল্লাহীন জানালার সঙ্গে চক্ষুহীন কোটর উপনীত হয়ে ক্ষয়িষ্ণু অট্টালিকার চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

পাশাপাশি প্রমথনাথ বিশীর অজস্র ছোটগল্পে উপমার সার্থক দৃষ্টান্ত আছে ঃ

১) "চরাচর ব্যাপী সেই তরল অন্ধকারের ভূমিকার উপরে নিত্যকার মতো সেদিনও নিঃশব্দে সন্ধ্যাতারা উঠিল।"[৩৪]

২) "এমন সময় সকলে দেখিতে পাইল, অলিন্দের শ্বেত পাথরের সোপান বাহিয়া প্রভাতের শুকতারার ন্যায় একজন রমণী নামিতেছে, সকলেই চিনিল—আর্যা শিলাবতী।"[৩৫]

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'হয়ত' ছোটগল্পে নারী চরিত্রের প্রতিনিধি মাধুরীর মুখের ভাষা নিম্নরূপ—"হাজার হাজার মেয়ে মানুষের শাপে এ বাড়ির প্রত্যেকটি ঘরের ভিত পর্যন্ত ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। সাত পুরুষ ধরে এরা মেয়ে মানুষের এমন অপমান লাঞ্ছনা নেই, যা করেনি। তাদের সে অভিশাপ যাবে কোথায়। যা নিয়ে একদিন ছিনিমিনি খেলেছে তারই জন্য দুর্ভাবনা আজ তোর বরের বুক কুরে কুরে খাচ্ছে।"[৩৬]

প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পের নারীজাতির ভাষার একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি ঃ "হ্যাঁ মা, সবাই আমাকে গন্ডার মাসি, গন্ডারানী বলিয়া ডাকে কেন বলতে পার?"

পরিশেষে বলা যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র বস্তুনিষ্ঠ ও মননের শিল্পী এবং অর্ন্তভেদী বিশ্লেষক। তাঁর গল্পের চরিত্র, কাহিনী, প্লট, ভাষা, শুরু ও সমাপ্তি, ক্লাইমেক্স ও এন্টিক্লাইমেক্স স্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি সার্থক। পাশাপাশি প্রমথনাথ বিশী ব্যঙ্গধর্মী ছোটগল্পকার হলেও ইতিহাস, অতিলৌকিক ও বাস্তবসমাজ জীবন কেন্দ্রিক কাহিনী বিন্যাস, চরিত্র, সংলাপ, ভাষা, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, নাট্যগুণ, কাব্যগুণ প্রভৃতি তুলনা করলে উভয়ের মধ্যে ব্যাপক সাদৃশ্য থাকলেও দুইজনে সমগোত্রীয় গল্পকার নন।

ঃ প্রমথনাথ বিশী ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ছোটগল্পের তুলনামূলক পর্যালোচনা ঃ

কল্লোল ত্রয়ীর বিশিষ্ট দিক্‌পাল অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম এই দুই ছোটগল্পকারের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আমাদের কাছে বিচার্য! অচিন্ত্যকুমার ও প্রমথনাথ বিশী দুই জন সমকালীন ছোটগল্পকার। প্রমথনাথ অচিন্ত্যকুমারের চেয়ে দুই বছরের বয়ঃজ্যেষ্ঠ।

মানসিকতার দিক থেকে দুইজনই সমধর্মী ছোটগল্পকার নন। অচিন্ত্যকুমারের গল্পের একদিকে যেমন যৌবনের উন্মাদনা, বিদ্রোহাত্মক লেখনী, সেই সঙ্গে এক যাযাবরী মানসিকতা, অস্থিরতা, গতানুগতিক নিয়মভঙ্গের প্রয়াস এবং রোমান্টিক ব্যাকুলতা অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। অচিন্ত্যকুমার রুশ, ন্যাভিয়, ফরাসি ও ইংরেজ সাহিত্যিকদের দ্বারা

বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। অন্যদিকে প্রমথনাথ বিশী ইংরেজি সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত। প্রমথনাথের ছোটগল্পে রোমান্টিকতার সুর প্রাধান্য পেয়েছে। দুইজনের ছোটগল্পে অবক্ষয়িত সমাজ থেকে নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন আছে। আমরা দুইজনের ছোটগল্পে বিষয়গত সাদৃশ্য কতটুকু তা আলোচনা করতে পারি।

অচিন্ত্যকুমার শুধু মাত্র নগরমুখী ছোটগল্পকার নন। তিনি পল্লীবাংলার জনজীবনের ইতিকথাকে ছোটগল্পে স্থান দিয়েছেন। তাঁর ছোটগল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের পরাজয়ের বেদনা ঘনীভূত হয়েছে। অচিন্ত্যকুমার সমাজের নীচুতলার মানুষদের নিয়ে ছোটগল্প লিখে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি গ্রাম বাংলার বঞ্চিত ও প্রতারিত হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতিকে নিয়ে যে ছোটগল্প লিখেছেন তার মধ্যে প্রতারক ও প্রবঞ্চক বিত্তবান মানুষদের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতাকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত করেছেন। তবে মুসলমান চরিত্র নিয়ে তিনি যে ছোটগল্পগুলি লিখেছেন তার সংখ্যা ও গল্পের সাহিত্য মূল্য সবচেয়ে বেশি। সর্বোপরি বিচারবিভাগের অধীনস্ত আদালতের প্রকৃত স্বরূপকে উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে আপন অভিজ্ঞতার আলোকে বিচিত্রধর্মী চরিত্র নির্মাণ করেছেন। মানুষের মধ্যে ঘৃণ্যতা, সংকীর্ণতা, নৃশংসতা, পৈশাচিক মনোবৃত্তি, মিথ্যা, কপটতা যেমন জাল বিস্তার করে আছে তাঁর ছোটগল্পে ঠিক তেমনি পাশাপাশি সৎ আদর্শবান, মহৎ সহানুভূতি সম্পন্ন ও দয়ালু চরিত্র তিনি নিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন। এই ধরনের ছোটগল্পের মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে খাল, সারেঙ, হাড়, নতুন দিন, জমি, জনমত, অশরীর, ধান, মুন্সি, কেরসিন, কালরক্ত, ঔষধ প্রভৃতি ছোটগল্প। যদিও গল্পগুলিতে দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, দাঙ্গা প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে। এছাড়া নগর জীবনের মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনচিত্র আঁকা হয়েছে যে কে সে ও ধন্বন্তরী প্রভৃতি ছোটগল্পে।

প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পের বিষয় বহুমুখী যথা— প্রেমের গল্প, পৌরাণিক গল্প, অতিপ্রাকৃত রসের গল্প, ঐতিহাসিক গল্প, রঙ্গব্যঙ্গ মূলক ছোটগল্প, রাজনৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক, সাহিত্য বিষয়ক ছোটগল্প লিখে তিনি পাঠক মনে স্থায়ী আসন অধিকার করেছেন।

প্রমথনাথ ও অচিন্ত্যকুমার দুইজনেই অভিজ্ঞতার শিল্পী। কর্ম উপলক্ষ্যে অচিন্ত্যকুমারকে ঘুরতে হয়েছিল বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে। মুন্সেফ হয়ে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বিচিত্র মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে। চাষা, হাড়ি, ডোম, মালো, মুচি ও জেলেদের জীবন চিত্র তিনি বাস্তবোচিতভাবে ছোটগল্পে উপস্থাপন করেছেন। ঠিক তেমনি প্রমথনাথ উত্তরবঙ্গের রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর, কলকাতা, দিল্লি ও বীরভূম প্রভৃতি স্থানের ভৌগোলিক পটভূমিতে বিচিত্র অভিজ্ঞতার আলোকে সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করতে পেরেছেন।

কলকাতা ও পূর্ববঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান জীবন কাহিনী অবলম্বনে গ্রামীণ প্রেমের গল্প রচনায় অচিন্ত্যকুমারের সাফল্য কোনো অংশে কম নয়। তাঁর 'যশোমতী', 'নুরবানু', 'দাঙ্গা', 'জমি' প্রভৃতি প্রেমের গল্পে প্রেমের চিত্র নেই। আছে মানুষের মহত্তর দিক। পাশাপাশি

প্রমথনাথের প্রেমের গল্পে নায়ক নায়িকাদের প্রেম ভাবনা কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি এনে দিয়েছে। এজন্য প্রমথনাথের প্রেমের গল্পে প্রেমের গভীরতা থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে করুণ সুর উপজীব্য হয়ে উঠেছে।

এবার অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে প্রমথনাথের ছোটগল্পের আঙ্গিক বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। অচিন্ত্যকুমার তাঁর 'শতগল্প' সংকলনের ভূমিকায় ছোটগল্পের শিল্পরীতি সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন ঃ

"ছোটগল্প লেখবার আগে চাই ছোটগল্পের শেষ কোথায় সে বাঁক নেবে, কোণে কোণে। ....শেষ না পেলে ছোটগল্পে আমি বলতেই পারবো না। শুধু ঘটনা যথেষ্ট নয়। শুধু চরিত্র যথেষ্ট নয়। চাই আবার সমাপ্তির সম্পূর্ণতা। ....গল্পকে বৃত্ত বলছি বটে কিন্তু তা অত্যন্ত লঘু বৃত্ত। তার বেষ্টনী চক্র, গতি দ্রুত, পরিসর ক্ষীণ, সমাপ্তি পরিমিত। শুধু তাকে ঘুরানই চলবে না, কোন কেন্দ্রের উপর কতখানি জায়গা নিয়ে ঘুরবে তারও আগে থেকে নির্ধারণ করা চাই। ....ছোটগল্পে চাই স্পষ্টতা তেমনই চাই সংযম, যেমন চাই সংকোচ, তেমনি চাই সুবক্তব্য....তাঁর বাণ শব্দভেদী নয়, লক্ষ্যভেদী। ....তারপর সবচেয়ে যা বিস্ময়ের গল্পের যা শৃঙ্গভাগ, তা হচ্ছে বিস্ময় উৎপাদন। তবে আমরা কি পেলাম—বাঁক বা বৃত্তরেখা। শেষের প্রতি আরম্ভের শাণিতাগ্র, ধাবমানতা, বিস্তরবর্জন বা ভারলাঘব। রসের এককত্ব এবং অপ্রত্যাশিত বিস্ময় সৃষ্টি এবং সর্বশেষে চাই সেন্স অব ফর্ম বা আকার চেতনা। এই আকারের পরিমিতি থেকেই রসের সমগ্রতা আসে।"[৩৮]

অচিন্ত্যকুমারের ছিল গল্প গঠন সম্পর্কে সচেতন দৃষ্টি, গল্পের শুরু ও শেষ অংশের সার্থকতা। সেই সঙ্গে উপস্থাপন কৌশলের প্রধান অঙ্গ ভাষা সম্পর্কে তাঁর শিল্পবোধের পরিচয় সুস্পষ্ট। অনেক ক্ষেত্রে অচিন্ত্যকুমারের গল্পের শৈলী কাহিনীধর্মী। ডঃ ভূদেব চৌধুরী এই প্রসঙ্গে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন—

"কথকতার স্বাদুতা তার পদে পদে, মধুর কথা—অমৃতময় বাণীরচনা—সুললিত 'বর্ণনা', কর ধাতুর তাৎপর্য সর্ব অবয়বে। লেখকের প্রতিভার যথার্থ স্বাক্ষরবহ সবচেয়ে আবেগপূর্ণ গল্পগুলিও আসলে গল্প কথিকা, বাকি অনেক কয়টি আছে কাব্যস্বাদী গল্পই।"[৩৯]

"অচিন্ত্যকুমারের প্রচুর ছোটগল্পের কাব্যগুণ থাকলেও গল্পের গল্পত্ব এতটুকু হ্রাস পায়নি। 'ভারতী' পত্রিকায় অচিন্ত্যকুমারের গল্প প্রকাশিত হতে থাকে। সেই ভোরের আলোচনাতেই গাল্পিক অচিন্ত্যকুমারের মধ্যাহ্ন প্রতিভার পরিচয়টুকু সার্থক আভাসিত হয়েছিল বলে মনে করি। একটি গল্পের নাম আলতার দাগ।"[৪০]

অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পের নিম্নোক্ত অংশটির কাব্যধর্মিতা সার্থকভাবে পরিস্ফুট হয়েছে ঃ

"আলতার দাগ। মেয়েটির পদ্মকলির মতোন ছোট ছোট দুই পা ঘিরে আলতার লালিম লেপন—একটা যেন রঙীন মায়া, জাগরণের বিচিত্র কোলাহলের মাঝে স্বপ্নের মধুর একটা রেশ, আষাঢ় সন্ধ্যার সুরভরা একটি রামধনু। মেয়েটি চলে গেল, মনে হল

সরু গলিটা জুতোর ভারে কাঁপচে না, আলতার ছোঁয়ায় শিউরে শিউরে উঠছে। 'কথার যত ছন্দ—বাঁধুনীই থাক, সুরটিকে সে হারায়নি।"[৪১]

আচিন্ত্যকুমার তাঁর ছোটগল্পে বরিশালের কথ্য ভাষাকে স্থান দিয়েছেন। 'ডাকাত' ছোটগল্প থেকে দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল—"এউগাও মাইয়া নাই। শোন খবরদার বেডির গায়ে হাত ছোয়াইতে পারিবি না। যে কাপড় দিচ্ছি অর গায়ে যেন নিটুট থাহে।"[৪২]

এছাড়া অচিন্ত্যকুমার বেশ কিছু আঞ্চলিক শব্দ প্রয়োগে নিতান্ত অন্তরঙ্গতার সুর গল্পের পরিবেশকে জীবন্ত করে তুলেছেন। এমনি কয়েকটি আঞ্চলিক শব্দ প্রদত্ত হল 'খাওন পিয়নের কষ্ট', 'ফেরায়া নৌকা', 'সোতের শ্যাওলা', 'গলায় সোনার হার', 'বিয়া না পুরুষের আনাগোনা' প্রভৃতি।

অচিন্ত্যকুমারের গল্পের বাঁক, ক্লাইমেক্স, চমক, গল্পের শুরু ও শেষ গল্পগুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। 'ডাকাত' ছোটগল্পের শেষ বাক্যটি শিল্পগুণ সমৃদ্ধ "তবু যাক পেয়েছিস তো নতুন কাপড়। পবন গাজি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।"[৪৩]

আবার 'সারেঙ' ছোটগল্পের সমাপ্তি অংশটুকু শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক যা প্রদত্ত হল "সারেঙ হুকুম দিল, আজ থেকে নাসিম সিঁড়ি ধরবে। বলে দরাজ গলায় নাসিমকে উৎসাহিত করতে লাগল সারেঙ। যে লোক নাসিমকে এতদিন নানাভাবে পীড়ন করেছে তারই এই মহত্ত্ব। নাসিম তাকাল সারেঙের দিকে তার মতো চেহারা দয়ালু সারেঙ আজ অসহায় কিশোরের দৃষ্টিতে মহান হয়ে উঠেছে।" লেখকের কলমে বর্ণনা অংশটি রসোত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

'দোলনা' ছোটগল্পে সমাপ্তি অংশটি পাঠক মনে বিশেষ ভাবে রেখাপাত করে—"বুঝেছি কিছু, সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি। পরিপূর্ণ চোখ তুলে সুভদ্রা বললো, কেন ফেলে দিয়েছিলে বলো দিকি? বা এ আবার কে—না বোঝে? হাঁটতে হাঁটতে তারা এগিয়ে গেল ভোরের জানালার দিকে। নাগস্বামী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, নইলে তোমাকে বিয়ে করতুম কি করে।"[৪৪]

সমাপ্তি অংশে সুন্দরের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও গল্পের পরিণতি হয়েছে বিয়োগান্তক। গল্পের কাহিনী বৃত্ত ও ঘটনাবিন্যাসকে তীক্ষ্ণ মননে গড়ে তুলেছেন অচিন্ত্যকুমার। অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পের চরিত্রগুলি অনবদ্য। তাঁর সারেঙ, নাসিম, প্রদত্ত, আনন্দময়, নুরবানু, যশোমতী, দুর্গাচরণ, হানিফ, যতন, মমিনা, মকবুল, জিনাদ আলী, শিবানী, কুঞ্জবিহারী, সুরমা, মনোরথ, ক্ষীরোদ, সুমিতা, হরেন্দ্র, শেফালী, অনুনয় ও মিনতি প্রভৃতি প্রতিটি চরিত্রই অচিন্ত্যকুমারের কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

প্রমথনাথের ছোটগল্পের শুরু ও সমাপ্তি অংশটি শিল্প সমৃদ্ধ। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি ঃ

'আয়নাতে' ছোটগল্পটি শুরু করেছেন চিঠির মাধ্যমে এবং শেষ করেছেন এক দার্শনিক বক্তব্যের মধ্যদিয়ে। অলঙ্কার ছোটগল্পের শুরুতে যমুনার শ্বশুর বাড়িতে যাবার প্রাক্কালে

মায়ের উপদেশ এবং গল্প শেষে অলঙ্কার হরণের প্রভাব থেকে মুক্ত যমুনার দিন পূর্বের মতোই সুখে দুঃখে থাকার বর্ণনায়। অসমাপ্ত কাব্য ছোটগল্পের প্রারম্ভে যুবরাজ কুমার গুপ্ত হূণ শক্তিকে প্রতিহত করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনকালে যুবরাজকে স্বাগত সম্ভাষণের মধ্য দিয়ে গল্পটি শুরু হয়েছে। গল্প শেষে কালিদাস ও শিলাবতী নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করেছে। গদাধর পণ্ডিত ছোটগল্পের শুরু নরেশ চন্দ্রের জোড়া দীঘির গ্রামের অফিসের হাকিম পদে স্থলাভিষিক্ত হবার বিবরণ দিয়ে এবং গদাধর পণ্ডিতের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে গ্রাম ত্যাগ করে কলকাতায় রওনা হবার ঘটনার মধ্য দিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

অচিন্ত্যকুমার ও প্রমথনাথ দুইজন ছোটগল্পকার বহু গল্প উত্তম পুরুষের জবানিতে লিখেছেন। অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পের উদাহরণ—"ওর বাঁচার জন্যে আমার একটা চার্জ রায়কে ভুল হয়ে যেতে হবে? পরদিন সকালে উঠে জজ দেখল 'রামেশ্বরের নমস্কারের মতোই সমস্ত আকাশ আন্দোলিত। ক্ষতি নেই ক্ষোভ নেই। প্রাণের রোদে মৃত্যুদণ্ড মুছে গিয়েছে।"[৪৫]

প্রমথনাথের "চোখে আঙুল দাদা" ছোটগল্প থেকে উত্তম পুরুষের জবানি অংশ প্রদত্ত হল—"আমি চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে পারি কিন্তু সেই চোখ বা আঙুল তৈয়ারির ক্ষমতা আমার নাই।"[৪৬] এখানে আমি আমার জবানিতে বক্তার অক্ষমতা প্রকাশিত করেছি।

প্রমথনাথের প্রকৃতি অনেক গল্পে মানব চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি পূর্ণ। 'সাগরিকা' ছোটগল্প থেকে দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল ঃ

"সাগর বেলায় দূর দিগন্তে তখন সুদূর অস্তাচলের শিখরে অর্ধচন্দ্র উঠিতেছেন। সেই আলোতে দিগন্তের শেষ হইতে এই তীর পর্য্যন্ত তরঙ্গের শিখর ঘিরে অপূর্ব জ্যোৎস্নার একটি অপরূপ সেতু রচিত হইয়াছে। স্বর্গীয় এই আলোক পথ কি মানুষকে মহারহস্যের পরপারে লইয়া যাইতে পারে। জানি না।"৪৭

অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্পে প্রকৃতি বর্ণনা আছে এবং প্রকৃতি চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

প্রমথনাথ ও অচিন্ত্যকুমার দুজনের ছোটগল্পে আছে উপমার বাহুল্য—কিন্তু অচিন্ত্যকুমার উপমার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংযম রক্ষা করেছেন। দুইজন শিল্পী বর্ণনা অংশ ও সংলাপ অংশে কাব্যরীতি প্রয়োগ করেছেন। প্রমথনাথ যেমন হিন্দি, ইংরেজি, সংস্কৃত, আরবি, ফার্সি ও আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ করেছেন তুলনামূলক বিচারে অচিন্ত্যকুমার তাঁর ছোটগল্পে কথ্য ভাষার ও আঞ্চলিক ভাষার সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায় অচিন্ত্যকুমার কল্লোলের ধর্মকে আক্ষরিক ভাবে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু প্রমথনাথের ছোটগল্পে কল্লোলোত্তর বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য পেয়েছে। দুইজন ছোটগল্পকার সার্থকভাবে তাঁদের ছোটগল্পে জীবনের বিচিত্র রহস্যকে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। শিল্পীরীতির দিক থেকে দুইজন ছোটগল্পকার সার্থক হলেও দুইজনকে সমধর্মী ছোটগল্পকার হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না।

ঃ প্রমথনাথ বিশী ও বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্পের তুলনামূলক পর্যালোচনা ঃ

প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেব বসু এই কল্লোলত্রয়ীর অন্যতম লেখক বুদ্ধদেব বসু সাহিত্য জগতে সব্যসাচী হিসেবে পরিচিত। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলোর প্রতিটি ছোটগল্প বিষয়বস্তু ও রচনারীতির দিক থেকে বৈচিত্র্যময়। তাঁর 'অভিনয় অভিনয় নয়' (১৯৩০, 'রেখাচিত্র' (১৯৩১), 'এরা আর ওরা' (১৯৩৪), 'রঙিন কাঁচ' (১৯৩৩), 'অদৃশ্য শত্রু' (১৯৩৩), 'ঘুম পাড়ানি' (১৯৩৩), 'প্রেমের বিচিত্র গতি' (১৯৩২), 'মিসেস গুপ্ত' (১৯৩৪), 'অসামান্য মেয়ে' (১৯৩৪), 'শনিবারের বিকেল' (১৯৩৬), 'খাতার শেষ পাতা' (১৯৪৩), 'ফেরিওয়ালা' (১৯৪১), 'একটি কি দুটি পাখি' (১৯৫৫), 'একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু' (১৯৬০), 'হৃদয়ের জাগরণ' (১৯৬১), 'ঘরেতে ভ্রমর এলো' (১৯৩৫), 'নতুন নেশা' (১৯৩৬), প্রভৃতি গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি পাঠক মনে স্থায়ী আসন অধিকার করে আছে। প্রমথনাথের বিচিত্রধর্মী গল্পগ্রন্থ যথাক্রমে 'শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব' (১৩৪৮), 'শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব' (১৩৫২), 'গালি ও গল্প' (১৩৫২), 'ডাকিনী' (১৩৫২), 'ব্রহ্মার হাসি' (১৩৬২), 'অশরীরী', 'ধনেপাতা' (১৩৫৯), 'চাপাটি ও পদ্ম' (১৩৬২), 'নীল বর্ণ শৃগাল' (১৩৬৩), 'অলৌকিক' (১৩৬৪), 'এলার্জি' (১৩৬২), 'অনেক আগে অনেক দূরে' 'প্রমথনাথ বিশীর স্বনির্বাচিত গল্প' (১৩৬২), 'প্রনাবির নিকৃষ্ট গল্প' (১৩৬১), 'অমনোনীত গল্প' (১৩৬১), 'নীরস গল্প সঞ্চয়ন' (১৯৫৭), 'গল্প পঞ্চাশৎ' (১৩৬৭), 'যা হলে হতে পারত' (১৩৫৯) প্রভৃতি। বুদ্ধদেব বসুর মতো প্রমথনাথের গল্পগুলিও বিষয়বস্তু ও রচনাগত দিক থেকে অভিনবত্বের দাবি রাখে সন্দেহ নেই।

বুদ্ধদেব বসু প্রেমের গল্প রচনার ক্ষেত্রে সার্থক শিল্পী। মূলত তিনি প্রেমের গল্প রচনার মধ্য দিয়ে পাঠক মনে স্থান করে নিয়েছেন। বুদ্ধদেবের বহু ছোটগল্পের নায়িকারা ইংরেজি সাহিত্য কিংবা রবীন্দ্রসাহিত্য প্রেমিক। পাশাপাশি তাঁর ছোটগল্পে প্রেমের রোমান্টিক ধ্যানধারণার ঊর্ধ্বে বাস্তবধর্মী ছোটগল্পকার হিসেবে তাঁর পরিচয় পাঠকদের কাছে অজানা নয়। সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, ঈর্ষা, প্রতারণা, ব্যর্থতা, প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষা, প্রতিবাদী চেতনা বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্পে প্রকাশিত হয়েছে। 'রাধারাণী' ও 'নিজের বাড়ি' ছোটগল্পে নতুন বাড়িতে প্রবেশের পরদিন সিঁড়ি থেকে পড়ে রাধারাণীর ছেলের আকস্মিক মৃত্যু গল্পের করুণ পরিণতি বহন করে এনেছে। তাঁর 'চোরচোর' ছোটগল্পে ললিতার সঙ্গে কমল নামে এক চোরের প্রতি সমবেদনা সার্থক সুন্দরভাবে বুদ্ধদেব বসু তুলে ধরেছেন। স্বামী ও স্ত্রীর সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয় এই গল্পে উপজীব্য হয়ে উঠেছে। 'জ্বর' ও 'ফেরিওয়ালা' ছোটগল্পে পুরুষ জীবনের নৈরাশ্য বেদনা ও ইতরতার পরিচয় আছে। পাশাপাশি এক পুরুষ জীবনের মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কি করে অবক্ষয়ের দিকে পৌঁছে গেল 'একটি জীবন' ছোটগল্পে তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর 'প্রথম ও শেষ', ছোটগল্পে এক কুমারী হৃদয়ে কি করে প্রেমের জন্ম হল তার অনবদ্য কাহিনী। 'লুসি ললিতা' ছোটগল্পটি একটি সার্থক প্রেমের গল্প। এই প্রসঙ্গে ডঃ ভূদেব চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও

গল্পকার গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"গল্পের শেষে সুনীল বলল ঃ কিন্তু আমি তো তোমাকে হারাতে পারি না, লুসিললিতা, আমি আছি এই আমার মধ্যেই তুমি আছো। বুদ্ধদেব গল্প সম্বন্ধে এখানেই শেষ কথা মাইকেল এঞ্জেলোর মতো লালচে ছিঁটে তার চোখে আছে কি? আর গগনেন্দ্র নাথের তুল্য শিল্পী তিনি হননি। সে কথাই ওঠেনা। তবু তিনি আর্টিস্ট মিকায়েলেঞ্জেলোর সৃষ্টির মদিরাদাত্যে যিনি তাঁর রোমান্টিক মনকে ডুবিয়েছেন। ভি. এইচ. লরেন্স আর তরুণ অলডাস হাক্সলীর অনুসরণে সেক্স ভাবনায় নিমগ্ন মানস কবি তিনি আর তাঁর মানসী সেই আক্ষেপরই এক বিচিত্র দল কমলিনী, গল্পে নেই, স্থূল শরীরেও কোথাও না। তাঁর গল্পসাধনার সর্বশেষ ফল পরিণাম—নিজের স্বগত ভাববিলাসিতা নিয়ে তিনি আছেন, আর তাঁরই মধ্যে আছে তাঁর 'বিলাসী' মনের কামনাস্মৃতি, সকল সার্থক গল্পের যা প্রাণ।"[৪৮]

প্রমথনাথ বিশী সার্থক ব্যঙ্গ শিল্পী। তাঁর ছোটগল্পে তীক্ষ্ণ শ্লেষ বর্ষিত হয়েছে। 'চিত্রগুপ্তের রিপোর্ট', 'সদা সত্য কথা কহিবে', 'কল্কি', 'রাঘব বোয়াল', 'চাকরিস্থান', 'নতুন বস্ত্র' ও 'ভগবান কি বাঙালি' প্রভৃতি ছোটগল্পে ব্যঙ্গের বাণ অযথা বিদ্ধ করে কিন্তু পাঠক মনে যন্ত্রণা সৃষ্টি করে না। তাঁর গভীর জীবন রসযুক্ত ছোটগল্প 'সুতপা', 'পেশকার বাবু', 'অতি সাধারণ ঘটনা', 'শকুন্তলা', 'ডাকিনী ছোটগল্প' তাঁর সাহিত্য বিষয়ক ছোটগল্প 'শাপেবর', 'বাল্মীকির পুনর্জন্ম', 'কপালকুন্ডলার দেশে', 'রোহিণীর কি হইল', 'ভাঁড়ু দত্ত' ও 'প্রনাবির সঙ্গে কথোপকথন' প্রভৃতি গল্প বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। প্রমথনাথের সমাজ চেতনামূলক ছোটগল্প অথ কৃষ্ণার্জুন সংবাদ, ঘোগ ও মোটর গাড়ি উল্লেখযোগ্য যার মধ্যে ঘুষ নেবার বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। শিক্ষা জীবনের নগ্নতা প্রাধান্য পেয়েছে 'আধ্যাত্মিক ধোপা' ছোটগল্পে। ঐতিহাসিক ছোটগল্পের মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে 'পলাশীর শতবার্ষিকী', আগম-গন্না-বেগম, বেগম শমরুর তোষাখানা, পরী, কোতলে আম, দর্শনী, তিন হাসি, অভিশাপ, রক্তের জের, প্রায়শ্চিত্ত, রুথ, মড, কোকিল, ছায়া বাহিনী, গুলাব সিং এর পিস্তল, জেমি গ্রীনের আত্মকথা, রাখাল কি রাজা, ধনেপাতা, অসমাপ্ত কাব্য, যক্ষের প্রত্যাবর্তন, মহালগ্ন, মহেঞ্জোদড়োর পতন প্রভৃতি ছোটগল্প। বুদ্ধদেব বসু প্রমথনাথের মতো ঐতিহাসিক ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না।

প্রমথনাথের অতিপ্রাকৃত বিষয়কও ভূতের গল্প মোট সতেরোটি। গল্পগুলি যথাক্রমে— খেলনা, পাশের বাড়ি, পুরন্দরের পুঁথি, ভৌতিক চক্ষু, বিনা টিকিটের যাত্রী, অশরীরী, তান্ত্রিক, কালোপাখী, নিশীথিনী, চিলা রায়ের গড়, কপালকুন্ডলার দেশে, সিন্দুক, ফাঁসি গাছ, আয়নাতে, স্বপ্নলব্ধ কাহিনী, শুভদৃষ্টি প্রভৃতি। এছাড়া অবচেতন, গুলাব সিংয়ের পিস্তল, সার্থক অতিপ্রাকৃত রসের ছোটগল্প। তাঁর মতে "ভূত এবং-ভগবান দুই প্রমাণাতীত বিশ্বাসগ্রাহ্য।"[৪৯]

প্রমথনাথ বিশীর প্রেমের গল্প রচনাতেও সাফল্য কম নয়। 'শকুন্তলা গল্পে অতীশ ও

মালতীর প্রেম, 'সুতপা' গল্পে সুতপার প্রেমের স্বপ্ন, 'উল্টাগাড়ি' ছোটগল্পে মঞ্জুলাকে ভালোবাসার কথা জানিয়েছিল প্রবীণ এক নায়ক। এছাড়া ছবি, মাধুবী মাসী ছোটগল্পের নায়িকা প্রবীণা। প্রেমের স্মৃতিচারণ সমৃদ্ধ ছোটগল্প অতিসাধারণ ঘটনা। এক দম্পতির প্রেমের গভীরতা ও আত্মত্যাগে গল্পটি মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানব চরিত্রের সঙ্গতি স্থাপন মূলক সার্থক ছোটগল্প চেতাবনী। 'প্রত্যাবর্তন' গল্পে তুলসীর সঙ্গে নিবারণবাবুর প্রেমের মূর্তি বিচিত্র ভাবে অঙ্কিত হয়েছে। পাশাপাশি বুদ্ধদেবের সেরা 'ভাসো আমার ভেলা' ছোটগল্পটি এক বিশুদ্ধ রোমান্টিক ভালোবাসার গল্প। গল্পটিতে নায়ক নায়িকার মন কেমন করা এক অনুভূতি পাঠক মনে এক অনুভবের জগতে নিয়ে যায়। একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা ছোটগল্পটি বুদ্ধদেবের প্রেমের গল্পগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গল্প হিসেবে চিহ্নিত। 'প্রথম ও শেষ' একটি বিশুদ্ধ প্রেমের ছোটগল্প। বিদ্যাপতি বাবুর সঙ্গে লীনার প্রেমের পরে তাঁর নবজন্ম হয়েছে এবং লীনাও পেয়েছে পরিপূর্ণ শান্তি। যা নীল আকাশের মতো উদার। কিংবা 'তুমি কেমন আছো', 'সুপ্রতিম' ও আবছা ছোটগল্পগুলিতে প্রেমের বিচ্ছেদ বেদনা উচ্চারিত হলেও পাঠক মনে এক সুখের অভিজ্ঞতার সঞ্চার করে।

প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পের ভৌগোলিক পটভূমি কলকাতা, শান্তিনিকেতন, রাজশাহী, পাবনা, দিল্লি, দার্জিলিং, কোচবিহার প্রভৃতি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থান। পাশাপাশি বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্পের ভৌগোলিক পটভূমি ঢাকা ও কলকাতা। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ এর দশকের ঢাকা ও কলকাতা এই দুই নগরীর ঘটনা প্রবাহ আকর্ষণীয় ভাবে তাঁর ছোটগল্পে উপজীব্য হয়ে উঠেছে। মূলত বুদ্ধদেব ভালোবেসেছেন জীবনকে, ভালোবেসেছেন মানুষকে। সেই সঙ্গে তাঁর প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা ছিল গভীর। প্রকৃতি প্রেমের অনুষঙ্গে তাঁর ছোটগল্পে ঢাকার প্রকৃতির অনবদ্য চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'সবিতা দেবী', ছোটগল্প থেকে প্রকৃতি চেতনার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হলে ঃ "নীলখেত রমলার পশ্চিম প্রান্তে মৈমনসিং—এর রেল লাইন গোল হয়ে এমনি দিয়ে চলে গেছে। তারপরেই মাঠের পর মাঠ একেবারে ঘন শ্যামল দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। —বড়ো দিনের ছুটির আগে স্পোর্টস-এর দিন পড়লো। আকাশ ঝকঝকে নীল, শীতের রোদ্দুরে রমলা যেন সোনা দিয়ে মোড়া।"[৫০]

বুদ্ধদেব বসুর প্রেম বর্ণনায় সেক্স ভাবনা অনুপস্থিত নয়। নির্মল প্রকৃতির আঙ্গিনায় এমিলিয়ার প্রেম ছোটগল্পে নায়ক নায়িকার রোমান্টিক স্বপ্নাবেশে সার্থকতার এক মধুর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গল্পের একটি খণ্ড অংশ নিম্নে প্রদত্ত হল—

"গভীর রাতে 'ঘুম ভাঙলো অন্ধকারে', এমিলিয়া দাঁড়িয়ে আছে মুখের উপর মুখ রেখে। স্বপ্ন নয়। সত্যি!—কত ঘুমোবে? ওঠো। এমিলিয়া হাত রাখলো তার কপালে।

দুই হাত বাড়িয়ে ভাস্কর তাকে টেনে নিল বুকের উপরে।"[৫১]

১) ঢাকার প্রকৃতি চেতনা কতটা অনবদ্য নিম্নোক্ত অংশে তার চিত্র প্রদত্ত হল—

"সকাল বেলাটি জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দিল। কাল রাতে যে বৃষ্টি হয়েছিল আকাশে

তার চিহ্ন মাত্র নেই। বাতাসে আছে তার স্মৃতি। আজ আকাশ কূলে কূলে নীল, কানায় কানায় উজ্জ্বল, দিগন্ত থেকে অবারিত। মস্ত নগ্ন উন্মুক্ত আকাশটির কোনখানে এক ফোঁটা সাদা মেঘও লেগে নেই। তীব্র তপ্ত রোদ্দুর পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে, সে তাপে তেজ আছে, ক্লেশ নেই, কেননা হাওয়া এখনো গরম হয়ে উঠতে পারেনি। কালকের বৃষ্টির স্পর্শটুকু এখনো যে ছড়িয়ে দিচ্ছে পৃথিবী ভরে। ⋯যে কোন শহরে যে কোন মদির আনন্দময় মূর্তিটি পরিপূর্ণ করে অন্য কোথাও কি প্রকাশিত হতে পারতো, যেমন হয়েছে এই ঢাকায়, পুরান পল্টনে? শহরের বাইরে এই পাড়াটি নতুন গড়ে উঠেছে, এখনো চার পাঁচখানার বেশি বাড়ি ওঠেনি, সমস্ত দক্ষিণ জুড়ে পড়ে আছে বিস্তীর্ণ শূন্য প্রান্তর, প্রান্তর শেষ হয়ে যেখানে পাড়া আরম্ভ, ঠিক সেখানটায় একটা উন্নত প্রশস্ত বলীয়ান অচল চঞ্চলের মিলন তোরণের মতো দাঁড়িয়ে; উত্তরে ও পূর্বে দেখা যায় গাছপালার গ্রাম্য শ্যামলিমা, পশ্চিমে রমলার উপনগর—তা উপনগর না উপবন কে বলবে? এই আলো এই আনন্দ। এই অনুপ্রেরণা শুধু যে বাইরে খোলা মাঠে আকাশের তলাতেই পরিব্যপ্ত তা নয়, ঘরের মধ্যেও তার উল্লাস, তার বিশ্বাস, তার গন্ধ পুরানা পল্টনের ঘরে—ঘরে আজ সকালবেলায় সোনার প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত।"[৫২]

২) কলকাতার ছবি অঙ্কনে তাঁর শিল্পসিদ্ধি—

"এসপ্লানেডের মোড়ে এসে প্রতাপ একটু দাঁড়ালো। কার্জন পার্ক পার হয়ে তার চোখ গেল চৌরঙ্গীতে, নান রঙের আলো গাঁথা মালা, যুদ্ধের পর জেল্লা ফিরেছে, ডাকছে ঝলমল করে এসো এসো—নিশার মতো লাগিল প্রতাপের। দ্রুত পা চালিয়ে দু-মিনিটে চৌরঙ্গীতে এসে পড়লো। একশো আলো জ্বলা মেট্রো সিনেমার তলায় আশ্চর্য ভিড় তিনটের শো ভাঙলো, ছ'টার শো আরম্ভ হবে। আশ্চর্য চেহারা, আশ্চর্য সাজ, আশ্চর্য বড়ো বড়ো গাড়ি এই তো জীবন⋯আনন্দই জীবন, আর কিসের জন্য মানুষ বাঁচে, যদি না আনন্দের জন্য? হাজার গাড়ী ছুটছে পথ জুড়ে আনন্দের খোঁজে, হাজার দোকানে আনন্দের পশরা সাজানো, এসো, এসো এসো। ডাক পৌঁছাল প্রতাপের কানে। তীব্র জীবন ক্ষুধা তাকে জাগিয়ে দিল, জাগিয়ে তুললো তার ভিতরে অন্য একজনকে, সকলের মধ্যে যে একজন আছে সেই একজনকে, তার যৌবনকে। আছে সেও আছে তারও আছে, এই আনন্দ তারও, একশো আলো জ্বলা সিনেমা তলার মতো উজ্জ্বল জীবন—এও তাঁর।"[৫৩]

প্রমথনাথ বিশীর প্রকৃতি বর্ণনায় কাব্যগুণ প্রাধান্য পেয়েছে। বাহাদুর শা বুলবুলি ছোটগল্পটি দিল্লির ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লেখা। বাহাদুর শার বাগানের বর্ণনাটি লেখকের কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে ঃ "মওয়াবাগের সামনে পূর্বে পশ্চিমে লম্বা একটি বাগান, মাটি ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা, মাঝে মাঝে রঙদার ফুলের কেয়ারী—দেখনে ফুলবাটা দামী যদুনন্দ বলে ভ্রম হয়। বাগানের চারদিকে ঘিরে কমলালেবু, পীচ, নাশপাতি, আঙুর, ডালিম প্রভৃতি গাছ। যখন ফুল ফোটে মছলন্দের শোভা বাড়ে। এই বাগানের মধ্যে বিকাল বেলায় বাদশার বৈঠক বসে, সেই সুবাদে জায়গাটা বৈঠক নামেও পরিজ্ঞাত।"[৫৪]

প্রমথনাথের অবচেতন ছোটগল্পের কাব্যগুণ কতটা শিল্প মন্ডিত হয়ে উঠেছে তাঁর একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল—

"তাঁর শাড়ির রাঙা পাড়ের রক্ত বেষ্টনী। তার খোপার রক্তকরবীর রক্তিম ঈক্ষণ, তার লজ্জারুণ কপোলের ভাব বলাকা বিন্যাস, তার রক্ত অধরপুটে চুম্বনের অর্ধস্ফুট কুঁড়িটি, সব মিলে কি বলব, আমি তো কবি নই।"[৫৫] অংশটিতে গল্পের নায়িকার রোমান্টিক অনুরাগকে সার্থকভাবে প্রমথনাথ উপস্থাপিত করেছেন।

প্রমথনাথ বিশী তাঁর প্রকৃতি বর্ণনায় শুধুমাত্র বর্ণময় আলোর ছটাকে উপজীব্য করেন নি সেই সঙ্গে অন্ধকারের চিত্র তাঁর কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে—"হঠাৎ আলো বলিয়া ওঠাতে বাবলা গাছের একদল পাখি কিচমিচ করিয়া উঠিল, অদূরবর্তী একটি কৌতূহলী শৃগালের একটি পীত হরিৎ চক্ষুতারা ঝকমক করিয়া উঠিল, নিকটবর্তী ভূমি যেমন আলোকিত হইল, দূরবর্তী অন্ধকার তেমনি নিবিড়তর হইল।"[৫৬]

প্রমথনাথের বিখ্যাত সাগরিকা ছোটগল্পের শুরু হয়েছে প্রকৃতি বর্ণনার মাধ্যমে। রোমান্স প্রিয় নিসর্গ পিপাসু প্রমথনাথের আলোচ্য গল্পটি শুরু হয়েছে প্রকৃতি বর্ণনার মাধ্যমে— "প্রমথনাথ বিশীর নিসর্গ চেতনা সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য আবার স্মরণ করতে হয়। কিন্তু আলোচ্য গল্পে তার চেয়েও বেশি করে লক্ষ্য করতে হয় লেখকের শিল্প চেতনাকে অন্তহীন নিসর্গ— সৌন্দর্যে আচ্ছন্ন সমুদ্রের বালুচরে লুটিয়ে পড়ে পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপে। অতি সন্তর্পণে যিনি সূক্ষ্ম স্পর্শকাতর প্রেমানুভবের আরতি করেছেন। এই একই প্রসঙ্গে শিল্পীর অ-দ্বিতীয় বাক্‌শৈলীও অনুধাবন যোগ্য। একটি মাত্র পদধ্বনির সুধাপূর্ণ ইঙ্গিতের জন্য।" শিল্পী বলেন "আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় শ্রবণশক্তি লাভ করিয়া উৎসুক হইয়া আছে।" সর্বেন্দ্রিয়ের শ্রবণশক্তি লাভের এই অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি বুদ্ধি জগতের আয়ত্ত নয় কিছুতেই, এর অপরিহার্য উপকরণ স্ববোধ। অন্যপক্ষে ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ বোধশক্তির অভাব এই অনির্বচনীয় অনুভবকে একটি বাক্যের খণ্ড সীমায় প্রদীপ্ত করে তোলাও একেবারেই অসম্ভব হতে পারত। প্রমথ শৈলীর অভিনবত্ব এখানেই একটি দুটি ক্ষুরধার শব্দ ও বাক্যাংশের প্রয়োগে পাঠক চেতনাকে চমকিত এবং সম্ভব স্থলে চমৎকৃৎ করে তোলা। বস্তুত এটুকু সম্ভব হয় বোধ এবং বোধির গভীর উপলব্ধি ও ক্ষুরধার বুদ্ধির দ্বৈতাদ্বৈত সম্মিলনের ফলে। আগে বলছি, অজস্র প্রমথ রচনাবলীর রসাবেদনের উৎসও এইখানে।"[৫৭]

বুদ্ধদেব বসুর বহু ছোটগল্প স্মৃতিময়। আনন্দ বেদনার স্মৃতি, মধুর স্মৃতি, মন কেমন করা স্মৃতি, অর্থাৎ একটা নষ্টালজিয়ার ভাব তাঁর বহু ছোটগল্পে মূর্ত হয়ে উঠেছে এই ভাব অনেকটা ভিক্টোরীয় এবং রবীন্দ্র সাহিত্যের ভাবলোকের সাথে তুলনীয়। প্রমথনাথের ছোটগল্পে নস্টালজিয়ার ভাব আছে। তবে বুদ্ধদেব বসুর তুলনায় অনেক কম।

বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্পের উপস্থাপন রীতি বিচিত্রধর্মী। তিনি প্রথম পুরুষ, তৃতীয় পুরুষ, আত্মকথন রীতি ও লেখকের জবানিতে এছাড়া নাট্যরীতি ও পত্র বিনিময় রীতিতে

ছোটগল্প লিখেছেন। নাট্যরীতিতে রচিত তাঁর ছোটগল্পগুলি পাঠকমনে স্থায়ী আসন অধিকার করতে পেরেছে।

পরিশেষে বলা যায় কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ, বর্ণনা, গল্পের শুরু ও সমাপ্তি, ক্লাইমেক্স, মানবিক আবেদন যুক্ত এবং বিচিত্র বিষয়ের ছোটগল্পকার হিসেবে বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসু একজন সার্থক শিল্পী। প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে বুদ্ধদেবের ছোটগল্পের সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্য বেশি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পের তুলনামূলক পর্যালোচনা ঃ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ বিশী সমকালীন দুই ছোটগল্পকার বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। দু'জনেই কৃতী শিল্পী। দু'জনেই শরৎউত্তর বাংলা ছোটগল্পের প্রাণ পুরুষ।

'প্রবাসী' পত্রিকা ও 'বিচিত্রা পত্রিকায়' বিভূতিভূষণের ছোটগল্পগুলো প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে প্রমথনাথের ছোটগল্পগুলো 'শান্তিনিকেতন', 'যুগান্তর', 'আনন্দবাজার', 'কল্লোল', 'কথাসাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

মূলত বিভূতিভূষণ ছিলেন রোমান্টিক শিল্পী। প্রধানত প্রকৃতি প্রেম, অতীত স্মৃতি ও লোকোত্তর লোকাভিসার এই তিনটি উপকরণ সামনে রেখে বিভূতিভূষণ ছোটগল্পগুলি রচনা করেছেন। প্রমথনাথ বাস্তববাদী শিল্পী হলেও অতীত চারিতা, অতিলৌকিকতা ও ইতিহাস নিষ্ঠার অভাব তাঁর ছোটগল্পে নেই।

বিভূতিভূষণের গল্পরাজ্যে প্রবেশের আগে তাঁর ছোটগল্পগুলো বিষয়বস্তু অনুসারে আমরা ভাগ করে নিতে পারি। সর্বমোট ২২৪ টি নানা স্বাদের ছোটগল্প লিখে বিভূতিভূষণ ছোটগল্পের জগতে পরিচিত হয়ে আছেন। তাঁর গল্পের শ্রেণি বিভাগগুলি নিম্নরূপ ঃ

১) চরিত্র নির্ভর গল্প ঃ এই শ্রেণির গল্পগুলি বিভূতিভূষণের শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে। এই শ্রেণির ছোটগল্পের মধ্যে তিনি পুরুষ ও নারীর হৃদয়ের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি সার্থকভাবে উপস্থাপিত করেছেন। যে গল্পগুলোতে নারী চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে সেগুলো হল উপেক্ষিতা, উমারাণী, মৌরীফুল, ডাইনী মুক্তি, বেনীদির ফুলবাড়ি, বুড়ো হাজরা কথা কয়, হিঙের কচুরি, সুলোচনা কাহিনী। যে গল্পগুলো পুরুষ চরিত্র নির্ভর, সেগুলো হল ঃ ভন্ডুল মামার বাড়ি, ফকির, দৈবাত, নসুমামা ও আমি, কবি কুন্ডু মশাই, সিঁদুর চরণ, রুপো বাঙাল, ত্রিদিবের নিচে, মুক্ত পুরুষ হরিদাস, বারিক অপেরা পার্টি, ফকির কৃষ্ণলাল, শান্তিরাম, মণি ডাক্তার, রামশরণ দারোগার গল্প ও জলু হাজরা প্রভৃতি।

২) কাহিনী নির্ভর গল্প ঃ বিভূতিভূষণের কাহিনী নির্ভর বা ঘটনা নির্ভর গল্পগুলো যথাক্রমে—পুঁইমাচা, এমনিই হয়, বিপদ, খুকির কান্না, গ্রহের ফের, হাসি, থিয়েটারের টিকিট, 'বাক্সবদল', 'কিন্নর দল', 'দ্রবময়ীর কাশীবাস', 'শাবল তলার মাঠ', 'দাতার স্বর্গ', 'সার্থকতা' প্রভৃতি।

৩) স্বপ্নকল্পনা যুক্ত গল্প ঃ মেঘমল্লার, নাস্তিক, নববৃন্দাবন, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি।

৪) বিভূতিভূষণের অতিলৌকিক ছোটগল্প ঃ অভিশপ্ত, বউচন্ডীর মাঠ, আরক, হাসি, খুঁটি দেবতা, পেয়ালা, তারানাথ, তান্ত্রিকের গল্প, রঙ্কিনী দেবীর স্বর্গ, মেডেল, মশলাভূত, গঙ্গাধরের বিপদ, পৈত্রিক ভিটা, অভিশাপ প্রভৃতি।

৫) সকৌতুক শ্রেণির গল্প ঃ উইলের খেয়াল, বৈদ্যনাথ, লেখক, জনসভা, পাঁচুমামার বিয়ে, ঠাকুরদার গল্প, একটি ভ্রমণ কাহিনী, আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা, মূলের‍্যাডিস, অভয়ের অনিদ্রা প্রভৃতি।

৬) মানুষ ও প্রকৃতি বিষয়ক ছোটগল্প ঃ পুঁইমাচা, জলসত্র, কনেদেখা, বুধীর বাড়ি ফেরা, প্রত্যাবর্তন, ভুবন বোষ্টমী, বংশ লতিকার সন্ধানে প্রভৃতি।

৭) আনন্দম্ শ্রেণিভুক্ত ছোটগল্প ঃ একটি দিন, ছোটনাগপুরের জঙ্গলে, নদীর ধারে বাড়ি, তুচ্ছ প্রভৃতি।

'কিন্নর দল' ছোটগল্পে এক অপরূপা গ্রাম্য মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে এসে তার মধুর আচরণ প্রত্যেকের মন জয় করে। কিভাবে এক অশরীরী কণ্ঠস্বর নিয়ে সে আবার ফিরে এসেছে তার এক মধুর আলেখ্য।

'যাচাই' ছোটগল্পটি এক বিধবা মহিলা প্রবাসে দুঃখে কষ্টে দিন কাটাবার পর যোগ্য পুত্রকে নিয়ে ফিরে এসেছে স্বগ্রামে, যেখানে তার অতীত স্মৃতি রোমন্থনে এক প্রগাঢ় রসের সৃষ্টি হয়েছে। গল্পটি দেশী ও বিদেশী গল্পভাণ্ডারের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

'বুধীর বাড়ি ফেরা' গল্পটিতে বিভূতিভূষণের পশুপ্রীতির পরিচয় সুস্পষ্ট। এখানে বুধী কোনো নারী চরিত্র নয়। একটি গাভীর নাম রাখা হয়েছে বুধি হারিয়ে যাওয়া বুধি কি করে আবার ফিরে এল তার অনবদ্য কাহিনী আলোচ্য গল্পের মূল প্রতিপাদ্য।

'তুচ্ছ' গল্পটিতে অতি নগন্য ছোট্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছোটগল্পটির সাহিত্যরস সৃষ্টি করেছে।

'গল্প নয়' ছোটগল্পটিতে মাতৃহৃদয়ের চিরন্তন আবেদন প্রাধান্য পেয়েছে।

একটি কলহে প্রিয়া গ্রাম্য বধুর কাহিনী 'মৌরীফুল' গল্পটির বিষয়।

'পুঁইমাচা' ছোটগল্পে ভোজন প্রিয় চরিত্র ক্ষেন্তির এক বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহের পর তাঁর পতি মিথ্যে দোষারোপ করে শ্বশুরবাড়িতে নিগ্রহ ও তার অকাল মৃত্যু অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে গল্পকার বিবৃত করেছেন।

'চাঁদের পাহাড়ে' ছোটগল্পটি অ্যাডভেঞ্চার পূর্ণ। 'দ্রব্যময়ীর কাশীবাস' ছোটগল্পে স্বগৃহে উৎপীড়িতা এক রমণী বিষয় বাসনাযুক্ত হয়ে জগন্নাথ বিগ্রহের পরিবর্তে সে লাউ দর্শন করেছে। যে পুণ্যলাভের আশায় দ্রব্যময়ী কাশীবাস করতে গিয়েছিল তার কাছে শ্রেষ্ঠ পূণ্যক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হয়েছে তারে স্বামীর ভিটা। তরু, গাছপালা, লতাপাতা, প্রতিবেশীদের প্রীতি ও স্নেহ ভালবাসার মধ্যে খুঁজে পেয়েছে চিরশান্তি। মাটির টানে কাশীবাস ছেড়ে তাকে ফিরে আসতে হয়েছিল।

'আহ্বান' গল্পটিতে জাতি ধর্মের উর্ধ্বে বাৎসল্য রস উচ্চারিত। এক মুসলমান বৃদ্ধাবে সাহায্য করেছিল গল্পের বক্তা। স্নেহের আকর্ষণে বক্তাকে উদ্দেশ্য করে ডাকতো 'অ-মোর গোলাপ'। এরপর বুড়ির মৃত্যু হলে বক্তা তার কবরে দেবার জন্যে নিয়ে এসেছিল কফিনের কাপড় এবং কবরে দিয়েছিল এক কোদাল মাটি। স্নেহ-ভালবাসা যে জাতিভে প্রথার উর্ধ্বে বিভূতিভূষণ এই মর্মবাণীটি প্রকাশ করেছেন আলোচ্য গল্পে।

'কনে দেখা' গল্পটিতে হিমাংশুর কনে দেখতে আসবার ঘটনাটিকে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন লেখক।

'ভন্ডুলমামার বাড়ি' ছোটগল্পে ইঁটের পর ইঁট সাজিয়ে স্বপ্নের বাড়ি তৈরির প্রয়াস এবং তার প্রচেষ্টা মর্মস্পর্শী কারুণ্যের সঞ্চার করেছে।

বিভূতিভূষণ 'একটি দিনের কথা' ছোটগল্পে সদ্য বিধবা রাণীর প্রতি শ্বশুরবাড়ির নিষ্ঠুর আচরণ কতটা মর্মস্পর্শী তা দেখিয়েছেন এবং ভাগ্য বিড়ম্বিত নারী এঁকেছেন।

বিভূতিভূষণের ছোটগল্প যেন চরিত্র চিত্রশালা, ঐকান্তিক সমবেদনা ও বাস্তব নিষ্ঠা নিয়ে বিভূতিভূষণ কলমে গ্রাম বাংলার অজস্র পুরুষ ও নারী চরিত্র এঁকেছেন। নগরের চেয়ে গ্রামের প্রতি বিভূতিভূষণের আর্কষণ ছিল বেশি। তিনি নগর জীবনের সাথে পরিচিত হলেও তার ছোটগল্পে নগরের চোখ ঝলসানো ছবি নেই। তবুও নগর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ছোটগল্পে শিক্ষক, ফেরিওয়ালা, ভিখারি, বারবনিতা এছাড়া গ্রামবাংলার বিভিন্ন চরিত্র যেমন—ফকির, জুয়াড়ি, হাতুড়ে চিকিৎসক, পুরোহিত, কবি, কেরানি পাঠশালার পণ্ডিত, যাত্রার পালাকার, ব্রাহ্মণ, রাধুনি, দরিদ্র চাষি প্রভৃতি চরিত্র স্থান পেয়েছে। অন্যদিকে বিভূতিভূষণ গ্রামীণ নারীদের দেখেছেন নানারূপে—বালিকা অবিবাহিতা তরুণী, গৃহস্থ বধূ, প্রবীণা গৃহিনী, কন্যা, জননী, পতিতা, জরাগ্রস্ত, বৃদ্ধা, তাঁর লেখনীতে হাঁড়ি বৌ, দুলে-বৌ, বাগদি মেয়ে, বুড়ি বৌ, প্রভৃতি নারী চরিত্র লেখকের কলমে উপস্থাপিত হয়েছে। তুচ্ছ অবহেলিত নারী চরিত্রের ব্যর্থতা, বেদনা ও বঞ্চনার ছবি এঁকেছেন বিভূতিভূষণ।

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পে চরিত্র নির্ভর নামকরণ, ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ প্রভৃতি বিষয় অনুসারে নির্বাচনে সাফল্য প্রশংসাতীত।

তাঁর ছোটগল্পের প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তি অংশটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'তাল নবমী' গ্রন্থের রুক্মিণী দেবীর খড়্গ গল্পের প্রারম্ভে বিভূতিভূষণ লিখেছেন "জীবনের অনেক জিনিস ঘটে যাহার কোনো যুক্তি সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—তাহাকে আমরা অতিপ্রাকৃত বলিয়া অভিহিত করি।"[৫৮]

'পুঁইমাচা কাহিনী শুরু হয়েছে শীতের সকালে— শেষ হবে শীতের রাতে, শুরুতে দেখেছি সহায় হরি, চাটুজ্জের উঠোন, অন্নপূর্ণার ক্রোধ, খবরশোনা— শেষ হবে কাহিনী এই উঠোনেরই এক কোণে পুঁইমাচার ধারে অন্নপূর্ণার স্তব্ধ বেদনায়। ছোটগল্পের পরিসমাপ্তি

অংশটি বিশেষ ব্যঞ্জনাধর্মী। তুচ্ছ গল্পের সমাপ্তি অংশটি তুলে ধরছি—"কি আনন্দ আমার স্নান করতে নেমে নদীজলে, উদার নীল আকাশে কিসের যেন সুস্পষ্ট, সৌন্দর্যময় বাণী। অন্তরের ও বাইরের রেখায় রেখায় মিল। চমৎকার দিনটা সুন্দর দিনটা।"[৫৯] পরিসমাপ্তি অংশটি পাঠক মনে স্নিগ্ধ আনন্দানুভূতি জাগিয়ে তুলেছে।

ছোটগল্পের কাহিনী ও চরিত্রগুলিকে লেখক কার্যকারণ সূত্রে গেঁথেছেন। কাহিনীকে রসসৃষ্টির অনুপম কৌশল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আদি, মধ্য ও অন্ত এই তিনটি পর্বে সার্থকভাবে বিন্যস্ত করেছেন। প্রত্যেকটি ছোটগল্পে ঘটনা বিন্যাসগত পরিচয় আছে সন্দেহ নেই।

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পে কাহিনীর পটভূমি নির্মাণে, স্থানগত, কালগত ও সময়গত ঐক্যস্থাপনে লেখকের মুন্সিয়ানার পরিচয় রয়েছে সন্দেহ নেই। বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের বর্ণনা অংশে সাধুরীতি ও চলিতরীতি দুটোকেই স্থান দিয়েছেন। 'নাস্তিক' ছোটগল্প থেকে একটি বর্ণনা অংশ প্রদত্ত হলঃ

"পথের বাঁকে একদিনের মেঘভরা বৈকালে মেয়েটিকে খুব মেরেছে, তাঁর এলোমেলো চুলগুলি মুখের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে—কাপড় কে টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে— সে কেঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলছে— কেন তুমি মারবে? কেন আমায় মারবে? ....এ পাড়ায় আসি বলে? ....আর কক্‌খনো আসবো না....দেখে নিও, আর কক্‌খনো যদি আমি আসি।" বিভূতিভূষণ সাহিত্যের কথায় জানিয়েছেন সাহিত্যের বিষয় সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত—

"বাংলাদেশের সাহিত্যের উপাদান বাংলার নরনারী, তাদের দুঃখ দারিদ্র্যময় জীবন, তাদের আশা নিরাশা, হাসিকান্না, পুলক-বহির্জগতের সঙ্গে তাদের ক্ষুদ্র জগতগুলির ঘাত প্রতিঘাত, বাংলার ঋতুচক্র, বাংলার সন্ধ্যা-সকাল, আকাশ-বাতাস, ফুল-ফল, বাঁশবনের আমবাগানের নিভৃত ছায়ায় ঝরা সজনে ফুল বিছানো পথের ধারে যে সব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে—তাদের কথাই বলতে হবে। তাদের সে গোপন সুখ দুঃখকে রূপ দিতে হবে।"[৬০]

বিভূতিভূষণ তাঁর ছোটগল্পে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের কথা পরম মমতার সঙ্গে বলেছেন, তার সঙ্গে গভীর প্রকৃতি চেতনা যুক্ত হয়ে সার্থক ছোটগল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। যে বিশেষ গুণে বিভূতিভূষণ পাঠক মানসে স্থায়ী আসন অধিকার করতে পেরেছেন তা হল বাস্তব বর্ণনা, সত্যতা, প্রকৃতি প্রেম ও স্মৃতি মেদুরতা।

প্রমথনাথ বিশী যুগ সচেতন শিল্পী তাঁর ছোটগল্পের সামাজিক সচেতনতা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্য, ভাষার তির্যকতা ও বিষয়ের স্বাতন্ত্র্যের অভাব নেই অথচ বিভূতিভূষণের ছোটগল্পে সমাজ সচেতনতার অভাব আছে সেই সঙ্গে বিশ্লেষণ ও পাণ্ডিত্যের অভাব এবং ভাষার তির্যকতা ও বিষয়ের স্বাতন্ত্র্যের অভাব থাকলেও তিনি পাঠকমনে সাড়া জাগিয়েছেন এজন্যেই যে তিনি মাটির কাছাকাছি অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ স্মৃতি ও প্রাত্যহিক

জীবনের ছবিকে জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন তাঁর ছোটগল্পে। তিনি ছোটগল্পের যে ছবি এঁকেছেন সে ছবি যেন আমাদের একান্ত চেনা জগতের, কোনো চরিত্রই যেন আমাদের অচেনা নয়। বিভূতিভূষণের জীবন দর্শনের স্বরূপ অনেকটা যেন রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত লাইন দুটির মত—

"অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো সেহ তো তোমার আলো
সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো সেই তো তোমার ভালো।"[৬১]

বিভূতিভূষণ ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে দুঃখ দারিদ্র্য ক্লিষ্ট জীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে সে জীবন থেকে সন্ধান পেয়েছেন দুঃখ প্রতিকারের মহৌষধ।

রুশতি সেন তার "বিভূতিভূষণ ঃ দ্বন্দ্বের বিন্যাস" গ্রন্থের ভূমিকা অংশে বলেছেন— "....বিভূতিভূষণ তো এমনই শিল্পী যিনি ক্ষতের অভ্যন্তর থেকেই সেই ক্ষতের উপসম খুঁজতে চাইতেন। ....প্রকৃতি প্রেমে অথবা বাল্যস্মৃতির মেদুরতায়, কখনো আবার মরণের সমাধানে সে উপশম এমনই স্নিগ্ধ যে, বাঙালির আলোক পর্বের ছিন্নমূল যাত্রীদের কাছে তার পলায়নের পথ বলে দেয়।"[৬২]

প্রকৃতির প্রতি সুগভীর অনুরাগের জন্য বিভূতিভূষণ জাত রোমান্টিক। এক প্রকৃতি ভাবুকতায় তাঁর মন আপ্লুত। এই প্রকৃতি যেন তাঁর অস্তিত্বের প্রেরণা, মাটি ও মাটির উপর গজিয়ে ওঠা সবুজ প্রাণের স্পর্শ, রক্ত-মাংস, মজ্জা-প্রাণ, জনতার প্রকৃতিকে ঘিরেই অবস্থান করছে। তাঁর মতে প্রকৃতি জীবনের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত। এই প্রকৃতি মুগ্ধতার কথা বিভূতিভূষণের ছোটগল্পে, দিনলিপিতে, উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে—"পৃথিবীর মাথার উপর আকাশ যেন নীল চাঁদোয়া খাটিয়ে দিয়েছে—আকাশের গায়ে কি অপূর্ব নক্ষত্র শ্রেণি মনে হচ্ছিল–– যেন আকাশে দেওয়ালির দীপ জ্বলছে জ্বলজ্বল করে। অপূর্ব আনন্দ উপলব্ধি করেছিলুম। মনে হচ্ছিল ভগবানের কি মহাশিল্প এই পৃথিবী।"[৬৩]

আবার অপ্রকাশিত দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ লিখেছেন—

"দুপুরে স্নান করবার সময় মাঠের ধার দিয়ে যাবার সময়ে গরম দুপুরে প্রজাপতি উড়ছে। আকন্দফুলের ঝোপে— যে এক আনন্দ। দুপুরে খুব ঘুমালাম। উঠে দেখি পাঁচটা, খুব মেঘ করে এল। কালবৈশাখীর ঘনকৃষ্ণ নীল মেঘ ঈশান কোলে জমে এল—বৃষ্টি পড়তে লাগল—আমি বৃষ্টি মাথায় নিয়ে নদীজলে পড়লুম—ওপরে ওপরে সাঁতার দিতে লাগলুম। কি আনন্দ। ওপারের নীল চরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, অপূর্ব সবুজ শিমুল গাছ ওধারে, নদীজলের গন্ধ, জলের কালো ঢেউ— সে এক অপূর্ব ব্যাপার।"[৬৪] একটি সহজাত আনন্দ ও সামান্যের মধ্যে অসামান্য যেন প্রতিটি গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে।

বিভূতিভূষণের 'কুশলপাহাড়ী' ছোটগল্পে সাধুজির উপলব্ধি কবি ভাষায় সৌন্দর্যময় হয়ে উঠেছে ঃ "কবিই তিনি বটেন বাবা। এখানে বসে বসে দেখি শালগাছটাতে ফুল ফোটে, বর্ষাকালে পাহাড়ে ময়ূর ডাকে, ঝর্ণা দিয়ে জল বয়ে যায়, তখন ভাবি, কবিই বটে তিনি। ....তার এই কবিরূপ দেখে ধন্য হয়েছি।"[৬৫]

বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যের সন্ধানে তার সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য যেন কবি ভাষায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। এজন্যই সমালোচক বিভূতিভূষণের প্রকৃতির সঙ্গে আধ্যাত্মিক চেতনার এবং মানব চেতনার যোগসূত্র প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন ঃ

"একমাত্র প্রকৃতিকে অবলম্বন করে তিনি কোনো গল্প লেখেননি—প্রকৃতি যখনই আবির্ভূত হয়েছে ছোটগল্পের রঙ্গ মঞ্চে তখনই তার সঙ্গে এসে দেখা দিয়েছে মানুষ কিংবা মানুষের উপাস্য দেবতা।"[৬৬]

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন—"বিভূতিভূষণের উপন্যাসে প্রকৃতি ও মানুষ একসূত্রে গ্রথিত। তাহার সর্বজন পরিচিত অপু অর্ধেক মানব অর্ধেক প্রকৃতি। কিন্তু এটি কেবল অপুর লক্ষণ নয়। বিভূতিবাবুর সমস্ত রচনারই সাধারণ লক্ষণ।"[৬৭]

ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যে প্রকৃতির অন্তর্লীন সত্তা যতটা প্রাধান্য পেয়েছে—নিসর্গরূপের বর্ণনা ততটা পায়নি। অন্যদিকে হাডসন ছিলেন প্রকৃতিবাদী, কিন্তু বিভূতিভূষণের সাহিত্যে এই দুয়েরই সমন্বয় ঘটেছে। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী এজন্যই মূল্যবান মন্তব্য করেছেন—

"একদিকে প্রকৃতির রূপময়ী কান্তি আর তারই অন্তরালে অন্যদিকে পেয়েছি নিগূঢ় প্রাণ সত্তাকে।"

সমালোচক চিত্তরঞ্জন ঘোষের মতে, "বিভূতিভূষণের প্রকৃতি যেমন সুন্দর ও মঙ্গলময় তাঁর এই মানুষরাও তাই।"[৬৯]

'পুঁইমাচা' গল্পে প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যে লেখকের নিখুঁত পর্যবেক্ষণ শক্তি, ঘরোয়া ভাষা ও গ্রাম বাংলার নিসর্গ চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যেমন—

"....নীল রঙের মেদীফুলের গুচ্ছগুলি যেখানে নত হইয়া আছে।"[৭০] এখানে মেদীফুল গ্রাম্য সাধারণ উচ্চারণ এবং নত শব্দটি দ্বারা ফুলের কোমল সৌন্দর্য বোঝানো হয়েছে। প্রমথনাথের ছোটগল্পে প্রকৃতি চেতনার বিশেষ স্থান আছে—

১) "সভা স্থল পুষ্প গন্ধে ধূপ ও আতরের সৌরভে আমোদিত। শত শত দীপের প্রভাবে অলৌকিক, সমস্ত সভা, নিস্তব্ধ তবু জনপূর্ণ বলিয়া থম থম করিতেছে। এমন সময় সূচী শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। মহারাজার ইঙ্গিতে কুলগুরু উঠিয়া মঙ্গলাচরণ করিলেন এবং তারপরে সভ্যস্থ সকলের অনুমতি লইয়া মহারাজা কবিকে কাব্য পাঠ করিতে অনুরোধ জানালেন।"[৭১]

২) "আকাশে তারা যেমন অগণ্য। সৈকতে বালু যেমন অসংখ্য, বনস্পতিতে পাতা যেমন—অজস্র তেমনি অগণ্য, অসংখ্য অজস্র আলোক বিন্দু, আততায়ী, সর্পের মাথার মণির প্রভায় সন্ত্রস্ত হরিণ যেমন মুগ্ধ বিস্ময় অনুভব করে। নগরবাসীও তেমনি প্রকার ভাব অনুভব করিল।"[৭২]

৩) "তাহার নিম্নতম অংশে জয়ন্তী নদীর দেখা যায়, সেখান হইতে জমি উঁচু হইতে হইতে দিগন্ত পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। দিগন্তের সেই উপত্যকার প্রান্তে বসিল অতীশ ও

মালতী।"[৭৩]

সংলাপ রচনায় বিভূতিভূষণ সার্থক শিল্পী। "ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল সব টাকা খরচ করে ফেলে মালিককে অসহায় ভাবে জানিয়েছেন—"যাক ক্যাশ এনেছেন এখন? কৃষ্ণলাল অপরাধীর মতো বড়বাবুর মুখের দিকে চাহিল। বলিল—ক্যাশটা আনিগে যাই।

—না।

—না একটু মুস্কিল হয়েছে। আচ্ছা আসি।"[৭৪]

এই সংলাপটি যেন গভীর ব্যঞ্জনা বহন করে। 'নসুমামা ও আমি' ছোটগল্পের ক্লাইম্যাক্স বা মহামুহূর্তটি শিল্পগুণ সমৃদ্ধ— "খুড়শাশুড়ী....মুখ টিপে হেসে বললেন— বৌমার বাপের বাড়ির লোক। খুব কষ্ট হয়েছে বৌমা তোমার—না? যখন তখন দেখা হতো তো। অন্য গাঁ থাকতে এ গাঁয়ে এসেছিল সে জন্যই তো, তবুও তো দেশের ঘরের লোক আছে একটা। ছিলে খোলা ধনুকের মতো সটাং সোজা হয়ে বলে উঠি— নিশ্চয়ই। আমার কষ্ট তো হবারই কথা।"[৭৫]

প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পের শ্রেণি বিভাগ করলে আমরা দেখতে পাই তিনি রঙ্গব্যঙ্গ মূলক, বিশুদ্ধ কৌতুক রসাত্মক গভীর জীবন চেতনা যুক্ত, ঐতিহাসিক, অতিপ্রাকৃত, সাহিত্য, শিক্ষা, রাজনীতি, রূপক, কুসংস্কার মূলক ও দেবদেবী বিষয়ক ছোটগল্প লিখে শিল্পসিদ্ধির স্তরে পৌঁছে গেছেন। অথবা বিভিন্ন ছোটগল্পকারদের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে সে প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রমথনাথের ছোটগল্পে গ্রামীণ জীবনের চিত্র আছে। তবে তাঁর ছোটগল্পে নাগরিক সভ্যতার বিষ ও অমৃত দুই উঠে এসেছে। নাগরিক জীবনের নারী পুরুষ চরিত্র তাঁর ছোটগল্পে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। ব্যবসায়ী, শিক্ষক, চানাচুর বিক্রেতা, ছাত্র, উকিল, খেলোয়ার, প্রেমিক, দোকানদার, রাজনীতিবিদ, ঘুষখোর, পেশকার, ছাত্রী নিবাসের মাসি, রাজা, রাণী, মন্ত্রী, দারোয়ান, সন্ন্যাসী, ভিখারি, গুরু ও শিষ্য প্রভৃতি চরিত্র স্থান পেয়েছে।

'মোটরগাড়ি' গল্পটি শুরুতে দ্বিতীয় শ্রেণির অফিসার রজতকুমারের চরিত্রের বিশেষ গুণ প্রকাশের মধ্য দিয়ে। গল্পশেষে গান্ধিবাদী রজতকুমার তার আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে গল্পের সূত্রপাত, সেই সঙ্গে কলকাতার এক বিখ্যাত জ্যোতিষীর আবির্ভাব গল্পের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। গল্প শেষে জ্যোতিষীর গণনা কতটা সত্য তা উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রমথনাথ তাঁর ছোটগল্পে কাহিনীর সঙ্গে চরিত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। তাঁর গল্পের আয়তন মাঝারি ও বড় ধরনের প্রতিটি গল্প আদি, মধ্য ও অন্ত পর্বে ভাগ করে অনুপম রসসৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। সেই সঙ্গে কাহিনীর স্থানগত, সময়গত, ঐক্যকে সুদৃঢ় ভাবে বিন্যস্ত করেছেন, তাঁর ছোটগল্পের নামকরণ ব্যঞ্জনাধর্মী, ভাবধর্মী ও চরিত্রধর্মী। দুইজনের ছোটগল্পেই নাট্যগুণ ও কাব্যগুণ প্রাধান্য পেয়েছে।

প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পের সংলাপ নৈপুণ্য একটি বিশেষ গুণ। তাঁর সংলাপগুলি বাস্তবধর্মী। 'আধ্যাত্মিক ধোপা' ছোটগল্প থেকে একটি সংলাপ অংশ প্রদত্ত হল—"যদুবাবু

বলিলেন— তা না হয় হল! কিন্তু আপনারা শিক্ষক, আপনাদের কি এই নীচ কাজ করা উচিত? আপনাদের উপর ভার জাতিগঠনের—জাতিগঠনের কথা শুনিয়া 'বীরবাহু' গভীর রাত্রে কাঁদিয়া ফেলিলেন। যদুবাবু বলিলেন—কাঁদছেন কেন?

বীরবাহু বলিলেন—বড় দুঃখ! তবে শুনুন, এই বলিয়া তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—জাতিগঠন কেউ চায় না—সকলেই চায় নিজের স্বার্থ। গর্ভমেন্ট চায় মন্ত্রীত্ব বজায় রাখতে, লিডারেরা চায় নিজের দল বজায় রাখতে, সাংবাদিক চায় কাগজের গ্রাহক সংখ্যা ঠিক রাখতে, দেশের লোক চায়—কী চায় জানি না, বোধ করি বিনা হাঙ্গামায় জীবন যাপন করতে! কারও উপর কোন ভার নেই—কারও কোনো দায়িত্ব নেই—সব ভার এই মাস্টারদের উপরই।"[৭৬]

প্রমথনাথ বিশী ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দু'জনে ছোটগল্প রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, স্টাইল, জীবনদর্শন ও উপস্থাপন কৌশলগত দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করলে এই দু'জন ছোটগল্পকার সমধর্মী নন। দু'জনে স্বতন্ত্র ধারার শিল্পী। প্রমথনাথের ছোটগল্পে ব্যঙ্গ আছে কিন্তু বিভূতিভূষণের ছোটগল্পে প্রকৃতি প্রেম প্রধান উপাদান হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রমথনাথ বিশী ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের তুলনামূলক আলোচনা

রাঢ়বঙ্গের রূপকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ বিশী শরৎউত্তর বাংলা ছোটগল্পের দুই শক্তিমান শিল্পী। দু'জনেই সমকালীন লেখক। তারাশঙ্করের জন্মকাল ১৮৯৮ এবং প্রমথনাথ বিশীর জন্মকাল ১৯০১। সুতরাং এঁদের মধ্যে তারাশঙ্করই বয়ঃজ্যেষ্ঠ। বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিক শাখাটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন তারাশঙ্কর, প্রমথনাথ বিশী সেখানে আঞ্চলিক পটভূমি পরিহার করে সুদূর অতীত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সামাজিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা ছোটগল্পগুলো আমাদের উপহার দিয়েছেন।

তারাশঙ্করের বিভিন্ন গল্পগুলোকে বিভিন্ন পর্বে ভাগ করা যেতে পারে, এই পর্বগুলো নিঃসন্দেহে বিষয়ানুসারে। তাঁর গল্পসংকলন গ্রন্থের সংখ্যা প্রচুর। তার মধ্যে রয়েছে—পাষাণপুরী (১৯৩৭), নীলকণ্ঠ (১৯৩৩), ছলনাময়ী (১৯৩৬), জলসাঘর (১৯৩৭), রসকলি (১৯৩৮), তিনশূন্য (১৯৪১), প্রতিধ্বনি (১৯৪৩), বেদেনী (১৯৪৩), দিল্লীকা লাড্ডু (১৯৫৩), যাদুকরী (১৯৪৪), স্থলপদ্ম (১৯৪৪), প্রাসাদ মালা (১৯৪৫), হারানো সুর (১৯৪৫), ইমারৎ (১৯৪৬), রামধনু (১৯৪৭), মাটি (১৯৫০), কামধেনু (১৯৫৩), এছাড়া তারাশঙ্করের প্রেমের গল্প, তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ গল্প, তারাশঙ্করের প্রিয় গল্প, তারাশঙ্করের স্বনির্বাচিত গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রমথনাথের ছোটগল্পগ্রন্থগুলি যথাক্রমে শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব, ডাকিনী, গালি ও গল্প, গল্পপঞ্চাশৎ, নীরস গল্প সঞ্চয়ন, চাপাটি ও পদ্ম, অনেক আগে অনেক দূরে, যা হলে হতে

পারত প্রভৃতি।

তারাশঙ্করের গল্পগুলো ভারতী, চতুরঙ্গ, বঙ্গশ্রী, তরুণের স্বপ্ন, দেশ, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, আনন্দবাজার, গল্পভারতী, কল্লোল, কালিকলম, শনিবারের চিঠি, শারদীয় কিশোর পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছে আনন্দবাজার, দৈনিক যুগান্তর, কথা সাহিত্য, শনিবারের চিঠি প্রভৃতি পত্র পত্রিকায়।

তারাশঙ্করের গল্পের শ্রেণি বিভাগ নিম্নরূপ ঃ

(ক) বৈষ্ণব রসাশ্রিত গল্প ঃ রসকলি, রাইকমল, হারানো সুর, প্রসাদ মালা, সর্বনাশী এলোকেশী, সন্ধ্যামণি প্রভৃতি।

(খ) জমিদার শ্রেণিভুক্ত চরিত্রের দম্ভ, গর্ব ও প্রতিষ্ঠার ছবি এবং জমিদারি থেকে বিচ্যুতির দুঃখ এই শ্রেণির যে সমস্ত গল্প লিখেছেন তার মধ্যে—জলসাঘর, রায়বাড়ি, রাজা—রাণী ও প্রজা ও সমুদ্রমন্থন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(গ) প্রকৃতি ও নিয়তির অমোঘ লীলাযুক্ত গল্প—তারিণী মাঝি ও অগ্রগানী প্রভৃতি।

(ঘ) অন্ত্যজ শ্রেণিভূক্ত যাযাবর মানুষের আদিম জীবন নিয়ে লিখিত ছোটগল্প—নারী ও নাগিনী, বেদেনী, ডাক হরকরা, ব্যঘ্রচর্ম, আখড়াইয়ের দীঘি, ঘাসের ফুল, ট্যাংরা ও বাউল প্রভৃতি।

(ঙ) রাজনীতি নির্ভর ছোটগল্প—ইস্কাপন, মরামাটি, অহেতুক, আখেরী, বোবাকান্না, পৌষলক্ষ্মী, শেষকথা ও শবরী প্রভৃতি।

(চ) পশু চরিত্র নির্ভর ছোটগল্প—গবিন সিং-এর ঘোড়া, কালাপাহাড়, কামধেনু, নারী ও নাগিনী প্রভৃতি।

(ছ) আধ্যাত্মিক উপলব্ধিযুক্ত ছোটগল্প—না, কবি, শ্যামদাসের মৃত্যু, বোবাকান্না, পৌষলক্ষ্মী, দেবতার বেদী, ইমারত, কামধেনু, মাটি, শিলাসন, সখী ঠাকুরুণ প্রভৃতি।

প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পগুলো বিচিত্রধর্মী। তিনি ব্যঙ্গধর্মী, ঐতিহাসিক, অতিলৌকিক, পৌরাণিক, সাহিত্য বিষয়ক, সমাজ সচেতনতামূলক, রাজনৈতিক ও তর্ক বিতর্কমূলক ছোটগল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন এছাড়াও পশু চরিত্র নিয়ে তিনি সার্থক ছোটগল্প লিখেছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের বিষয়বস্তু আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই—'আখড়াইয়ের দীঘি' ছোটগল্পে ঠ্যাঙারদের নির্মমতা। 'জলসাঘর' গল্পে পুরনো জমিদার বংশের জলসাঘরের ধ্বংসস্তূপের উপর জমিদারদের ভোগবিলাসের অতীত স্মৃতি জড়িত। 'বেদিনী' গল্পে রাধা শম্ভুর তাঁবুতে অগ্নি সংযোগ ঘটিয়ে কিষ্ট বেদের সঙ্গে নিরুদ্দেশের অভিমুখে যাত্রা করে। 'তারিণী মাঝি' ছোটগল্পে ময়ূরাক্ষী নদীতে ভেসে চলেছে তারিণী মাঝি। নিজেকে বাঁচাবার জন্য সুখীকে গলা টিপে মেরেছে অন্ধ জৈব সত্তার তাগিদে। 'নারী ও নাগিনী' গল্পে নায়ক সাপুড়ে খোঁড়া শেখ। তার স্ত্রী জোবেদা খোঁড়াশেখের অদ্ভুত

বাসনা বন্ধন উদয় নাগ নামক সাপিনীর প্রেমকে মেনে নিতে পারেনি। পরিশেষে উদয় নাগের দংশনে প্রাণ হারাতে হল জোবেদাকে। 'অগ্রদানী' গল্পে হীনচিত্ত উদর সর্বস্ব পূর্ণ চক্রবর্তীর লোভের দুর্জয় আকর্ষণে নিজ পুত্রের পিন্ড খেতে হয়েছে। 'ডাইনী' গল্পে অনাথা মেয়েটির নরুন দিয়ে চেরা ছুরির মতো এবং বিড়ালের মতো দৃষ্টিতে একে একে তার স্বামী সন্তান প্রাণ হারিয়েছে। এরূপ ডাইনী অপবাদে সেই অনাথা মেয়েটি নিজেই মনে করেছে যে, সে ডাইনী। স্নেহ—প্রেম বঞ্চিতা অভিশপ্ত এই নারীটি নির্বাসন জীবনকে বেছে নিয়েছে। 'তমসা' গল্পে অনাথা বাউন্ডুলে অন্ধ পল্খী রেল স্টেশনে ভিক্ষা করে দিন কাটাত। সে একদিন থিয়েটারের দলের এক মেয়েকে ভালোবেসেছে। সেই ভালোবাসার কাহিনী গল্পটির বিষয়। মানুষের সঙ্গে পশুর আত্মীয়তাব সূত্র ধরে 'কালাপাহাড়' ছোটগল্পটি রচিত। কালাপাহাড় নামে বিশাল মহিষটির প্রতি প্রধানের স্নেহ ও দুর্বলতা এবং পরিশেষে কালাপাহাড়ের আকস্মিক মৃত্যু এবং প্রধানের আত্মহত্যা—গল্পটির মূল বিষয়। 'খাজাঞ্চিবাবু' গল্পে বার্ধক্যের অপরাধে খাজাঞ্চিবাবুর চাকুরী চলে যাবার কাহিনী বর্ণিত। 'নুটু মোক্তারের সওয়াল' ছোটগল্পে পুরাতনের পরাজয় বর্ণিত হয়েছে। মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত 'বোবাকান্না' ছোটগল্পে মহামারীতে মৃত বিধবা বোবা স্ত্রীকে ঘিরে শশি ডোমের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং পরিশেষে শশীর আত্মহত্যায় গল্পটিতে কারুণ্যের সুর ধ্বনিত। 'কামধেনু' ছোটগল্পে সুরভি মাতার কাছে নাথুর অপরাধের স্বীকারোক্তি মূলক মনস্তাত্ত্বিক দিক প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। 'সপ্তপদী' ছোটগল্পে গান্ধিবাদী ভাবধারার মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার মেলবন্ধন ঘটেছে। 'সত্যপ্রিয়ের কাহিনী' ছোটগল্পটিতে নায়ক সত্যপ্রিয়ের আত্মত্যাগ বর্ণিত হয়েছে। 'তাসের ঘর' ছোটগল্পে মিথ্যাবাদিনী গ্রাম্য বধূ শৈলর চরিত্র বিশ্লেষণের সঙ্গে কৌতুক মধুর রসের সংযোজন ঘটেছে। ' দেবতার ব্যাধি' ছোটগল্পে উজ্জ্বল ডাক্তারের বিকৃত দেহ লালসা কি ভাবে যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়ে রূপান্তরিত হয়ে পশু থেকে দেবত্বে পৌঁছোল সেই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

প্রমথনাথ বিশীর গদাধর পণ্ডিত ছোটগল্পে পরাধীন ভারতবর্ষের শিক্ষক সমাজের দৈন্যতা প্রকাশিত হয়েছে। অথ কৃষ্ণার্জুন সংবাদ ছোটগল্পে চোরাকারবারীদের মুখোশ ছোটগল্পকার তুলে ধরেছেন। নগেন হাঁড়ীর ঢোল ছোটগল্পে ইংরেজ শাসনের পরিবর্তে জমিদারি প্রথার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন। তাঁর ঐতিহাসিক ছোটগল্পে ইতিহাসের সঙ্গে মানবজীবন রস সম্পৃক্ত হয়েছে। অতিলৌকিক ছোটগল্পগুলি রচনার ক্ষেত্রে প্রমথনাথের মুন্সিয়ানার পরিচয় সুস্পষ্ট। তাঁর ব্যঙ্গধর্মী ছোটগল্পগুলিতে সামাজিক অসংগতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনার সার্থক পরিচয় দিয়ে তথাকথিত সামাজিক ধ্বজাধারীদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছেন। প্রমথনাথ বিশী ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই বাস্তব জীবনের সার্থক রূপকার। দুজনের ছোটগল্পের বিষয় সমধর্মী না হলেও দুজনেই যে সমাজ চেতনার পরিচয় দিয়েছেন এর মধ্যে দিয়ে এই দুই প্রতিভাধর শিল্পীর জীবনদর্শন অনেকটা সমধর্মী একথা নিঃসন্দেহে আমরা মেনে নিতে পারি।

তারাশঙ্কর ও প্রমথনাথ বিশী দু'জনেই অভিজ্ঞতার শিল্পী। দু'জনেরই সাহিত্যের পাতায় বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রা ও মানবিকতার পরিচয় রয়েছে। আত্মস্মৃতি গ্রন্থে তারাশঙ্কর লিখেছেন—"জমিদার শ্রেণি ছাড়াও বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, চৌকিদার, ডাকহরকরা প্রভৃতি যারা সমাজের বিশেষ অংশ জুড়ে ছিল তাদের নিয়ে গল্প রচনা করবার প্রেরণাই হোক বা অভিপ্রায়ই হোক আমার মধ্যে এসেছিল, বোধ করি এদের কথা অন্য কেউ বিশেষ করে আগে লেখেননি বা লেখেন না বলে। সামগ্রিক পেশার প্রভাবে এরা সচরাচর মানুষ থেকে স্বতন্ত্র ও অভিনব হয়ে ওঠে।" তারাশঙ্করের প্রকৃতি বর্ণনায় ইঙ্গিতধর্মিতা প্রাধান্য পেয়েছে। 'তারিণী মাঝি' গল্পে বন্যার পূর্বাভাস সূচিত হয়েছে সারি সারি অসংখ্য পিঁপড়ের দৃশ্য বর্ণনায়। 'না' গল্পের প্রকৃতি প্রতীকী ব্যঞ্জনা নিয়ে দেখা দিয়েছে। অনন্তের মানসিক অবস্থার সঙ্গে প্রকৃতি এখানে সম্পর্কযুক্ত—

"নারিকেল গাছের মাথায় পেচকটা কর্কশ স্বরে আবার ডাকিয়া উঠিল। অকস্মাৎ অনন্তের সমস্ত ক্রোধ গিয়া পড়িল ঐ কর্কশকণ্ঠ নিশাচর পাখিটার উপর। সে ঘরের কোণ হইতে স্থিরভাবে কিছুক্ষণ শব্দ লক্ষ্য করিয়া ঘোড়াটা টানিয়া দিল। আকস্মিক ভীষণ গর্জনে রাত্রিটা কাঁপিয়া উঠিল, নারকেল গাছের মাথায় একটা আলোড়ন বহিয়া গেল, কি একটা নীচে সশব্দে খসিয়া পড়িল।"[৭৭] 'ডাইনী' গল্পের বীভৎস ও ভয়ঙ্কর পটভূমি রচিত হয়েছে ছাতি ফাটার মাঠকে কেন্দ্র করে। ছাতি ফাটা মাঠের নিসর্গ চিত্র যেন আদিমতা দিয়ে নিয়তির অসহায়তাকে ভাষারূপে দেওয়া হয়েছে—

"শাখাটার তীক্ষ্ণ প্রান্তে বিদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে বৃদ্ধা ডাকিনী। আকাশপথে যাইতে ঐ গুণীনের মন্ত্র প্রহারে পঙ্গুপক্ষ পাখী। মতো পড়িয়া ঐ গাছের ডালে বিদ্ধ হইয়া মরিয়াছে। ডালটির নীচে ছাতফাটার মাঠে খানিকটা ধুলা কালো কাদার মতো ঢেলা বাঁধিয়া গিয়াছে। ডাকিনীর কালো রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে।"[৭৮] অতিলৌকিক আবহ সৃষ্টিতে লেখকের মুন্সিয়ানা সুস্পষ্ট। এই গল্পের প্রকৃতি যেন একটা চরিত্র। ডাইনির মৃত্যু অনেকটা প্রকৃতির প্রয়াসরূপে দেখা দিয়েছে।

প্রমথনাথ তারাশঙ্করের মতো ডাইনি প্রথার বীভৎস ও ভয়ঙ্কর রূপ তুলে ধরেছেন তার 'ডাকিনী' ছোটগল্পে। উচ্চশিক্ষিতা মল্লিকার জীবন ডাইনি অপবাদে গল্প শেষে আত্মহত্যার পথকে বেছে নিয়েছে। তৎকালীন সমাজ তার প্রতি যে ঘৃণা ও দুর্ব্যবহার দেখিয়েছে তা নিঃসন্দেহে একটা সুস্থ প্রগতিশীল দেশের পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ।

তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্পে ছড়া, প্রবাদ, গান প্রভৃতির সার্থক সংযোজন করিয়াছেন। 'রসকলি' গল্পে মঞ্জরীর কণ্ঠে গান ঃ

"লোকে কয় আমি কৃষ্ণ কলঙ্কিনী
সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী গো, আমি গরবিনী।"

প্রমথনাথ বিশী সচেতনভাবে বাংলা ছোটগল্পের সমৃদ্ধি এনেছেন বিভিন্ন ছড়া গান ও প্রবাদ প্রবচনের সার্থক ব্যবহারে।

কাহিনীর সঙ্গে চরিত্র সম্পর্ক যুক্ত হয়ে তারাশঙ্করের ছোটগল্পগুলোর নাটকীয় গতির সৃষ্টি করেছে। লেখক 'অগ্রদানী' ছোটগল্পে পূর্ণ চক্রবর্তীর দ্বন্দ্বে সংশয়ে ক্লাইম্যাক্স বা মহামুহূর্ত বর্ণনা করেছেন যা গভীর ব্যঞ্জনা বহন করে—

"কলিকার আগুনে ফুঁ দিতে গিয়ে চক্রবর্তী আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল, জ্বলন্ত অঙ্গারের প্রভায় চোখের মধ্যেও যেন আগুন জ্বলিতেছে। ....চক্রবর্তী উঠিয়া দাঁড়াইল। শিশুর নিকটে আসিয়া কিন্তু আবার তাহার ভয় হইল। পর মুহূর্তে সে মৃতপ্রায় শিশুকে বস্ত্রাবৃত করিয়া লইয়া খিড়কির দরজা দিয়া সন্তর্পণে বাহির হইয়া পড়িল।"[৮০]

প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পে আছে নাটকীয় চমক, উৎকণ্ঠা ও ক্লাইমেক্স। দ্বিতীয় পক্ষ ছোটগল্পে নায়িকার স্বপ্ন দর্শনে আছে নাটকীয় চমক কিংবা নীলমণির স্বর্গলাভ ছোটগল্পে নীলমণির জ্ঞান ফিরে পাবার পর সে এক স্বর্গীয় অনুভূতিতে মুগ্ধ হয়েছে। তাঁর ঐতিহাসিক ও অতিলৌকিক ছোটগল্পগুলি প্রত্যেকটি নাট্যগুণ সমৃদ্ধ। চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ক্লাইমেক্স উপস্থাপনে লেখকের মুন্সিয়ানা প্রশংসনীয়।

তারাশঙ্কর গল্পের শুরু ও সমাপ্তি অংশটি সার্থকভাবে উপস্থাপিত করেছেন যেখানে অলংকরণ ও মন্ডন শিল্পের কারুকার্য ঝঙ্কৃত হয়েছে। 'শেষকথা' ছোটগল্পে গান্ধিজির অনশন ভঙ্গ ও কস্তুরবা গান্ধির মৃত্যুর ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখক গল্পটির পরিসমাপ্তি টেনেছেন যা শিল্পগুণ সমৃদ্ধ—

"চোখে জল টলমল করছিল, তবুও বুড়ার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠল, বুড়া বলল, বল বুড়ি কি বুলছ, বল? মরণ ভারি সুন্দর গো বুড়া, মরণ ভারি সুন্দর।

বুড়া হাসতে লাগল, চোখের জল টপটপ করে পড়ছে, ঝরে পড়ল বুড়ীর কপালের উপর। বুড়া মুছে দিতে গেল সে জল। বুড়ী বলল, না, থাক।"[৮১]

প্রমথনাথের ছোটগল্পের শুরু ও সমাপ্তি অংশ তারাশঙ্করের মতোই সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ। গল্পের পরিবেশ সৃষ্টিতে সূচনা অংশ নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ এবং তাঁর গল্পের পরিণতি গভীর ব্যঞ্জনাগুণে সমৃদ্ধ সন্দেহ নেই।

কৌতুকপ্রদ সংলাপ প্রয়োগে তারাশঙ্কর কতটা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত রাধিকা বেদিনীদের সঙ্গে কিষ্টো বেদের সংলাপটি ঃ

"নাম শুনলি গালি দিবি আমাকে বেদিনী।

কেনে?

নাম বটে কিষ্টোবেদে।

তা গালি দিব কেনে?

তুমার নাম কি রাধিকা বেদেনী, তাই বুলছি।

রাধিকা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল"[৮২]

প্রমথনাথ সংলাপধর্মী ছোটগল্পের সংখ্যা কম নেই। তিনি সচেতনভাবে তাঁর গল্পে বর্ণনা অংশের সঙ্গে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে যে সংলাপ দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে বাস্তবগুণ

সমৃদ্ধ। তিনি ভদ্রেতর চরিত্রগুলিতে যে সংলাপ প্রয়োগ করেছেন সংলাপগুণে সে গল্পগুলি সফলতার স্তরে উন্নীত হতে পেরেছে। আবার ভদ্র চরিত্রের সংলাপগুলিও লেখকের কলমে জীবন্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্পে রাঢ় বঙ্গের বিচিত্র জনজীবনের ছন্দকে উপস্থাপিত করেছেন। নীচ ও অন্ত্যজ অবজ্ঞাত, অবহেলিত চরিত্রের মেলায় তাঁর গল্পগুলো প্রাণবন্ত হয়েছে। বেদে, মালাকার, ডাকহরকরা, চৌকিদার, পটুয়া, ডোম, বাগদি, বাউল, ওঝা, বৈষ্ণব, জুয়ারি, ডাইনি, জমিদার, শিক্ষক, চিকিৎসক, বাজীকর প্রভৃতি অসংখ্য চরিত্র তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে।

প্রমথনাথ বিশী তাঁর ছোটগল্পে আপন অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন চরিত্রের আমদানি করেছেন সে চরিত্রগুলির একটা বৃহৎ অংশ অবিভক্ত উত্তরবঙ্গের জনজীবন থেকে সংগৃহীত। এছাড়া কলকাতার নাগরিক জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থেকে সেখান থেকে অজস্র চরিত্র তাঁর ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন। বলা যতে পারে তাঁর ছোটগল্পে আছে কৃষক, মজুর, জমিদার, বাদশা, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি, চিকিৎসক, রাজনীতিবিদ, বৈষ্ণবী ও ডাইনি চরিত্র। মোট কথা প্রমথনাথের ছোটগল্পে তৎকালীন সমাজজীবনে বিভিন্ন চরিত্র প্রতিনিধি সার্থকভাবে স্থান পেয়েছে। একজন ব্যঙ্গ লেখক শিল্পীর কলমে চরিত্রগুলি রক্ত মাংসে গড়া চরিত্র হতে পেরেছে। চরিত্র নির্মাণ কৌশলে প্রমথনাথের সাফল্য অবিসংবাদিত সন্দেহ নেই।

সমাজসচেতন শিল্পী তারাশঙ্করের ছোটগল্পে নতুন ও পুরাতন দ্বন্দ্বে নতুনকেই স্বাগত জানিয়েছেন। জমিদার হয়ে তারাশঙ্কর সামন্ততান্ত্রিক অবক্ষয়ের জন্য তিনি হতাশ হয়েছেন তবুও স্বাগত জানিয়েছেন নতুন কালকে। পাশাপাশি তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই তারাশঙ্কর ও প্রমথনাথ বিশী দুইজনেই জমিদার বংশোদ্ভুত। জমিদারি ঐতিহ্যে দুজনেই লালিত ও পালিত হয়েছেন। স্বাভাবিক কারণে তাঁদের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি জমিদারি ঐতিহ্যের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁরা দুজনেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার করুণ পরিণতিতে ব্যাথিত হয়েছেন এবং গভীর বেদনায় ঐতিহ্য লালিত জমিদারি ব্যাবস্থাকে বিদায় জানিয়ে স্বাগত জানিয়েছেন আধুনিক যুগ জীবনের গভীর যন্ত্রণাকে। প্রমথনাথ ও তারাশঙ্করের অসংখ্য ছোটগল্প তাঁর উজ্জ্বল প্রমাণ দেয়। .

চরিত্রের রূপ বর্ণনাতে তারাশঙ্করের দৃষ্টিভঙ্গি উপভোগ্য—"জলসাঘর, গল্পের রাবণেশ্বর রায় দীর্ঘাকায় পুরুষ খড়গের ন্যায় তীক্ষ্ণ নাসিকা, আয়ত চোখ, সিংহের ন্যায় বলিষ্ঠ দেহ, প্রশস্থ দেহ, ক্ষীণ কটি।"[৮৩] চরিত্রে সঙ্গে রূপবৈচিত্র্যে সৃষ্টিতে তারাশঙ্কর সিদ্ধহস্ত। পাশাপাশি প্রমথনাথের ছোটগল্পে চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণে রূপ বর্ণনা একটি প্রধান উপাদান। সম্ভবত একটি চরিত্রকে সার্থকভাবে তুলে ধরবার প্রয়োজনে তিনি বিভিন্ন

চরিত্রের রূপ, পোশাক পরিচ্ছদ, চলন বলনকে জীবন্তভাবে চিত্রশিল্পীর মতো অঙ্কন করেছেন।

নাটকীয় বিন্যাসে সমাজ বাস্তবতার বর্ণনায় ও সংলাপ অংশের সার্থক সংযোজন চরিত্রে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদানে দক্ষ শিল্পী। প্রমথনাথ বিশী ও তারাশঙ্কর সমকালীন ছোটগল্পকার হলেও তাঁরা দুজনে সমধর্মী ছোটগল্পকার নন।

তুলনার দর্পণে—প্রমথনাথ বিশী ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ বিশী বাংলা সাহিত্যের দুই শক্তিমান ছোটগল্পকার। আবার দুজনেই 'কল্লোল' পত্রিকায় লিখে সেখান থেকে সরে এসেছেন। অচিন্ত্যকুমার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কল্লোলের কুলবর্ধন আখ্যা দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কল্লোলে লিখলেও তাঁর বিজ্ঞান বুদ্ধি, সত্য এষণা, বস্তু জিজ্ঞাসা, সংগ্রামী চেতনা ছোটগল্পের জগতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। নীচু তলার মানুষ নিয়ে লিখেছেন মানিক। অন্ধকার জীবন বৃত্তের রূপকার, কূটৈষণা ও জটিলতার নিরাসক্ত শিল্পী ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোনদিনই কল্লোল বা কালিকলম পত্রিকায় কোনো লেখা প্রকাশ করেননি। তাঁর ছোটগল্পগুলো বেশিরভাগ প্রকাশিত হয়েছে বিচিত্রা পত্রিকায়। অন্যদিকে প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পগুলো প্রকাশিত হয়েছে শনিবারের চিঠি, কল্লোল, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তোর পর্বের অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় দুজনের ছোটগল্প রচিত হয়েছে। প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পের পটভূমিগত দিক থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঐক্যেবোধ লক্ষ্য করা যায়। অতসী মামী, প্রাগৈতিহাসিক, মিহি ও মোটা কাহিনী, সরীসৃপ, আজ কাল পরশুর গল্প, উত্তর কালের গল্প সংগ্রহ, কিশোর বিচিত্রা, খতিয়ান, ছোট বড় গল্প, পরিস্থিতি, ফেরিওয়ালা, বাছাই গল্প, বৌ গল্প সংকলন, ভেজাল, মাটির মাশুল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সংগ্রহ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, লাজুক লতা, স্ব-নির্বাচিত গল্প, সমুদ্রের স্বাদ, হলুদ পোড়া, ছোটবকুলপুরের যাত্রী ইত্যাদি বিচিত্র স্বাদের ছোটগল্পগ্রন্থের গল্পগুলি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য সৃষ্টি। তন্মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক, আত্মহত্যার অধিকার গল্পদুটি তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মানিকের প্রাগৈতিহাসিক ও সরীসৃপ এই দুটি ছোটগল্পকে শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে রেখেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলোকে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—

ক) রাজনৈতিক ছোটগল্প—নমুনা, দুঃশাসনীয়, যাকে ঘুষ দিতে হয়, শিল্পী, হারানের নাত জামাই, রাসের মেলা, আপদ, চুরিচামারি, ফেরিওয়ালা প্রভৃতি।

খ) প্রেমের গল্প— মেকি, শিপ্রার অপমৃত্যু, সর্পিল, মহাকালের জটার জট, বিষাক্ত প্রেম, শৈলজ শিলা, খুকি প্রভৃতি।

গ) সংসার জীবনের জটিল ঘাত প্রতিঘাত যুক্ত ছোটগল্প—আগন্তুক, প্রকৃতি, ফাঁসি,

মহাসঙ্গম, আত্মহত্যার অধিকার, মমতাদি, বৃহত্তর ও মহত্তর, ভেজাল, ভয়ঙ্কর, রোমান্স, ধনজন যৌবন বেয়ে, দিশাহারা হরিণী, মৃত জনে দেহ প্রাণ, স্বামী-স্ত্রী প্রভৃতি।

ঘ) ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সম্পর্কযুক্ত গল্প—টিকটিকি, ভূমিকম্প ও বিপত্নীক প্রভৃতি।

ঙ) প্রতিবাদী চেতনাযুক্ত ছোটগল্প—আজ কাল পরশুর গল্প, ধান, ছিনিয়ে খায়নি কেন, প্যানিক, নমুনা, সাড়ে সাত সের চাল, নেড়ী, রাঘব মালাকার, কে বাঁচায় কে বাঁচে, খতিয়ান, ভালোবাসা, ছেলেমানুষি, স্থানে ও স্থানে, পেরানটা, দীঘি, বেজাজ, গুপ্তধন, শিল্পী, কংক্রীট, ঢেউ, সুবালা, উপায়, টিচার, পাশ ফেল, অসহযোগী, কালোবাজারে, প্রেমের দর, ব্রীজ, মাসিপিসি, ছাঁটাই রহস্য, চক্রান্ত, একটি বখাটে ছেলের কাহিনী, কোনদিকে, পথ্যান্তর, প্রাণের গুদাম ও উপদলীয় প্রভৃতি।

প্রমথনাথ বিশীর গল্পগ্রন্থগুলি যথাক্রমে—শ্রীকান্তের পঞ্চমপর্ব, শ্রীকান্তের ষষ্ঠপর্ব, গল্পের মতো, গালি ও গল্প, ডাকিনী, ব্রহ্মার হাসি, অশরীরী, ধনেপাতা, চাপাটি ও পদ্ম, নীলবর্ণ শৃগাল, অলৌকিক, এলার্জি, অনেক আগে অনেক দূরে, যা হলে হতে পারত, সমুচিত শিক্ষা, প্র. না. বি.-র নিকৃষ্ট গল্প, প্রমথনাথ বিশীর স্ব-নির্বাচিত গল্প, অমনোনীত গল্প, নীরস গল্প সঞ্চয়ন, গল্প পঞ্চাশৎ, ছোটগল্প সংগ্রহ—১ম দ্বিতীয়—৩য়—৪র্থ খণ্ড।

তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ভাগ করা যায় ঃ

১) রঙ্গব্যঙ্গ মূলক ঃ এই শ্রেণিতে শিক্ষা বিয়য়ক, রাজনীতি বিষয়ক, কুসংস্কার ও অনাচার বিষয়ক, ধর্ম ও দেবদেবী বিষয়ক প্রভৃতি গল্প স্থান পেয়েছে।

২) বিশুদ্ধ কৌতুক রসাত্মক, ৩) ঐতিহাসিক, ৪) গভীর চেতনা বোধক, ৫) অতিপ্রাকৃত রসাত্মক এছাড়া সাহিত্য বিষয়ক, পুরাণ কেন্দ্রিক, রূপকধর্মী ও প্রকৃতি প্রেমমূলক প্রভৃতি গল্প স্থান পেয়েছে।

প্রমথনাথ বিশী ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের শ্রেণি নির্ণয় করতে গিয়ে আমরা দেখি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমথনাথ বিশীর মতো ঐতিহাসিক, অতি প্রাকৃত, রঙ্গ ব্যঙ্গমূলক ছোটগল্পের মতো কোনো গল্প লেখেননি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রতিবাদী চেতনা প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পে প্রতিবাদী চেতনা আছে কিন্তু তা হল মূলত ব্যঙ্গধর্মী।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের বিষয়বস্তুকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একদিকে আদিম মানুষের রক্তনাড়ীতে প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার অন্যদিকে মধ্যবিত্ত মনে সরীসৃপ কুটিলতা। "একজন আদিম মানুষ যেন নিরঞ্জন দৃষ্টিতে বাঙালি মধ্যবিত্তের সমাজকে দেখে নিচ্ছে, তার উপর সমস্ত বর্ণপ্রলেপের নেপথ্যে যে ভন্ডামী, স্বার্থবাদ, আর কূটকামনার সর্পিল প্রবাহ বইছে—তার কিছুই তাঁর চোখকে এড়িয়ে যায়নি।" মধ্যবিত্ত সম্বন্ধে মানিক ছিলেন নির্মম। 'আততায়ী গল্পে' এই নির্মমতা তুলনারহিত। এক বন্ধু অপর বন্ধুর স্ত্রীকে

কিভাবে নিজ অধীনে আনে তার কাহিনী। 'সিঁড়ি' গল্পে ভাড়াটের কাছ থেকে ভাড়া না পেয়ে বাড়িওয়ালা ভাড়াটের খোঁড়া মেয়েটির সঙ্গে ব্যভিচার করে। 'সরীসৃপ' ছোটগল্পে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ভিক্ষু প্রাচীকে নিয়ে এগিয়ে যায় নতুন জীবন গঠনের প্রত্যাশায়। 'কংক্রীট' ছোটগল্পে রঘু লুকিয়ে রেখেছে তার অস্ত্রটি। ভাববস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রকৃতি চেতনা অনবদ্য ভাবে মানিক পরিস্ফুট করেছেন। প্রাগৈতিহাসিক গল্প থেকে তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি—"প্রাচীকে পিঠে নিয়ে ভিখু জোরে জোরে পথ চলছে—দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিতেছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা। হয়ত ঐ চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে।" সরীসৃপ গল্পে গণপতি যে ফাঁসির দড়ি এড়িয়ে এসেছিল তার স্ত্রী শেষ পর্যন্ত রমার জীবনে করুণ পরিণতি ডেকে এনেছে।

'বিপত্নীক' ছোটগল্পে সবিতা সন্দেহ বাতিকগ্রস্থ স্বামীর কাছ থেকে অপমানিত হয়ে আত্মহত্যা করেছে। এজন্য স্বামী অনুতপ্ত হয়েছে এটাই গল্পের মূল বক্তব্য নয়। মূলবক্তব্য তার স্বামীর কাছে কিছু প্রশ্ন। প্রশ্নটা হল কি করে সবিতা তার মৃত্যুর আয়োজন করল কিংবা কি করেই বা সে দড়িটা হুকে আটকালো। এই প্রশ্নগুলিই তার কাছে মৃত্যুর চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে। 'টিকিটিকি' ছোটগল্পে জ্যোতিষার্ণবের ধারণা তার প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর সাথে টিকটিকির সম্পর্ক জড়িত। তার দ্বিতীয়া স্ত্রী ও কিশোর উত্তম সম্পর্কে তার মনোভাব সেই সঙ্গে চারচোখে টিকটিকি দেখে প্রতিহিংসা চরিতার্থ হবার উল্লাস গল্পটির অভিনবত্ব এনে দিয়েছে। 'হলুদপোড়া' গল্পে ধীরে ভূতের মতো ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে রাত্রের অন্ধকারে যখন বাড়িতে আসে তখন কুঞ্জগুণীর কাঁচা হলুদ পোড়ানোর ঘটনায় অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী ধীরেন জানিয়েছে "আমি বলাই চক্রবর্তী, শুভ্রাকে আমি খুন করেছি" এই সংলাপে এসে উপস্থিত হয় এক অশরীরী প্রেতাত্মা।

"চোর" গল্পে মধু চুরি করেছে বেঁচে থাকবার জন্য, কিন্তু পান্না মধুর স্ত্রীকে অপহরণ করেছে তার লালসা চরিতার্থ করবার জন্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাই স্পষ্ট বলেছেন জগতে চোর নয় কে? সবাই চুরি করে।" নীচুতলার ও উঁচুতলার মধ্যে চুরি করবার ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গল্পটির মূল বিষয়। 'চিকিৎসা' গল্পে ধনী ও দরিদ্রের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। গাড়ির ড্রাইভার পথ দুর্ঘটনায় মানসিক ব্যাধিগ্রস্থ হয়েছে।

'বড়দিন' ছোটগল্পে শিকারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 'বিবেক' ছোটগল্পে ঘনশ্যাম ফিরিয়ে দেয় বড়লোক বন্ধুর চুরি করা ঘড়িটি। অন্যদিকে তাঁর একান্ত দরিদ্র বন্ধুর মানি ব্যাগ থেকে টাকা নিতে সে সংকোচ বোধ করেনি। এর মধ্যে মধ্যবিত্ত মানসিকতার দিকটি আলোচিত হয়েছে। 'সশস্ত্র প্রহরী' গল্পে প্রহরী মদন মদ্যপবাবুদের বিলাসিতার প্রতি অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলে। সেই মদনের একমাত্র শিশু সন্তানকে ঘরের বেড়া ভেঙ্গে চুরি করে নিয়ে যায় একটা শিয়াল। মদন বাঁচাতে পারেনি তার সন্তানকে। এর মধ্যে মদনের প্রতি ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের মনকে অলোড়িত করে।

'মেজাজ' গল্পে ভৈরবের প্রতিশোধের বাসনায় রণংদেহী মূর্তি দেখা দিয়েছে তার

নিজের স্ত্রীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে। 'হারানের নাত জামাই' গল্পে পলাতক বিপ্লবী ভুবনকে বাঁচাতে গিয়ে ময়নার মা যে কৌশল অবলম্বন করে তা তেভাগা আন্দোলন ব্যাপকতা দান করে।

'ছিনিয়ে খায়নি কেন' গল্পটিতে সামাজিক অত্যাচারের কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। 'মাটির মাসুল' গল্পটির জোতদারদের বিরুদ্ধে চাষিদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের জ্বলন্ত ঘটনা মূল উপজীব্য। অন্যায়ভাবে ধান মজুত করে রেখেছিল জোতদার ধরণী তরফদার। তার ধানের আড়ৎ থেকে সংঘবদ্ধ কৃষকরা জোতদারের বিরুদ্ধে গিয়ে ধান লুট করে নেবার কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে এই গল্প। 'অসহযোগ' গল্পে পিতার অন্যায়ের বিরুদ্ধে পুত্রের প্রতিবাদ সোচ্চার হয়েছে। এই প্রতিবাদ একজন মুনাফা লোভী পুঁজিপতি শ্রেণির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। 'পথ্যান্তর' গল্পটিতেও আদর্শহীন পিতা রাঘব চৌধুরীর বিরুদ্ধে পুত্র অতুলের রুখে দাঁড়াবার কাহিনী। 'চক্রান্ত' গল্পটিতে বাসন মাজা কাজ করা ঝি এর প্রতি দুর্ব্যবহার ও তার নায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করবার ঘটনাটি প্রাধান্য পেয়েছে। 'ছাটাই রহস্য' গল্পটি অর্থনৈতিক শোষনের বিরুদ্ধে লেখা।

'শত্রু মিত্র' গল্পটি লাঠিয়াল রসুলের যোগ্য নেতৃত্বে শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কাহিনী। 'দিঘি' গল্পটি 'তেভাগা' আন্দোলনের কাহিনী। জমিদারের বিরুদ্ধে চাষিরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে নায্য অধিকারের দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করেছে। 'খতিয়ান' গল্পের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রেখে ধনী-দরিদ্র, শোষক শোষিতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঘটনা মূল উপজীব্য।

প্রমথনাথের 'শার্দুলের শিক্ষা' ছোটগল্পে দেশের সাম্প্রদায়িকতার হিংস্ররূপ দেখানো হয়েছে। হাতুড়ি গল্পে সহজ উপায় দানের মধ্যে নেতাদের অসাধারণত্ব প্রাধান্য পেয়েছে। 'মারণযজ্ঞ' গল্পে ধর্মের ভন্ডামি প্রকাশ পেয়েছে। 'সদা সত্য কথা কহিবে' ছোটগল্পে সত্য কথা বলতে গিয়ে রামতনুর লাঞ্ছনা ও মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। প্রমথনাথের ঐতিহাসিক গল্পে ইতিহাস রস মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে যা সিপাহি বিদ্রোহের সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে প্রমথনাথের পৌরাণিক ছোটগল্পের উপজীব্য বিষয় রঙ্গব্যঙ্গের অবতারণা। প্রমথনাথের প্রেম ভাবনা মানিক থেকে স্বতন্ত্র। অলৌকিক রসের রচনার ক্ষেত্রে প্রমথনাথের রহস্য ও রোমান্সের আমদানি করে পাঠক মনে স্থায়ী আসন অধিকার করতে পেরেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলোর কাহিনীর সঙ্গে চরিত্রের মেলবন্ধন ঘটেছে। চরিত্রগুলো বলতে গেলে প্রত্যেকটি জীবন্ত। সামাজিক বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত করতে গিয়ে মানিক চরিত্র অনুযায়ী সংলাপ ব্যবহার করেছেন। কাহিনীর কাব্যগুণের চেয়ে নাট্যগুণ গল্পগুলির প্রধান অবলম্বন। তাঁর প্রত্যেকটি ছোটগল্প স্থান কাল ও পাত্রের ত্রিবেণী বন্ধনে গল্পরস আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি গল্পের নামকরণ বিশেষ ব্যঞ্জনাবহ। 'মেজাজ' গল্পটি গরীব চাষীর সংলাপকে অনেকটা অস্বাভাবিক বলে মনে হয়, যেমন—

"জমি নেই ভাত কাপড় নেই আরাম বিরাম স্বাস্থ্য নেই....মানুষ বলে গণ্য হবার যোগ্যতা নেই, মেজাজের মতোন এমন ফ্যাসনেবল দামি চিজ্ সে কোথায় পেল।"[৮৪]

গরীব চাষির ক্রোধযুক্ত সংলাপটি স্বাভাবিক স্তরে পৌঁছায়নি।

মানিকের মতো প্রমথনাথ বিশীর গল্পগুলোর পরিসমাপ্তি ও প্রারম্ভ শিল্পসম্মত সন্দেহ নেই। প্রমথনাথ বিশীর মতো মানিকের কিছু কিছু গল্পে ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন স্থান পেয়েছে।

মানিক অনেক গল্পে বর্ণনামূলক অংশে ও সংলাপ অংশ চলিত ভাষায় লিখেছেন—'বাগ্দিপাড়া দিয়ে' ছোটগল্পের সংলাপ ঃ "বামুনের চেয়ে সেরা জাত এসেছে পৃথিবীতে, মজুরের জাত খাটিয়ার জাত। চোর বেজাতের দেবতা ধরম মোরা ডাকাইত নাকি যে ঘরে আসামী রাখুম? বিকালে জামাই আইছে, শোয়াইছি মাইয়া-জামাইরে।"[৮৫] সংলাপ বর্ণনায় ও চরিত্রের বিশ্লেষণে গল্পটি সার্থকতা পেয়েছে।

মানিক তাঁর ছোটগল্পের বাক্য গঠনে সাধুচলিতের দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন। বিশেষত তাঁর মানসিকতায় নিরাসক্ত ও তির্যকতা সক্রিয় ছিল। এরূপ একটা তির্যক বাক্যের দৃষ্টান্ত 'কুষ্ঠ রোগীর বউ' গল্প থেকে প্রদত্ত হল—"দুঃখ দেখিলে কাঁদিয়াই মরিয়া যায়, কেহ উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবে বিকালে চান করা হয় নাই বলিয়া মাথাটা ঝিমঝিম করিতেছে, আকাশে কি আশ্চর্য একটা পাখি উড়িয়া গেল।"[৮৬] তির্যক বাক্যের ব্যবহারে অসমাপ্ত ভাবনার দৃষ্টান্ত তাঁর গল্পে অভাব নেই।

মানিক ছোটগল্পে সার্থক উপভাষার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। পূর্ব বাংলার উপভাষা, রাঢ় বঙ্গের উপভাষা অর্থাৎ এপার বাংলা—ওপার বাংলার উপভাষাকে তিনি সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। যেমন—

ক) "শৈল বলে, জট ছাড়াইয়া কাম নাই, বড় লাগে। চুল বাঁধুম আগে সুদিন আইলে।"[৮৭]

খ) "উই তো মোর কপাল। তোমরা বুঝবে নি। ই যে সামাজিক অমান্য গো, জেতার ব্যাপার ঠেঙাবো কাকে।"[৮৮]

সংলাপের তীক্ষ্ণতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'ফেরিওয়ালা' গল্প থেকে এরূপ তীক্ষ্ণ সংলাপ তুলে ধরছি—"মা বলে ডেকেছ বাকি না রেখে গিয়ে পারবে না বাবা। গা থেকে খুলে নিতে হবে। তোমার সামনে আসতে পারিনি, তোমার কাপড়টি পড়ে তবে এলাম।"[৮৯] সংলাপটিতে জীবনের ট্রাজেডি বিবৃত হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের বর্ণনা অংশে আছে সংযম। 'ধর্ম' ছোটগল্পটি থেকে বর্ণনার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল—

"বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ দুজনের বেঁধে যায়। তীক্ষ্ণ ধারালো কথায় পরস্পরকে এরা কুচিকুটি করে কাটতে থাকে, মুখের সঠিক সূক্ষ্ম ভঙ্গী সমর্থন করে চলে কথাকে, ভিতরের জ্বালার তাপে আর আক্রোশের চাপে ফর্সা মুখ দুটি লাল হয়ে যায়।"[৯০]

মানিকের ছোটগল্প কাব্যধর্মী নয়। প্রকৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি উচ্ছ্বসিত নন। 'চাঁদের আলো' তার ছোটগল্পে এনে দেয় নিষ্ঠুর সত্যকে। যেমন 'ঢেউ' ছোটগল্পের প্রকৃতি বর্ণনায়—"চাঁদ কারো প্রাণের দুয়ারে ধর্না দেয় না, মালিকবাবুরা চাঁদনী রাতে চুটিয়ে মজা লোটে,

আর দালাল দিয়ে চাঁদমার্কা ঘুমপাড়ানি স্বপন ছড়ায়। চাঁদের বাবা ভগবানের দোহাই দিয়ে—বাঁচার মজা বরবাদ করে দুনিয়ার মানুষ ঠাণ্ডা রাখবে বলে।"[৯১] আলোচ্য চন্দ্রালোকের বর্ণনাটি কাব্যধর্মী হয়ে ওঠেনি বরং বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার ছোটগল্পে যে এপিকগ্রামগুলি ব্যবহার করেছেন সেগুলো থেকে জগৎ ও জীবনকে অতি সহজে চেনা যায়। যদিও প্রত্যেকটি এপিকগ্রাম বুদ্ধিদীপ্ত। যেমন—

(১) দারিদ্র্য মানুষের সেরা শত্রু।

(২) অলস কল্পনা আজও আকাশে ফুলের চাষ করছে।

(৩) নারীর মতো মালিকহীন টাকাও পৃথিবীতে নাই।

(৪) বাংলাদেশের মানুষ কখনো প্রমাণ ছাড়া শাস্তি দেয় না।

(৫) "স্বার্থ মানুষকে শক্ত করে, বিপদে সাহস যোগায়।" এরূপ অজস্র মানিকের অভিজ্ঞতালব্ধ যা মুক্তাসুলভ দৃষ্টি এনে দেয়।

প্রমথনাথের ছোটগল্পের এপিকগ্রামগুলো ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

১) "ক্ষুদ্র সৌন্দর্য চোখ ভোলায়, মহৎ সৌন্দর্য মন ভোলায়।"

২) "পূর্বরাগের দীপ্ত অসিকে বিবাহের বক্রখাপের ভেতর ঢোকানো চলে না।"

৩) "পাপের গতি কুটিল আর অদৃষ্টের গতি গোপন—"প্রভৃতি।

প্রমথনাথের সংলাপ নৈপুণ্য শিল্প সিদ্ধির স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। 'উতঙ্ক গল্পের একটি সংলাপের অংশ প্রদত্ত হল ঃ

'উতঙ্ক' বলিল—স্যার

অধ্যাপক বলিলেন—কি চাঁদা নাকি? উতঙ্ক বলিল, না ব্লেকের সেই কবিতাটা—

—কোন কলেজের ছাত্র?[৯২]

'সিন্ধবাদের অষ্টম সমুদ্র যাত্রার কাহিনী' ছোটগল্পে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সংলাপটিকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দীপ্ত হয়ে উঠেছে ঃ

"প্রশ্নঃ সংবাদপত্র কি?

উত্তর ঃ মূর্খ যাহার লেখক, ধূর্ত যাহার সম্পাদক, গুন্ডা যাহার প্রকাশক, শঠ যাহার স্বত্বাধিকারী, রাত্রে যাহা বিছানার চাদর, দিনে যাহা সংগ্রামের ধ্বজা, চুল ছাঁটিবার সময় যাহা মাথা, ভাত খাইবার সময় যাহা টেবিল ক্লথ, বিজ্ঞাপনের দ্বারা যাহা যৌনতত্ত্বের শিক্ষা দেয়, মিথ্যা যাহার বারো আনা এবং ভুল যাহার চার আনা তাহাই সংবাদপত্র।"

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষাকে স্থান দিয়ে ছোটগল্পকে রস সমৃদ্ধ করতে পেরেছেন। কিন্তু প্রমথনাথ তাঁর ছোটগল্পে আঞ্চলিক ভাষাকে প্রাধান্য দেননি।

প্রমথনাথের ছোটগল্প অনেকটা কাব্যধর্মী, প্রকৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রমথনাথের সাফল্য স্বীকৃত। যেমন—"এখানকার ঝিঁ ঝিঁ ডাকা দুপুরের ঘুঘুর করুণ কান্না ভীরু প্রকৃতির শঙ্কিত মিনতির মতো। তরুলতাকে স্পর্শ করলে বিশ্বের রক্ত প্রবাহের বেগ যেন অনুভব

করতে পারি, তার মাঠের মাঝে ঘাসের উপর শুয়ে শুনতে পাই পৃথিবীর স্পন্দনের সঙ্গে আমার হৃৎস্পন্দনের ঐক্য তলে দোহার চলছে।"

মানিক বন্দোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের চরিত্রগুলি বাস্তবধর্মী ও জীবন্ত। রায় বাহাদুর, কালাচাঁদ, মাখন, দাদাসাহেব, কেশব, নীলমণি, ভুবনমন্ডল, জগমোহন, তমসা, ময়না প্রভৃতি চরিত্র মানিকের অনবদ্য সৃষ্টি। পাশাপাশি প্রমথনাথের চরিত্রগুলো রক্ত মাংসে গড়া। গদাধর, মাধবী মাসী, নানাসাহেব, নগেন হাঁড়ি, আলমগীর, নাদিরশাহ, জুবেদী, সুতপা, তুলসী, নিবারুণবাবু প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টিতে প্রমথনাথের সাফল্য প্রশংসাতীত।

মানিক ও প্রমথনাথের তুলনা করলে বোঝা যায় যে দু'জনেই বাস্তবধর্মী লেখক হলেও প্রমথনাথ একটু স্বাতন্ত্র্য ধর্মী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রয়েড ও মার্ক্সবাদী চিন্তা তাঁর ছোটগল্পের প্রধান উপজীব্য বিষয় হিসাবে গড়ে তুলেছেন, একদিকে মনোবিজ্ঞান অন্যদিকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তু বিজ্ঞান তিনি তাঁর সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। তবে ফ্রয়েডীয় মনোভাব তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী ছোটগল্পে স্থান পেয়েছে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধোত্তর পটভূমিকায় মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা গল্পে অর্থনৈতিক ও শ্রেণি সংগ্রামের প্রকাশ ঘটেছে। পাশাপাশি প্রমথনাথ তাঁর ছোটগল্পে ফ্রয়েড ও মার্ক্সবাদকে সচেতনভাবে পরিহার করেছেন। তবে প্রমথনাথের ছোটগল্পে মানিকের মতো বিজ্ঞান চেতনার প্রকাশ ঘটেনি। বিষয় ও আঙ্গিক নৈপুণ্যে দু'জনে সার্থক শিল্পী কিন্তু তাঁরা সমকালীন লেখক হলেও সমধর্মী লেখক হিসেবে পরিচিত নন।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পের তুলনামূলক আলোচনা

প্রমথনাথ বিশী ও গজেন্দ্রকুমার মিত্র দুজনে বাংলা সাহিত্যের সার্থক ছোটগল্পকার হিসেবে পরিচিত। প্রমথনাথ বিশীর চেয়ে গজেন্দ্রকুমার মিত্র বয়সে আট বছরের প্রবীণ। সাহিত্যিক হিসাবে দুইজনের সঙ্গে ছিল অন্তরঙ্গ পরিচয়। এই অন্তরঙ্গতা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে অক্ষুন্ন ছিল। বিংশ শতাব্দীর তিন দশকের বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের পাশাপাশি এই দুই প্রতিভাধর সাহিত্যিক ছোটগল্পের নৈবেদ্য সাজিয়েছেন। 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'বিচিত্রা', 'শনিবারের চিঠি' ও 'আনন্দবাজার' পত্রিকাতে দুই জনের লেখা ছোটগল্প প্রকাশিত হয়।

দুই জনের ছোটগল্পের জগৎ ছিল বহু বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময়। মনস্তাত্ত্বিক গল্প, ঐতিহাসিক গল্প, প্রেমের গল্প, প্রতিবাদী চেতনা মূলক গল্প, হাস্যরস প্রধান গল্প, কাহিনী ধর্মী ছোটগল্প অলৌকিক ছোটগল্প ও ভৌতিক ছোটগল্প রচনা করে গজেন্দ্রকুমার মিত্র শিল্পসিদ্ধির স্তরে পৌঁছে পাঠক মানসে স্থায়ী আসন অধিকার করে নিয়েছেন। এছাড়া গজেন্দ্রকুমার মিত্র পৌরাণিক কাহিনী বিশেষ করে মহাভারতের ঘটনা অবলম্বনে অসংখ্য ছোটগল্প উপহার দিয়েছেন। বস্তুত তিনি নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের নিপুণ চিত্র শিল্পী হিসেবে ছোটগল্পের জগতে অম্লান স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। ছোটগল্পের সংখ্যাগত বিচারে গজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রমথনাথকে ছাড়িয়ে গেছেন। মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে গজেন্দ্রকুমার মিত্র তাঁর

সাহিত্য জীবনে পাঁচশর কাছাকাছি গল্প লিখেছেন। সেখানে প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পের সংখ্যা তিনশর কাছাকাছি। প্রমথনাথ গজেন্দ্রকুমার মিত্রের মতো বৈচিত্র্যময় ছোটগল্প লিখলেও ব্যঙ্গধর্মী ছোটগল্প রচনা করেছেন। পাশাপাশি গজেন্দ্রকুমার ব্যঙ্গকে পরিহার করেছেন।

দুইজনেই ছোটগল্পে বিভিন্ন চরিত্রের অন্তর্জীবন ও বাইরের জীবন মনস্তাত্ত্বিক দিকটি আলোকপাত করেছেন। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'বিগত যৌবন', 'সর্পিল', 'স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম', 'বিন্দুপিসী', 'আকৃতি ও প্রকৃতি' প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিক ছোটগল্পে বিভিন্ন চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। প্রমথনাথের মনস্তত্ত্ব নির্ভর ছোটগল্পের মধ্যে অতিসাধারণ ঘটনা, ডাকিনী, আরোগ্য স্নান, পেশকার বাবু, শকুন্তলা ও সুতপা গল্পগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। প্রমথনাথের স্বপ্নাদ্য কাহিনী ছোটগল্পটি অতিপ্রাকৃতমূলক হলেও মনস্তত্ত্ব নির্ভর ছোটগল্প।

প্রমথনাথ রোমান্টিক প্রেমের গল্প লিখেছেন। 'টেনিস কোর্টের কাহিনী', 'পাশের বাড়ি', 'শকুন্তলা', 'সুতপা', 'উল্টাগাড়ি', 'মাধবী মাসী', 'ছবি', 'চেতাবনী', 'প্রত্যাবর্তন' প্রভৃতি ছোটগল্পে প্রেমের প্রজ্জ্বোল প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হয়েছে।

পাশাপাশি গজেন্দ্রকুমার মিত্রের প্রেমের গল্প বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। 'নূতন ও পুরাতন', 'প্রারব্ধ', 'কথা ও সেমিকোলন', 'প্রাণের মূল্য' ও 'রহস্য' প্রভৃতি প্রেমের ছোটগল্প। তাঁর গল্পে—

"প্রেমের গতি অতি অসরল, অতি কুটিল—তাঁর নায়ক নায়িকার জীবনে প্রেমের আর্বিভাব প্রায় সর্বদাই দুর্ভাগ্যের অশনি সংকেত ব্যতীত আর কিছুই নয়।"[৯৫]

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ছোটগল্পে নায়ক নায়িকার মনে রোমান্টিক প্রেম প্রকাশিত হয়েছে। অন্ধ কানা গলির পথ ধরে প্রসারিত রাজপথে তাঁর গল্পের নায়ক নায়িকাদের প্রেম আসে নি। তাঁর প্রেমের গল্পে অমৃত ও গরল দুই আছে কিন্তু সেখানে অমৃতের ভাগের চেয়ে গরলের অংশ অনেক বেশি।

"অমৃতের আনন্দ ও প্রশান্তির চেয়ে বিষের জ্বলুনী টাই বেশি পরিমাণে অনুভূত হয়। তাই তাঁর লেখা প্রেমের গল্প প্রায় সব দুঃখের গল্প।"[৯৬]

গজেন্দ্রকুমারের প্রেমের গল্প প্রসঙ্গে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—

"গজেন্দ্রকুমারের প্রেমের গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার ছদ্মরূপ। তাঁর লেখা প্রেমের গল্প পড়ে শেষ করার পরও অনেক সময় টের পাওয়া যায় না সেটা প্রেমের গল্প। গজেন্দ্রকুমার এই প্রেমের ছদ্মবেশ পরানো প্রেমের গল্প রচনার দুরূহ শিল্পকৌশল আয়ত্ত করেছিলেন।"[৯৭]

তুলনামূলক বিচারে গজেন্দ্রকুমার মিত্রের চেয়ে প্রমথনাথ বিশী ঐতিহাসিক গল্প বেশি লিখেছেন। ইতিহাস রস ও ঐতিহাসিক পরিমন্ডল সৃষ্টি করে প্রমথনাথ যে ঐতিহাসিক

ছোটগল্পগুলি লিখেছেন তা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে গণ্য। 'বেগম শমরুর তোষাখানা', 'ছিন্ন মুকুল', 'নানাসাহেব', 'রুথ', 'ছায়া বাহিনী', 'রক্তের জের', 'জেমি গ্রীনের আত্মকথা', 'গোলাপ সিং-এর পিস্তল', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'পরী', 'মহেঞ্জোদড়োর পতন' প্রভৃতি প্রমথনাথের সার্থক ঐতিহাসিক ছোটগল্প। গজেন্দ্রকুমার-এর ঐতিহাসিক ছোটগল্প 'একরাত্রি', 'থেমে যাওয়া সময়', 'মুখুজ্জে মশাই' প্রভৃতি ছোটগল্পের বিভিন্ন চরিত্রের জীবন উচ্চগ্রামে বাঁধা। প্রমথনাথের অতিপ্রাকৃত রসের ছোটগল্পে এক গা ছম্‌ছম্‌ করা ভৌতিক পরিমন্ডল সৃষ্টি করে শিল্প সিদ্ধির স্তরে পৌঁছে গেছে। তাঁর 'চিলা রায়ের গড়', 'খেলনা', 'কপালকুন্ডলার দেশে', 'দ্বিতীয় পক্ষ', 'পুরন্দরের পুঁথি', 'গোষ্পদ', 'তান্ত্রিক', 'পাশের বাড়ি' প্রভৃতি অতিলৌকিক ছোটগল্পগুলি সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সাহিত্যিক খ্যাতি তাঁর অতিলৌকিক ছোটগল্প রচনার জন্য একথা বলা যেতে পারে। তিনি অতিলৌকিক ছোটগল্প রচনার জন্য একথা বলা যেতে পারে। তিনি অতিলৌকিক গল্প রচনায় প্রথম শ্রেণির শিল্পী। তার 'সাধু ও সাধক', 'নিশীথের ডাক', 'রহস্য' 'অন্তহীন যাত্রা', 'এপার ওপার', 'মরণের পরে' ও 'সময়ের বৃন্ত হতে খসা' প্রভৃতি ছোটগল্প প্লটের বৈচিত্র্য ও শিল্পোৎকর্ষের সার্থক দৃষ্টান্ত।

অলৌকিক গল্প সম্পর্কে অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য— "কাহিনীগুলি কল্পনাদৃষ্ট হলেও অনুরূপ পরিবেশে বাস্তব জীবনেও যে এরকম অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে এ সম্বন্ধে লেখকের নিজের কোনো সন্দেহ নেই। তিনি বিশ্বাসী মানুষ এবং তাঁর বিশ্বাসে আধুনিক সন্দেহবাদের খাদ বিন্দুমাত্র মিশ্রিত নেই। ....পাঠক যদি লেখকের বিশ্বাসটুকু বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে পারেন তাহলেই বুঝতে পারবেন এইসব গল্পে কি অপরূপ শিল্পোৎকর্ষের পরিচয় তিনি দিয়েছেন।"

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ছোটগল্পের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেছেন— "গজেন্দ্রকুমার কি আধুনিক গল্পলেখক? উত্তরে বলতে হয়—হ্যাঁ। বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে তাঁর কেবল নৈপুণ্য নয়, সাহস্য লক্ষ্য করা যায়। শ্রী চক্রবর্তী দেখিয়েছেন, প্রথাবিরুদ্ধ দুঃসাহসিক গল্প লেখায় কতোটা সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। 'আদিম', 'জরা ও বাসুদেব', 'বন্ধুমেধ', 'স্বর্ণমৃগ', গল্প তার পরিচয়স্থল। 'আদিম' গল্পে বার্ধক্যের যে ছবি তিনি এঁকেছেন তা ভয়ংকর—তা পড়ে পাঠকমনে একসঙ্গে জাগে আতঙ্ক আর জুগুপ্সা। 'জরা ও বাসুদেব' গল্পে পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণকে ব্যর্থ প্রেমের মনস্তাপদগ্ধ সাধারণ মানবরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। 'স্বর্ণমৃগ' গল্পের ('অমৃত', ৪ এপ্রিল ১৯৭৫ - সংখ্যায় প্রকাশিত) একজোড়া বিবাহবদ্ধ নরনারীর যৌনজীবনকে সমস্ত ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে প্রকাশ্যে আনা হয়েছে ও এক ভয়াবহ নিষ্ঠুর পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আর 'বন্ধুমেধ' গল্পে (আকাশের আয়না) এক ভয়ংকর অকপটতার সঙ্গে সাম্প্রতিক নকশালপন্থী রাজনীতির রক্তাক্ত পরিণাম উন্মোচিত হয়েছে।"

প্রমথনাথের ব্যঙ্গধর্মী ছোটগল্পে ঘুণধরা সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি তুলে ধরেছেন।

এই ধরনের শ্লেষ ধর্মী ও কৌতুক রসাশ্রিত ছোটগল্প 'ভগবান ও বিজ্ঞাপনদাতা', 'পুতুল', 'গঙ্গার ইলিশ', 'সাবানের টুকরো', 'রাশিফল', কৃষ্ণনারায়ণ সংবাদ' ও 'ঘোগ' প্রমথনাথের সার্থক সৃষ্টি।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র হাসির গল্প লিখেছেন। 'জামাই চাই', 'হাসির গান', 'দুর্ঘটনা', 'চাকর', 'ঘেরাও', 'রাস্তা খরচ' প্রভৃতি হাসির ছোটগল্প রচনায় তিনি বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

গজেন্দ্রকুমারের মিত্রের প্রতিবাদী চেতনামূলক প্রতিনিধি স্থানীয় ছোটগল্প—'ম্যায় ভুখা হুঁ', 'মহাকালের নিঃশ্বাস' প্রভৃতি ছোটগল্পে অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। পাশাপাশি প্রমথনাথের প্রতিবাদী চেতনা মূলক 'রক্তাতঙ্ক', 'রক্তবর্ণ শৃগাল', 'হাতুড়ি', 'গদাধর পণ্ডিত' প্রভৃতি ছোটগল্প অনবদ্য। পাশাপাশি প্রথা বিরুদ্ধ দুঃসাহসিক গল্প 'স্বর্ণমৃগ', 'বন্ধু মেধ', 'আদিম' ও 'জরা ও বাসুদেব' প্রভৃতি ছোটগল্পে বিষয় বৈচিত্র্য ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে আধুনিক গল্প লেখক হিসাবে গজেন্দ্রকুমার মিত্র পাঠক মহলে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন।

প্রমথনাথ বিশী ছোটগল্পে সাধু ও চলিত উভয় রীতি প্রয়োগ করেছেন। সংলাপ অংশে কথ্যরীতি এবং বর্ণনা অংশে সাধু ও চলিত রীতির দুটোকেই বেছে নিয়েছে। গজেন্দ্রকুমার মিত্র চলিত ভাষাকে ছোট গল্পে সার্থক ভাবে ব্যবহার করেছেন—যেমন "কাল তোমাকে ঠাট্টা করেছিলাম। ঠাট্টা বোঝ না? যাও, ওঠ তাড়াতাড়ি, দোহাই তোমার।"

পরিশেষে বলা যায় ছোটগল্পের বিষয়, আঙ্গিক, জীবনদর্শন, চরিত্র, ঘটনা, সংলাপ, বর্ণনা, নাটকীয়তা প্রভৃতির তুলনামূলক বিচারে প্রমথনাথ বিশী ও গজেন্দ্রকুমার মিত্র সমকালীন ছোটগল্পকার হলেও সমধর্মী ছোটগল্পকার নন।

সুমথনাথ ঘোষের ছোটগল্পের তুলনামূলক আলোচনা

প্রমথনাথ বিশীর চেয়ে সুমথনাথ ঘোষ বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও দুজন ছোটগল্পকারের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রমথনাথ বিশী তার ছোটগল্পগুলি আনন্দবাজার, শনিবারের চিঠি, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, কথাসাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। প্রমথনাথের ছোটগল্প বৈচিত্র্যময়। ঐতিহাসিক, সামাজিক, অতিলৌকিক মনস্তাত্ত্বিক গল্পের পাশাপাশি তিনি মধ্যবিত্ত জীবনের কথা তাঁর গল্পে স্থান দিয়েছেন।

সুমথনাথ ঘোষের 'জটিলতা' গল্প সংকলন গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। আলোচ্য গল্প গ্রন্থগুলি যমুনা, ভারতবর্ষ ও দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সুমথনাথ ঘোষ ছিলেন বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার। তাঁর ছোটগল্পে দুঃখ ও বেদনা মূল উপজীব্য। মধ্যবিত্ত শ্রেণির করুণ কাহিনী অবলম্বনে লেখা ছায়া সঙ্গিনী' গল্পটি সুমথনাথের অনবদ্য সৃষ্টি। গল্পটিতে প্রেমিক প্রেমিকার করুণ আর্তি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু গল্পের কাহিনীতে নায়ক নায়িকার জীবনে প্রেমের সাফল্য আসেনি। আলোচ্য ব্যর্থ প্রণয়ের ছোটগল্প হিসেবে 'ছায়া সঙ্গিনী' ছোটগল্পটি শুধুমাত্র পাঠক মনে এক অনুভবের

জগতে পৌঁছে দেয় না, লেখকের গল্প রচনার কৌশল বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুঃখ দরিদ্র ও হতাশার কাহিনী অবলম্বনে এই ছোটগল্পটিকে বঙ্গদেশের ভিত্তিহীন মানুষের দিনলিপি চিত্রায়িত হয়েছে। 'বাড়ির কর্তা' ছোটগল্পে প্রবীণ গৃহকর্তার অসহায় জীবনের দিনলিপি চিত্রিত হয়েছে। রংখেলা ছোটগল্পে একজন মৃতপ্রায় ব্যক্তির আকাশ কুসুম কল্পনা প্রাধান্য পেয়েছে। 'চুড়ি' ছোটগল্পে সুমথনাথ ঘোষ একজন সদ্য বিধবার আশাহত দৃষ্টিভঙ্গি-র মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'প্রতিবেশী' ছোটগল্পে সুসম্পর্কের পরিবর্তে নিষ্ঠুর মানসিকতার পরিচয় আছে। 'কলহ' ছোটগল্পটি বিচিত্র ধর্মী। একজন নিষ্ঠাবতী স্ত্রী কিভাবে সচেতন ভাবে স্বামীর অনিবার্য বিপদ ডেকে এনেছে তাঁর করুণ কাহিনী। 'চেঞ্জার' ছোটগল্পটি এক অভাবগ্রস্থ পরিবারের কাহিনী। দারিদ্র্য পীড়িত নায়ক দুঃখের সাগরে ভাসমান হলেও যে দুঃখ যেন অনেকটা উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত। 'কুহু' ছোটগল্পটি সুমথনাথের অনবদ্য সৃষ্টি। বয়েসে প্রবীণ পরমেশবাবু সূর্যালোকহীন জীর্ণ গলিতে আসন্ন বসন্তে কুহুধ্বনি শুনে কিভাবে তাঁর জীবনে বসন্তের সঞ্চার ঘটল তাঁর অনবদ্য কাহিনী। 'লেডিস সীট' ছোটগল্পটির আরেক নাম রূপ থেকে রূপে। একদিন সীতেশবাবু একটি ভিড় বাসে উঠে পড়েছেন। এক সুন্দরী যুবতী তাকে তার সীটের পাশে বসবার অনুরোধ জানায়। এই ঘটনায় সীতেশবাবু নিজেকে সুপুরুষ বলে বিবেচনা করে। তাঁর দৃষ্টিতে সহযাত্রিণী সুন্দরী যুবতী তার রূপে মুগ্ধ। বাস্তবে এক পানওয়ালা ও ভিখারি সীতেশবাবুকে বড়হাবাবু বলে সম্বোধন করায় তিনি বুঝতে পেলেন সম্ভবত সুদর্শনা যুবতীটি হয়ত বয়ঃবৃদ্ধ বলে তাকে তার পাশে বসবার আসন দিয়েছে। সুমথনাথ আলোচ্য গল্পে দেখাতে চেয়েছেন নারী ও পুরুষের অহঙ্কারের কোনো ভিত্তি নেই। 'দুর্জ্ঞেয়' ছোটগল্পটি পলাশ ফোটে এই নামে প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ। সতীনাথবাবুর অসুস্থ স্ত্রী মণিমালাকে সেবা করতো গরীব ভাড়াটের মেয়ে চপলা। সতীনাথ বাবু তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমের ভান করতো। অবচেতন মনে সে ভালোবেসেছিল কিশোরী চপলাকে। মণিমালার মৃত্যুর পর মহাধুমধামে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেছিল সতীনাথবাবু কিন্তু শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে চপলার অনুপস্থিতি তাকে ভাবিয়ে তোলে। চপলার গৃহে গিয়ে তার রোমান্টিক প্রেমানুরাগের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। পরিশেষে যেখানে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের প্যাণ্ডেল তৈরি হয়েছিল তিনমাস পর আবার যেখানে বিয়ের প্যাণ্ডেল নির্মিত হল। শ্রাদ্ধের কীর্তনীয়াদের পরিবর্তে সেখানে সানাই বাজলো। সুমথনাথ ঘোষকে প্রেম মনস্তত্ত্বের রূপকার বলে চিহ্নিত করা যায়।

'মরণের পরে' ছোটগল্পটি অতিলৌকিক। মরণোত্তর জীবনের কথা আলোচ্য গল্পের বিষয়। জীবিত ও মৃত এই দুয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের নিবিড় বন্ধনে ও আশাআকাঙ্ক্ষার বিচিত্র ঘটনা আলোচ্য গল্পের মূল উপজীব্য।

'ওখানে পদ্মা এখানে গঙ্গা' ছোটগল্পটি ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এপার বাংলার ওপার বাংলার রক্তাক্ত কাহিনী যেমন—আলোচ্য গল্পে চিত্রিত হয়েছে—অন্যদিকে দুই বাংলার সঙ্গে পারস্পরিক যোগসূত্র কতখানি তা বর্ণিত হয়েছে। নাটকীয় চমক সৃষ্টি

করে তিনি দুই বাংলার মানবিক চেতনাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

প্রমথনাথের ছোটগল্পেও সুমথনাথ ঘোষের মতোও বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের দুঃখ বেদনা আছে। 'গঙ্গার ইলিশ', 'মাধবী মাসী', 'পেশকার বাবু', গৃহিনী গৃহমুচ্ছ্যতে', 'অধ্যাপক রমাপতি বাঘ', 'শিবুর শিক্ষানবিশী', 'মোটরগাড়ি', 'সতীন', 'দর্জ্জি ও প্রেম', 'প্রত্যাবর্তন', 'অর্থপুস্তক', 'চাকরিরস্থান', 'গণক', 'টিউশন', 'গদাধর পণ্ডিত', 'কাঁচি' প্রভৃতি ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের দুঃখ ও বেদনা চিত্রিত হয়েছে।

প্রমথনাথ সুমথনাথের মতোও বেশ কিছু প্রেমের গল্প লিখেছেন। 'শকুন্তলা' গল্পে অতীশ ও মালতির প্রেম মিলনান্তক এবং 'সুতপা' গল্পে সুতপার ব্যর্থ প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এছাড়া 'উল্ট াগাড়ি', 'ছবি', 'অতিসাধারণ ঘটনা', 'চেতাবনী' প্রভৃতি গল্পে বেদনাহত নায়ক নায়িকার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে।

সুমথনাথ ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা বিষয়ক, কৌতুক রসযুক্ত, রঙ্গব্যঙ্গ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ছোটগল্প লেখেননি। কিন্তু প্রমথনাথ এই বিষয়গুলি নিয়ে অসংখ্য ছোটগল্প লিখেছেন।

অতিলৌকিক ছোটগল্প রচনাক্ষেত্রে সুমথনাথ সফল শিল্পী। তিনি যদিও সংখ্যাগত দিক থেকে খুব কম ছোটগল্প লিখেছেন কিন্তু তার এই ধরনের ছোটগল্প মৃত্যুর পরবর্তীকালীন জীবনের গল্প কাহিনী বিন্যাস, চরিত্রায়নের ভৌতিক পরিবেশ, সংলাপ ও নাট্যগুণে সমৃদ্ধ হয়েছে সন্দেহ নেই।

পাশাপাশি প্রমথনাথের অতিপ্রাকৃত রসাত্মক ছোটগল্প ভৌতিক পরিমন্ডল গড়ে তুললেও গল্পগুলি অনেকক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক হয়ে উঠেছে। প্রমথনাথের অতিলৌকিক ছোটগল্পের সংখ্যা সুমথনাথের চেয়ে অনেক বেশি। বলতে গেলে তাঁর প্রতিটি গল্প শিল্পসার্থক।

সুমথনাথের ছোটগল্পের চরিত্রগুলো প্রমথনাথের চরিত্রের মতোই জীবন্ত। চরিত্র চিত্রণের সময় মনস্তাত্ত্বিক রহস্য দু'জন ছোটগল্পকার উদ্‌ঘাটন করেছেন।

ভাষাগত বৈচিত্র্য দুই জনের ছোটগল্পে বর্তমান। বিশেষ করে প্রমথনাথ তাঁর ছোটগল্পে বর্ণনা অংশে সাধু গদ্যরীতি এবং সংলাপ অংশে চলিত গদ্যরীতির প্রয়োগ করেছেন। সুমথনাথ প্রমথনাথের মতো বর্ণনা অংশে সাধুরীতির প্রয়োগ করলেও তাঁর অনেক গল্পে চলিত ভাষার ব্যবহার রয়েছে। নিম্নে সুমথনাথের সাধু ভাষা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল "জীর্ণ গলির মধ্যে কুহুধ্বনি প্রবেশ করিয়া দীর্ঘ অনাবৃষ্টি পরে শহরে বৃষ্টি নামিয়া দারিদ্র্যজীর্ণ নরনারীর জীবনে অভাবিত রসের সঞ্চার করিয়াছে। মুহূর্ত পূর্বে তাহারাও রাখিত না মনের এই সংবাদ— লেখক চোখে কলম দিয়ে দেখাইয়া না দিলে পাঠকও কল্পনা করিতে পারিত না।"

পরিশেষে বলা যায় সুমথনাথ ঘোষ, প্রমথনাথ বিশী দু'জনে সমকালবর্তী সার্থক ছোটগল্পকার রচনাগত বৈচিত্র্য উভয়ের মধ্যে আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু দুইজনকে সমধর্মী লেখক বলা যায় না।

প্রমথনাথ বিশী ও সৈয়দ মুজতবা আলীর ছোটগল্পের তুলনামূলক পর্যালোচনা ঃ

প্রমথনাথ বিশী ও সৈয়দ মুজতবা আলী সমসাময়িক স্বনামধন্য দুই বিশিষ্ট সাহিত্যিক। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বহু ভাষাবিদ মুজতবা আলী রচিত ছোটগল্পের সঙ্গে প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পে সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য কতটুকু তা আমার আলোচ্য বিষয়।

প্রথমেই বলে রাখছি মুজতবা আলীর মতো বহু ভাষাবিদ হিসেবে প্রমথনাথের পরিচিতি খুবই গৌণ। মুজতবা আলী বাংলা, ইংরেজি, ইতালি, ফার্সি, হিন্দি, সংস্কৃত, রুশ, উর্দু, মারাঠী, গুজরাটি, আরবি, জার্মান প্রভৃতি আঠারোটি ভাষায় অভিজ্ঞ। মুজতবা আলীর ছোটগল্পের স্টাইল বা রচনাশৈলী প্রমথনাথের চেয়ে স্বতন্ত্র একথা বলা বাহুল্য। তাঁর ছোটগল্পের ভাষাভঙ্গি, উচ্চারণ, বানান, বাগ্ধারা, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আছড়ে পরে পাতায় পাতায়। তিনি পূর্ববঙ্গের বরিশাল, সিলেট, ঢাকা ও ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে সাধু ভাষার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। সেই সঙ্গে প্রচুর এপিটোন বা নতুন শব্দ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আরবি, ফারসি ও বিভিন্ন ভাষায় সমৃদ্ধ করে বাংলা ছোটগল্পের জগতে এক চমৎকারিত্ব এনে দিতে পেরেছেন। বলা বাহুল্য তাঁর বহু ছোটগল্পে মজলিসি ঢঙ্গের সমাবেশ ঘটেছে। তিনি প্রমথনাথের মতো ব্যঙ্গধর্মী ছোটগল্পকার নন। তাঁর ছোটগল্প পাঠ করে পাঠক মনে নির্মল হাসির উদ্ভব ঘটে। তিনি অত্যন্ত সাদামাটা কথায় বাগাড়ম্বরহীন ও অতিশয়োক্তিহীন যে ছোটগল্পগুলি আমাদের উপহার দিয়েছেন তা শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় বিশ্বসাহিত্যে স্থান পেতে পারে।

এবার আমরা মুজতবা আলী সৃষ্ট গল্প সম্ভারের সঙ্গে প্রমথনাথ বিশীর গল্প সংগ্রহের তুলনামূলক আলোচনার দিকে এগিয়ে যাব। 'চাচা কাহিনী', ও 'দ্বন্দ্ব মধুর' এই দুটি গল্পগ্রন্থ মুজতবা আলী আমাদের উপহার দিয়েছেন। তবে বেশ কিছু ছোটগল্প তাঁর অন্যান্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তাঁর প্রতিনিধি স্থানীয় চাচা কাহিনীর ছোটগল্পগ্রন্থে 'বেঁচে থাকো সর্দি কাশি', 'পুনশ্চ', 'পাদটীকা', 'রাক্ষসী', 'বিধবাবিবাহ', 'কাফে-দে-জেনি', 'বেলতলাতে দু'বার', 'তীর্থহীনা', 'মা-জননী', 'কর্ণেল', 'স্বয়ম্বরা', 'দ্বন্দ্বমধুর' প্রভৃতি গল্প রয়েছে। তাঁর পাঁচটি নিটোল ছোটগল্প হল 'বাঁশি', 'চাচা কাহিনী', 'মণি', 'নোনামাটি', 'নোনাজল'। এছাড়া 'কাইরো', 'সাবিত্রী', 'আধুনিকা', 'রসগোল্লা', 'ত্রিমূর্তি', 'দুহারা', 'গাঁজা' প্রভৃতি ছোটগল্প এবং তাঁর বড় মাপের গল্প 'টুনিমেম', বা 'একপুরুষ', বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তুলনামূলক বিচারে প্রমথনাথের তুলনায় মুজতবা আলীর গল্প সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। বিষয় বৈচিত্র্য প্রমথনাথের গল্পে মুজতবা আলীর তুলনায় বেশি। দু'জনেই অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

প্রমথনাথের ছোটগল্পে নতুন শব্দ বা এপিটোনের ব্যবহারে শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। যেমন ইড্রিমিড্রিভাব, দেখনহাসি, গণ্ডারমাসী, ছুটন, স্রকচন্দন, সদ্যপক্ষোদভিন্ন, তৌল প্রভৃতি।

তেমনি সৈয়দ মুজতবাও নতুন শব্দের প্রয়োগ করেছেন। যেমন গব্বযন্ত্রণা, উত্তমাঙ্গে, মাখার , ভাণ্ডচি, জান-বাঁচানেওয়ালী, তেড়িমেড়ি, খুদখেয়ালী, ঘড়াকেশ, গুলম্‌গীর প্রভৃতি।

পাশাপাশি প্রমথনাথের বিদেশী আরবি শব্দ আক্কেল, নবাব, মোক্ষম, নজর, কেচ্ছা, কিতাব, তাজ্জব। ফারসি শব্দ আন্দাজ, কুপন, কার্তুজ, চাপরাশি। তুর্কি শব্দ বাহাদুর, গালিপ, তকমা, উজবুক, আলখাল্লা। পর্তুগিজ শব্দ বরগা, কামিজ, নিলাম, গির্জা। ইংরেজি শব্দ শমন, টেরামাইসিন, জজ প্রভৃতি শব্দের সার্থক সংযোজনে ছোটগল্পগুলি রসগ্রাহী হতে পেরেছে।

মুজতবা আলীর ছোটগল্পে প্রকৃতির বর্ণনা প্রমথনাথের মতো ততটা কাব্যধর্মী নয়। তবে তাঁর প্রকৃতি বর্ণনা এসেছে স্বাভাবিক ভাবে উপমার সূত্র ধরে যেমন— "নর্থ সী দেখেছেন? তবে বুঝতেন হব হব সন্ধ্যায় তার জল কিরকম নীল হয়—তারই মতো সুন্দরীর চোখ। দক্ষিণ ইতালিতে কখনো গিয়েছেন? না? তবে বুঝতেন সেখানে সোনালী রোদে রূপালী প্রজাপতির কি রাগিনী। তারই মতো তাঁর ব্লন্ড চুল, ডানয়ুর নদী দেখেছেন? না। তা হলে আমার সব বর্ণনাই বৃথা। ওরকম বেয়ারিং পোষ্টের বর্ণনা দিতে আমার মন মানে না।"[৯৮]

নিম্নোক্ত প্রকৃতি বর্ণনাটি মুজতবা আলীর কলমে অনবদ্য হয়েছে ঃ

"দুদিকে পাহাড়, তার মাঝখানে দিয়ে সুন্দরী নেচে নেচে চলে যাবার সময় দুপাড়ে যেন দুখানা সবুজ শাড়ি শুকাবার জন্য বিছিয়ে দিয়েছেন, যে শাড়ি দুখানা আবার খাঁটি বেনারসী, হেথায় নীল সরোবর ঝলমলানি, যেন পাকা হাতের ছবির কাজ। মেঘলা দিনের আলোছায়া সবুজ শাড়িতে সাদা কালোর আল্পনা এঁকে দিচ্ছে আর তার ভিতর চাঁপা রঙের ট্রামের আসা যাওয়া।"[৯৯]

সৈয়দ মুজতবা আলীর উপমাগুলি সার্থক যেমন—

ক) "কুন্ডলী পাকানো গোখরে সাপ যে রকম হঠাৎ ফণা তুলে দাঁড়ায় মেয়েটা ঠিক সেই রকম বলে উঠলো, কী। সেই কাপুরুষ যে আমাকে অসহায় করে ছুটে পালালো। তাকে বিয়ে করে আমার বাচ্চাকে দেব সেই কাপুরুষকে, সেই পশুর নাম। তারপর দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললো।"[১০০] প্রেম ছোটগল্পে গল্পের নায়িকার সঙ্গে কুন্ডলী পাকানো বিষধর গোখরো সাপের ফণাকে তুলনা করা হয়েছে। গল্পের নায়িকার প্রতিবাদী চেতনা আলোচ্য উপমার মাধ্যমে লেখক উপস্থাপিত করেছেন।

খ) "নাৎসীদের তুলনায় ইংরেজ সম্বন্ধীরা ঘুঘু—ভারতবর্ষের পরাধীনতার সঙ্গে ব্যবহার করে যেন বাড়ীর ছোট বউ।"[১০১] 'বেলতলাতে দুবার' ছোটগল্পে পরাধীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে নাৎসীদের তুলনায় ইংরেজদের কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির তুলনাটি মুজতবা আলীর কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

গ) "একবার কথা বলতে আরম্ভ করলে চোখমুখ যেন নাচতে থাকে, ড্যাবডেবে পুকুরে ঢিল ছুড়লে যে রকম ধরা হয়। কারো কথা শোনার সময়ও এমন ভাবে তাকায়

যেন চোখ দিয়ে কথা গিলছে। তার উপর গানের ফোয়ারা তার ছিল অন্তহীন।"[১০২] 'মা জননী' ছোটগল্পে সিবিলার মাতৃত্বের আভাস বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর চোখ মুখের ভঙ্গিমার সঙ্গে পুকুরে ঢিল ছোড়ার তুলনাটি অনবদ্য হয়ে উঠেছে।

প্রমথনাথ বিশীর প্রকৃতি বর্ণনা ও উপমার ব্যবহার মুজতবা আলীর তুলনায় অনেক বেশি কাব্যধর্মী। নিম্নে দু-একটি প্রমথনাথের প্রকৃতি বর্ণনার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল :

"ঘনবদ্ধ শাল, মহুয়া, হরিতকির বনস্পতি মাটিতে শুকনো পাতার সুশ্রাব্য আস্তরণ বিছানো। পাতা ঝরা শাল গাছের ডালগুলো সারিসারি দন্ডায়মান। মহুয়ার গাছে অজস্র সাদাসাদা গোল গোল মহুয়ার ফুল শ্যামল পাতার ফাঁকে ফাঁকে বনদেবীর নোলকের স্থূল মুক্তার মতো বাতাসে দুলিতেছে। পাশেই ছোটে একটুখানি নদী জলের নীচের মাছগুলোর প্রত্যেকের গতিবিধি দেখা যায়। ওপারে পলাশের শিমুল বাজে বনের মধ্যে যতদূর দৃষ্টি চলে উইয়ের ঢিবির সারি। হরিতকির শাখায় শাখায় মধুর চাক।"[১০৩]

প্রমথনাথের শকুন্তলা ছোটগল্পের প্রকৃতি চেতনার অনবদ্য দৃষ্টান্ত—"তবে শাড়ির রাঙা পাড়ের রক্ত বেষ্টনী, তার খোপার রক্তকরবীর রক্তিম ঈক্ষণ, তাঁর লজ্জারুণ কপোলের ভাব বলাকা বিন্যাস, তার রক্ত অধরও চুম্বনের অর্ধস্ফুট কুঁড়িটি।"[১০৪]

প্রমথনাথের নিশীথিনী ছোটগল্পের নিসর্গ চেতনার উদাহরণ— "সুবর্ণরেখা গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্রের তুলনায় কৌলিন্য দীন হইলেও অস্তিত্বের দলিল তাহার অনেক বেশি পাকা।"[১০৫]

মুজতবা আলীর পুরুষ চরিত্রগুলি বহু মাত্রিক। অনেকক্ষেত্রে পুরুষ চরিত্রে পেরাডক্স বা বিরোধ বর্তমান। কর্ণেল, অস্কার, পন্ডিত প্রভৃতি পুরুষ চরিত্র লেখকের কলমে বেশ আন্তরিক হয়ে উঠেছে।

প্রমথনাথের বহু পুরুষ চরিত্র বহু মাত্রিক। বিপত্নীক ছোটগল্পে নিবারণ, 'টেনিস কোর্টের কাহিনী' ছোটগল্পের রজত, নাদির শার পরাজয় ছোটগল্পের নাদির শাহ। নানাসাহেব চরিত্র ও বাহাদুর শার বুলবুলি গল্পের বাহাদুর শা চরিত্রগুল বহুমাত্রিক।

সৈয়দ মুজতবার ছোটগল্পে প্রেমের চিত্র আছে। অনেক ক্ষেত্রে সেই প্রেমে বিচ্ছেদের সুর ব্যঞ্জিত হয়েছে—মণি, সাবিত্রী, সিবিলা, ডাক্তার, করীম, মহম্মদ, এভা, কর্ণেল, ভেরা. গ্রেটে, অস্কার, সুজন প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে নারী চরিত্রগুলো হয়ে উঠেছে প্রেমময়ী, জননী, রমণী, তথাকথিত সমাজ জীবনে নারীরা অনেকক্ষেত্রে সম্মানিতা আবার অনেক ক্ষেত্রে অবলুণ্ঠিতা। আবার পুরুষ চরিত্রগুলো আদর্শ প্রেমিক কিংবা ব্যর্থ প্রেমিক। তাঁর বহু পুরুষ ও নারী চরিত্র আশাভঙ্গের বেদনায় বিধবস্ত।

প্রমথনাথের ছোটগল্পের প্রেমের চিত্র আছে সুতপা, শকুন্তলা, স্টেশন মাস্টার, রত্নাকর, রুথ, অসমাপ্ত কাব্য, মহালগ্ন, যক্ষের প্রত্যাবর্তন, জেমি গ্রীনের আত্মকথা, ছায়া বাহিনী প্রভৃতি ছোটগল্পে রোমান্টিক প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে সেই প্রেম আশাভঙ্গের বেদনা বহন করেছে।

সৈয়দ মুজতবা আলীর বেশিরভাগ ছোটগল্প ঘটনা প্রধান। প্রমথনাথের ছোটগল্পে

চরিত্রই মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। ডঃ মনীষা রায় 'চাচা কাহিনী' প্রবন্ধে মুজতবা আলীর ঘটনা প্রধান গল্পের বিষয় তুলে ধরেছেন নিম্নোক্তভাবে—

"নিশার প্যারিসের ছবি কাফে-দে-জেনিতে বরোদার মহারাজ তৃতীয় সয়াজী রাওয়ের একটি সরস স্মৃতি 'বিধবাবিবাহ', পার্সীদের টাওয়া অব সাইলেন্সের একটি কাহিনী 'রাক্ষসী', নোনাজল গল্প এক খালাসীর পারিবারিক কাহিনী, 'চাচা কাহিনী' বার্লিনের এক নিমন্ত্রণের আসরে এক ভৌতিক পোশাকের উপদ্রবের ঘটনা। বেঁচে থাকো সর্দি-কাশি' কাহিনী জার্মানির—লেখকের সর্দি—কাশির সূত্রে এক ডাক্তারের পূর্বরাগ ও বিবাহের কৌতুকাদির স্নিগ্ধ ছবি। তাদের পুর্বরাগের পালা প্রেমিকের প্রবল হাঁচির দাপটে সব বাঁধা টপকে হাজির হয়েছিল বিবাহের দরজায়। সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও 'নেড়ে' গল্প নয় গল্পরেখা। কলকাতাগামী চাঁদপুর স্টিমারে মৌখিক প্রগতিশীল এক দম্পতির জাতপাত মুক্ত সংস্কারের কাহিনী। 'বাঁশি' ও 'গল্প নয়' শান্তিনিকেতনে ঝড়ের মাঝে নাজেহাল লেখকের অমূলক ভয়ের কৌতুক ঘটনা, পরিবেশ নৈপুণ্যে রসরচনা হয়ে উঠেছে।"[১০৬]

প্রমথনাথ শিক্ষা বিষয়ক, রাজনীতি বিষয়ক, ধর্ম ও দেবদেবী বিষয়ক, সাহিত্য ও সম্পাদনা বিষয়ক, সামাজিক কুসংস্কার ও অনাচার বিষয়ক ছোটগল্পগুলি লিখেছেন তা মূলত রঙ্গব্যঙ্গধর্মী। এছাড়া সাহিত্য, পুরাণ, ইতিহাস, কৌতুকরস, অতিপ্রাকৃত ও জীবনবোধ প্রমথনাথের ছোটগল্পের মূল বিষয়।

তুলনামূলক ভাবে বলা যায় মুজতবা আলীর ছোটগল্পে স্বদেশের ও বিদেশের বহু বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে। সেখানে প্রমথনাথের ছোটগল্প মূলত স্বদেশী ঘটনা কেন্দ্রিক।

মুজতবা আলীর গল্পের সময়কাল সুদূর অতীত নয় বর্তমানকে আশ্রয় করেই গল্পের পরিসমাপ্তি। পাশাপাশি প্রমথনাথ বর্তমানকে আশ্রয় করে প্রচুর ছোটগল্পে লিখেছেন। তাঁর ছোটগল্পে অতীতচারিতার নিদর্শন মেলে। দুই জনেই আড্ডাধর্মী ও মজলিসি ছোটগল্প লিখেছেন। বলা বাহুল্য এই দিক থেকে দুইজন সাহিত্যিক সমধর্মী সন্দেহ নেই। দুইজনেই ফ্ল্যাশ ব্যাক রীতিতে বহু ছোটগল্প লিখেছেন। প্রমথনাথের ছোটগল্পে গতি অনেকটা ঋজুরেখ কিন্তু মুজতবা আলীর ছোটগল্পে গতি বক্ররেখ। গঠন প্রণালী অনেকটা পিরামিড সাদৃশ্য। প্রমথনাথের ছোটগল্পের ক্লাইমেক্স মুজতবা আলীর মতো বৈচিত্র্যময় এবং দুইজনের গল্পের প্রারম্ভ অংশের বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়। বর্ণনাভঙ্গি যতটা মুজতবা আলীর ছোটগল্পে আগোছাল ভাবে উপস্থিত হয়েছে সেখানে প্রমথনাথের বর্ণনা ভঙ্গি অনেকটা গোছানো।

পরিশেষে বলা যায় সৈয়দ মুজতবা আলীর ছোটগল্পগুলি গঠন, ভাষা, বিষয়, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংলাপ নৈপুণ্য বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভুবন গড়ে তুললেও তাঁর উত্তরসূরী অনেকটাই নেই বললেই চলে। বলা বাহুল্য মুজতবা আলীর ছোটগল্পগুলি প্রমথনাথের মতো কালজয়ী হতে পারেনি। তাঁর আধুনিক ছোটগল্পকারদের কাছে তাদের ভাবধারা হয়তো বা নতুন রাজপথ তৈরি করতে পারেননি তবুও গল্পগুলোর সাহিত্য মূল্য উপেক্ষিত নয়।

উল্লেখপঞ্জী

(১) পরশুরাম গল্পসমগ—আলোচনা অংশ—পৃঃ ২
(২) বাংলা গল্প বিচিত্রা—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—পৃঃ ৯৭
(৩) বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—প ৩৮৮
(৪) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ৩৭২
(৫) পরশুরামের গল্প সমগ্র—মহেশের মহাযাত্রা—পৃঃ ৭২
(৬) পরশুরামের গল্প সমগ্র—বিরিঞ্চিবাবা—পৃঃ ৪৮
(৭) প্রমথনাথ বিশীর গল্প সমগ্র—ভেজিটেবল বোম—পৃঃ ৭৯
(৮) প্রমথনাথ বিশীর গল্প সমগ্র—ভূতের গল্প—পৃঃ ১২৬
(৯) পরশুরামের গল্প সমগ্র—ষষ্ঠীর কৃপা—পৃঃ ৯৫
(১০) পরশুরামের গল্প সমগ্র—অক্রুর সংবাদ—পৃঃ ১২০
(১১) পরশুরামের গল্প সমগ্র—লম্বকর্ণ—পৃঃ ১২০
(১২) পরশুরামের গল্প সমগ্র—শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড—পৃঃ ১৭৮
(১৩) অনেক আগে অনেক দূরে—পরী—পৃঃ ১৪২
(১৪) প্রমথনাথ বিশীর গল্প সমগ্র—সুতপা—পৃঃ ২০৪
(১৫) গালি ও গল্প—সত্য মিথ্যা কথা—পৃঃ ৬৭
(১৬) পরশুরামের গল্প সমগ্র—বিরিঞ্চিবাবা—পৃঃ ৪৯
(১৭) পরশুরামের গল্প সমগ্র—চমৎকুমারী—পৃঃ ১০৮
(১৮) যা হলে হতে পারত—কুন্দনন্দিনীর বিষপান—পৃঃ ১৩০
(১৯) গল্প পঞ্চাশৎ—চাচাতুয়া—পৃঃ ৪৩
(২০) পরশুরামের গল্পসমগ্র—উদ্ভব ও স্পন্দ ছন্দা—পৃঃ ৫৭
(২১) পরশুরামের গল্প সমগ্র—ভুষন্ডীর মাঠে—পৃঃ ৮৭
(২২) সরস গল্প—শারদীয়—পৃঃ ৬৫
(২৩) বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প—বসন্ত—পৃঃ ৩০৫
(২৪) বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প—কুইট ইন্ডিয়া—পৃঃ ৯৫
(২৫) চাপাটি ও পদ্ম—গুলাব সিং এর পিস্তল—পৃঃ ১৮৮
(২৬) চাপাটি ও পদ্ম—রক্তের জের—পৃঃ ২০৩
(২৭) চাপাটি ও পদ্ম—রুথ—পৃঃ ২০৯
(২৮) গল্পসমগ্র প্রমথনাথ বিশী—এক গজ মার্কিন ও এক চামচ চা—পৃঃ ৯৮
(২৯) গল্প পঞ্চাশৎ—নগেন হাঁড়ির ঢোল—পৃঃ ১৩০
(৩০) শরদিন্দুর অমনিবাস—স্বাধীনতার রস—পৃঃ ২৮৬
(৩১) শরদিন্দুর অমনিবাস—চুয়াচন্দন—পৃঃ ২৮৬
(৩২) ভাঙা কাচের শিল্প—বাংলা ছোটগল্পের শিল্পীদল —পৃঃ ৫৯
(৩৩) কালের পুত্তলিকা-বাংলা ছোটগল্পের ১০০ বছর - অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—পৃঃ ১৯৭
(৩৪) প্রমথনাথ বিশীর স্বনির্বাচিত গল্প—(মহেঞ্জোদড়োর পতন)—পৃঃ ৬৪
(৩৫) প্রমথনাথ বিশীর স্বনির্বাচিত গল্প—অসমাপ্ত কাব্য—পৃঃ ২৭

(৩৬) প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প—হয়তো—পৃঃ ১১৪
(৩৭) গল্প পঞ্চাশৎ—গন্ডার—পৃঃ ৪১১
(৩৮) শত গল্প সংকলন—ভূমিকা অংশ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—পৃঃ ৫
(৩৯) বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার—ভূদেব চৌধুরী—পৃঃ ৫১৯
(৪০) পত্রিকা ভারতী —পৌষ ১৩৩০ সাল
(৪১) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্প সমগ্র—আলতার দাগ—পৃঃ ৩৮১
(৪২) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্প সমগ্র—ডাকাত—পৃঃ ৩১১
(৪৩) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্প সমগ্র—ডাকাত—পৃঃ ৩১৩
(৪৪) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্প সমগ্র—সারেঙ—পৃঃ ১১১
(৪৫) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্প সমগ্র—ওষুধ—পৃঃ ৯০
(৪৬) গল্প পঞ্চাশৎ—চোখে আঙুল দাদা—পৃঃ ২৫১
(৪৭) গালি ও গল্প—সাগরিকা—পৃঃ ১২০
(৪৮) বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার—ভূদেব চৌধুরী—পৃঃ ৪৯২
(৪৯) ছোটগল্প সংগ্রহ—প্রমথনাথ বিশী—স্বপ্নাদ্য কাহিনী—পৃঃ ৩৪৩
(৫০) বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্প—সবিতা দেবী—পৃঃ ২৭০
(৫১) বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্প—এমিলিয়ার প্রেম—পৃঃ ১৯৫
(৫২) বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্প—একটি সকাল একটি সন্ধ্যা—পৃঃ ২২৪
(৫৩) বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্প—একটি লাল গোলাপ—পৃঃ ২৩৬
(৫৪) অনেক আগে অনেক দূরে—বাহাদুর শার বুলবুলি—পৃঃ ২০৮
(৫৫) গল্প সংগ্রহ—প্রমথনাথ বিশী—অবচেতন—পৃঃ ৮
(৫৬) গল্প সংগ্রহ—প্রমথনাথ বিশী—মহালগ্ন—পৃঃ ১২৮
(৫৭) বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার—ভূদেব চৌধুরী—পৃঃ ৫১৩
(৫৮) বিভূতিভূষণ গল্প সমগ্র—তালনবমী—পৃঃ ২৮৫
(৫৯) বিভূতিভূষণ গল্প সমগ্র—পুঁইমাচা—পৃঃ ২৮৮
(৬০) সাহিত্যের কথা—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ১৬২
(৬১) গীতবিতান—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পৃঃ ৬০
(৬২) বিভূতিভূষণ—দ্বন্দ্বের বিন্যাস—ভূমিকা অংশ — রুশতি সেন—পৃঃ ৫
(৬৩) বিভূতিভূষণ গল্প সমগ্র—১ম খন্ড—ছোটনাগপুরের জঙ্গলে—পৃঃ ৪৭৬
(৬৪) অপ্রকাশিত দিনলিপি—২৯ মে ১৯৩৪—পৃঃ ২৩৭
(৬৫) বিভূতিভূষণ গল্প সমগ্র—কুশল পাহাড়ী—পৃঃ ৩০৯
(৬৬) বিভূতি পরিচয়— ১ম খন্ড—মোহাম্মদ আবু জাফর—পৃঃ ৮১
(৬৭) বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্প—ভূমিকা অংশ—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৭
(৬৮) বিভূতিভূষণ—মন ও শিল্প—গোপিকানাথ চৌধুরী—পৃঃ ৫২
(৬৯) বিভূতিভূষণ—চিত্তরঞ্জন ঘোষ—পৃঃ ৫২
(৭০) বিভূতিভূষণ গল্প সমগ্র—পুঁইমাচা—পৃঃ ২৮৯
(৭১) গল্পপঞ্চাশৎ—অসমাপ্ত কাব্য—পৃঃ ১৮

(৭২) নীরস গল্প সঞ্চয়ন—মহেঞ্জোদড়োর পতন—পৃঃ ৬০
(৭৩) গল্প সমগ্র—প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১১৩
(৭৪) বিভূতিভূষণ গল্প সমগ্র—১ম খন্ড—ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল—পৃঃ ৫৮২
(৭৫) বিভূতিভূষণ গল্প সমগ্র—১ম খন্ড—নগুমামা ও আমি—পৃঃ ৪১০
(৭৬) গল্প পঞ্চাশৎ —আধ্যাত্মিক ধোপা—পৃঃ ১৯০
(৭৭) তারাশংকরের গল্পগুচ্ছ—২য় খন্ড—না—পৃঃ ৬৪২
(৭৮) তারাশংকরের গল্পগুচ্ছ—১ম খন্ড—ডাইনী—পৃঃ ২৫৫
(৭৯) তারাশংকরের গল্পগুচ্ছ—২য় খন্ড—রসকলি—পৃঃ ৪৯১
(৮০) তারাশংকরের গল্পগুচ্ছ—১ম খন্ড—অগ্রদানী—পৃঃ ২০৩
(৮১) তারাশংকরের গল্পগুচ্ছ—২য় খন্ড—শেষকথা—পৃঃ ৩৭৫
(৮২) তারাশংকরের শ্রেষ্ঠগল্প—বেদেনী—পৃঃ ১০৫
(৮৩) তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প—জলসাঘর—পৃঃ২২
(৮৪) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প—মেজাজ—পৃঃ ৮৯
(৮৫) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সংগ্রহ—বাগদী পাড়া দিয়ে—পৃঃ ১৫২
(৮৬) বৌ গল্প সংকলন—কুষ্ঠরোগীর বৌ—পৃঃ ১৪৫
(৮৭) রসকলি—তাসের ঘর—পৃঃ ৯২
(৮৮) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সংগ্রহ—বাগদীপাড়া দিয়ে—পৃঃ ১৫৪
(৮৯) স্বনির্বাচিত গল্প—ফেরিওয়ালা—পৃঃ ৩২
(৯০) আজকাল পরশুর গল্প—ধর্ম—পৃঃ ১৭৫
(৯১) ছোট বড় গল্প—ঢেউ—পৃঃ ২২৯
(৯২) গল্পসমগ্র—প্রমথনাথ বিশী—উতঙ্ক—পৃঃ ৮৯
(৯৩) গল্প পঞ্চাশৎ—সিন্ধবাদের অষ্টম সমুদ্র যাত্রার কাহিনী—পৃঃ ১২৩
(৯৪) গল্পসমগ্র—প্র.না.বি.র সঙ্গে ইন্টারভিউ —পৃঃ ১০২
(৯৫) গল্প শিল্পী গজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রবন্ধে, কথা সাহিত্য, কার্তিক ১৩৮২, অক্টোবর, ১৯৭৬, সংখ্যায় প্রকাশিত গল্প সংকলন, কথা কল্পনা কাহিনী, প্রথম পর্যায় ফাল্গুন ১৩৪৮
(৯৬) গল্প শিল্পী গজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রবন্ধ, কথা সাহিত্য কার্তিক ১৩৮২, সংখ্যায় প্রকাশিত, গল্প সংকলন কথা প্রথম পর্যায়, ফাল্গুন ৩ পুনঃ মুদ্রিত
(৯৭) কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের ১০০ বছর — অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—পৃঃ ৩০৪
(৯৮) চাচা কাহিনী—বেঁচে থাকো সর্দ্দিকাশি—পৃঃ ১৭৫
(৯৯) চাচা কাহিনী—তীর্থহীনা—পৃঃ ১৯৫
(১০০) দ্বন্দ্ব মধুর—প্রেম—পৃঃ ৮৯
(১০১) চাচা কাহিনী—বেলতলাতে দুবার—পৃঃ ৯৭
(১০২) চাচা কাহিনী—মা জননী—পৃঃ ১৬৭
(১০৩) গল্প পঞ্চাশৎ—নীলমণির স্বর্গ—পৃঃ ২২৫
(১০৪) গল্পসমগ্র—প্রমথনাথ বিশী—শকুন্তলা—পৃঃ ২৫
(১০৫) গল্প পঞ্চাশৎ—নিশীথিনী—পৃঃ ১৭২
(১০৬) ভাঙা কাঁচের শিল্প—প্রবন্ধ স্বস্তি মন্ডল—পৃ ৬৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঃ উপসংহার ঃ

প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পের মূল্যায়ন

প্রথমনাথ বিশী বাংলা কথাসাহিত্যের এক অনন্য সাধারণ শিল্পী, বাংলা ছোটগল্পের এক সার্থক রূপকার। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা ছোটগল্পের যথার্থ শিল্পী হিসেবে যাঁরা তাঁদের নিজস্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন এবং বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করেছেন প্রমথনাথ বিশী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ছোটগল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচনে দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্বে, গঠন কৌশলে, ছোটগল্পের চরিত্র নির্মাণে, বিচিত্র উপাদানের ব্যবহারে ও ভাষার সৌকর্যে সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যে প্রমথনাথ একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে ছোটগল্পকার প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পের প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে বিষয়বস্তু, আঙ্গিক ও প্রকরণ, তুলনার আলোকে প্রমথনাথের ছোটগল্পকার হিসেবে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় আমরা পেয়েছি। সেই সঙ্গে তাঁর মননের দিগন্ত নিয়ে বিশ্লেষণে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত তিনি কতটা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি সাধন করেছেন সেই প্রসঙ্গেও আমরা স্বরাজ্যে স্বরাট প্রমথনাথ বিশীর যথাযথ মূল্যায়ন করেছি। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ছোটগল্প রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করে তিনি আমাদের দিয়েছেন বঙ্গদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, অতিলৌকিক ও পৌরাণিক বিভিন্ন উপাদানকে। তাঁর লেখায় শুধু ব্যক্তি নয়, সমাজ নয়, স্বদেশ কিংবা বিদেশ নয় তিনি ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের যোগসূত্র স্থাপন করে ও সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। আমরা তাঁর ছোটগল্পে তাঁকে সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করি সমাজ সচেতন শিল্পী হিসেবে। জীবনবাদী লেখক হয়ে তিনি জীবন থেকে দূরে সরে থাকেননি। সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, হাসি, কান্না ভরা জীবনকে ভালোবেসে সমাজের নানা স্তরের নর-নারীদের রূপ চিত্রণ করে তিনি সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেছেন। জগৎ ও জীবনকে তিনি দেখেছেন এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে। ধূসর অতীত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত একটা গভীর যোগসূত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির আলোচনার সূত্র অনুসরণে শেষ অধ্যায় 'উপসংহার' এ পৌঁছে আলোচ্য লেখকের ছোটগল্প সম্পর্কে মূল্যায়ন করা হবে। বলা বাহুল্য এই আলোচনায় একদিকে থাকবে ছোটগল্পধারায় প্রমথনাথের স্থান নিরূপণ, অন্যদিকে লেখক হিসেবে প্রমথনাথের বিশিষ্ট জীবনাদর্শের প্রতিফলন হিসেবে তাঁর সৃষ্টির শিল্পগত বিচার বিশ্লেষণ। মূল্যায়নের শুরুতে প্রমথনাথের লেখা প্রতিনিধিস্থানীয় ছোটগল্পগুলির স্থান, সমস্যা, প্রধান অভিঘাত ও কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে যাতে গল্পগুলির প্রকৃত স্বরূপ আমরা একনজরে উপলব্ধি করতে পারি।

ছোটগল্প	স্থান	সমস্যা	কেন্দ্রীয় চরিত্র	প্রধান অভিঘাত
ছিন্নদলিল	কানপুর	সিপাহি বিদ্রোহকালীন	মুখুজ্জে ইংরেজ কর্মচারীর সক্রিয়তা	সিপাহি ফৌজ বনাম ইংরেজফৌজ
গুলাব সিং এর পিস্তর	গুজরাণপুর, কানপুর	রহস্যময় পিস্তল	গুলাব সিং	অতিপ্রাকৃতের বিশ্বাসযোগ্যতা
ছায়াবাহিনী	লক্ষ্ণৌ, কানপুর, মিলনগঞ্জ	পাথরের রহস্য	অঞ্জন তেওয়ারী মিঞাগঞ্জের ভবিষ্যৎ বক্তা বৃদ্ধ	লেঃ রবার্টস, ক্যাপ্টেন ওয়াটসন ও অঞ্জন তেওয়ারীর সঙ্গে সিপাহীদের অশ্ববাহিনীর সংঘর্ষ
মড়	মীরাট, লক্ষ্ণৌ সীসাপুর	আধিপত্যের লড়াই	মাদলিন, ওয়াজেদ	কোম্পানি ফৌজ বনাম ভারতীয় সিপাহি
কথা	কানপুর	সিপাহি বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে প্রেমঘটিত	মিস্ মটিনডেল ও মনসুর	মনস্তাত্ত্বিক
নানাসাহেব	কানপুর	সিপাহি বিদ্রোহোত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা	নানাসাহেব, কাশীবাঈ	ফেরার নানাসাহেবের সঙ্গে কাশীবাঈ ও জুবেদি বিবির অধিকার সংক্রান্ত
রক্তের জের	ঝান্সী শহর, কানপুর	লঘুপাপে গুরুদণ্ড	মেজর আলী	মজর আলী বনাম মেজর নীল
ডাকিনী	হলদে কলসি গ্রাম	দাম্পত্য ডাইনি অপবাদ	নায়ক শশাঙ্ক, নায়িকা মল্লিকা	সামাজিক কুসংস্কার ও রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি
ভাঁড়ু দত্ত	দামুন্যা	উৎকোচ তত্ত্ব	ভাঁড়ু দত্ত	পরিবর্তনশীল সমাজ কিন্তু অপরিবর্তিত চরিত্র
উল্টা গাড়ি	পশ্চিমের ছোট্ট রেলস্টেশন	মনস্তাত্ত্বিক	গল্পকথক, নায়িকা মঞ্জুলা	অতীত স্মৃতি চারণের মধ্য দিয়ে বর্তমানের অনুষঙ্গ
দ্বিতীয় পক্ষ	পশ্চিমের এক শহর	স্বপ্নে নিশি পাওয়া	নায়ক অন্নদাপ্রসাদ নায়িকা নীলিমা	প্রথম পক্ষের বিবাহিত স্ত্রীর প্রসঙ্গ গোপন
মাধবী মাসী	কোন এক মেয়েদের বোর্ডিং	বৈধব্য জীবনের যন্ত্রণা	মাধবী ও বিনতা	মনস্তাত্ত্বিক
গঙ্গার ইলিশ	কলকাতা শহর	আর্থ সামাজিক	জুট মিলের অধ্যাপক	অর্থনৈতিক অসঙ্গতির জন্য গৃহিনীর সঙ্গে বিরোধ
নগেন হাঁড়ির ঢোল	জোড়াদীঘি	অবক্ষয়িত জমিদারি ব্যবস্থা	নগেন হাঁড়ি	সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ইংরেজ শক্তির বিরোধ

ছোটগল্প	স্থান	সমস্যা	কেন্দ্রীয় চরিত্র	প্রধান অভিঘাত
শকুন্তলা	জোড়ামউ	সফল প্রেম	নায়ক অতীশ নায়িকা মালতী	প্রাক্‌বিবাহিত ও বিবাহোত্তর প্রেম
অতি সাধা-রণ ঘটনা	কলকাতা	দাম্পত্য প্রেমে ব্যর্থতা	নায়ক অমিত নায়িকা শমিতা	সংক্রামক যক্ষা রোগী অমিত ও শমিতার বৈধব্য
সুতপা	কলকাতা	ত্রিভুজ প্রেম	সুতপা রমা মিহির	মনস্তাত্ত্বিক
অসমাপ্ত কাব্য	উজ্জয়িনী	কাব্য সমাপ্তিতে অনাগ্রহ	কালিদাস	রাজরুচি বনাম সাহিত্যাদর্শ
যক্ষের প্রত্যাবর্তন	রামগিরি	নির্বাসন যন্ত্রণা	কালিদাস	মেঘদূতম্ লেখায় কবির মনোভূমির প্রাধান্য
নিচ্চধনের পরীক্ষা	খুল্লবিহার	নিচ্চধনের আত্মার উন্নতি ও যুগের প্রসারে ঈর্ষা	নিচ্চধন	বৌদ্ধপুরাণের শয়তান মার বনাম বুদ্ধের শরণাগত নিচ্চধন
খুল্লবিহার	খুল্লবিহার	বিহার নির্মাণে মারের বাধা	নিচ্চধন	নিচ্চধনের খুল্লবিহার নির্মাণে তার চিরশত্রু মারের (শয়তানের) ষড়যন্ত্র
রক্তাতঙ্ক	ছাত্রী নিবাস	রাজনৈতিক মতাদর্শ	প্রতিমা	ইংরেজদের জমিদারি বাজেয়াপ্ত
দৃষ্টিভেদ	গৌড়ীয় উন্মাদাগার	রাজনৈতিক	ক্ষেমেশ ও পরমেশ	মানসিক
যার যেথা স্থান	পূর্ব রেলপথের হাওড়া অফিস	কালের পরি-বর্তনে গ্রামীণ জীবন বিপন্ন	নিরাপদবাবু	আদর্শবাদ ও বাস্তববাদ
এক টিন খাঁটি ঘি	পটলডাঙার মেস	অর্থনৈতিক	হরিহর	ভেজাল ব্যবসায়ী বনাম কলকাতার নাগরিক রণেশ-বাবু ও সুরেশ্বরবাবু
ছাপ সন্দেশ	কলকাতা শহর	নৃশংসতা ও অর্থলোলুপতা	রমেশবাবু	কুটুম্বিতার ব্যর্থ প্রচেষ্টা
দর্জ্জি ও প্রেম	কলকাতা শহর	প্রেমে সাম্যস্থাপন	হানিফ মিঞা, প্রমিতা	প্রেম মনস্তত্ত্ব
প্রত্যাবর্তন	মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ডোঙার গড় ও কলকাতা শহর	অসফল প্রেম	নায়ক নিবারণবাবু নায়িকা তুলসী	প্রেম মনস্তত্ত্ব

ছোটগল্প	স্থান	সমস্যা	কেন্দ্রীয় চরিত্র	প্রধান অভিঘাত
পশু শিক্ষালয়	দেশপ্রিয় পার্ক	রাজনৈতিক অস্থির-তায় বিপর্যস্ত অর্থনীতি	হরিবাবু	সরকারি উদাসীনতা
উঠতি গুন্ডা	কলকাতার বিদ্যালয় ও হ্যারিসন রোডের চৌ মোড়	- পুলিশের সন্দেহ	উঠতি চারজন সাহিত্যিক	সাহিত্যিকদের অধিকার বনাম প্রশাসনিক দৌরাত্ম্য
গদাধর পণ্ডিত	জোড়াদীঘি গ্রাম	শিক্ষায় সরকারি উদাসীনতা	গদাধর ও নরেশচন্দ্র	পাঠশালার শিক্ষকদের চরম দুর্দশা
পেশকার বাবু	আদালত	আদালতের পেশকার রতনমণির পেনসনের পরও আদালতের প্রতি মোহ	রতনমণি বাবু	বাঙালি জজের নির্মম আচরণে মানসিক আঘাতে পেশকার রতনমনি বাবুর মৃত্যু
সেই সন্ন্যা-সীটির কি হইল	কপিলাবস্তু ও শ্রাবস্তীপুর	ভোগী ব্যক্তির সন্ন্যাসী হবার আকাঙ্ক্ষার পরিণাম	সন্ন্যাসী	ত্যাগ ও ভোগের দ্বন্দ্ব
ভৌতিক চক্ষু	ইংল্যান্ডের বার্ক শায়ার, সদ্য কল কাতা, মিলক্ষপ নামে বার্কশায়া রের ছোট্ট গ্রাম	মৃত খুনীর চোখ সোফিয়ার চোখে স্থানান্তর	ফস্টার, সোফিয়া, ডঃ মেরিগোল্ড	পৈশাচিক আত্মার প্রভাবে সোফিয়ার বামচক্ষু বিদ্ধ করে মৃত
পাশের বাড়ী	সাঁওতাল পরগনা ছোটনাগপুর অঞ্চল	রহস্যময়তা	প্রফুল্ল, নগেন, গীতীশ	অতিপ্রাকৃত জগৎ ও বাস্তব জগতের দ্বন্দ্ব
সাহিত্যে তেজিমন্দি	কলকাতা	পত্রিকা সম্পাদকের পক্ষপাতিত্ব	অনিরুদ্ধ সেন	পাঠক ও পত্রিকা সম্পাদকের জীবন-দর্শনের বৈপরীত্য
সংস্কৃতি	দক্ষিণ কলকাতা কালীঘাট লালদীঘি	সদস্য পদ গ্রহণে আগ্রহী ট্রামে যাত্রীরা ও প্রকাশ্যে দুজন কর্ম-কর্তার নির্লজ্জপনা	সম্পাদক ও সভাপতি	সংস্কৃতি সমিতির প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারির আমরণ দুর্নীতি
থার্মোমিটার	কলকাতা শহর	বিকল থার্মোমিটার	যদুবাবু	ডাক্তার ও রোগী
রামায়ণের নূতন ভাষ্য	কোনো এক শহর	আস্তিক্যবাদী ও নাস্তিক্যবাদী	অভিরাম	অর্থনৈতিক
অলঙ্কার	শ্বশুরগৃহ	অলঙ্কারে আসক্তি	যমুনা	অলঙ্কার প্রীতি বনাম পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ

ছোটগল্প	স্থান	সমস্যা	কেন্দ্রীয় চরিত্র	প্রধান অভিঘাত
অদৃষ্ট সুখী	কোনো একটি দেশ	অন্ধত্বের সুখ ও দুঃখ	অদৃষ্টসুখী	মনস্তাত্ত্বিক
রাজা কি রাখাল	বাহাদুরগড়	সুখ ও দুঃখ	বাদশা আলমগীর	বুড়ী ও বাদশা
পরী	শহর শাজাহানাবাদ	অবক্ষয়িত মোঘল যুগের বেগমদের দুরবস্থা	বড়ে মিএগ্রা	আর্থ সামাজিক
দর্শনী	লালকেল্লার তিরপলিয়া কারাকক্ষ	প্রেমঘটিত	ফারুকশিয়ার ও জুলেখা	প্রেমের অনুষঙ্গে স্বাভাবিক জীবন থেকে উন্মাদ রূপান্তর
আগম্-ই-গন্না-বেগম্	গোয়ালিয়ারের সন্নিকটে নুরাবাদ ও ফরাক্কাবাদ	ব্যর্থ প্রেম	গন্না বেগম্ ও আব্দুস সামাদ	অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার নির্দেশে বেগম্ থেকে বাঁদি হয়ে বিষপানে গন্নাবেগমে্র মৃত্যু
তিন হাসি	দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, অযোধ্যা	পাখির হাসিতে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের গতি নির্ণয়	কাকাতুয়া পাখি	সিদ্ধান্ত নির্ধারণে কাকাতুয়ার ভূমিকা
মহালগ্ন	তক্ষশিলা	আগ্রাসীনীতি	সেকেন্দর শা	ভারতীয়দের সঙ্গে গ্রিক সেনা বাহিনীর যুদ্ধ
ধনেপাতা	কাশ্মীরের অন্তর্গত শ্রীনগর শহরের চক	শিক্ষা সম্পর্কিত	নরেন্দ্র ও বীরেন্দ্র	গৌড়বাসী বিদ্যার্থী ও কাশ্মীরী বিদ্যার্থীদের শিক্ষা বিষয়ক
নাদির শার পরাজয়	শাজাহানাবাদ শহর	আধিপত্যের লড়াই	নাদির শা	বাদশাহি ফৌজের নাদির শার বিরুদ্ধে লড়াই
চোখে আঙুল দাদা	জম্বুদ্বীপ	নির্বুদ্ধিতা	বিধাতা পুরুষ ও চোখে আঙুল দাদা	উচ্চাকাঙ্ক্ষা
লবঙ্গীয় উন্মাদাগার	লবঙ্গদেশ	মস্তিষ্ক বিকৃতি	সকল শর্মা	রাজনির্দেশে উন্মাদ আগারে প্রাচীর ভাঙ্গার প্রসঙ্গ
মানুষের গল্প	হরিণঘাটা	বাঙালি চরিত্রের বিশ্লেষণ	কর্তা	ভৌতিক রহস্য
শিখ	আকন্দপুর ও মুকুন্দপুর গ্রাম	সাম্প্রদায়িকতা-বাদ	ছদ্মবেশী শিখ	প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ
অধ্যাপক রমাপতি বাঘ	সুন্দরবন	শিক্ষার ত্রুটি	অধ্যাপক রমাপতি বাঘ	অর্থনৈতিক
শিবুর শিক্ষানবিশী	কালিকাপুর	পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি	শিবু	বাঙালি বিদ্বেষ

ছোটগল্প	স্থান	সমস্যা	কেন্দ্রীয় চরিত্র	প্রধান অভিঘাত
ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র	সুন্দরবন	রাজনৈতিক	বিপুলক্ষুদা ও বহুক্ষুদা	ধর্মনিরপেক্ষতার নামে প্রহসন
নীলমণির স্বর্গলাভ	সাঁওতাল পরগনার জয়ন্তী নদীর ধার	বন্য প্রাণীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থা	নীলমণি নামে ভাল্লুক	বন্ধন থেকে মুক্তি
বাঁশ ও কঞ্চি	গ্রামীণ পরিবেশ	সামন্ত্রতান্ত্রিক বিপর্যয়	রমেশ ও তারাচরণ বাবু	জমিদার ও নায়েবের সম্পর্ক
ন-ন-লৌ-ব-লি	স্বর্গের নন্দনবন	ঘুষ	যুধিষ্ঠির, বুদ্ধ ও যীশুখ্রিষ্ট	সৎ ও অসৎ
প্র-না-বির-সঙ্গে ইন্টা-রভিউ	সাঁওতাল পরগনা	ব্যক্তি স্বরূপ বিশ্লেষণ	প্র-না-বি ও আমেরিকান বন্ধু	তর্ক বিতর্ক
টেনিস কোর্টের কান্ড	কলকাতা	প্রেম	রজতরঞ্জন ও শ্রীমতি রেবা রায়	মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব
জেমি গ্রীনের আত্মকথা	লক্ষ্ণৌ,কানপুর, মীরাট, বেরিলি, রোহিলাখন্ড	সিপাহি বিদ্রোহ	জেমি গ্রীন, নেপিয়ার	ইংরেজ শক্তির সঙ্গে সিপাহির যুদ্ধ
কোকিল	এলাহাবাদ	কোকিলের কুহুস্বর	প্যালিসার, বিউল	মনস্তাত্ত্বিক
মৌলাবক্স	শাহজাহানা-বাদের বাদশার পিলখানা	বাদশাহি বিপর্যয়	মৌলাবক্স নামে একটি হাতি ও হেড মাহুত করিম খাঁ	মৌলবক্সকে বিক্রয় সংবাদে অন্তর্দ্বন্দ্ব
বাহাদুর শার বুলবুলি	শাহজাহানা-বাদ	মোঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়	বুলবুলি পাখি ও বাহাদুর শা	কোম্পানির সৈন্যদের কামানের আওয়াজ শুনে বুলবুলি পাখি ও বাদশার অন্তর্দ্বন্দ্ব
চেতাবনী	জোড়াদীঘি গ্রাম	আসন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়	বিনুনী	শ্রীদাম ও বিনুনীর বৈবাহিক সম্পর্ক
ঘোগ	লবঙ্গ দেশ	ধনী ও দরিদ্রের সম্বন্ধ	ঘোগ	বুদ্ধিমান ও নির্বোধের দ্বন্দ্ব
অথ কৃষ্ণার্জুন সংবাদ	ক্লাইভ স্ট্রিট	চোরাবাজারী	অর্জুন ও কৃষ্ণ	দুর্নীতির বিরুদ্ধাচরণ
গাধার আত্মকথা	রজকালয়	মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ঐক্য	রামু	শিক্ষক জীবন বনাম গর্দভ জীবন

ছোটগল্প	স্থান	সমস্যা	কেন্দ্রীয় চরিত্র	প্রধান অভিঘাত
দুঃশাসনের শাস্তি	ইন্দ্রপস্থ	স্ত্রী ও পুরুষগণের বিপদ মুক্তি	পলামাসী	নারীর সতীত্ব বিষয়ক
মানুষের গল্প	হরিণঘাটা	মধ্যবিত্ত ভূত বনাম সাধারণ ভূত	পিতা মাতা	বাঙালি সম্পর্কে ভীতি
অটোগ্রাফ	স্বর্গধাম	সৃষ্টি সম্পর্কিত	ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র	মর্ত্যধামের সঙ্গে স্বর্গধামের শান্তির প্রসঙ্গ
চিত্রগুপ্তের অ্যাড্‌ভেঞ্চার	বঙ্গদেশ	বঙ্গদেশের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি	চিত্রগুপ্ত	বঙ্গজাতির নীতি জ্ঞান বনাম স্বর্গের ন্যায় ও ধর্ম
উতঙ্ক	কলকাতা	কলেজের ছাত্রদের ঔদ্ধত্য	উতঙ্ক	শিক্ষার ত্রুটি
গণক	কলকাতা	পরীক্ষার খাতার নম্বর দানে পরীক্ষকের উদাসীন দৃষ্টি	জনৈক পরীক্ষার খাতার নম্বরের গণক	কর্তব্য জ্ঞানের অভাব
অর্থপুস্তক	কলকাতা	বিদ্যার্থীদের মৌলিক ভাবনার অভাব	প্রকাশক	অর্থের প্রলোভন
সরল থিসিস রচনা প্রণালি	কলকাতা	ফুটনোট সম্পর্কিত	রামতনু	সরস ও নীরস রচনা সম্পর্কিত

প্রমথনাথের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এবার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে ঃ

বাংলা সাহিত্যের ত্রৈলোক্যনাথের সময় থেকে যে হাস্যরসের ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছিল সেই ধারাকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন অশোক চট্টোপাধ্যায়, বনফুল, পরিমল গোস্বামী, সজনীকান্ত, রবীন্দ্র মিত্র, পরশুরাম, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধায় ও শিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীর দল। 'শনিবারের চিঠি' অবলম্বনে বিভিন্ন সাহিত্যিকের লেখনীতে বহু সিরিয়াস রচনা প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষত ব্যঙ্গ পরিহাস মূলক যে সাহিত্যগুলো রচিত হয়েছিল কালের বিচারে সেগুলি পাঠক মহলে বিশেষ ভাবে নাড়া দিয়েছিল। বলা বাহুল্য কালজয়ী ব্যঙ্গ পরিহাস রস সৃষ্টি করে অফুরন্ত বৈচিত্র্য নিয়ে তাঁদের আবির্ভাব, তাঁর মধ্যে হাসির গল্প রচনার ক্ষেত্রে তাঁদের সম্মানীয়তা আজও অবিসংবাদিত।

প্রমথনাথ বিশী শনিবারের চিঠির হাসির গল্পের আসরে অবতীর্ণ হয়ে সাহিত্য কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র কর্মা বিস্ময়। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির সর্বস্তরে তিনি বিরাজিত। সেই সঙ্গে সকল মঠে তাঁর সুদৃঢ় অধিষ্ঠান। নতুন কথামালার গল্প নিয়ে তাঁর প্রথম আবির্ভাব। মূলত বিষ্ণুশর্মা ছদ্মনাম নিয়ে ব্যঙ্গ পরিহাস রসিক নতুন কথামালায় গল্প তিনি লিখেছেন। আবার কখনও তিনি লিখেছেন তিব্বতি বাবা, শ্রীনীলকণ্ঠ শর্মা কখনও বা মনজুয়ান এর কবি স্কট টমসন ছদ্মনামে। শনিবারের

চিঠি, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক আনন্দবাজার, কথাসাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ। ব্যঙ্গ মিশ্রিত হাস্যরস, নির্মল হাস্যরস, ভদ্র হাস্যরস, সংযত হাস্যরস, কারুণ্য সুক্ত হাস্যরস, বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস, নির্মল কৌতুক রস বা বাগ বৈদগ্ধ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সব্যসাচী লেখক প্রমথনাথ বিশীর সাহিত্যে। সমকালীন সমাজ জীবনের নানা প্রতিকূল অবস্থা জীবন সংগ্রামে বিধ্বস্ত ও ক্ষত বিক্ষত মানুষ অনেকটা হয়ে পড়েছে যান্ত্রিক। অফুরন্ত হাসির ঝর্ণা ধারা থেকে তারা বঞ্চিত, এই সব প্রসন্ন হাসি মিলিয়ে গেছে তাদের মন থেকে। সতত গম্ভীর ও বিষাদগ্রস্ত মানুষের মুখে ও মনে আনন্দ ও হাসি বলে কিছু নেই। প্রমথনাথের ভাষায়—"প্রবাহিত নদীতেই ফেনা দেখা যায়—হাসি তো জীবন স্রোতের ফেনা। আজ জীবন স্রোত শুষ্কপ্রায়—হাসি কেমন করিয়া সম্ভব।—বর্তমান যুগে হাসি জমিয়া শ্লেষ হইয়া গিয়াছে, বর্তমান যুগ Humour-এর নয়—এ যুগটা Wit-এর অনুকূল। আমরা যদি এযুগে Humour-এর সন্ধান করি, নিরাশ হইব। যদি Wit-এর সন্ধান করি, প্রচুর পাইব। যে যুগের যে নৈবেদ্য। — Humour-এর মূলে করুণা, Wit-এর মূলে বুদ্ধি, একটির আবেদন পাঠকের হৃদয়ে, অপরটির আবেদন পাঠকের মস্তিষ্কে, একটি হাসিতে হাসিতে কাঁদায়, অপরটি হাসিতে হাসিতে ভাবায়।—এ যুগে প্রাণখোলা হাসি নাই বলিয়া যদি মন উজ্জ্বল করা হাসিকেও প্রত্যাখান করি তবে নির্বুদ্ধিতায় প্রশ্রয় দেওয়া হইবে।"[১]

পরিমল গোস্বামীর মতে—"আমাদের জীবনে হাসির উপকরণ নানাবিধ—প্রধানত মানুষের জীবনে অসঙ্গতির যে একটা দিক আছে, সেইটিকে একটু বাড়িয়ে দেখলেই আমরা সাধারণত হাসি।"[২]

প্রমথনাথ বিশী উইট ও স্যাটায়ার ধর্মী লিখেছেন অনেক। এই পর্যায়ের ছোটগল্প রচনায় তাঁর নৈপুণ্য প্রশংসার দাবি রাখে। তাঁর নূতন কথামালার গল্পগুলি উইট ও স্যাটায়ারধর্মী। এছাড়া শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব, শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব, গল্পের মত, গালি ও গল্প, ডাকিনী, ব্রহ্মার হাসি, সমুচিত শিক্ষা প্রভৃতি গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি উইট ও স্যাটায়ার প্রধান। এ ধরনের ব্যঙ্গগল্প রচনায় প্রমথনাথের সাফল্য অনস্বীকার্য। সমাজজীবনের যা বিকৃত তাকে অবিকৃত করে সাহিত্যে পরিবেশন করার মধ্যেই প্রমথনাথের সাফল্যের পরিচয় মেলে। ভূদেব চৌধুরী হাস্যরসিক প্রমথনাথ বিশীর যে মূল্যায়নটি করেছেন এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য:— "প্রমথনাথ বিশীর ব্যঙ্গ গল্পের তীক্ষ্ণধার খড়গাঘাতে ভূতলশায়ী হয়ে পড়েও আতঙ্কিত মনে চমকে উঠে ভাবতে হয়, যত জোরে যতটুকু আঘাত লাগবার কথা ছিল, তা যেন লাগেনি! এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার ব্যঙ্গহত মনেও কৌতুকানুভবের এক মৃদু পরিতৃপ্তি সঞ্চারিত করে দেয়। এটুকু জীবন-প্রেমে কৌতুক-স্মিত প্রমথনাথ বিশীর অনন্য দান। ফলকথা, তাঁর হৃদয়ানুভবস্নিগ্ধ রচনার অন্তরালে ও খরবুদ্ধি কৌতুক—রসিকের খুশির লঘু আমেজ জড়িয়ে থাকে, ব্যঙ্গ রচনার অন্তর্লীন হয়ে থাকে জীবন—প্রিয় শিল্পীমানসের গোপন চিত্ত স্পর্শ। অর্থাৎ সৃষ্টির গহনে বসে প্রমথনাথ বিশী নিজের অজ্ঞাতেই যেন স্মিত হাসি হাসেন, আবার প্রমথনাথ বিশীর হৃদয় বিদারণ (?) হাসির

অন্তরালে সহৃদয় হৃদয়ভাবাতুর প্রমথনাথ বিশী নিজের ডান হাতের আঘাত বাঁ-হাত পেতে গ্রহণ করেন।"[৩] সার্থক স্যাটায়ারধর্মী ছোটগল্পকার প্রমথনাথ সত্য ও সুন্দরের পূজারী। তাঁর ব্রত ছিল মানুষের অহেতুক আস্ফালনকে ব্যঙ্গ বাণে আহত করে তার পরিমার্জিত ও সংশোধিত রূপ দেয়া। এই উদ্দেশ্য তখনই সার্থক হয় যখন উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সাময়িক আহত হয়েও সরস হাসির প্রাণোচ্ছলতায় পরিপুষ্ট হয়। প্রমথনাথের শ্লেষ মিছরির ছুরির মতো মানুষকে আহত করে ও আনন্দিত করে। তাঁর শ্লেষ বাস্তবধর্মী এর মধ্যে তাঁর মনন, চিন্তন সমৃদ্ধ ভাষা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য—

"তাঁহার সমস্ত রচনার মধ্যে ব্যঙ্গ গুণটিই প্রবল ও প্রকট। সে ব্যঙ্গ কোথাও তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী—যাহার উদ্দেশ্য বর্ষিত হয় তাহার চর্ম ভেদ করিয়া মর্মে প্রবেশ করিয়া দাহ সৃষ্টি করে—আবার কোথাও তাহা শুধুই নির্মল কৌতুকে স্নিগ্ধ, কিছুকালের জন্য পাঠকচিত্তে একপ্রকার অনাবিল হাস্যরসের সঞ্চার করিয়া আনন্দধারায় সিক্ত ও প্রসন্ন করিয়া তোলে। এগুণ তাঁহার ছোটগল্পগুলির মধ্যেই অধিকতর লক্ষণীয়। তাই বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধ ছোটগল্পের রাজ্যে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।"[৪]

সৃজনশীল শ্লেষ ও মনস্বিতার পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে প্রমথনাথের ছোটগল্পে। তাঁর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ নির্মম মনে হলেও তার মধ্যে স্থান পরিগ্রহ করে আছে এক পরিশীলিত যুক্তিবাদী মন। এই যুক্তিবাদ সমাজহিতৈষী মনোভাবে বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। সমাজ জীবনের সর্বত্র অন্যায় ও অসঙ্গতির বিরুদ্ধে তাঁর কশাঘাত। বিদ্রূপের আড়ালে তিনি যে একজন ভবিষ্যদ্বক্তা তা হয়তো বুঝে নিতে আমাদের কষ্ট হয় না।

প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক সুবোধ ঘোষ প্রমথনাথকে বিদগ্ধ রসিক মনস্বী আখ্যা দিয়ে যে মূল্যবান মন্তব্যটি করেছেন তা এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—

"বর্তমান বাংলায় শিক্ষিত সাধারণ সকলেরই কাছে একটি পরিচিত নাম শ্রী প্রমথনাথ বিশী। বলাবাহুল্য প্রমথনাথের মনস্বীতার উজ্জ্বল প্রদীপটি বিশেষ কোনো একটি প্রকোষ্ঠের সম্পদ নয়। তাঁর প্রতিভার রশ্মি সাহিত্যের সকল ঘর আলোকিত করেছে—দেখে খুশি হয়েছি তাঁর লেখনীর শক্তির সামান্য আঘাতে মতবাদের ঔদ্ধত্য, মিথ্যা কাব্যিকতাও আর্তনাদ করে। যে শ্লেষ অপূর্ব বস্তুনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা তিনি তাই মহৎ অধিকার লাভ করে সাহিত্যের একটি মহৎ রূপনা সম্ভব করেছেন।"[৫]

প্রমথনাথ শুধু বিভিন্নপ্রকার হাস্যরস পরিবেশন করেই থেমে থাকেন নি। হাস্যরসের একটি তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেই সঙ্গে নান্দনিক তাৎপর্য আবিষ্কার প্রমথ প্রতিভার উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

প্রমথনাথের ব্যঙ্গ গল্পগুলির কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। 'শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্বের' গল্পগুলি বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত ছোটগল্প যার মধ্যে দীপ্ত উইট ও শাণিত স্যাটায়ার প্রধান। প্রমথনাথ শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর রোমান্টিক ভালবাসাতে ব্যঙ্গের বোমা ফাটিয়ে চমকে দিলেন। শ্রীকান্ত কিভাবে বই লিখে দু-পয়সা করেছে ইন্দ্রনাথের এই

প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকান্ত জানিয়েছে—"উদরের মধ্য দিয়ে বাঙালির কাদায় প্রবেশের পথ আবিষ্কারের গৌরব আমার।"৬ নায়ক নায়িকার প্রেমের সঙ্গে যে ঔদরিক প্রেমের প্রশ্ন জড়িত এবং তার মধ্যে দিয়ে হৃদয়বৃত্তি জাগ্রত হয় শ্রীকান্তের এই তাৎপর্যপূর্ণ উক্তিটি প্রশংসার দাবি রাখে।

প্রমথনাথের ব্যঙ্গধর্মী একটি শ্রেষ্ঠ গল্প 'গদাধর পণ্ডিত'। প্রমথনাথ অধ্যাপনার বৃত্তি ছেড়ে যখন সাংবাদিকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সেই সময় শিক্ষা আর শিক্ষকতার অসংগতিকে ব্যঙ্গ কটাক্ষ করে 'গদাধর পণ্ডিত' ছোটগল্প রচনা করেন। গল্পটিতে একদিকে আছে হাস্যরসের প্রবাহ, অন্যদিকে আছে গভীর যন্ত্রণাবোধ। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শশার মাচায় যোগ বিয়োগ শেখানো, মুদির দোকান করা, পাঠশালার একপাশে গরুর গোয়াল থাকায় নরেশ যখন গদাধর পণ্ডিতের চাকরিনাশের জন্য পাঠশালা পরিদর্শকের নিকটপত্র লেখে অন্যদিকে চার টাকা মাস মাইনা তাঁর আবার বছরে এগার মাস বাকি। সেক্ষেত্রে দেশের জাতি গঠনে আশা কতটুকু করা যায়। গদাধর পণ্ডিতের গৃহে কোনো এক রবিবার বেলা দুটোয় নরেশ পৌঁছে তাকে ডাকাডাকি করলে পণ্ডিত ঘর থেকে বেরিয়ে না আসায় উত্তেজিত হয় নরেশ চন্দ্র।

অসহায় পণ্ডিত বলে "ডাক শুনেছি হুজুর, কিন্তু বাইরে যাবার উপায় নেই!" অপমানিত বোধ করিয়া নরেশ বলিল—কেন? গদাধর বলিল—'আমরা স্ত্রী পুরুষে নল-দয়মন্তীর পালা অভিনয় করছি।' নরেশ কিছুই বুঝতে না পারিয়ে বলিল 'ঠাট্টা করবার আর লোক পেলেন না?'

"—সর্বনাশ! হুজুরের সঙ্গে কি ঠাট্টা করতে পারি। —হুজুর স্ত্রী পুরুষ মিলে আমাদের দু'খানা বস্ত্র, দু'খানাই ধুতি। একখানা আমি পরি, একখানা আমার সহধর্মিণী পরে। পরতে পরতে যখন খুব ময়লা হয়, তখন কেচে নিতে হয়, রবিবারটা ছুটি আজ একখানি কেচে শুকোতে দিয়েছি। যতক্ষণ না শুকোচ্ছে আমরা স্ত্রী পুরুষ একখানা ধুতির দুইদিক জড়িয়ে ঘরে বন্ধ হয়ে থাকি। এ সেই নলদয়মন্তীর কথা আর কি? ভাগ্যিস পুরাণে এই গল্পটা ছিল—নইলে কি যে করতাম হুজুর! এই বলিয়া সে খুব একটা সপ্রতিভের হাসি হাসিল। নরেশ হাসিবে কি কাঁদিবে স্থির করিতে না পারিয়া প্রস্থান করিল। '

চাকরি চলে গেলে নরেশ অনুতপ্ত ও মর্মাহত হয়। এমন কি সমাজসেবার মহান ব্রত নিয়ে যে নরেশের আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁর মোহপাশ মুক্ত হয়। সেই রাতেই সে চাকরিতে ইস্তফা দেয়। আর কখনও সে উন্নতি করবার চেষ্টা করেন নি। এখন যে সিভিল সাপ্লাই এর কাজ করে মোটা বেতন। আলোচ্য গল্পে বঙ্গদেশের প্রাথমিক শিক্ষার উদাসীনতা সেই সঙ্গে শিক্ষক সমাজের বঞ্চনা ও অবহেলার করুণ চিত্র ব্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। প্রমথনাথ বিশী সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে এক প্রশ্ন রেখেছেন—

"যে দেশের পাঠশালার পণ্ডিত চাকুরি গেলে খুশি হয় অপরের পাচক বৃত্তিকে শ্রেয় মনে করে, মনে করে এবারে তাহার সাংসারিক উন্নতি হইবে—সে দেশের কি আর ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু আছে?"৮

'গাধার আত্মহত্যা' ছোটগল্পে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের শিক্ষক সমাজকে লেখক গাধার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কখনও গাধাটি সার্থক শিক্ষাদানের জন্য অভিনন্দিত হয়। গল্পটিতে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কটাক্ষ বর্ষিত হয়েছে। 'অধ্যাপক রমাপতি বাঘ' ছোটগল্পে প্রমথনাথ বেসরকারি কলেজে শিক্ষকদের নিয়ে তীক্ষ্ণ পরিহাস করেছেন।

গল্পে ব্যঙ্গরস আছে। শিক্ষা জীবনে অনিবার্য বিপর্যয়ের ফলে রমাপতি সুন্দরবনে প্রাণ ভয়ে ছুটে আসে, সন্ন্যাসী তাকে সঠিক পথ দেখায় এবং তৎক্ষণাৎ সে সন্ন্যাসীকে সংহার করে রক্ত পান করে। শিক্ষার প্রসারতা ও নানা ত্রুটি বিচ্যুতি দেখে লেখক বিচলিত হয়েছেন। তীক্ষ্ণ শ্লেষে তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করে তিনি বাঙালির চোখে আঙ্গুল দিয়ে এই সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ করেছেন।

'শিবুর শিক্ষানবিশী' ছোটগল্পে প্রমথনাথ ছদ্মবেশী ছাত্র সমাজের শূন্য গর্ভ আস্ফালনের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেছেন। বাঙালি ছাত্রদের অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন আলোচ্য ছোটগল্পে। 'গঙ্গার ইলিশ' ছোটগল্পটিকে ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ হলাহল নেই। আছে নির্মল কৌতুক রস, ভোজন রসিক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের অন্তঃসারশূন্যতার বিষয় আছে এই গল্পটিতে, সেই সঙ্গে বাঙালি শিক্ষকদের দুরবস্থার প্রতি প্রমথনাথ অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। গল্পে গঙ্গার ইলিশের স্বাদ পাঠকরা রসনাতেও না পেলেও কল্পনা জগতে স্বাদ পেয়েছে।

'একটি ঠোঁটের ইতিহাস' ছোটগল্পে আকাট মন্ডলকে তাঁর বাঁকা ঠোঁটের জন্য বিভিন্ন স্থানে গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। বাঁকা ঠোঁট যুক্ত আকাট মন্ডলের মৃত্যুর পর তার সমাধি নির্মাণ করে হাসিয়া বাবার মাঠ নাম দিয়েছে। স্বর্গে গিয়ে সে তার ফল থেকে তো বঞ্চিত হল, কিন্তু বিধাতা তাকে নতুন ভাবে গড়ে তুললেন। প্রমথনাথ কতটা রঙ্গরসিক তাঁর দৃষ্টান্ত হল 'প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে কথোপকথন' ছোটগল্পে এই গল্পে দ্বৈত ভূমিকায় লেখক অবর্তীর্ণ। লেখক স্বয়ং রসিকতা করে বলেছেন—

"এ বড় মন্দ মজা নয়। আমরা দুজনে ভিন্নলোক—অথচ বাঙালি পাঠক কিছুতেই তা স্বীকার করবে না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এমন কেন হয়? তিনি বলিলেন—এটা মানসিক আলস্য ছাড়া আর কিছু নয়।"[১]

'প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে ইন্টারভিউ' ছোটগল্পে লেখকের ধারণা হয়েছে সম্ভবত লোকটি কবি কিংবা পাগল নতুবা বিদূষক। আসলে এই তিনের সমন্বয় না হলে জীবন শিল্পী হতে পারা যায় না।

'কাঙালী ভোজন' ছোটগল্পে প্রমথনাথ বিশী রঙ্গব্যঙ্গ সমভাবে দেখিয়েছে। ভিক্ষুক সমস্যা সমাধান কল্পে রেস্টুরেন্টে ভিক্ষুকের মাংস ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য সমস্যার সমাধানের কথা গল্পটিতে বলা হয়েছে।

'সদা সত্য কথা কহিবে' ছোটগল্পটি রঙ্গব্যঙ্গধর্মী। রামতনুর সত্য কথা বলতে গিয়ে জেলে যাওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। জেল থেকে বেরিয়েও আসবার পরেও সে যখন সত্যকে বেছে নিল তখন ছেলেদের ঢিল, যুবকদের ঠাট্টা, বৃদ্ধের পাগল অপবাদ তাকে

সহ্য করতে হয়েছে। বুর্জোয়ার দৃষ্টিতে লোকটি কমিউনিস্ট। কমিউনিস্টদের মতে লোকটি বুর্জোয়া। কংগ্রেসের মতে লোকটি ঘুষখোর। ব্যবসায়ীদের মতে লোকটি বেকারি, জার্নালিস্টরা ভাবেন লোকটা পরশ্রীকাতর, শ্রমিকরা ভাবেন লোকটা শিল্পপতি, শিল্পপতিরা ভাবেন লোকটা শ্রমিক। এভাবে সে লাঞ্ছনা সহ্য করতে করতে একদিন মৃত্যুকে বেছে নিল। মৃত্যুর পর তাঁকে অশ্বচক্রে পরিভ্রমণ করতে হল, এই মিথ্যাপীড়িত সমাজ জীবনে সত্যবাদীদের বঞ্চনা সহ্য করতে হয়।

'চিত্রগুপ্তের রিপোর্ট' ছোটগল্পটি ব্যঙ্গধর্মী হলেও উজ্জ্বল হাসির মূর্তি গড়ে উঠেছে। ব্রহ্মা ও চিত্রগুপ্ত দুই জনের সংলাপে পৃথিবীতে মানুষ আছে কিনা এই প্রশ্ন আলোচ্য গল্পের মূল প্রতিপাদ্য। চিত্রগুপ্ত সরেজমিনের তদন্ত করে দেখল কেউ বামপন্থী, কেউ দক্ষিণপন্থী, কেউ শ্রমিক, কেউ বুর্জোয়া, কেউ সোসালিস্ট, কেউ বা জার্নালিস্ট, রিপোর্টার, ফুটবলার, কেউ বা সুইমার, কেউ ফিল্মস্টার। চিত্রগুপ্ত এর পর এক চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করে দেখল সেখানে শুধু জন্তু জানোয়ার, এই জানোয়াররা কেউ নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দেয়নি। গল্পটি প্রমথনাথের সার্থক সৃষ্টি।

'ভাঁড়ু দত্ত' ছোটগল্পটি ব্যঙ্গধর্মী, গল্পে মকরধ্বজী হাসির উল্লেখ আছে। একদিন ভাঁড়ু দত্তের সঙ্গে লেখকের পথে দেখা। লেখক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—

"কি মন্ডল কোথায় গিয়েছিলে, বাজারে নাকি? সে একমাত্রা মকরধ্বজী হাসি হাসিল। মকরধ্বজী হাসি কি? সর্ববিধ দাবির সর্বজনীন উত্তর আছে সেই হাসিতে। এই হাসি দেখিয়া পাওনাদার ভাবে এবারে পাঠ উঠিলেই টাকা পাওয়া যাইবে, দেনাদার ভাবে শীঘ্র আর সুদের তাড়া আসিবে না। জমিদার ভাবে খাজনা মিলিল, প্রজা ভাবে খাজনা মাফ। কিন্তু কাহারো আশা সফল হয় না, অথচ সকলে খুশি হয়। এ হাসি এমন জিনিস। তেমন করিয়া হাসিতে জানিলে জীবনের অনেক সমস্যা সরল হইয়া যায়।"[১০] সমাজ জীবনের এরূপ ভাঁড়ু দত্তের মতো চরিত্রের অভাব নেই। গল্পকার ভাঁড়ু দত্তের ব্যবসায়ী সুলভ মানসিকতা বর্তমান যুগে নতুন ভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

প্রমথনাথ বিশীর ব্যঙ্গ ও কৌতুকরস যুক্ত ছোটগল্পের সংখ্যা নেহাত কম নয়। 'সিন্দুক'. 'রাঘববোয়াল', 'তিমিঙ্গিল', 'চোখে আঙ্গুল দাদা' প্রভৃতি ছোটগল্পের পরিসমাপ্তি ঘটেছে পরিহাসপ্রিয়তায় ও ব্যঙ্গ তীর্যক রীতিতে। আত্মসমালোচনায় ব্যঙ্গ পরিহাসে লেখক কতটা অনন্যসাধারণ এই গল্পগুলি পাঠ করে আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি। হাস্যরসের উজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রমথনাথের ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তিনি একজন জাত হিউমারিস্ট। উইট ও স্যাটায়ারধর্মী ছোটগল্পে প্রমথনাথের নৈপুণ্য সর্বজনবিদিত একথা হয়তো বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্যঙ্গধর্মী ছোটগল্পধারায় তার যে একটা বিশেষ স্থান আছে একথা আমরা নির্দ্বিধায় মেনে নিতে পারি। এই ধারার ছোটগল্প রচনায় প্রমথনাথ বিশী যে সুপ্রতিষ্ঠিত এতে কোনো সন্দেহ নেই।

তবে প্রমথনাথের ছোটগল্পের লঘু হাস্য পরিহাস প্রবণতা কোনো কোনো গল্পের শিল্প সিদ্ধির স্তরে পৌঁছাতে পারেনি, অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে যে কৌতুক

রস সঞ্চারিত হয়েছে তা অনেকটা উপভোগ্য ও পাঠক মনে সাময়িক রস সৃষ্টির উপকরণ হলেও কাহিনীর বৃত্ত গঠনে ও সংহতি সৃষ্টির পরিপন্থী হয়ে উঠেছে। আপাত ত্রুটি থাকলেও গল্পগুলিকে নিকৃষ্ট মানের বলা যায় না।

গল্পকার প্রমথনাথ বিশীর ইতিহাস চেতনা ছিল গভীর, বিশেষ করে ইতিহাসাশ্রিত গল্প রচনা প্রমথনাথের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ তাঁর অন্যান্য শ্রেণিভুক্ত গল্প রচনার ক্ষেত্রে তিনি যতটা সফল ছোটগল্পকার হিসাবে পরিচিত হয়েছেন তার মধ্যে তাঁর ঐতিহাসিক ছোটগল্পগুলোর শিল্পমূল্য সবচেয়ে বেশি।

বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ উপকরণ হল ইতিহাস রস পরিবেশন। ইতিহাসের মৃত ঘটনাকে জীবন্ত করে মানব রসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করবার দক্ষতা প্রমথনাথ বিশীর ছিল। ভারত ইতিহাসের প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনাধারা অবলম্বনে প্রমথনাথ যে ছোটগল্পগুলি আমাদের উপহার দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। প্রাচীন ইতিহাস ও সিপাহি বিদ্রোহের পটভূমিকায় লেখা ছোটগল্প সেই সঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের উপাদানকে নিয়ে ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনার মণিকাঞ্চন যোগে সৃষ্টি করেছেন অজস্র ছোটগল্প।

ঐতিহাসিক কাহিনী কখনও দূর অতীতের জীবন অবলম্বনে কখনও উত্তেজনা মুখর নিকট অতীতের চমকপ্রদ কাহিনী অবলম্বনে যে সব ছোট গল্পকার বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁরা হলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বসু ও গজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রমুখ ছোটগল্পকার।

রবীন্দ্রনাথ যদিও ঐতিহাসিক ছোট গল্পের প্রথম বীজ রোপন করেছিলেন 'দালিয়া' ছোটগল্প রচনা করে। ইতিহাসের ক্ষীণ ধারা অনুসরণে রচিত হলেও আলোচ্য ছোটগল্পটি ইতিহাসের রহস্যালোকে প্রবেশ করে রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিকতার আমদানি করেছেন। তাঁর এই অতীত ঐতিহ্য প্রীতি মানব জীবন রসযুক্ত সন্দেহ নেই।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে সার্থক ঐতিহাসিক ছোটগল্পকার। মোট সতেরোটি ঐতিহাসিক গল্প রচনা করে তিনি পাঠক মহলে বিশেষ সাড়া জাগাতে পেরেছেন। ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গে কাল্পনিক ও ঐতিহাসিক চরিত্র সৃষ্টি করে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে বিশেষ পরিচিত হয়েছেন। ইতিহাসের কঙ্কালে এক সুদূরপ্রসারী কল্পনার জাল বিস্তার করে প্রাণের সঞ্চার ঘটানো একজন বিশিষ্ট শিল্পীর কাজ। বলাবাহুল্য শরদিন্দু হলেন এদিক থেকে একজন সফল শিল্পী। তাঁর উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ছোটগল্প 'মৃৎশিল্পী' 'রক্তসন্ধ্যা', 'চুয়াচন্দন', 'তক্তমুবারক', 'শঙ্খকঙ্কণ', 'রেবারেধসি', 'বাঘের বাচ্চা', 'অষ্টম স্বর্গ', 'প্রাগ্ জ্যোতিষ', 'ইন্দ্রতুলক', 'আদিম', 'চন্দনমূর্তি', 'মরু ও সঙঘ' প্রভৃতি ছোটগল্প শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাস চেতনার স্বাক্ষরবাহী। পাশাপাশি মনোজ বসু বাংলা সাহিত্যের একজন ঐতিহাসিক ছোটগল্পকার। তাঁর 'বনমর্মর', 'রায় রায়ানের দেউল ছোটগল্পগুলি ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্টিক ছোটগল্পের সার্থক নিদর্শন।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র কিছু প্রথম শ্রেণির ঐতিহাসিক ছোটগল্প লিখেছেন, তার মধ্যে

বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে 'মুখুজ্জে মশাই', 'একরাত্রি', 'থেমে যাওয়া সময়' প্রভৃতি। পাশাপাশি প্রমথনাথ বিশী যে ঐতিহাসিক ছোটগল্পগুলি রচনার ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন সেই গল্পগ্রন্থগুলি যথাক্রমে 'ধনেপাতা' (১৩৫৭), এই গল্পগ্রন্থের প্রধান উপাদান মূলত প্রাচীন ইতিহাস এছাড়া সিপাহি বিদ্রোহের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রমথনাথের শ্রেষ্ঠ নিবেদন 'চাপাটি ও পদ্ম' (১৩৫২) মূলত এর কাল হল অনতিদূর। আবার দূর অতীত ও নিকট অতীত এই দুই কালের ঘটনাধারা অবলম্বনে প্রমথনাথের 'অনেক আগে অনেক দূরে' গল্প গ্রন্থ সৃষ্টি যার প্রকাশকাল (১৩৬৭)। সমসাময়িক ঐতিহাসিক ছোটগল্পকারদের কাউকেই প্রমথনাথ বিশী অনুসরণ করেননি প্রত্যেকেই নিজ নিজ পথে পরিক্রমা করেছেন।

প্রমথনাথ বিশীর সার্থক ঐতিহাসিক ছোটগল্প হল 'মহেন-জো-দড়োর পতন', 'মহালগ্ন', 'জেমি গ্রীনের আত্মকথা', 'কোকিল', 'ছিন্ন দলিল', 'গুলাব সিং-এর পিস্তল', 'ছায়া বাহিনী', 'মড়্', 'রুথ', 'নানাসাহেব', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'রক্তের জের', 'অভিশাপ', 'রাজা কি রাখাল', 'পরী', 'কোতলে আম', 'দর্শনী', 'আগম-ই-গন্না বেগম', 'তিন হাসি', 'বেগম শমরুর তোশাখানা' প্রভৃতি।

'মহেঞ্জোদড়োর পতন' ছোটগল্পটির কালসীমা সুদূর অতীত। গল্পটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঘটনা অবলম্বনে রচিত। অতীত ইতিহাসের পাতা থেকে সামান্য ঐতিহাসিক উপাদান নিয়ে আলোচ্য ছোটগল্পের সৃষ্টি। মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতা ঐতিহাসিকদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। আজও ঐতিহাসিকদের কাছে এই সভ্যতার ধ্বংসের কারণ বহু বিতর্কিত সন্দেহ নেই। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন সিন্ধুনদের বন্যা ও আর্য জাতির আক্রমণ প্রধানত এই দুটি সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংসের কারণ। প্রমথনাথ প্রাগার্য সিন্ধু সভ্যতার সময় কালকে অতীতকালীন যুগ পরিবেশে আলোচ্য গল্পে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। সেইসময় সিন্ধু সভ্যতায় অশ্বের ব্যবহার ছিল না, এই বিষয়টি তিনি অনবদ্যভাবে আলোচ্য গল্পে সংযোজন করেছেন। ঐতিহাসিক মতকে বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে সমর্থন করে তিনি সিন্ধু সভ্যতার পতনের আরেকটি কারণ সংশোধন করেছেন। কারণটি হল উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বিলাসবহুল ও আলস্যপূর্ণ জীবনযাত্রা। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের উদাসীনতা যে মহেঞ্জোদড়োর পতনকে অনিবার্য করে তুলেছে এই যুক্তি তিনি নিখুঁত ভাবে এই গল্পে পরিবেশন করেছেন। আলাপরত সেনাধ্যক্ষ আর পূর্তসচিব, অপদার্থ নাগরিক ও রাজপুরুষ প্রভৃতি চরিত্র নির্মাণে, গল্পের গঠন সৌকর্যে, গল্পের নাট্যরস সৃষ্টিতে প্রমথনাথ ইতিহাস রসকে ক্ষুণ্ণ করেননি। ঐতিহাসিক গল্পের মাত্রাবোধকে অক্ষুণ্ণ রেখে প্রমথনাথ শিল্প কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নেই।

প্রমথনাথের 'মহালগ্ন' গল্পটি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অবলম্বনে রচিত। গ্রিক বীর আলেকজাণ্ডারের ভারত আগমন ও চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব লাভের ইঙ্গিত আলোচ্য গল্পে স্থান পেয়েছে। ছোটগল্পকার এই গল্পে ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি ঐতিহাসিক ঘটনা চেয়ে ঐতিহাসিক পরিবেশ প্রভাবিত চন্দ্রগুপ্ত ও গ্রিক রমণীর প্রেমের রোমান্টিক কাহিনীতে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। মানব

জীবন রস পা· ·নে গল্প নির্মাণ দক্ষতায় প্রমথনাথের আলোচ্য গল্পটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

প্রমথনাথ বিশী মধ্যযুগের ভারত অবলম্বনে ঐতিহাসিক ছোটগল্প লিখেছেন। বিশেষ করে মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসকালের বিভিন্ন ঘটনা প্রমথনাথকে বেশি করে আকৃষ্ট করেছে। 'রাজা কি রাখাল' ছোটগল্পে বাদশা আলমগীর চরিত্রে নিষ্ঠুরতা ও কোমলতা এই দুই পরস্পর বিরোধী মানসিকতার পরিচয় পাই। ইতিহাসের নিষ্ঠুর পরিহাসের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে প্রমথনাথ বাদশা আলমগীরকে এক বৃদ্ধা ভিখারিনির চেয়েও বেশি দীন-দুঃখী হিসেবে চিত্রিত করেছেন।

'পরী' গল্পে মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের এক করুণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সাম্রাজ্যের অনিবার্য পতনের পর অন্তঃপুরের বেগমদের নিদারুণ দুর্দশা বর্ণনা আলোচ্য গল্পের মূল বিষয়। লালকেল্লার আস্তাবলের সহিসের মাধ্যমে এই গল্পকাহিনী পল্লবিত হয়েছে। অসহ্য ক্ষুধায় যন্ত্রণায় কাতর হয়ে হারেমের বন্ধন ছিন্ন করে অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসেছিল বেগমরা। রাতের অন্ধকারে বেগমরা বেরিয়ে এসেছিল ভিক্ষা করতে। আস্তাবলের সহিস বড়ে খাঁ গোস্ত রান্নার সঙ্গে সঙ্গে গল্পের আসর জমিয়েছিলেন কয়েকজনের সঙ্গে। সেইসময় গোস্ত রান্নার গন্ধ পেয়ে বেগম্‌রা এসে কড়াইসুদ্ধ মাংস তুলে নিয়ে অন্তঃপুরে গিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। সঙ্গীরা ও বড়ে মিঞা ভেবেছিল বেহস্তের পরীরা এসেছিল সেখানে।

'কোতলে আম' একটি অনবদ্য ঐতিহাসিক ছোটগল্প। গল্পে দেখানো হয়েছে নাদির শার অত্যাচারের কাহিনী সেই সঙ্গে এক নর্তকীর মনস্তাত্ত্বিক দিকটিকে লেখক অলোকপাত করেছেন। নাদির শাকে যে নর্তকী বীরপূজারী বলে মনে করত অথচ প্রেমিকের লোমশ বাহুর আলিঙ্গনে সে নিজেকে ধরা দিতে না গিয়ে মূর্চ্ছিত হয়। প্রমথনাথ নর্তকীর মতো সামান্য নারীকেও গল্পে স্থান দিয়েছেন।

'দর্শনী' গল্পটি প্রমথনাথের সার্থক সৃষ্টি। নাটকীয় চমৎকারিত্ব সৃষ্টিতে আলোচ্য গল্পটি অনন্য। ফারুকশিয়ার বন্দী হলে তার প্রেমিকা জুবেদী গিয়েছিল প্রেমিকের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। তাদের মিলন মধুর মুহূর্তের পর পাহারওয়ালা যখন জুবেদীর নিকট থেকে দর্শনী বুঝে নিতে ব্যস্ত সেসময় ফারুকশিয়ার খোঁপার কাঁটা দিয়ে দুচোখ বিদ্ধ করে দৃষ্টিশক্তি হারাল। ইতিহাসের প্রাণস্পর্শী বিবরণ বিশেষ নাট্যগুণ সৃষ্টি করেছে।

সিপাহি বিদ্রোহের কালবৈশাখী ঝড়ে তামাম হিন্দুস্থানের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটল। সিপাহি ও কোম্পানির সেনারা যারা জীবিত ছিল তারা বিভিন্ন স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। এসময় মানবহৃদয়ে শুভ ও অশুভ প্রকাশ ঘটেছিল সমভাবে।

Forbes Mitchell এর 'Reminiscences of the Great Mutiny 1857-59' গ্রন্থের ইতিহাস অবলম্বনে প্রমথনাথের একটি ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্প 'জেমি গ্রীনের আত্মকথা'। গুপ্তচর অপবাদে যে জেমি গ্রীনকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিল সে কিভাবে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে স্বদেশপ্রেমিকে রূপান্তরিত হল তার এক অনবদ্য ঘটনা আলোচ্য ছোটগল্পের বিষয়।

'ছিন্নমূল' গল্পটিতে বাঙালির ইংরেজ প্রীতির নামে কাপুরুষতার পরিচয় থাকলেও গল্পশেষে বাঙালি চরিত্রের গৌরব রক্ষা করেছেন।

সিপাহি বিদ্রোহের সময় বহু নর নারীর মৃত্যু হয়েছে আবার বহু নর নারীর হৃদয়ে ঘটেছে রাখি বন্ধন। এমনি এক রাখি বন্ধনের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে 'রুথ' ছোটগল্পটি।

'ছিন্নদলিল' ও 'নানাসাহেব' গল্প দুটি ঐতিহাসিক। সিপাহি বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত এই দুটি গল্প। বাঙালি চরিত্রের ভীরুতা নিয়ে লেখা 'ছিন্ন দলিল' ছোটগল্প এবং নানাসাহেব চরিত্রটি ইতিহাস ও কল্পনার সমন্বয়ে মহানায়কে রূপান্তরিত হয়েছেন। প্রমথনাথ ছদ্মবেশী নানাসাহেবের স্বদেশপ্রেমের সার্থক পরিচয় বিশেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'বেগম শমরুর তোশাখানা' প্রমথনাথের একটি সার্থক ঐতিহাসিক ছোটগল্প। গল্পটিতে লোভ প্রতিহিংসা কিভাবে মানবজীবনে অনিবার্য বিপর্যয় ডেকে আনে তাঁর সার্থক চিত্র প্রমথনাথ তুলে ধরেছেন আলোচ্য ছোটগল্পে। ঐতিহাসিক কাহিনীতে মানবজীবন রস যুক্ত করে প্রমথনাথ অনবদ্য ছোটগল্পটি আমাদের উপহার দিয়েছেন।

'ধনেপাতা' গল্পটি ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। গল্পটির উপাদান প্রমথনাথ সংগ্রহ করেছেন নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব গ্রন্থ থেকে। গল্পটিতে প্রাচীনকালের বাঙালি ছাত্রদের আচার আচরণকে রঙ্গব্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

প্রমথনাথ 'সেকেন্দার শার প্রত্যাবর্তন' ছোটগল্পটির উপাদন সংগ্রহ করেছেন ইংরাজি অনুবাদ গ্রন্থ থেকে। ইতিহাসের সঙ্গে কৌতুকপ্রিয়তার অনবদ্য মেল বন্ধন ঘটেছে আলোচ্য গল্পে। গ্রিক সুন্দরী হেলেনের এক গৌড়ীয় বিদেশীর সঙ্গে পলায়নের ঘটনায় সেকেন্দার শা ভাবত ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

প্রমথনাথের ঐতিহাসিক ছোটগল্পগুলি শিল্পগুণ সমৃদ্ধ। ইতিহাস নিষ্ঠা ও জীবন নিষ্ঠা এই দুটি বিশেষ গুণ প্রমথনাথের ছিল বলেই ইতিহাস রসের সঙ্গে মানবজীবনের মিশ্রণে উপহার দিয়েছেন ঐতিহাসিক ছোটগল্প যা বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বাস্তবিক পক্ষে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, মনোজ বসুর ঐতিহাসিক ছোটগল্পের পাশাপাশি প্রমথনাথের ঐতিহাসিক গল্প রচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রমথনাথ অন্য কোনো ছোটগল্পকারের গল্পের বিষয় ও রচনা শৈলীকে অনুসরণ করেননি। তিনি আপন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক ছোটগল্পধারায় প্রমথনাথের ঐতিহাসিক ছোট গল্পগুলির যে একটি বিশেষ স্থান আছে একথা প্রমথনাথ বিশীর গল্প পাঠক মাত্রেই মেনে নেবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই।

বাংলা সাহিত্যের উপাদান সেই উপাদানকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা ও নতুন মহিমায় উপস্থাপনের কৃতিত্ব প্রমথনাথের। সম্ভবত এ বিষয়ে প্রমথনাথ বিশী একক ও অনন্য। কি সমসাময়িক ছোটগল্পকার অথবা পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী কোনো ছোটগল্পকার নাটক, উপন্যাস, কাব্য ও ছোটগল্প নিয়ে নতুন কোনো দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেননি। সেদিক থেকে প্রমথনাথ

বিরল প্রতিভার অধিকারী। প্রমথনাথের শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব ও শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব গল্প দুটিতে শরৎচন্দ্রের অনবদ্য সৃষ্টি 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। গল্পদ্বয় বাংলা সাহিত্যে অভিনবত্বের দাবি রাখে।

প্রমথনাথের সিপাহি বিদ্রোহোত্তর পটভূমিকায় লেখা 'সেই শিশুটি' নামকরণ যুক্ত গল্পটি অভিনবত্বের দাবি রাখে। সেই শিশুটি যে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের নায়ক গৌরবরণ চক্রবর্তী আমরা 'গোরা' উপন্যাস পড়ে তা জানতে পারি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস পাঠে আমরা জানতে পারি গোরা মিউটিনির কুঁড়িয়ে পাওয়া সন্তান। সিপাহি বিদ্রোহের সময় পরিত্যক্ত গোরা কি ভাবে ব্রাহ্ম কৃষ্ণদয়াল বাবু ও ভারতাত্মার মূর্ত প্রতীক আনন্দময়ীর গৃহে আশ্রয় লাভ করল সে ঘটনা। সেই প্রসঙ্গ অবলম্বনে প্রমথনাথের এই শিশুটির কুড়িয়ে পাওয়া অংশটুকু বেছে নিয়ে অনবদ্য এই গল্পটি আমাদের উপহার দিলেন।

রবীন্দ্র সাহিত্যের 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের খন্ডাংশ অবলম্বনে রচিত প্রমথনাথের 'কমলার ফুলসজ্জা' একটি অনবদ্য ছোটগল্প। রমেশ, কমলা ও নলিনাক্ষের জীবন সমস্যার সমাধানের পথকে নতুন করে উপস্থাপন করলেন প্রমথনাথ বিশী আলোচ্য ছোটগল্পে। বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের ছোটগল্প রচনার প্রথম কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে ছোটগল্পকার প্রমথনাথের এতে সন্দেহ নেই।

প্রমথনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী' উপন্যাসকে বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন ভাবে রূপদান করলেন তাঁর 'রাধারাণী' ছোটগল্পে। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে রাধারাণী ও রুক্মিণীকুমারের রোমান্টিক প্রেম মধুর চিত্র দিয়ে কাহিনীর উপসংহার টেনেছেন। প্রমথনাথ সেখানে যুগ যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত হয়ে এই দুই নায়ক নায়িকার মিলনের পথকে পরিহার করে তাদের বিচ্ছেদ বেদনা দিয়ে 'রাধারাণী' গল্পটির পরিসমাপ্তি টেনেছেন। বলা বাহুল্য এই গল্পগুলি পাঠক মনে বিশেষ কৌতূহলের সঞ্চার করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের খন্ডাংশ অবলম্বনে রচিত 'রাজা কি রাখাল' ছোটগল্পটি রচিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন বাদশা আলমগীরকে প্রেমের কাঙ্গালরূপে। চঞ্চল কুমারীর রূপ ও লাবণ্য বাদশার মনকে আলোড়িত করেছে। কিন্তু একজন সম্রাট হয়েও সে পায়নি চঞ্চলকুমারীর হৃদয়কে। বঙ্কিমচন্দ্র আলোচ্য উপন্যাসে ইতিহাসের নিষ্ঠুর পরিহাসের চিত্র অনবদ্যভাবে উপস্থাপন করেছেন। সেখানে প্রমথনাথ তাঁর ছোটগল্পে বাদশা আলমগীর যে একজন ভিখারিনির চেয়েও দীনহীন তার পরিচয় দিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' একটি সামাজিক উপন্যাস। ত্রিভুজ প্রেম কিভাবে অনিবার্য বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয় তাঁর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত নগেন্দ্রনাথ চরিত্র। সূর্যমুখীকে বিয়ের পরেও কুন্দনন্দিনীর রূপ ও লাবণ্যে সে মুগ্ধ। যেদিন হীরাদাসী কুন্দনন্দিনীকে বিষপানে উদ্বুদ্ধ করেছিল কুন্দনন্দিনী সেদিন বিষপান করে আত্মহত্যার পথকে বেছে নেয়। সেই কুন্দননন্দিনীর করুণ মৃত্যু ঘটনা অবলম্বনে প্রমথনাথ লিখলেন 'কুন্দনন্দিনীর বিষ পান' ছোটগল্পটি। প্রমথনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের মত বিষ পান করে না মেরে আলোচ্য গল্পে কুন্দনন্দিনীকে

বাঁচিয়ে রাখলেন। তিনি কুন্দকে কলকাতায় কমল মণির আশ্রয়ে থাকবার সুব্যবস্থা করে দিলেন। তখন সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর নারী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। বিদ্যাসাগরের আগ্রহে কুন্দনন্দিনী কলকাতায় থেকে পূর্ব স্মৃতিকে ভুলে গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সংকল্প নেন। উচ্চশিক্ষিতা হয়ে কলকাতার একটি বালিকা বিদ্যালয়ের হেড মিস্ট্রেস পদ অলঙ্কৃত করে বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। আলোচ্য গল্পগুলির অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য পাঠকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এছাড়া 'কপালকুণ্ডলার দেশে', 'বাল্মীকির পুনর্জন্ম', 'রোগিণীর কি হইল', 'ভাঁড়ু দত্ত' প্রভৃতি বাংলা সাহিত্য বিষয়ক ছোট গল্পগুলির সাহিত্য মূল্য কোনো অংশে কম নয়। বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের গল্প রচনার প্রথম পথিকৃৎ প্রমথনাথ বিশী। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা সাহিত্যে প্রমথনাথের একটি বিশেষ স্থান আছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রমথনাথের সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি ছিল সুগভীর অনুরাগ। তিনি যে সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর নিদর্শন প্রমথনাথের সংস্কৃত কাব্য ও সংস্কৃত নাটক অবলম্বনে রচিত বিভিন্ন ছোটগল্প। আধুনিক পটভূমিকায় লেখা গল্পগুলি যথাক্রমে 'অসমাপ্ত কাব্য' 'যক্ষের প্রত্যাবর্তন' ও 'শকুন্তলা' গল্পত্রয়। প্রমথনাথ কালিদাসের সাহিত্য প্রতিভাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন।

মহাকবি কালিদাসকে নিয়ে নানা কিংবদন্তি প্রচলিত আছে।·প্রমথনাথের 'অসমাপ্ত কাব্য' ছোটগল্পটি কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্' কাব্যের সমাপ্তি অংশ অবলম্বনে রচিত। প্রমথনাথ আলোচ্য ছোটগল্পে কালিদাসের জীবন ও কাব্যকে এক সূত্রে গেঁথেছেন। কালিদাস কাব্য শেষে হরপার্বতীর মিলন চিত্র দিয়ে সমাপ্ত করেছেন। তৎকালীন রাজ ও রুচির পরিপন্থী ছিল এই অংশটি। বস্তুতঃ রাজা বিক্রমাদিত্য স্থূল রস পিপাসা যুক্ত করে কাব্যটিকে শেষ করবার আদেশ দেন সভা কবি কালিদাসকে। কালিদাস কিন্তু রাজা বিক্রমাদিত্যের নির্দেশ মানতে পারেননি। তার নির্দেশ মানলে কাব্যের ভাবমূর্তি কিছুটা ক্ষুণ্ণ হবে এই ভেবে রাজা তখন ক্ষুব্ধ হয়ে কালিদাসকে রামগিরিতে নির্বাসন দিয়ে দেবভট্টকে অসমাপ্ত অংশটি রচনার দায়িত্বভার অর্পণ করে।

'যক্ষের প্রত্যাবর্তন' ছোটগল্পটি প্রমথনাথ কালিদাসের নির্বাসিত জীবন অবলম্বনে রচনা করেন। লেখক কালিদাসের 'মেঘদূতম্' কাব্যটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন। গল্পটিতে তিনি কালিদাসকে যক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। লেখক মহারাজা বিক্রমাদিত্যের চরিত্র প্রতিরূপ দেখেছেন বিক্রমোর্বশী চরিত্রের সঙ্গে।

তিনি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের বিষয়কে অবলম্বন করে এক নতুন জীবন ভাষ্য রচনা করেন। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার জীবনের শেষ পর্যায়কে তিনি এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর গল্পে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা যেন অতীশ ও মালতীর মতো। গল্পে লেখক অতীশ ও মালতীর প্রথম দর্শনে প্রেমের সঙ্গে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রথম দর্শনের প্রেমকে এক সূত্রে বেঁধেছেন। গল্পের পরিণতিতে এই দুই নায়ক নায়িকার বিবাহের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। প্রমথনাথ এইভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের উপাদানকে ছোট

গল্পে উপস্থাপন করে এক নতুন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন। এদিক থেকে এই গল্পগুলো অদ্বিতীয় ও অভিনব সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য সংস্কৃত সাহিত্যকে গল্পের বিষয় করার বিশেষ কৃতিত্ব এক মাত্র প্রমথনাথ বিশীর। কাজেই বাংলা সাহিত্যের জগতে এই গল্পগুলি একক ও অনন্য। এই ধারার গল্প রচনার অন্যতম পথিকৃৎ প্রমথনাথের বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান আছে একথা আমরা অতি সহজেই মেনে নিতে পারি।

বাংলা সাহিত্যে অলৌকিক বিষয় নিয়ে বিভিন্ন ছোটগল্পকার ছোটগল্প রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ভূত ও মানুষ, ভূতের বাড়ি, পূজার ভূত, পিঠে পার্বনে চীনে ভূত, লুল্লু, ভয়ানক আংটি, বীরবালা প্রভৃতি ছোটগল্পে অতিলৌকিক রস সৃষ্টি করেছেন। পরশুরাম ভূত ও অতিলৌকিক বিষয় নিয়ে যে গল্পগুলি আমাদের উপহার দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে উপভোগ্য। তাঁর ভুষণ্ডীর মাঠে, মহেশের মহাযাত্রা, বদন চৌধুরীর শোকসভা, জটাধর বক্সী, শিবাসুখী চিমটে প্রভৃতি গল্পগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এছাড়া গজেন্দ্রকুমার মিত্রের অন্তহীন যাত্রা, রহস্য, রায় বাড়ির অতিথি, এপার ওপার, মরণের পরেও ছোটগল্পগুলি ভৌতিক গল্পের পর্যায়ভূক্ত। এছাড়া তাঁর অলৌকিক গল্প সাধু ও সাধক, নিশীর ডাক, সময়ের বৃন্ত হতে খসা প্রভৃতি প্রথম শ্রেণির ছোটগল্পের পর্যায়ভূক্ত। মনোজ বসু অতিলৌকিক গল্পগুলি অতি পরিচিত পরিবেশের মধ্যেই লিখেছেন। তাঁর মধ্যে প্রেতিনী, ছায়াময়ী, ভেজালের উৎপত্তি প্রভৃতি ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূতের গল্পগুলি যথাক্রমে রক্ত-খদ্যোত, অশরীরী, প্রেতপুরী, সবুজ চশমা, দেহান্তর, মালকোষ, টিকটিকির ডিম, অন্ধকার, মরণ-ভোমরা, বহুরূপী, প্রতিধ্বনি, ভূত-ভবিষ্যৎ, মধু-মালতী, নীলকর, কালো সোনার গল্প, প্রত্ন কেতকী প্রভৃতি। তাঁর প্রতিটি গল্পের বিষয়, অদ্ভুত ও রহস্য পাঠকমনে বেশ উপভোগ্যতা এনে দেয়। উক্ত ছোটগল্পকারদের পাশাপাশি প্রমথনাথের অলৌকিক গল্পগুলোর বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান আছে। তাঁর অন্যান্য গল্পের পাশাপাশি অতিলৌকিক ছোটগল্পরচনার কৃতিত্ব সর্বাধিক।

প্রমথনাথ বিশীর অতিলৌকিক গল্পগুলি শিল্পগুণ সম্পন্ন হয়ে উঠেছে, অতিলৌকিক পরিবেশ আমদানি করতে গিয়ে তা কখনো বাস্তবতার সীমা লঙ্ঘন করেনি। ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় কালের পুত্তলিকা (বাংলা ছোটগল্পের একশ বছর) গ্রন্থে প্রমথনাথের ভূতের গল্পের শ্রেণিভূক্ত মোট সতেরোটি গল্প উল্লেখ করেছেন। অলৌকিক (১৩৬৪) নামক গ্রন্থটি লেখকের ভূতের গল্পের অনবদ্য সংকলন। তাঁর অতিলৌকিক শ্রেণিভূক্ত গল্পগুলো নিম্নে প্রদত্ত হল—

শুভদৃষ্টি, স্বপ্নলব্ধ কাহিনী, আয়নাতে, ফাঁসি গাছ, সিন্দুক, কপালকুণ্ডলার দেশে, চিলারায়ের গড়, নিশীথিনী, কালো পাখী, তান্ত্রিক, অশরীরী, বিনা টিকিটের যাত্রী, ভৌতিক চক্ষু, পুরন্দরের পুঁথি, পাশের বাড়ি, খেলনা, দ্বিতীয় পক্ষ প্রভৃতি।

বাস্তবলোক থেকে ভৌতিকলোকে যাতায়াতের পথটা লেখকের জানা, খুব সহজেই

তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতা ও স্বপ্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে সেতু যোজনা করতে পারেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে অতিপ্রাকৃত একটি অন্যতম উপাদান। সোর থেকে শুরু করে শেক্সপীয়র, কোলরিজ মোঁপাসা, টলস্টয়ের সাহিত্যে অত্যন্ত সুকৌশলে লৌকিক অলৌকিকের সংমিশ্রণ করেছেন এবং কার্যকারণ সূত্রের পারম্পর্য রক্ষা করেছেন। সাহিত্যে অলৌকিক, অবাস্তব, অসাধারণ রহস্যমূলক কল্পনার অন্তরালে একটি জীবন সূত্র নিহিত রয়েছে। তিনি পাঠকের মনের সংবেদনশীলতাকে জাগিয়ে তুলে রহস্যের পরিমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। অশরীরীদের পদচারণা ও কথোপকথন অসীম রহস্যে ঘেরা জীবনের মধ্যে আশ্রয় দিলেন। ঠিক তেমনি বাংলা সাহিত্যে তার অতিপ্রাকৃত বর্ণনা অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছে। প্রাচীন সাহিত্যের তটপ্রান্তে দেবতার জয়গানে মুখরিত বাংলা সাহিত্যে আধুনিককালের পূর্ব পর্যন্ত দেবমাহাত্ম্য ও দেবতার কাহিনী প্রধান রূপ পরিগ্রহ করেছে। আর সেই সব দেবতা সমাজে নিজেদের স্থান অধিকার করতে গিয়ে নানা অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার মধ্যে মানুষকে টেনে এনেছেন। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ অলৌকিকতাকে অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক ভাবে বর্ণনা করেছেন। দেবতার অলৌকিকত্বে অখন্ড বিশ্বাস নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে তার বর্ণনা করেছেন।

আধুনিককালে অতিপ্রাকৃত উপাদান লুপ্ত হয়ে যায়নি বরং অতিপ্রাকৃত বর্ণনা সাহিত্যের একটা গুণ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্যের সোনার কাঠির স্পর্শে ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীকে আশ্রয় করে অতিপ্রাকৃতের সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। গিরীশ ঘোষের জন্য, মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্য', 'পদ্মাবতী', 'মায়াকানন', বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম', 'বিষবৃক্ষ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'আনন্দমঠ', 'ইন্দিরা' প্রভৃতি উপন্যাসে অতিপ্রাকৃতের আমদানি ঘটেছে যদিও অতিপ্রাকৃত সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র কোনো সচেতন সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন করেননি। কিন্তু রোমান্সের আতিশয্যে - objectivity কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথও অতিপ্রাকৃতের সংযোজন ঘটিয়েছেন তাঁর সাহিত্যে। বাঙালি জীবনের কতকগুলি সহজ সরল সংস্কার ও বিশ্বাসকে তিনি গল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন. ভৌতিক বিশ্বাস বাঙালি জীবনের সহজাত সংস্কার বা হাড়েমাসে জড়ানো সংস্কার, এই সমস্ত সংস্কারের প্রতি আমাদের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। এই সংস্কার এত প্রবল যে তা যুক্তি তর্কের অবকাশ রাখে না। যত অলৌকিকত্ব থাক না কেন এবং তা যতই অবিশ্বাস্য হোক না কেনো তা স্বীকার করতে কোথাও বাধা নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অতি সহজেই মানবমনের সংস্কারকে কয়েকটি গল্পে অদ্ভুতভাবে অঙ্কন করেছেন। ক্ষুধিত পাষাণ, নিশীথে, মণিহারা, কঙ্কাল, গুপ্তধন, জীবিত ও মৃত ইত্যাদি গল্পে এই বিশ্বাস ও সংস্কারকে শিল্পকলায় মন্ডিত করেছেন, ক্ষুধিত পাষাণ গল্পটি সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এই গল্পটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতিপ্রাকৃত উপাদান ব্যবহারে নিপুণতা দেখাবার চেষ্টা করেছেন।

প্রমথনাথ বিশী যে অলৌকিক ছোটগল্পগুলি লিখেছেন তা থেকে পাঠক মনে আতঙ্ক জেগে ওঠে। এই গল্পগুলোতে নেই কোনো কৌতুক রস কিংবা পরিহাস কুশলতা। সিরিয়াস

ভঙ্গিতে লেখা তাঁর প্রতিটি অতিলৌকিক গল্প পাঠকমনে সাড়া জাগাতে পেরেছে। তাঁর ছোটগল্পে আছে ফ্যানটাসি ও রহস্যময়তা। তিনি ভূত নিয়ে একটি বারের জন্য কোনো কৌতুক করেননি। হাস্যরসিক প্রমথনাথের এটি একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। একটা গা ছমছম করা ভাব ও ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রমথনাথ নিঃসন্দেহে সফল শিল্পী। মূলত অতিলৌকিক গল্পকে অতিলৌকিক রূপদান তিনি করেছেন। ভূতের গল্পকে আবার ভূতের গল্প রূপেই দেখিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্পে। প্রমথনাথ নিজেই বলেছেন—

"শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন ভূতের গল্প গল্পের রাজা। কথাটা মিথ্যা নয়। ভূত আছে কিনা জানি না, তবে গল্পে বর্ণিত ভূত আছে এবং তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করে গল্প বলিবার ভঙ্গির উপরে।"[১১]

কোলরিজ অলৌকিক গল্প প্রসঙ্গে বলেছেন willing suspension of disbelief. এই ধরনের গল্পে কোনো যুক্তি গ্রাহ্য আবেদন থাকে না। যদিও পাঠক তাঁর মধ্যে খুঁজে পেতে চায় জীবনের সত্যতা। অতিলৌকিক রসের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, আবার আছে সৌন্দর্য যে সৌন্দর্য পাঠককে নিয়ে যায় কল্পনার জগতে। প্রকৃত ছোটগল্পকার তাঁর শিল্পী সুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক করে পাঠকমনে উপস্থাপন করেন। একটা আনন্দরস পরিবেশন গল্পকারের মূল লক্ষ্য। প্রমথনাথ এই ধরনের অতিলৌকিক গল্প রচনায় কতটা সিদ্ধি লাভ করেছেন এই প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু গল্পের আলোচনা করা যেতে পারে। 'নিশীথিনী' ছোটগল্পটির কথা ধরা যাক গল্পকার সিংভূম জেলার এক অরণ্যে ঘেরা পাহাড়ে গভীর রাতের অন্ধকারে মাঝে মাঝে আলোর রশ্মি আমদানি করে এক অলৌকিক রহস্য জাল বিস্তার করেছেন, গল্পটি প্রমথনাথের অনবদ্য সৃষ্টি। গুলাব সিং এর পিস্তল ছোটগল্পটিতে একটি গুলিহীন পিস্তল কিভাবে অসংখ্য মৃত্যু ঘটনার কারণ হল তার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। গল্পটিতে অতিলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রমথনাথের নৈপুণ্য প্রশংসনীয়।

'চিলারায়ের গড়' গল্পটি রহস্য রোমাঞ্চে ঘেরা গল্পে এক অলৌকিক পরিমন্ডল গড়ে উঠেছে। কাহিনীর সমাপ্তিতে করুণ রস মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে। কালু খাঁ নামে যে কামানটি নিয়ে চিলা রায় তাঁর শত্রু পক্ষকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিলেন ভ্রাতৃ বিয়োগ বেদনায় একদিন কামানের সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র বক্ষে ঝাঁপ দেন, তার এই আত্মবিসর্জনের ঘটনা নিঃসন্দেহে করুণ। প্রমথনাথ তা গল্পেই উল্লেখ করেছেন—

"এ কাহিনী নাটকে আর চোখের জলে পূর্ণ।"

প্রমথনাথের 'অবচেতন' গল্পটিও রহস্যময়। এক ভয়াল ভৌতিক আবহ সৃষ্টি হলেও আলোচ্য গল্পটি মনোবিজ্ঞান সম্মত। 'খেলনা' গল্পটিও রহস্যজনক। একটি মৃত শিশুকে নিয়ে পিতা মাতার অপত্য স্নেহ এক স্বপ্নময় জগতে নিয়ে গিয়ে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। গদাধর রায়ের গৃহে যে মৃত কন্যাটি প্রতিদিন রাতে খেলনার জন্য আসত তার বর্ণনা করুণ রস সৃষ্টি করেছে। 'বিনা টিকিটের যাত্রী' ছোটগল্পে এক অলৌকিক যাত্রীর কাহিনী আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে।

'কালো পাখি' ছোটগল্পে মিনুর কালো পাখিটি একদিন মিনুর প্রাণ হরণ করেছে। আবার মিনুর মৃত্যুর পর সেই পাখিটি আশ্রয় নিয়েছিল ঝুমঝুমির গৃহে। এরপর ঝুমঝুমির মৃত্যু হয়েছে। কালো পাখিকে কেন্দ্র করে এই দুটি আকস্মিক মৃত্যু আমাদের ভাবিয়ে তোলে এবং মানসিক বিষন্নতার আবহ সৃষ্টি করে। 'আয়নাতে' ছোটগল্পে একটা সুসজ্জিত কক্ষের সুদৃশ্য একটি আয়নায় কিভাবে হত্যা লীলা সংঘটিত হচ্ছে তাঁর এক রোমাঞ্চকর কাহিনী যা অতিলৌকিক রস সৃষ্টি করেছে। 'শুভদৃষ্টি' গল্পে রেলস্টেশনের জনহীন ওয়েটিং রুমে গল্পকথক জানিয়ে যায় নমিতার প্রতি ব্যর্থ ভালোবাসার কাহিনী। যেদিন সে কমলাকে বিয়ে করে, বিয়ের শুভদৃষ্টির সময় কমলার মধ্যে দেখেছিল নমিতাকে। নমিতা ও কমলার একই সময়ে মৃত্যুর ঘটনায় এক অলৌকিক রস সৃষ্টি হয়েছে।

'ভৌতিক চক্ষু' ছোটগল্পটি অতিলৌকিক। এক হত্যাকারীর চোখ প্রেতাত্মা ফস্টারের মেয়ে সোফিয়ার জীবনে কোমল মন থেকে কিভাবে নৃশংস অবস্থায় রূপান্তরিত হল তাঁর কাহিনী। ডাক্তার মেরীগোল্ডের চিকিৎসায় সোফিয়ার দৃষ্টিশক্তিহীন একটি চোখে একটি হত্যাকারীর চোখ স্থানান্তরিত হয়। ডাক্তার মেরীগোল্ডের সাক্ষীতে সেই হত্যাকারীর মৃত্যুদন্ড হয়। মেরীগোল্ডের প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই সে চক্ষু ব্যাঙ্কে একটি চক্ষু দান করেছিল। সফিয়ার মৃত্যু ঘটনায় কোনো এক অদৃশ্য শক্তির হাত আছে বলে প্রত্যেকে বুঝতে পারে। গল্পটি বিষদাচ্ছন্ন ও ভয়ঙ্কর সন্দেহ নেই।

'ফাঁসি গাছ' গল্পটি উঠেছে নবাবি আমলে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করা হত যে গাছটির ডালে ফাঁসি দিয়ে সেই বৃহৎ ডালপালা যুক্ত গাছটিকে কেন্দ্র করে। শতবর্ষের পুরোনো এই গাছটিকে নিয়ে অনেক কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। সেই গাছটিকে কেন্দ্র করে দেশী ও বিদেশী বহু লোক ভীতিকর দৃশ্য দেখেছে। রাতের অন্ধকারে একদিন গল্পকথক যাচ্ছিলেন তাঁর পাঁচ বছর আগেই কালবৈশাখীর ঝড়ে বাজ পড়ে গাছটি ছাই হয় কিন্তু গল্পকথকের কাছে সেই গাছের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া অনেকটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, যাঁর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। 'গোষ্পদ' গল্পের অমলেন্দু কৃষ্ণপক্ষের এক রাতে ফিরছিল মেঠো পথ দিয়ে। চাদর গায়ে জড়ানো এক মুসলমান চাষি জুটল তাঁর সঙ্গী হিসেবে। যখন অমলেন্দু লোকালয়ের আলো দেখতে পেয়ে তখন ভীতিকর গোবাঘার হাত থেকে পরিত্রাণ পেল একথা জানাতে মুসলমান চাষিটির চোখের দৃষ্টি ও অমানুষি কণ্ঠস্বর শোনার পর দেখতে পেল তাঁর হাটুর নীচে পা দুখানা গরুর বা গোষ্পদ। তারপর অমলেন্দু অজ্ঞান হয়ে মাঠে পড়ে থাকে। আবার মুসলমান চাষিটি অমলেন্দুর মা ও বোনকে জানিয়ে যায় এই সংবাদ, গল্পটিতে এক ভয়ঙ্কর আবহ সৃষ্টি হয়েছে।

পুরন্দরের পুঁথি ছোটগল্পটি আমাদের ভীত করে তোলে। গ্রন্থপাগল পুরন্দর তিব্বতী ভাষায় লেখা একটি বই পুরানো বই বিক্রেতার কাছ থেকে কেনার পর প্রত্যহ একটি ভয়ঙ্কর আকৃতিযুক্ত লোককে স্বপ্নে দেখত। এমন কি লেখক যেদিন ছোটনাগপুরে পুরন্দরের গৃহে এসেছিলেন সেদিন তিনি ভয়ঙ্কর চেহারা যুক্ত লোকটিকে দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হলেন। একদিন বই বিক্রেতা প্রকৃত বইয়ের মালিকের নির্দেশে পুরন্দরের গৃহে বইটি

ফেরত নেওয়ার পর থেকে তারা আর দুঃস্বপ্ন দেখেনি। নিঃসন্দেহে গল্পটি ভৌতিক পরিবেশ বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। 'অশরীরী' ছোটগল্পে অসংখ্য মৃত্যুর ঘটনা গল্পের এক ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। দেত্ত ও লড়কার নেপথ্যে অতিলৌকিক ঘটনার জাল বিস্তার করেছে এই গল্পটিতে। স্বপ্নাদ্য কাহিনী ছোটগল্পটির ভৌগোলিক পরিবেশ হল মির্জাপুর জেলার গঙ্গাতীরে অবস্থিত একটি বাড়িকে কেন্দ্র করে। সেই বাড়িতে যারা ভাড়া নিতে আসত প্রত্যেকেই দেখতে পেত নর কঙ্কালের ছবি। আজ থেকে তিনশ বছর আগে একটি লোককে নির্মমভাবে খুন করে তাঁর মৃত দেহকে ইটের দেওয়ালের ভেতরে গেঁথে রাখা হয়েছিল। একটি বিদেহী সত্তা মানব জন্মের ক্ষেত্রে কিছুদিন সক্রিয় ও সজীব থাকে। এই বিশ্বাসের উপর আলোচ্য গল্পের কাহিনী গড়ে উঠেছে। তান্ত্রিক ছোটগল্পে যদুপতি বাবুর গৃহে শান্তিস্বস্ত্যয়নের পূর্ণস্থিতির দিনে চারজন খড়ম পায়ে খালি গায়ে বিরাটকায় পুরুষের আবির্ভাব গল্পটিতে অলৌকিক রস সৃষ্টি হয়েছে। 'দ্বিতীয় পক্ষ' ছোটগল্প প্রমথনাথের অনবদ্য সৃষ্টি, গল্পের নায়কের প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় স্ত্রী দেখতে পেত নায়কের প্রথম স্ত্রীকে। নায়কের গৃহে প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর আত্মা কিছুকাল অবস্থান করেছিল তাঁরই এক অলৌকিক কাহিনী আলোচ্য ছোটগল্পের বিষয়। 'কপালকুন্ডলার দেশে' অতিলৌকিক ছোটগল্পে কাপালিকের আবির্ভাব এক ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। স্বপ্নলব্ধ কাহিনী ছোটগল্পে স্বপ্নে দেখা ইন্দিরার সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে। গল্প লেখকের স্বপ্নে ইন্দিরার সাহচর্য লাভ গল্পটিতে রোমান্টিক ও ভৌতিক পরিমন্ডল সৃষ্টি করেছে। প্রমথনাথের অতিলৌকিক ও ভৌতিক ছোটগল্পগুলি প্রতিটি রহস্যমন্ডিত। তাঁর গল্প নির্মাণ কৌশল অসাধারণ। পাঠক তাঁর গল্পগুলি পাঠ করে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। গল্পের চরিত্র নির্মাণে, সার্থক সংলাপে, প্রকৃতি বর্ণনায়, ভৌতিক পরিমন্ডল সৃষ্টিতে প্রমথনাথ সিদ্ধহস্ত এতে কোনো সন্দেহ নেই। সামগ্রিক বিচারে প্রমথনাথের অতিলৌকিক ছোটগল্পগুলো লেখকের বিচিত্রমুখী প্রতিভার সার্থক নিদর্শন। অন্যান্য ছোটগল্পকারের অতিলৌকিক ছোটগল্পগুলি থেকে প্রমথনাথ এক স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি অন্য কোনো অতিলৌকিক ছোটগল্পকারকে অনুসরণ করেননি, নিজস্ব প্রতিভার পরিচয় তিনি দিয়েছেন। এদিক থেকে অতিলৌকিক ছোটগল্পকার হিসেবে প্রমথনাথের সফলতা ও সিদ্ধি। বাংলা অতিলৌকিক ছোটগল্পের ইতিহাসে প্রমথনাথের একটি বিশেষ স্থান আছে এতে সন্দেহ নেই। তাঁর এই পর্যায়ের গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে চিরকাল অবস্থান করবে।

প্রমথনাথের ছোট গল্পে নারী চরিত্রের প্রতিবাদী চেতনার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীদের প্রতি অমর্যাদার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনা নিয়ে লেখনী ধারণ করেছেন অনেক ছোটগল্পকার। রবীন্দ্রনাথের 'রবিবার', 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ', 'হালদার গোষ্ঠী', 'প্রতিবেশিনী', 'পাত্র ও পাত্রী', 'পয়লা নম্বর', 'শাস্তি', 'হৈমন্তী', 'স্ত্রীর পত্র', 'বৈষ্ণবী', 'বদনাম', 'চিত্রকর' প্রভৃতি ছোটগল্পে পুরুষের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে নারীদের এক বিদ্রোহী সত্ত্বার প্রকাশ ঘটেছে। আশাপূর্ণাদেবীর নারী প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে 'অভিনেত্রী', 'বিবি বেগমের শিবতলা', 'আত্মহত্যা', 'তাসের ঘর', 'সীমারেখার সীমা',

'অনাচার', 'জালিয়াত', 'নিখাদ', 'চিরন্তন', 'পৃথিবী' প্রভৃতি ছোটগল্পে। যে গল্পগুলিতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অসম্মানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হয়েছে। মুলত পুরুষের একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে, বংশানুক্রমিক সংকীর্ণতা এবং সমাজের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর আমরা শুনতে পাই। প্রমথনাথের ছোটগল্প নারীর প্রতিবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মুলত প্রেমের সার্থকতা ও ব্যর্থতার সরণি বেয়ে। যদিও এ ধরনের গল্প প্রমথনাথ খুব একটা বেশি লেখেননি। বস্তুত সামাজিক ন্যায় নীতিকে তিনি যে গুরুত্বের সঙ্গে মেনে নিয়েছে তাঁর যথেষ্ট প্রমাণ আছে বিভিন্ন ছোটগল্পে। অথচ তাঁর ভাবনা চিন্তায় একটা প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। 'সুতপা' ছোটগল্পে সুতপার মৃত্যু ঘটনা মূলত নীরব এক নারী বিদ্রোহ। সুতপা ভালোবেসেছিল মিহিরকে কিন্তু মিহির সুতপাকে ভালোবাসার পরেও রমার প্রতি গভীর ভাবে আসক্ত হয়ে রমাকে যখন স্ত্রী রূপে গ্রহণ করল প্রেমের ব্যর্থতাজনিত কারণে সুতপা বেছে নিল আত্মহত্যার পথ। সুতপার মৃত্যু নায়কের বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। এক ত্রিভুজ প্রেম কাহিনী সুতপার জীবনের বিয়োগান্তক পরিণতি। আধুনিক নারীর অধিকারবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সুতপা চরিত্রে বিশেষভাবে উজ্জীবিত হয়েছে। মৃত্যুর পথকে বেছে নিয়ে সুতপা যেন প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচয় দিতে পেরেছে। 'অতি সাধারণ ঘটনা' ছোটগল্পের নায়ক অমিত, নায়িকা শমিতা। শমিতা তৎকালীন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। দারিদ্র্যতা ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে শমিতার বিদ্রোহ পরিণামে করুণ রস সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তবুও সতীত্বে, নারীত্বে ও নিষ্ঠায়, সততায় শমিতা চরিত্র লেখকের সার্থক সৃষ্টি। শমিতা তার অধিকারকে প্রতিষ্ঠার জন্য আমরণ সংগ্রাম করেছে এখানে তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর উচ্চারিত। প্রমথনাথের ছোটগল্পে এরূপ প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমথনাথের বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে একটা বিশেষ স্থান আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

বাংলা সাহিত্যে ডাইনী চরিত্র নিয়ে একাধিক গল্প রচিত হয়েছে। তারাশঙ্কর তাঁর অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর 'ডাইনী', 'ডাইনীর বাঁশী' প্রভৃতি ছোটগল্প স্নেহ প্রেম বঞ্চিত ডাইনী জীবনের মর্মান্তিক বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। একটা মিথ্যে ডাইনী অপবাদের শিকার হল একটি মেয়ে। গ্রাম্য কুসংস্কার কতটা রুদ্র রূপ ধারণ করতে পারে তাঁর জ্বলন্ত নিদর্শন 'ডাইনী' ছোটগল্প। ডাইনীর বিড়ালী দৃষ্টি ও লোভের দৃষ্টি এই অপবাদে কিভাবে একটি নিষ্পাপ এগারো বছরের কিশোরী মেয়ের জীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছে আলোচ্য গল্পে সেটাই চিত্রিত হয়েছে। প্রমথনাথ বিশীর 'ডাকিনী' ছোটগল্পটি এই ধারারই ফলশ্রুতি। একটা এম.এ পাশ মেয়ে মল্লিকার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল শশাঙ্কের। উচ্চশিক্ষিতা হওয়া সত্ত্বেও মল্লিকাকে ডাইনী অপবাদের শিকার হতে হল, স্বামীর রক্তশূন্যতা ও কৃশতার জন্যই নাকি দায়ি মল্লিকা। একদিন মল্লিকা দুঃখ বেদনায় গুড় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার পথকে বেছে নিল অশিক্ষা ও কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে। প্রতিবেশীদের ধারণা জন্মাল ডাকিনী মানব দেহটা ফেলে কঙ্কাল হয়ে কামরূপ কামাক্ষায় চলে গেছে। স্নেহ,

প্রেম সঙ্গ বঞ্চিত হতভাগিনী মল্লিকার প্রতি গভীর সমবেদনা গল্পকার প্রকাশ করেছেন। সব মিলিয়ে 'ডাকিনী' ছোটগল্পটি প্রমথনাথের অনবদ্য শিল্প সৃষ্টি। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে এখনও ডাইনী অপবাদ নিয়ে অনেক নিষ্পাপ মেয়ের মৃত্যু ঘটছে।

প্রেম কথাসাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠ উপকরণ ও অবলম্বন। প্রেমকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন ছোটগল্পকার প্রচুর ছোটগল্প রচনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সমাপ্তি' ছোটগল্পে উচ্চশিক্ষিত অপূর্ব কৃষ্ণের সঙ্গে স্বল্প শিক্ষিতা এক মেয়ে মৃন্ময়ীর প্রেমের অনবদ্য রূপ অঙ্কনে রবীন্দ্রনাথ শিল্প সিদ্ধির স্তরে পৌঁছতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথের দালিয়া, 'চোরাই ধন', 'শেষের রাত্রি' গল্পটিও প্রেমের গল্পের পর্যায়ভুক্ত। শরৎচন্দ্রের প্রেমের গল্পগুলি মনস্তত্ত্ব নির্ভর। তাঁর প্রেমের গল্পগুলি জনপ্রিয় সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের প্রেম কোনোটিই সহজ সরল পথে আসেনি—এসেছে জটিল রহস্য ঘেরা পথে। 'কাশীনাথ', 'আলো ও ছায়া', 'অনুপমার প্রেম', 'মন্দির', 'বোঝা', 'পথ নির্দেশ' প্রভৃতি ছোটগল্প বিশ্লেষণ নৈপুণ্যে ও প্রেমের বিন্যাসে শরৎচন্দ্রের আলোচ্য প্রেমের গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ যা বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য। বুদ্ধদেব বসুর প্রেমের গল্পগুলি শিল্পগুণসম্পন্ন। তিনি যে বিশুদ্ধ ভালোবাসার গল্পগুলি রচনা করেছেন তার প্রতিটি গল্পই উপভোগ্য। 'একটি সকাল একটি সন্ধ্যা', 'লাল গোলাপ', 'প্রথম ও শেষ', 'তুমি কেমন আছো' প্রভৃতি গল্পগুলি পাঠক মনে মন কেমন করা ভাব জাগিয়ে তোলে। গল্পগুলি পাঠে পাঠক উপলব্ধি করে জীবনের মূল্যকে। প্রেমের মধ্য দিয়ে হৃদয়ের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। গল্পগুলোতে নেই কোনো বিচ্ছেদ বেদনা, আছে শুধু নায়ক নায়িকার মন দেওয়া নেওয়ার পালা। তাঁর একাধিক গল্পে যে বিচ্ছেদ ব্যথা নেই একথা বলা যায় না। এই ধরনের ছোটগল্প 'আবছায়া', ও 'সুপ্রতিম মিত্র' প্রভৃতি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের বিখ্যাত প্রেমের গল্প 'কলঙ্ক', প্রবোধকুমার সান্যালের সার্থক প্রেমের রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে 'সূচাগ্র' ছোটগল্পে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পলাতকা' একটি সার্থক রোমান্টিক ভালোবাসার গল্প। ভবানী মুখোপাধ্যায়ের প্রেমে আছে কুটিলতা ও জটিলতা। প্রেমের স্বাভাবিক প্রকাশ কিংবা সনাতনী প্রেমের স্পর্শ তাঁর গল্পে খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। তাঁর 'এতটুকু ছোঁয়া' ছোটগল্পটি বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। মনোজ বসুর ছোটগল্পগুলি গ্রামীণ নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারকে নিয়ে লেখা। দাম্পত্য প্রেম ও ভালবাসার ছবিযুক্ত সার্থক ছোটগল্প তাঁর 'হাসি হাসি মুখ', 'একদা নিশীথকালে', 'রাত্রির রোমান্স' প্রভৃতি। সজনীকান্ত দাস লিখেছেন ভালোবাসার গল্প। তাঁর 'আকাশ বাসর', 'পঞ্চম বাহিনী', 'জলের মতো পরিস্কার', 'পাঞ্চালীর স্বয়ম্বর' সার্থক প্রেমের গল্প। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের প্রেমের গল্পে কোনো উচ্ছ্বাস নেই, আছে শুধু জটিলতা আর প্রেমের ছদ্মরূপ। 'প্রাণের মূল্য', 'নতুন ও পুরাতন', 'রহস্য' ছোটগল্পে এই বৈশিষ্ট্যই মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে। শরদিন্দু মুখোপাধ্যায়, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ছোটগল্পকার বিশুদ্ধ প্রেমের গল্প নিয়ে আপন প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন। তারাশঙ্কর, মানিক দুজনেই প্রেমের গল্প লিখেছেন। গল্পগুলিতে জীবন শক্তির আদিমতা প্রকাশ পেলেও গল্পগুলি সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

বিশুদ্ধ প্রেমের গল্পগুলি লিখেছেন। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বিশুদ্ধ প্রেমের গল্পগুলি পুষ্পগন্ধের মতো স্নিগ্ধ ও অরুণোদয়ের মতো রক্তিম। তাঁর ছোটগল্পে প্রেমের সঙ্গে কৌতুকের সার্থক মেলবন্ধন ঘটেছে। হৈমন্তী গল্পটি বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সার্থক প্রেমের গল্প। সার্থক প্রেমের গল্পকারদের পাশাপাশি প্রমথনাথের প্রেমের গল্প রচনায় সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। 'উল্ট াগাড়ি' প্রমথনাথের একটি সার্থক প্রেমের গল্পের নিদর্শন। প্রথম যৌবনে গল্পকার ভালোবেসেছেন মঞ্জুলাকে। ইতিমধ্যে বহু বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এখানে মঞ্জুলা ও গল্পের নায়ক দুইজনেই প্রবীণ। ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে বসে নায়কের মনে হচ্ছিল তাঁর প্রথম ভালোবাসার কথা। আলাপ সূত্রে প্ল্যাটফর্মের প্রতীক্ষালয়ে নায়কের পরিচয় ঘটল প্রথম প্রেমিকা মঞ্জুলার সঙ্গে। ক্ষণকালের মধ্যেই ট্রেনে চলে গেলে মঞ্জুলা নায়কের মনে রেখে গেল অতীত প্রেমের সুরভি। 'মাধবী মাসি' ও 'ছবি' ছোটগল্পটিও স্মৃতির সূত্র ধরে রচিত। 'চেতাবনী' গল্পে প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে প্রেম পেল সার্থক রূপ। নিঃস্বার্থ প্রেমের নিদর্শন যুক্ত ছোটগল্প 'প্রত্যাবর্তন'। যদিও নিবারণবাবু ও তুলসী একে অপরকে ভালোবেসেছিল কিন্তু তাদের প্রেমে সার্থকতা আসেনি। পরিণতিতে এসেছে চোখের জল। শকুন্তলা গল্পে অতীশ ও মালতীর প্রেম রোমান্সের স্বর্গ থেকে বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছে। প্রমথনাথ প্রেমের গল্প প্রসঙ্গে বলেছেন "ব্যঙ্গ—লেখকের কলমের সঙ্গে প্রেমের বড় আড়াআড়ি। দুয়ে মেলে না, কিংবা মিলতে গেলেও তীক্ষ্ণ কলমের ঠোকরে প্রেমে বিকৃতি ঘটে যায়।"[১৩] তবুও প্রমথনাথের প্রেমের গল্পগুলি পাঠককে এক অনুভবের জগতে পৌঁছে দেয়। গল্পগুলি প্রেম বিষয়ে লেখা গল্পকারদের পাশাপাশি বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে স্থান পাবার যোগ্য।

বাংলা সাহিত্যে রাজনীতি বিষয় নিয়ে ছোটগল্পকারগণ ছোটগল্প রচনায় ব্রতী হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ছোটগল্পে শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের 'দুর্বুদ্ধি' একটি রাজনৈতিক ছোটগল্প। যে গল্পে ইংরেজ শাসনে পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদ। পুলিশ প্রশাসনের মুখোশ তিনি খুলে দিয়েছেন। 'মেঘ ও রৌদ্র' ছোটগল্পে তিনি বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন। 'নামঞ্জুর' ছোটগল্পে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রসঙ্গ আছে। 'উলু খড়ের বিপদ' ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন ইংরেজদের নির্মম প্রজাপীড়নের চিত্র। প্রমথ চৌধুরীর রাজনৈতিক বিষয়ে যে ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে সেগুলি হল 'নীল লোহিতের সৌরাষ্ট্র লীলা' ও 'রাম ও শ্যাম' প্রভৃতি। স্বরাজকে কেন্দ্র করে তৎকালীন কংগ্রেস দলে যে রাজনৈতিক মতবিরোধ তুঙ্গে উঠেছিল তাঁর দুর্বলতাকে লেখক দেখিয়েছেন রাম ও শ্যাম ছোটগল্পে। এই ছোটগল্পে তিনি রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষেপ করেছেন। এখনে রাম চরিত্রে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে লেখক বিশেষ বৈচিত্র্য এনে মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি কংগ্রেসী রাজনৈতিক নেতাদের ভন্ডামিকে ব্যঙ্গের বাণে বিদ্ধ করেছেন 'নীল লোহিতের সৌরাষ্ট্র লীলা' ছোটগল্পে। মনোজ বসুর রাজনৈতিক ছোটগল্পে অত্যাচারিত শোষিত বঞ্চিত মানুষদের সঙ্ঘবদ্ধ ও জোড় প্রতিরোধের

লড়াই প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে। তাঁর 'পৃথিবী কাদের'? 'দিল্লী অনেক দূর', 'ঘরে আগুন', 'হিন্দু মুসলমান', 'সীমান্ত' ছোটগল্পে মনোজ বসুর রাজনৈতিক চেতনার উজ্জ্বল প্রতিফলন ঘটেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রাজনৈতিক ছোটগল্পে ঐক্যবদ্ধ জনতার প্রতিরোধ ও সংগ্রামের চিত্র অঙ্কন করেছেন 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', 'কংক্রীট', 'বাগ্‌দীপাড়া দিয়ে' ছোটগল্প তাঁর প্রমাণ। সুবোধ ঘোষের রাজনৈতিক ছোটগল্পগুলো মূলত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেবাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ। 'আগস্ট' বিপ্লব বা ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা সুবোধ ঘোষের রাজনৈতিক ছোটগল্প 'কালাগুরু', 'শিবালয়' প্রভৃতি। শিবালয় গল্পের নায়ক অনন্তরাম গান্ধিজির আদর্শকে অনুসরণ করে 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' কিংবা 'ইংরেজ হাট যাও হিন্দুস্থান সে' স্লোগান দিয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে। বনফুলের 'ভোটার সাবিত্রীবালা' একটি রাজনৈতিক ছোটগল্প। যে গল্পে সমাজের অত্যাচার ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সাবিত্রীবালা দুর্নীতিগ্রস্থ ভোট প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। প্রমথনাথ বিশী রাজনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ছোটগল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন। তাঁর 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যানিং', 'সিন্ধবাদের অষ্টম সমুদ্রযাত্রার কাহিনী', 'শ্রীভগবান চাই', 'চিত্রগুপ্তের অ্যাড্‌ভেঞ্চার', 'রক্তাতঙ্ক', 'রক্তবর্ণ শৃগাল' প্রভৃতি ছোটগল্পে প্রমথনাথের রাজনৈতিক চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। প্রমথনাথ ছিলেন রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে দক্ষিণপন্থী। কংগ্রেসী মতবাদের প্রতি ছিল তাঁর গভীর আস্থা। বামপন্থী রাজনীতির তিনি বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। বামপন্থীদের সাম্যবাদী মতবাদকে তিনি ব্যঙ্গের বাণে নিক্ষিপ্ত করেছেন। প্রমথনাথের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল রাজনীতি। 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যানিং' ছোটগল্পে রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে শাণিত ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত করেছেন। "এই পকেট কাটার দল সুযোগ পাইলে রাজনীতিক হইত, কিন্তু সেজন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই। কারণ রাজনীতিক হইলে পকেট না কাটিয়া মানুষের গলা কাটিত।"[১৪] 'শ্রীভগবানকে চাই' ছোট গল্পটিও রাজনীতিমূলক। তিনি আলোচ্য গল্পে কমিউনিস্টদের ব্যঙ্গ করেছেন। কমিউনিস্টরা কালমার্কসের মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে ঈশ্বর ও ধর্মকে আফিং-এর নেশা বলে মনে করে। সেই কমুউনিস্টরাই নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যই কমিউনিজমের আদর্শকে অমান্য করে ধর্ম ও পূজা অর্চনা করে। কমিউনিস্টদের প্রতি প্রমথনাথ আলোচ্য গল্পে সরাসরি ব্যঙ্গ করেছেন। 'হাতুড়ি' ছোটগল্পে তিনি কমিউনিস্টদের প্রতি বিদ্রূপ করেছেন। লাল পতাকাবাহী একশ্রেণীর কমিউনিস্ট নেতারাই বাঁ হাত কোমরে রেখে এক দিকে শোষকদের পক্ষ সমর্থন করছে অন্যদিকে তারাই আবার রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে বড় বড় আদর্শের বুলি আওড়াচ্ছে। 'রক্তবর্ণ শৃগাল' ও 'রক্তাতঙ্ক' দুটি ছোটগল্পেই কমিউনিস্ট বিরোধী মানসিকতার পরিচয় সুস্পষ্ট। 'সিন্ধবাদের অষ্টম সমুদ্রযাত্রার কাহিনী' ছোটগল্পে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁর রাজনীতির সম্পর্কে ধারণা কি এই প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করেছেন।

"প্রশ্ন: রাজনীতি কি?

উত্তর: রাত্রের ক্ষুধা উদ্রেক করিবার জন্য বাক্ ব্যায়াম। এই জন্যই অধিকাংশ রাজনৈতিক

সভা সন্ধ্যাবেলা আহুত হয়।"[১৫]

চিত্রগুপ্তের অ্যাডভেঞ্চার ছোটগল্পে প্রমথনাথ বঙ্গদেশের আইন পরিষদের দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ শূল বিদ্ধ করেছেন। "ভোটের জোরে যেখানে যা খুশি করা যায়—এমন কি সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে এই মিথ্যাকেও সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।"[১৬] প্রমথনাথের রাজনৈতিক ছোটগল্পগুলি যখন রচিত হয় সেইসময় বামপন্থীদের প্রভাব ছিল ক্ষীণ। তিনি অনেকক্ষেত্রে কংগ্রেসের ত্রুটি বিচ্যুতিকে বড় করে না দেখে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে শাণিত ব্যঙ্গ নিক্ষেপ করেছেন। এইজন্য তাঁর রাজনৈতিক ছোট গল্পগুলি সাহিত্যিক সততা নিয়ে উপস্থাপিত হয়নি একথা সত্য। তবুও রাজনৈতিক নেতাদের ভন্ডামির বিরুদ্ধে তিনি যে জ্বালাময়ী ব্যঙ্গ লেখনীর আশ্রয় নিয়েছেন তা সর্বযুগের সর্বকালের বাস্তবসত্য বক্তব্য। গল্পগুলির সাহিত্যমূল্য হয়তো উচ্চাঙ্গের হতে পারেনি কিন্তু ছোটগল্পের মাধ্যমে প্রমথনাথ যে রূঢ় বাস্তবকে মূল উপজীব্য করে একটা বিশুদ্ধ আদর্শবান রাজনৈতিক চরিত্র গঠনের স্বপ্ন দেখেছেন সেদিক থেকে তাঁর ছোটগল্পগুলি রাজনৈতিক গল্পধারার এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এ ধরনের গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে স্থান পেতে পারে। তাঁর গল্পরচনার অভিনব কৌশল নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। একজন নিপুণ আর্টিস্টের মতো তিনি যে রাজনৈতিক গল্পগুলি লিখেছেন তা উপেক্ষনীয় নয় বরং তা হৃদয়ধর্মে সমৃদ্ধ।

বাংলা সাহিত্যে পশুপাখিদের নিয়ে রচিত হয়েছে বিখ্যাত ছোটগল্প। মানবেতর প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের সুসম্পর্ক গল্পগুলিতে স্থাপিত হয়েছে। স্নেহ, প্রেম, বাৎসল্য, প্রভুভক্তি নিয়ে লেখা ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' একটা মূক পশুকে অবলম্বন করে লেখা ছোটগল্প। মহেশ হল একটা পোষা ষাঁড়, গফুর ও আমিনা সমাজেব শোষিত মানুষের প্রতিনিধি।—"ঘটনা বিরলতা, কাহিনীর একমুখিনতা ও চরিত্র সৃষ্টির কুশলতার তিন দিকেই মহেশ শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গল্প।"[১৭]

প্রভাতকুমারের 'আদরিণী' একটি বিখ্যাত ছোটগল্প। আদরিণী আসলে একটি হস্তিনী, পশু বিরহে মানুষের চোখে জল আসে তাঁর সার্থক নিদর্শন আদরিণী ছোটগল্পটি। প্রভাতকুমারের আগে কেউ পশুর প্রতি প্রেম ভালোবাসার চিত্র নিয়ে গল্প লেখেননি। তারাশঙ্করের 'কালাপাহাড়' ছোটগল্পে দুটো মোষ একটির নাম কালাপাহাড় অপরটি কুম্ভকর্ণ। রংলালকে বাঁচাতে গিয়ে কুম্ভকর্ণ প্রাণ হারাল, পুলিশের রিভলবারের গুলিতে প্রাণ হারাল কালাপাহাড়, দুটি মোষের মৃত্যু ঘটনা গভীর বেদনাদায়ক। এছাড়া 'গবিন সিং এর ঘোড়া' ছোটগল্পে ঘোড়া, নারী ও নাগিনী ছোটগল্পে উদয় নাগ নামে সাপিনী, 'কামধেনু' গল্পের সুরভি গাই অবিস্মরণীয় পশু চরিত্র। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'কুইনঅ্যান' ছোটগল্পে কুইনঅ্যান একটি খেয়ালি ঘোড়ার নাম। গল্পের এক অবিস্মরণীয় পশু চরিত্র এটি। পাশাপাশি রমেশচন্দ্র সেনের 'সাদা ঘোড়া' একটি উল্লেখযোগ্য পশু চরিত্র। দাঙ্গার শিকার হয়েছে এই মূক পশুটি। গল্পকার হিন্দু মুসলমান এই দুই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্যের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন আলোচ্য ছোটগল্পে। এছাড়া মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

'টিকটিকি', সুমথনাথ ঘোষের 'কুহু', অচিন্ত্যকুমারের 'কাক', জ্যোতিরীন্দ্র নন্দীর 'গিরগিটি', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'শ্বেত ময়ূর', বনফুলের 'বাঘা' নামে একটি কুকুরের গল্প, 'টিয়া', ও 'চন্দনা' ছোটদের জন্য লেখা গল্পগুলি আমাদের মুগ্ধ করে। শরদিন্দুর 'বাঘিনী' গল্পটিতে সৈনিক ও বাঘিনীর ভালবাসার কাহিনী। আদিমতার এমন রূপ বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সৈনিক' আসলে একটি হস্তী। যে মৃত্যুর আগে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। মহারাষ্ট্রের পটভূমিকায় লেখা প্রফুল্ল রায়ের 'বাঘ' ছোটগল্পটি পশুচরিত্র নিয়ে লেখা সার্থক ছোটগল্প। অনিল ঘড়াই এর 'কাক' একটা অন্যতম ছোটগল্প।

পশুচরিত্র অবলম্বনে বিখ্যাত ছোটগল্পগুলির পাশাপাশি প্রমথনাথের পশুপ্রীতি মূলক গল্পগুলির একটা বিশেষ স্থান আছে। গভীর পশুপাখির প্রতি মমত্ববোধ না থাকলে এ ধরনের গল্প লেখা যায় না, প্রমথনাথের পশু চরিত্র অবলম্বনে প্রথম শ্রেণির ছোটগল্পগুলি যথাক্রমে—

'নীলমণির স্বর্গলাভ', 'তিন হাসি', 'কালো পাখি', 'কাকাতুয়া', 'মৌলবক্স', 'কুকুর বিড়ালের কান্ড', 'কোকিল', 'বাহাদুর শার বুলবুলি' ও 'হাতি' প্রভৃতি এছাড়া পশু চরিত্র অবলম্বনে রূপকধর্মী ছোটগল্পগুলি যথাক্রমে 'ভিক্ষুক কুকুর সংবাদ', 'নর পশু সংবাদ', 'রক্তবর্ণ শৃগাল', 'অ্যালসেশিয়ান ডগ্', 'ঘোগ', 'গন্ডার', 'শার্দূল' প্রভৃতি। প্রমথনাথের 'হাতি' ছোটগল্পে এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের শেষ সম্বল হাতিটি একদিন জমিদার কন্যার বিয়ের বন্দোবস্ত করে মধুর মিলনে সহায়ক হতে পেরেছে। প্রমথনাথের 'কাকাতুয়া' ছদ্মনাম চাচাতুয়া, রাধাকৃষ্ণ ও আল্লাতালা এই দুই ধর্মবোধ যে অভিন্ন এই চরম সত্যকে চাচাতুয়ার সুমিষ্ট কণ্ঠে শোনানো ছড়াতে প্রকাশিত হয়। নৈবুদ্দি, গফুর ও আমিনার একান্ত প্রিয় ছিল এই পাখিটি। গভীর মমত্ববোধ আলোচ্য গল্পে উপজীব্য হয়ে উঠেছে। 'নীলমণির স্বর্গলাভ' প্রমথনাথের মানবেতর প্রাণীদের নিয়ে লেখা শ্রেষ্ঠ গল্প। নীলমণি আসলে একটি ভাল্লুক, মাতৃহারা এই ভাল্লুকটি আশ্রয় পেয়েছিল ভাল্লুকওয়ালার কাছে। বন্যার জলোচ্ছ্বাসে ভাসতে ভাসতে একদিন সে চলে যায় এক নতুন জগতে। সেখানে রয়েছে মহুয়ার ফুল মধুর চাক এগুলি খাওয়ার পর দেখল অন্যান্য ভালুকরা তাকে ঘিরে মনের আনন্দে শুকনো পাতার তালে তালে নাচছে। তার কাছে মনে হয়েছে এই স্থানটি স্বর্গভূমি। প্রমথনাথের 'কোকিল' গল্পটিতে আছে একটি রোমান্টিক প্রেমের কাহিনী তাঁর কুহু কুহু ডাক রোমান্টিক নায়ক নায়িকার মিলনাত্মক পরিণতি বহন করে এনেছে। প্রমথনাথের মৌলবক্স হল বাদশা বাহাদুর শার পাট হাতি। যেদিন বাহাদুর শা বন্দী হয় মৌলবক্সের দুচোখ বেয়ে বর্ষিত হয় অশ্রুধারা। যেদিন মাহুত করিম খাঁ মৌলবক্সকে বিক্রি করতে আগ্রহী হয় সেদিন হাতিটি নিভৃতে ফেলে যায় চোখের জল। সন্তাস বেনেকে হাতিটি বিক্রি করে দেওয়ার পর ক্ষুধা ক্ষোভ অভিমান ও দুঃখে বিকট চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। পশু চরিত্রের প্রতি গভীর মমত্ববোধ না থাকলে এ ধরনের গল্প লেখা যায় না। প্রমথনাথের 'বাহাদুর শার বুলবুলি' ছোটগল্পে অবক্ষয়িত বাহাদুর শার শেষ সঙ্গী ছিল বুলবুল-ই-হাজার দস্তান। বাদশাকে সে শোনাত সুমধুর কণ্ঠে গজল গান। বাদশা বন্দী হলে

বুলবুলি পাখিটি শোকে দুঃখে আর শিষ্ দেয়নি, খাদ্য খায়নি এবং গজল গানও শোনায় নি, বাদশা তন্ময় হয়ে তাঁর গান শুনত, বাদশা পারেনি পাখিটির জন্য শাহজাহানাবাদ ছাড়তে। কাকাতুয়া পাখি অবলম্বনে রচিত 'তিন হাসি' ছোটগল্পটি প্রমথনাথের অনবদ্য সৃষ্টি। এই পাখিটি যেন ভবিষ্যত বক্তা। মিঃ রস্টাফ ও সার কোলিনের হিন্দু মন্দির ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র এবং দানিয়েলের রণনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কাকাতুয়ার তীক্ষ্ণ কর্কশ হাসি হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ উচ্চারণ করে ইতিহাসের গতিকে করেছিল নিয়ন্ত্রণ। 'কালো পাখি' একটি অতিলৌকিক ছোটগল্প। গল্পে মিনু ও ঝুমঝুমির মৃত্যুর কারণ হল এই পাখিটি। 'কুকুর বিড়ালের কান্ড' ছোটগল্পে মানুষের চেয়ে কুকুর বিড়ালের ঘনিষ্ঠতা অনেক বেশি তা দেখানো হয়েছে। মানবেতর প্রাণীদের নিয়ে লেখা প্রমথনাথ ছোটগল্পগুলির আবেদন নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে।

রূপক ছোটগল্প ধারা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। রূপক গল্পে থাকে একটি বহিরঙ্গ অর্থ অন্যটি অন্তঃর্নিহিত অর্থ। প্রতিরূপ সৃষ্টির মাধ্যমে মূল বক্তব্যকে তুলে ধরা হল রূপক ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য। এই গল্পগুলি সাধারণত হয়ে থাকে বুদ্ধিপ্রধান। এখানে এক চিরন্তন মহৎ সত্য প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যে রূপকধর্মী ছোটগল্পগুলি লিখেছেন তাঁর মধ্যে 'তোতা কাহিনী', 'একটি আষাঢ়ে গল্প', 'ঘোড়া', 'কর্তার ভূত' বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। স্যাডলার কমিশনের শিক্ষাব্যবস্থার অসংগতিকে রবীন্দ্রনাথ অনবদ্য ভাবে তুলে ধরেছেন তোতাকাহিনীর ছোটগল্পে। খাঁচায় বন্দী তোতাপাখিটির পুঁথিরস্তুপে থেকে একদিন তাঁর মৃত্যু হল, তাঁর পেট থেকে বের হয়ে এল অসংখ্য কাগজপত্র। জীবনের সঙ্গে শিক্ষার যোগ না থাকায় এই শিক্ষা অপমৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল। বনফুলের রূপকধর্মী বুদ্ধিপ্রধান ছোটগল্প হল 'রূপান্তর', 'পাখী', 'ভৈরবী ও পূরবী', 'অতি ছোটগল্প', 'অধরা', 'রূপকথা', 'স্বাধীনতার জন্ম' প্রভৃতি। গল্পগুলির অভিনব ও অনবদ্য বিষয় নির্মাণের সার্থক নিদর্শন। বিষয় গৌরবে শিল্প সার্থক এই গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে আরোও অনেক রচিত হয়েছে। প্রমথনাথ বিশী রূপকধর্মী ছোটগল্প লিখে শিল্প সিদ্ধির স্তরে পৌঁছতে পেরেছেন। জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার বহু বিচিত্র লীলা রহস্যকে অবলম্বন করে প্রমথনাথ এক স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত ছোটগল্পকার হিসেবে পরিচিত হয়ে আছেন। প্রমথনাথের এই ধারার গল্পগুলোর বিষয়, আর্ট ও ফর্ম তাঁর শক্তিমান স্পর্শে সমৃদ্ধ হতে পেরেছে এতে সন্দেহ নেই। 'জামার মাপে মানুষ' একটি রূপক গল্প। গল্পে আসল বস্তুর চেয়ে বাহ্যিক আড়ম্বরকে বড় করে দেখা কতটা অর্থহীন এটাই গল্পের মূল প্রতিপাদ্য। রূপকধর্মী 'রামায়ণের নূতন ভাষ্য' ছোটগল্পে বাঙালির চরিত্রে অপরের ত্রুটি ধরার দিকটি আলোকপাত করা হয়েছে। 'ঘোগ' ছোটগল্পটি রূপক শ্রেণিভুক্ত। গল্পের বাঘ হল অফিসের বড় সাহেব এবং ঘোগ হল অফিসের কেরাণি। বেঁচে থাকার জন্য ঘোগকে চুরি করতে হয়েছে। 'অথ কৃষ্ণার্জুন সংবাদ' গল্পটিও রূপক। রাষ্ট্রযন্ত্রের ধারক ও বাহক হল চোরাকারবারীর প্রতিনিধি কৃষ্ণ ও অর্জুন। তাঁর কেউ মহাভারতের বিখ্যাত চরিত্র নয়। 'ভিক্ষুক কুকুর সংবাদ' রূপকধর্মী ছোটগল্পে মনিব গৃহে কুকুরের স্বাচ্ছন্দ ও ভিক্ষুকের দৈন্যতা দেখানো হয়েছে।

কুকুর ও ভিক্ষুক দুইজন দুইজনের পোশাক বদল করে দেখে কুকুররূপী ভিক্ষুক স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাচ্ছে। সে তার পোশাক বদলাতে অনিচ্ছুক। তাঁর পর আসল কুকুরটি মনিবের ঠেঙানি খেয়ে বিতাড়িত হয়। 'গাধার আত্মকথা' ছোটগল্পে রূপকের আড়ালে শিক্ষকরূপী গাধার আত্মকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বলাবাহুল্য প্রমথনাথ ইংরেজ আমলের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন এই গল্পে। 'বাঁশ ও কঞ্চি' ছোটগল্পে বাঁশ হল জমিদার, কঞ্চি হল নায়েব। রূপকধর্মী এই ছোটগল্পে প্রমথনাথ শক্তি মত্তার পরিচয় দিয়েছেন। 'ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র' ছোটগল্পে বিপুল ক্ষুধা ও বহু ক্ষুধা নামে দুটি বাঘ সুন্দরবনে দক্ষিণ রায়ের রাজত্বে পৌঁছে দেখেছে সেখানে চলছে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে প্রহসন। 'বস্ত্রের বিদ্রোহ' ছোটগল্পটি প্রতীক ধর্মী। এই বিদ্রোহ আসলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের বিদ্রোহ। পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রশাসন যে কোনো বিদ্রোহকে দমন করবার জন্য হিংস্রপথ অবলম্বন করে। শুকনো বস্ত্রে জল ঢেলে দিলে বস্ত্র যেমন করে চুপসে যায় ঠিক তেমনি ইংরেজের পোষা পুলিশ বাহিনীর গুলি বর্ষণে আন্দোলনকারীরা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। এই গল্পে রূপকের আড়ালে প্রমথনাথ শ্রেণি সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরেছেন। প্রমথনাথের রূপকধর্মী রস সার্থক বলিষ্ঠ ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন বাস্তব সমাজ জীবনকে রূপকের মোড়কে মুড়ে প্রমথনাথ যে গল্পগুলি পরিবেশন করেছেন বাংলা সাহিত্যের শিল্প সার্থক এই ছোটগল্পগুলির বিশেষ স্থান আছে এতে সন্দেহ নেই।

বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয় অবলম্বনে রচিত হয়েছে অসংখ্য ছোটগল্প। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, শিখ প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী নরনারীদের নিয়ে রচিত ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বিশেষ করে কয়েকজন লেখকের লেখনীতে যে পারস্পরিক সম্প্রীতিমূলক ছোটগল্প আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে সার্থক ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। শান্তি সম্প্রীতি নিয়ে ছোটগল্পকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও নরেন্দ্রেনাথ মিত্র ছোটগল্প লিখেছেন। তারাশঙ্কর বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়ার, বিভূতিভূষণ যশোহর জেলার, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ফরিদপুর জেলার, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অখন্ডবঙ্গের সব জেলার হিন্দু মুসলমান নরনারীদের নিয়ে যে ছোটগল্পগুলি আমাদের উপহার দিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যের সার্থক সৃষ্টি। যদিও এই গল্পগুলির সময়কাল ছিল সংকটপূর্ণ। এইসময় দেশব্যাপি যুদ্ধ ও ধ্বংসের দামামা বেজে উঠেছে। বন্যা ও মড়কে বিপর্যস্ত হয়েছে সাধারণ মানুষ। দুর্ভিক্ষ ও কৃত্রিম অভাব কেড়ে নিয়েছে মানুষের মুখের গ্রাস, দেশ বিভাগের রক্তাক্ত পথে হাঁটতে হয়েছে মানুষকে। একদিকে বারুদের গন্ধ, মড়ার গন্ধ ও পচা চালের গন্ধ অতিক্রম করে শেফালি ফুলের গন্ধের আশায় মানুষ ছুটেছে। তারাশঙ্কর যাদুকবি, ইমারৎ, রমজান শের আলী, বেদের মেয়ে, নারী ও নাগিনী প্রভৃতি ছোটগল্পে মুসলিম সমাজের দিনলিপি তুলে ধরেছেন। জীবনশিল্পী তারাশঙ্করের কামধেনু ছোটগল্পের নায়ক নাথু ধর্মে মুসলমান হলেও আচার আচরণে হিন্দু। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি না থাকলে নাথু চরিত্র গড়ে উঠত না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যশোহর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ জেলার গরিব

মুসলমান পরিবারের দৈন্য, নিপীড়ন ও লাঞ্ছনার ছবি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর আহ্বান, ফকির, তৃণাঙ্কুর, বারিক অপেরা পার্টি ছোটগল্পে। মুন্সেফ পদে বৃত থেকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ছোট বড় ধনী দরিদ্র উৎপীড়ক উৎপীড়িত মুসলমানদের কাছ থেকে দেখে তাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার চিত্র নিপুণভাবে এঁকেছেন সরবানু রোস্তম, সারেঙ, দাঙ্গা, যতনবিবি, মা, জনমত, খর, তসবির, ডাকাত, ঔষধ, বিড়ি, কেরামত, মাটি, মুন্সি, দলীল ও বদ্যি, কেরোসিন, আমানত, রমজাম, সোনাওল্লা প্রভৃতি ছোটগল্পে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রস, চাঁদমিয়া, দ্বিরাগমন, বন্যা, কেরামত প্রভৃতি ছোটগল্পে মুসলমান সমাজ জীবনকে নিখুঁতভাবে এঁকেছেন। প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পে হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক সম্প্রীতির পরিচয় আছে। প্রাক্ স্বাধীনতা, স্বাধীনতা উত্তর ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রমথনাথ পারস্পরিক সম্প্রীতিমূলক ছোটগল্পগুলি আমাদের উপহার দিয়েছেন। সিংহ চর্মাবৃত গর্দভ ছোটগল্পে দ্বিজাতিতত্ত্ব ও সাম্প্রদায়িকতার কুৎসিত দিকটি লেখক আলোচ্য গল্পে আলোকপাত করে হিন্দু মুসলমানদের পারস্পরিক সম্প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। টিকি গল্পে হিন্দু মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক বিরোধ কতটা দেশের বিপর্যয় ডেকে আনে লেখক তাঁর চিত্র তুলে ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা ব্যক্ত করেছেন। ওরা ছোটগল্পে ভাষাগত ঐক্যের প্রসঙ্গ ব্যক্ত হয়েছে ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছোটগল্পে হিন্দু মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের বিপর্যয়ের চিত্র ও বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক সম্প্রীতির প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। দক্ষিণ রায়ের দাক্ষিণ্য গল্পে হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক ঐক্যের প্রশ্নে রাম ও রহিম এই দুই চরিত্রের মাধ্যমে লেখক কাহিনীকে পল্লবিত করেছেন। ইয়া-সিন-শর্মা অ্যান্ড কোং ছোটগল্পটি হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক সম্প্রীতি মূলক। মুসলমান শ্রেণির প্রতিনিধি ইয়াসিন ও হিন্দু শ্রেণির প্রতিনিধি গোপালের পারস্পরিক সহাবস্থান দেখিয়েছে। শিখ ছোটগল্পে প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চিত্র নিখুঁত ভাবে এঁকেছেন। হিন্দু প্রধান মুকুন্দপুর গ্রাম ও মুসলমান প্রধান আকন্দপুর গ্রামে যে গণহত্যা শুরু হয়েছিল সেইসময় একজন পাগল রূপী ব্যক্তিকে দুর্ধর্ষ শিখ ভেবে দুই গ্রামে যে নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়েছিল তা গল্পটিকে অন্য মাত্রা দান করেছে। প্রমথনাথের পারস্পরিক সম্প্রীতি মূলক ছোটগল্পগুলি স্বাধীনতার কিছু আগে ও কিছু পরে দেখা রাজনৈতিক ডামাডোলের বিষয় প্রধান উপজীব্য হলেও সমকালের পাঠক মানসে বিশেষ সাড়া জাগাতে পেরেছে সন্দেহ নেই। গল্পগুলি যুগোত্তীর্ণ না হলেও গল্পের কাহিনী বয়নে, চরিত্র সৃষ্টিতে নাটকীয়তায় গল্পগুলি অভিনবত্বের দাবি রাখে। পারস্পরিক সম্প্রীতি মূলক প্রমথনাথের ছোটগল্পগুলির বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থান আছে এতে সন্দেহ নেই।

প্রমথনাথের ছোটগল্পে সংবাদধর্মিতার ছাপ আছে। তিনি অনেক ছোটগল্প পরিবেশনের ক্ষেত্রে সাংবাদিকের ঢঙে লিখেছেন। আমরা জানি যে কোনো ছোটগল্পকারকে গল্প রচনার ক্ষেত্রে দুটো স্টাইলের মধ্যে যে কোনো একটিকে বেছে নিতে হয়। একটি স্টাইল হল পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থাৎ পূর্ব থেকেই গল্পের কাহিনী চরিত্র, শুরু ও শেষ, সংলাপ,

নাটকীয়তা কবিত্ব গুণ, ভৌগলিক পরিবেশ ভাষা অনুসরণে গল্প লেখেন। গল্পের বৃত্ত সেখানে থাকে নিটোল ভাবে। অপর শ্রেণির গল্প রচিত হয় গল্পকারের খেয়াল অনুসারে। এই ধরনের গল্পে যদিও গল্পকারকে কাহিনী আগে থেকে ভেবে নিয়ে আপন খেয়ালে লিখতে হয়। পূর্ব পরিকল্পিত ছোটগল্পে প্লট অনেকটা ঠিক থাকে বলে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের স্থান সেখানে থাকে না। খেয়াল অনুসারে লেখা ছোটগল্পে গল্পের প্লট থাকে না এজন্য গল্পের কাহিনীর গতি চরিত্রের তর্ক বিতর্কের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যায় এবং বিচিত্রগামী পথে এগিয়ে গিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। এভাবে চলাতে গল্প লেখকের থাকে পূর্ণ স্বাধীনতা, হঠাৎ বাঁক পরিবর্তন এসে যায় এবং নিজস্ব মর্জির উপর চলে বলেই অপ্রয়োজনীয় কিছু কথা গল্পে স্থান পায়। ফলে এতে সময়ের বাঁধন থাকে না। প্রমথ চৌধুরী খেয়াল অনুসারে ছোটগল্প রচনার অন্যতম পথিকৃৎ।

প্রমথ চৌধুরী খেয়াল অনুসারে অনেক গল্প লিখেছেন—গল্পের মুক্ত স্বচ্ছন্দ বিহার আছে ফরমায়েশি গল্পে, নীল লোহিতের সৌরাষ্ট্রলীলায়, নীল লোহিতের স্বয়ম্বরে, ঘোষালের হেঁয়ালিতে। ধূর্জটিপ্রসাদের মতে, "এইসব ক্ষেত্রে ভাষার দক্ষতা ও গতির মোড় ফেরাবার বুদ্ধিটাই মুখ্য এবং এই সব বুদ্ধি প্রমথ চৌধুরীর ছিল বলেই তিনি এই ধরনের গল্প লিখতে ভালোবাসতেন।"[১৮]

প্রমথ চৌধুরীর উত্তরসূরী প্রমথনাথ বিশী খেয়াল অনুসারে ছোটগল্প রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর গল্পে অবান্তর প্রসঙ্গ থাকলেও গল্পগুলি অনুভববেদ্য সন্দেহ নেই। সাংবাদিকতার জগৎ সম্পর্কে কর্মসূত্রে তাঁর পরিচয় ছিল বলেই বহু গল্প তর্ক বিতর্ক ও কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে। জি.বি.এস. ও প্র.না.বি. ছোটগল্পে সংবাদ জগতের নিত্য নূতন চাঞ্চল্যকর খবর সংগ্রহের সমস্যার কথা বর্ণিত হয়েছে। অনেক সময় সংবাদ নূতন ভাবে বানিয়ে নিয়ে পরিবেশন করা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই—"মাকড়সা যেমন করিয়া নিজেরা রস দিয়া জাল বুনিয়া তোলে, তেমনই করিয়া চিন্তা রসের দ্বারা সংবাদ বয়ন করিবে।" কবির আশ্বাস মনে পড়িল—"ঘটে যা তা সত্য নহে, যা ভাবিবে সেই সত্য।"[১৯] আধুনিক দেশীয় সংবাদপত্র সম্বন্ধে কাল্পনিক সংবাদ পরিবেশনের ব্যাপারে লেখককে অপ্রিয় সত্য কথা বলতে হয়। পরিস্থিতি গল্পটিতেও সংবাদধর্মিতার ছাপ সুস্পষ্ট। পত্রিকা সম্পাদক বিভাগে কাজের অভিজ্ঞতার কথা আলোচ্য গল্পে বিশ্লেষিত হয়েছে। পত্রিকা সম্পাদককে নিয়ে তিনি রঙ্গ রসিকতা করে ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষেপ করেছেন। প্রমথনাথ এই গল্পে লিখেছেন—

"আমি একাধারে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। সপ্তাহে ছয়দিন আমি সাংবাদিক, সপ্তম দিনের সেই আমিই সাহিত্যিক।....মাথার উপরে বিদ্যুতের আলো জ্বলিতেছে, বাঁ হাতের রয়টারের সংবাদের কাগজের খন্ড, ডান হাতে কলম, কোলের কাছে সাদা কাগজ, সম্মুখে চলন্তিকা অভিধান আর আমি অবলীলাক্রমে অভিধান ও ব্যাকরণের ট্রেঞ্চ ও সিগফ্রিড লাইন অতিক্রম করিয়া সাংবাদিকতার সর্বধ্বংসী ট্যাঙ্ক চালাইয়া দিয়াছি। শুনিয়াছি ট্যাঙ্ক ভেদী কামান বাহির হইয়াছে, কিন্তু আমাদের কান্ডজ্ঞানহীনতাকে ভেদ করিতে পারে এমন

কামান কোথায় আছে? মনুষ্যত্ব বোধ থাকলে খাঁটি সাংবাদিক হওয়া যায় না—তোমার মধ্যে এখনো মনুষ্যত্ব আছে, পূর্ণভাবে সাংবাদিকত্ব জাগে নাই।....তোমার চাকরি গেল।"[২০]

কাঁচি গল্পটি রিপোর্টধর্মী। গন্ডার গল্পটি সংবাদিকধর্মী। পত্রিকার সম্পাদক হতে গেলে সম্পাদক ও সাংবাদিকের গায়ের চামড়া গন্ডারের মতো শক্ত করতে হয়। শেষ পর্যন্ত গণেশের শক্ত চামড়ার খ্যাতি আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এতদিন পর্যন্ত তাদের ধারণা ছিল যে তাদের চামড়াই মোটা কিন্তু এখন তাদের সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তাই সেই ভুল সংশোধনের জন্য গণেশের চামড়াটি প্রয়োজন। ফলে সেই চূড়ান্ত রঙ্গ—ট্রাজেডি ঘটেছে এইভাবে—"গন্ডার রাজ বলিল—তোর প্রবন্ধের উপর আমার লোভ নেই। লোভ তোর চামড়াখানার উপরে। এই বলিয়া সে তীক্ষ্ণ খড়গের আঘাতে গণেশের দেহ চিরিয়া ফেলিয়া তাহার চামড়াখানি খুলিয়া লইয়া বেশ সযত্নে ভাঁজ করিয়া ছোট একটি সুট্‌কেসে পুরিয়া পুনরায় শীত বস্ত্রাদি গায়ে জড়াইয়া হেলিতে দুলিতে প্রস্থান করিল। গণেশের চর্মহীন রক্তাক্ত দেহ টেবিলের উপর পড়িল। খানিকটা রক্ত ছুটিয়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধের একটি ছত্রের নীচে গিয়া পড়িল। সকলে ভাবিল, সম্পাদক ছত্রটিকে লাল কালিতে আন্ডার লাইন করিয়া দিয়াছেন। সেই ছত্রটি তুলিয়া দিয়া আমার গন্ডার—জীবন কাহিনীর অবসান করিলাম কর্মের দৃঢ়তাই মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব।"[২১]

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার প্রতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের তরবারি প্রমথনাথের কলমে দীপ্ত হয়েছে। খেয়াল অনুসারে রচিত স্বনির্বাচিত গল্পগ্রন্থের শেষ গল্প ভগবান কি বাঙালি তে সাংবাদিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। গল্পটি বঙ্কিমী ঢঙে প্রমথনাথ পরিবেশন করেছেন। 'প্র.না.বির সঙ্গে ইন্টারভিউ', 'প্র.না.বির কথোপকথন', 'সিন্ধবাদের অষ্টম সমুদ্রযাত্রার কাহিনী', 'সাহিত্যের তেজী মন্দা', 'সাপে বর' প্রভৃতি ছোটগল্পের প্লট পরিকল্পিত নয়। এর সমাপ্তি অংশটিও খেয়ালিচালে লেখা হয়েছে। অবান্তর ও অনাবশ্যক কথা লেখক স্বাধীনভাবে গল্পে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু গল্পগুলিতে সাহিত্য রসের অভাব ঘটেনি। গল্পের বিভিন্ন আঙ্গিকের মধ্যে প্রথমনাথের রিপোর্টস ধর্মী ছোটগল্পগুলিতে ছোটগল্পের গতানুগতিক বৈশিষ্ট্য হয়ত নেই তথাপি যে বিচিত্র স্বাদের গল্প লিখে ছোটগল্পকে একটি জাতে তুলেছেন পাঠক মাত্রেই তা স্বীকার করে নেবেন। রবীন্দ্রোত্তর ছোটগল্পের জগতে প্রমথনাথের স্বাতন্ত্র্য এখানেই। তাঁর রিপোর্টধর্মী ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সংযোজন। এদিক থেকে বাংলা ছোটগল্পের জগতে প্রমথনাথের একটা বিশেষ স্থান আছে একথা স্বীকার করে নিতে হবে।

ছোটগল্পের পরিসর অত্যন্ত সীমিত, সেখানে ব্যক্তি চরিত্রের উজ্জ্বল আত্মপ্রকাশ নেই। তারা স্বল্পকাল অবস্থান করে। তাদের ক্ষণিক আবির্ভাব তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। ঘটনাপ্রধান গল্পে চরিত্রের স্থান গৌণ এবং চরিত্র প্রধান গল্পে চরিত্রের স্থান মুখ্য। চরিত্র প্রধান গল্পে চরিত্রের অতীত ঘটনা সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরা হয়। তারপর তমসাময়ী রাতের আকাশের ধ্রুবতারার মতো চরিত্র স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় এবং অন্তর্গূঢ় ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটে। প্রমথনাথের গল্পের চরিত্রগুলি স্বাতন্ত্র্য দীপ্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কোনো গল্পে

চরিত্র হয়ে উঠেছে প্রতিবাদ দীপ্ত। যদিও সার্থক ছোটগল্পে জীবনের খন্ডাংশ অর্থাৎ জীবনের চলমান মুহূর্তকে অবলম্বন করে চরিত্রের মানস জগৎ উদ্‌ঘাটিত হয়। প্রমথনাথের কলমে চরিত্র চিত্রণের সময় রাউন্ড চরিত্রে দ্বন্দ্ব জটিল ঘটনা এবং ফ্ল্যাট চরিত্র অনেকটা একরঙা যার কোনো বিবর্তন নেই এরূপ চরিত্র দিয়ে গল্পের কাহিনী আবর্তিত। প্রমথনাথের ছোটগল্প যেন চরিত্র চিত্রশালা সমাজের প্রতিটি স্তর থেকে উঠে আসা চরিত্রগুলি এক অপরূপ শিল্প প্রতিমার সৃষ্টি করেছে সেই সঙ্গে লেখকের জীবন দর্শন বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে উপজীব্য হয়ে উঠেছে।

প্রমথনাথ বিশীর ছিল অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তি। এই শক্তিবলে তিনি সচেতন ভাবে মানব জীবনের সন্ধান করেছেন। শিক্ষাবিভাগে ও পত্রিকা বিভাগে কর্মসূত্রে যুক্ত থেকে জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে দেখেছেন মানুষকে। চরিত্রমুখ্য ছোটগল্পগুলি তাঁর উজ্জ্বল প্রমাণ। ভাঁড়ু দত্ত, জগবন্ধুর মোহমুক্তি, নিচ্ছ ধনের পরীক্ষা প্রভৃতি চরিত্রগুলি টাইপ বা ফ্ল্যাট। 'শকুন্তলা', 'সুতপা', 'প্রফেসার রামমূর্তি', 'মহামতি রাম ফাঁসুড়ে', 'নগেন হাঁড়ীর ঢোল', 'নানাসাহেব', 'রাধারাণী' প্রভৃতি ছোটগল্পে পুরুষ ও নারী চরিত্রের বিচিত্র সত্তার পরিচয়, প্রকৃতি ও আচরণ জীবন্ত ভাবে দেখা দিয়েছে। চরিত্রগুলিতে একদিকে আছে আর্তি, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, অনিবার্য রহস্য, অনমনীয়তা, অধ্যবসায়, সাফল্য, ব্যর্থতা, হিংসা ক্রুরতা, দয়া, মায়া ও প্রেম। বাংলার মাটি থেকে জীবন রস আস্বাদন করে তিনি যে ছোটগল্পের নৈবেদ্য সাজিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। বর্ণনার গুণে প্রমথ সৃষ্ট ছোটগল্পের চরিত্রগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁর গল্পগুলিতে চরিত্রের তেমন ভীড় নেই, গৌণ চরিত্রগুলি যা এসেছে তা গল্পের প্রয়োজন। পুরুষ ও নারী এই দুধরনের চরিত্রকে প্রমথনাথ শিল্প সম্মত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, নারী চরিত্র সৃজনে প্রমথনাথের দক্ষতা আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। তুলসী, শমিতা, বিনুনী, হেমনলিনী, কমলা, প্রমিতা, শকুন্তলা, সুতপা, নিরুপমা, সুলতা, মঞ্জুলা, মাধবী মাসি প্রভৃতি নারী চরিত্র প্রমথনাথের অনবদ্য সৃষ্টি। তাঁর লেখনীতে পুরুষ চরিত্রগুলো রক্ত মাংসে গড়া। চরিত্র প্রধান গল্পগুলি প্রমথনাথের বর্ণনা গুণে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে। প্রমথনাথ ছোটগল্পে যে চরিত্রগুলি অঙ্কন করেছেন তাঁর ভৌগোলিক পটভূমি গ্রাম ও শহর দুটোকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। উত্তরবঙ্গের রাজশাহী, পাবনা প্রভৃতি জেলা, বীরভূম, কলকাতার পার্শ্ববর্তী গ্রাম, বিহারের সিংভূম জেলা, দিল্লির নিকটবর্তী স্থান প্রভৃতি ভৌগোলিক পরিবেশ ঘটনা ও চরিত্র সার্থকভাবে ছোটগল্পে উপস্থিত হয়েছে। প্রমথনাথের চরিত্রগুলি বাস্তবধর্মী সন্দেহ নেই। চরিত্র নির্মাণে কল্পনার সঙ্গে সম্ভাব্য সত্যের মেল বন্ধনে প্রমথনাথের কৃতিত্বে অবিসংবাদিত। মানুষকে তিনি প্রাণভরে ভালবেসেছেন। মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা তিনি উজাড় করে দিয়েছেন বলেই মানব দরদী ছোটগল্পকার হিসাবে প্রমথনাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। মানব দরদী না হলে প্রমথনাথ পেশকার বাবু, গদাধর পণ্ডিত, শিবু, নগেন প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টি করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। তাঁর গল্পে বিভিন্ন চরিত্রের আদর্শবাদের সঙ্গে মানবতাবাদের লড়াইতে মানবতাবাদের জয় ঘোষিত হয়েছে। তাঁর সৃষ্ট গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের প্রতি

পাঠকের সমবেদনা ও সহানুভূতি জাগ্রত হয়। এইভাবেই মানবতাবাদের পাঠ নিয়েছেন বলে প্রমথনাথ একজন সফল ছোটগল্পকার।

ছোটগল্পে চরিত্র প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে রূপ, বর্ণনায় অনেকক্ষেত্রে পোশাক পরিচ্ছদ ও গৃহের সাজসজ্জায় চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ধরা পরে। প্রমথনাথের অনেক ছোটগল্পে দৈহিক আকৃতি বা রূপের সঙ্গে পোশাক পরিচ্ছদের বর্ণনায় চরিত্রের মুল বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। 'চেতাবনী গল্পে' বিনুনির নিজের বলে কিছু নেই, থাকবার মধ্যে আছে শুধু মুখের হাসিটা। তাঁর কচি কণ্ঠের হাসি জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের শিখা সমূহের মধ্যবর্তিনী জানকীর মতো, প্রতিনিয়ত হো হো, হি হি করে হাসে। লাবণ্যময়ী এই মেয়েটির মুখের হাসিতে একটি স্নিগ্ধ মধুর সরলা অপাপবিদ্ধ স্বভাব সুন্দর রূপ প্রকাশিত হয়েছে। দৈহিক চিত্র চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশের ক্ষেত্রে যে একটা বিশেষ কৌশল প্রমথনাথ সে বিষয়ে ছিলেন সচেতন। শিখ ছোটগল্পে মুকুন্দপুর ও আকন্দপুর এই দুটি গ্রামের শিখের আবির্ভাব নিয়ে যে ডামাডোল শুরু হয়েছিল প্রমথনাথ বাঙালি ছদ্মবেশী শিখটির দৈহিক বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে। "পশ্চিমে হিন্দুর নাম শিখ, লম্বা চওড়া চেহারা মস্ত চুল, ইয়া গোঁফ দাড়ি, হাতে লোহার বালা।"[২২]-- ছেলে হারানো ভদ্রলোকটি তাঁর ছেলের বর্ণনা থেকে জানা গেল ছেলের প্রকৃত গঠন। ছেলেটির দীর্ঘ আকৃতি, চুল দাড়ি অনেককাল না কাটার ফলে লম্বা হয়েছে। কারো সঙ্গে কথা বলে না, আপন মনে বিড়বিড় করে, একা থাকতে সে ভালবাসে, তার বাঁ হাতে আছে একটি লোহার তাগা। প্রমথনাথের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি একটি শিখকে নিয়ে যে আতঙ্ক দুটি গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল আসলে সে শিখ নয় এক বাঙালি যুবক।

রাজ্যসভার সান্ধ্য অধিবেশনে রাজকবি সদ্য প্রণীত কাব্যপাঠ করবেন এই উপলক্ষ্যে প্রমথনাথ অসমাপ্ত কাব্যগ্রন্থে চরিত্রের ব্যক্তিত্ত্ব প্রকাশের জন্য উপবিষ্ট ব্যক্তিদের দৈহিক আকৃতি বা রূপের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অর্থবহ হয়ে উঠেছে। "রাজসভার মধ্যস্থানে সিংহাসনোপোরি মহারাজা উপবিষ্ট, তাহার বামে যুবরাজ কুমারগুপ্ত, দক্ষিণে শুভ্রকেশ, শুভ্রবেশ কুলগুরু, আরোও বামে স্বাধীন ও মিত্র নৃপতিগণ, আরোও দক্ষিণে ভারতের যাবতীয় কবি ও পণ্ডিতগণ। পণ্ডিতগণের মধ্যে; তারাগণের মধ্যে বৃহস্পতির ন্যায় আলংকারিক শ্রেষ্ঠ দিঙ্‌নাগাচার্য উপবিষ্ট; তিনি বৃদ্ধ কিন্তু শরীর যেন ঋজু ও সবল, চোয়াল ভারী, মস্তক প্রকান্ড, প্রকান্ড একটা হাতুড়ির ন্যায়, ঐ হাতুড়ির আঘাতে কতো কবি যশঃপ্রার্থীর যশংস্তম্ভকে ভূগর্ভে সমূলে তলাইয়া দিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই; স্বয়ং সরস্বতী তাঁহাকে ভয় করিয়া চলেন; তাঁহার মস্তকের চারিদিক ক্ষুর দিয়া কামানো মাঝখানে একগুচ্ছ দীর্ঘ কেশ, দিঙ্‌ নাগাচার্য দুর্ধর্ষ দ্রাবিড়ী পণ্ডিত, তাহার পার্শে বসিয়াছেন রাজসভার প্রাচীন কবি দেবভট্ট।

সিংহাসনের সম্মুখে অদূরে, সিংহাসনের দিকে মুখ করিয়া শ্বেত প্রস্তরের সামনে কালিদাস উপবিষ্ট; তাঁহার কণ্ঠে শ্বেত উত্তরী ও শ্বেত পদ্মের মালা, কুঞ্চিত কেশ দামে একটি আকন্দ ফুলের মালাজড়িত, সম্মুখে তাঁহার ভূর্জ পত্রের পুঁথি, সদ্য প্রণীত কুমার সম্ভবম্ মহা কাব্যম্।"[২৩]

আলোচ্য বর্ণনা অংশে আমরা কুমার গুপ্তের রাজসভার একটি নিখুঁত চিত্র লক্ষ্য করি। এর মধ্যে দিঙ্ নাগাচার্যের ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্য, দেব ভট্টের কবিত্ব এবং মহাকবি কালিদাসের নূতন কাব্য প্রকাশের এক অনবদ্য সৃষ্টি হয়েছে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রমথনাথ রাজসভার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অনবদ্য।

সেকেন্দার শা-র প্রত্যাবর্তন ছোটগল্পে গৌর দাসের যে পোশাক পরিচ্ছদ ও দৈহিক বর্ণনাটি দিয়েছেন তাতে ব্যক্তি চরিত্রটির স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছেঃ

"বিদেশী যতদূর সম্ভব কৃশ, নাতিখর্ব, নাতিদীর্ঘ পরনে মূল্যবান রঙিন পট্টবাস; সম্মুখে অকারণ একটা কুঞ্চিত অংশ মাটি পর্যন্ত দোদুল্যমান; গায়ে চিত্র—বিচিত্র রঙিন আঙরাখা, পায়ে ময়ূরপঙ্খী পাদুকা; কণ্ঠে সূক্ষ্ম স্বর্ণহার, কানে কুন্ডল, অনাবৃত মস্তকে কেশদাম তরঙ্গি-ত, কোটরগত চক্ষুতে এক সঙ্গে ভীতি, চাতুরী ও কৌতূহল; নাসাগ্র আত্মম্ভরিতায় উদ্ধত; সূক্ষ্ম চিবুকে চারিত্রিক দৃঢ়তার ও মানসিক স্থিরতার অভাব; অসমান দন্তপঙক্তি তাম্বুলরাগে রঞ্জিত; জীর্ণ তম্বুরার মতো দীর্ঘ ও মলিন কণ্ঠে অনেকগুলি শিরা—উপশিরা দৃশ্যমান; আর দেহটি বার্তাহত গুবাকতরুর মতো সর্বদা যেন কম্পিত, একদন্ড স্থির হইয়া থাকে না।"[২৪]

ব্যক্তি চরিত্রের এই অন্তর্নিহিত অনন্যতা প্রশংসার দাবি রাখে। চরিত্রটির চিন্তা চেতনার সঙ্গে রঙ ও রেখাভঙ্গি অনবদ্য।

আবার অতিপ্রাকৃত শ্রেণির গল্পে আলোআঁধারি দর্পণ প্রতিবিম্বিত হয়েছে চরিত্রের ভয় জাগানো ঘটনা ও পরিস্থিতিতে। 'ভৌতিক চক্ষু' গল্পে মিঃ জন ফস্টার ও রিচার্ডস চরিত্রে সরলা সেফিয়ার হিংস্র রূপ দেখে ভীতির সঞ্চার ঘটেছে। 'খেলনা' একটি অতিপ্রাকৃত গল্প। এই গল্পে গদাধর চরিত্রে মেয়ের খেলনাকে নিয়ে এক আনন্দঘন পরিমন্ডল গড়ে উঠেছে। গল্পকথকের মনে ফাঁসি গাছকে নিয়ে গা শিহরণ জাগানো পরিমন্ডল সৃষ্টি হয়েছে। পুরন্দরের পুঁথি গল্পে পুরন্দরের চিত্ত বিকার অতিলৌকিক প্রতীতি জাগাতে পেরেছে। কিভাবে একটা চরিত্রকে শিল্পসার্থক করে তোলা যায় এব্যাপারে প্রমথনাথ একজন নিপুণ কারিগর।

প্রমথনাথ হৃদয়ের রস অভিষিক্ত করে যে চরিত্রগুলি সৃষ্ট করেছেন সেই চরিত্রগুলি সর্বজনীন আবেদনে সমৃদ্ধ। তাঁর সৃষ্ট যুগোত্তীর্ণ চরিত্রযুক্ত বিশিষ্ট ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে স্থান পেতে পারে তা হয়তো বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রমথনাথ বর্ণিত সমাজ অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি আজও অমর হয়ে আছে। আশ্চর্যভাবে তিনি কাহিনী ও চরিত্রের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য বজায় রেখেছেন—যা ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়।

বাংলা সাহিত্যে প্রমথনাথের স্থান কোথায় তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ছোটগল্পের লক্ষণগুলি তাঁর সাহিত্যে কতটা সার্থকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা বিচার করে দেখা যেতে পারে। ছোটগল্পের বিষয় ও বক্তব্যই শেষ কথা নয়, শেষ কথা হল তাঁর শিল্পকর্ম। একজন সচেতন শিল্পী অভিজ্ঞতা অনুভূতির সঙ্গে শিল্প কর্মের সামঞ্জস্য বিধান করেন।

খন্ড খন্ড শিল্পের উপাদানের সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমে এক অখন্ড শিল্প মূর্তি গড়ে তোলেন প্রত্যেক সাহিত্যিক। অন্তরঙ্গ ও বহিঃরঙ্গের মিলনেই শিল্পের সার্থকতা। তথ্য ও ঘটনার শিল্প সঙ্গতরূপ হল সার্থক সাহিত্য। রূপ ও বিষয়ের সার্থক মিলনের ফলে একটি গল্প পাঠকের কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। প্রমথনাথের ছোটগল্পের শিল্প রূপের পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রথমে আসছি গল্পের আরম্ভের আগে আরেকটি আরম্ভের কথায়। অর্থাৎ সেই আরম্ভ হল গল্পের নামকরণ বা শিরোনাম। প্রমথনাথ শিল্পরূপ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এই সচেতনতার বিশেষ পরিচয় নিহিত আছে তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্পের নামকরণের মধ্যে। ছোটগল্পের নামকরণ তখনই সার্থক হয় যখন নামকরণের মধ্যে গল্পের মূল বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পরে। শিল্পাঙ্গিকটির কি নামকরণ করলে লেখকের বক্তব্যটি সর্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে পাঠক হৃদয়কে স্পর্শ করবে তা নির্বাচনের চাবিকাঠি লেখকের হাতে। ছোটগল্পের নামকরণের পেছনে যে বিষয়গুলির প্রতি শিল্পীর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতে হয় সেইগুলো হল ব্যক্তিমূলক, ঘটনামূলক, ও ভাবমূলক এই তিনটি বিষয়। নায়ক নায়িকা কিংবা কোনো ব্যক্তির খন্ড আচরণ ও জীবনকথা যদি ছোটগল্পের আঙ্গিকে সার্থক ভাবে উপস্থাপিত হয় সেই নামকরণ হল ব্যক্তিমূলক। বিশেষ ঘটনাকে উপজীব্য করে যে ছোটগল্পের নামকরণ করা হয়ে থাকে তা হল ঘটনামূলক নামকরণ। আবার যে গল্পের নামকরণ একটি বিশেষ ভাব, উদ্দেশ্য নীতি, তত্ত্বাদর্শ যদি গল্পে আত্মপ্রকাশ করে সেই গল্প ভাবমূলক গল্প হিসেবে পরিচিত। প্রমথনাথের ছোটগল্পে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ নামকরণ আমরা লক্ষ্য করি। তাঁর গল্পের শিরোনাম দেখেই গল্পপাঠের সূচনাতে আমাদের মনে কিছুটা আগ্রহ ও কৌতূহল জাগে যেমন 'সেই সন্ন্যাসীটির কি হইল', 'আরোগ্য স্নান', 'একটি ঠোঁটের ইতিহাস', 'বিনা টিকিটের যাত্রী', 'ছিন্ন মুকুল', 'কৃষ্ণ নারায়ণ সংবাদ' প্রভৃতি গল্পের শিরোনাম দেখে আমাদের কৌতূহল জাগে। প্রমথনাথ ব্যঙ্গধর্মী নামকরণ করেছেন যেমন 'পক্ষিরাজ গাধা', 'ভেজিটেবল বোম', 'বাজিকরণ', 'চোখে আঙ্গুল দাদা', 'ভারতীয় ব্যাঘ্র ও ভারতীয় নৃত্য', 'চারজন মানুষ' ও 'এক তক্তপোষ' প্রভৃতি ছোটগল্পের নামকরণে তীব্র ব্যঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে। কখনও লেখক ইঙ্গিতময় নামকরণ করেছেন। তাঁর ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ গুলো শিল্পমূল্য বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। অনেক সময় গল্পের নাম দেখেই আমাদের মনে হয় গল্পটি অতিপ্রাকৃত শ্রেণির। 'স্বপ্নাদ্য কাহিনী', 'অশরীরী, স্বপ্নলব্ধ কাহিনী', 'গোষ্পদ' প্রভৃতি অতিপ্রাকৃত পটবিধৃত গল্প। প্রমথনাথের গল্পের নামকরণ শিল্পরূপের পরিচায়ক এতে সন্দেহ নেই।

যে কোনো ছোটগল্পের সূচনা ও সমাপ্তি অংশ সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হলেও তাঁর মধ্যভাগ ও আরম্ভ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। গল্পের সূচনার সময় লেখক গল্পের ধরন সম্পর্কে অনেকটা আভাস দেন। প্রমথনাথ তাঁর গল্প শুরু করেছেন কখনও আত্মকথন ভঙ্গিতে কখনও নাটকীয় সংলাপে, কখনও সাধারণ কথোপকথনের মাধ্যমে, আবার কখনও গল্পের শুরু করেছেন রূপকথার আদলে। আমরা জানি জীবনের খন্ডাংশ অবলম্বনে লেখকের একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা যেখানে পূর্ণতা লাভ করে সেখান থেকেই শুরু হয় ছোটগল্প।

ছোটগল্পের শিল্পরীতির বিচারের সময় আরম্ভ ও সমাপ্তি অংশটি কতটা শিল্প সফল তা পর্যালোচনা করা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কয়েকটি ছোটগল্পের আরম্ভ ও সমাপ্তি অংশটি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত গল্পে আরম্ভ অংশ সম্পর্কে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা একটি পত্রাংশ তুলে ধরেছি—

"আরম্ভটাই সকলের চেয়ে শক্ত এইটার উপরেই প্রায় সমস্ত বইটা নির্ভর করে।"[২৫] সাহিত্যের প্রতিটি শাখার ক্ষেত্রে এই কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। একজন শিল্পীর মুন্সিয়ানা প্রকাশিত হয় তাঁর সূচনা বা আরম্ভের মধ্যে। প্রমথনাথের গল্পে সূচনা অংশটি বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। সহজ সরলভাবে গল্পকার বিভিন্ন চরিত্রের অবস্থা প্রকৃতি ও পরিবেশের সার্থক সুন্দর বর্ণনা দিয়ে গল্পের শুরু করেছেন। রাশি ফল গল্পের শুরুতে "ওরে বাবা অত বড় জ্যোতিষী কলকাতা শহরে আর নেই।"[২৬] শুরুতেই আমরা বুঝে নিচ্ছি গল্পের জ্যোতিষীর সুনামের প্রসঙ্গ। গল্প শেষ করেছেনঃ 'টাকা কয়টি বৃথা খরচ হয় নাই ভাবিয়া এক প্রকার সান্ত্বনা পাইলাম।"[২৭] দুইজন সাহিত্যিকের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে গল্পের মধ্যভাগে তাদের অশান্ত অবস্থা থেকে পরিণতিতে শান্ত অবস্থা লেখক দেখিয়েছেন। অদৃষ্ট সুখী গল্পটি রূপকথার আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে। গল্পের প্রথমেই অদৃষ্ট সুখী চরিত্রের অবস্থা ও প্রকৃতির পরিচয় আমরা পাই। গল্পের মধ্যভাগে এসেছে নাটকীয় চমক এবং কাহিনী শেষ হয়েছে সরস মন্তব্যে—"আঃ বাঁচলাম। সার্থক আমার অদৃষ্ট সুখী নাম।"[২৮]

রাঘব বোয়াল গল্পের আরম্ভ হয়েছে কৌতুককর মন্তব্য দিয়ে—

"অবশেষে ওঙ্কারনাথ স্থির করিয়া ফেলিল যে, অতঃপর সে চুরি করিবে।"[২৯]

ওঙ্কারনাথের করুণ প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করে লেখক অসঙ্গতিজনিত কৌতুক রস পরিবেশন করেছেন—

"দুর্যোধন বলিলেন—দুঃশাসন পান্ডবগণ এখন তো বনে গিয়াছে, আপদ চুকিয়াছে। এইবার বলো পুরীর সংবাদ কি? ইন্দ্রপ্রস্থের নাগরিকগণ শিষ্টভাবে আছে তো? শান্তি ও শৃঙ্খলা লঙ্ঘনে তাহারা এখনো কি তৎপর? যে পান্ডবগণের ভরসায় তাহারা কৌরবগণকে লঘু মনে করিত তাহারা তো অন্তর্হিত, এখন ইন্দ্রপ্রস্থের মনোভাব কি রূপ—সম্যকভাবে সমস্ত আমাকে বুঝাইয়া বলো।"[৩০]

আলোচ্য গল্পের আরম্ভ অংশটি রহস্যে ভরা। পাঠকমনে কৌতূহল জাগানোর জন্যই লেখক সংলাপটির সার্থক প্রয়োগ করেছেন। 'নহুষের অতৃপ্তি', 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র', 'সত্য মিথ্যা কথা', 'নতুন বস্ত্র', 'ছাপ সন্দেশ', 'কল্কি', প্রভৃতি ছোটগল্প আরম্ভ হয়েছে সংলাপের মাধ্যমে অতি প্রাকৃতধর্মী খেলনা গল্পটি শুরু হয়েছে নিম্নোক্তভাবে—

"শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন—ভূতের গল্প গল্পের রাজা। কথাটা মিথ্যা নয়। ভূত আছে কিনা জানিনা তবে গল্পে বর্ণিত ভূত আছে এবং তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করে গল্প বলিবার ভঙ্গির উপরে। হ্যাঁ, বিনয়বাবু গল্প বলিতে পারেন বটে আমরা পাঁচ সাতটি বয়স্ক জীব পততি পতত্রে অবস্থার জড়সড় হইয়া বসিয়া আছি।"[৩১]

প্রমথনাথ যে ভূত ব্রহ্মদত্যির গল্প লিখতে যাচ্ছেন গল্পের প্রারম্ভে সে কথা সার্থক

সুন্দর ভাষায় উপস্থাপিত করেছেন। গল্পটি শুরু ও শেষের মধ্যে আছে এক সম্পূর্ণ নিটোল রূপ। গোষ্পদ ছোটগল্পটি শুরু হয়েছে নিম্নোক্তভাবে—

"যেমনটি শুনেছি বলেছি। কাউকে বিশ্বাস করতে বলি না। কারণ, মানুষের বিশ্বাসের একটা সীমা আছে। প্রথমটা আমি নিজেও বিশ্বাস করিনি, তাঁর পরে যখন গল্প বলিয়ে লোকটার বিশ্বাস হল, তাঁর গল্পটাতেও বিশ্বাস জন্মে গেল তখন।"[৩২] অতিলৌকিক চেতনার যুগে অবিশ্বাস্য সন্দেহ নেই। উপস্থাপন কৌশলে ও কাহিনী বয়নে গল্পটি অবিশ্বাসীর মনেও বিশ্বাস যোগ্যতা এনে দেয়। এটাই প্রমথনাথের অলৌকিক গল্প রচনার কৌশল।

ছোটগল্পের ইঙ্গিতমূলক পরিণতি দুভাবে হয়ে থাকে, একটি হল ব্যঞ্জনাধর্মিতা, অপরটি বক্রোক্তি ও আয়রনির মাধ্যমে। ব্যঞ্জনাগর্ভ উপসংহারের শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় লেখক মোঁপাসা এবং বক্রোক্তিমূলক উপসংহারের লেখক চেকভ। প্রমথনাথের ছোটগল্পের উপসংহারে এই দুই রীতির সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে। শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব ছোটগল্পের সমাপ্তি অংশটিতে আয়রনির অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণতা উজ্জ্বল ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে—

"নৈশাহারের পর শ্রীকান্ত অনেক রাত পর্যন্ত ইন্দ্রনাথকে পতিতাতত্ত্ব, দরদ, অন্নব্রহ্ম, প্রেম (স্বাধীন ও পরাধীন) প্রভেদ নিজস্ব আবিষ্কারের সূত্র কি বুঝিয়েছে, তারপর ঘুমোতে গেছে। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে শ্রীকান্ত দেখে ইন্দ্রনাথ অন্তর্ধান করেছে; সেই সঙ্গে রাজলক্ষ্মীও। দুইজনেই দুটি চিঠি লিখে গেছে। ইন্দ্রনাথ লিখে গেছে ভাই শ্রীকান্ত, তোমার প্রেম ও যৌবনের ডেফিনেশন যেমন সান্ত্বনাদায়ক তেমনি চিত্তাকর্ষক। পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য রাজলক্ষ্মীকে লইয়া সরিয়া পড়িলাম। আমার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এই কল্কেটি রাখিয়া গেলাম। আর কোনো কাজে না লাগে কাগজ চাপার কাজে লাগিবে।"

ইতি

তোমার ইন্দ্রনাথ

"আর এক টুকরো কাগজে রাজলক্ষ্মী লিখেছে সেদিন বৈঁচির মালা দিয়া যাহাকে বরণ করিয়াছিলাম আজও তাহাকে পাই নাই। এখন দেখিব, সে মালা বিনা সুতায় গাঁথা কি তার মধ্যে বন্ধনে আছে। তুমি রোহিনীকে হত্যা করিবার জন্য গোবিন্দলালকে ক্ষমা করিতে পার নাই—দেখিব নিজে কি কর। মনে রাখিও মহৎ প্রেমের ব্যর্থতায়। তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম।"

ইতি

হতভাগিনী রাজলক্ষ্মী

পুঃ- "তোমার বালিশের তলে সিন্দুকের চাবি রহিল। আর ভাঁড়ার ঘরের পশ্চিমের আলমারির উপরের থাকে বাঁদিক হইতে দ্বিতীয় হাঁড়িতে সরের নাড়ু রহিল ও তৃতীয় থাকে কাঁচের বয়ামে কুলের আচার রহিল। মাথা খাও—খাইও। ইতি ইন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ তুমিই প্রকৃত পরার্থপর, পরোপকার তোমার পক্ষে এখন সহজাত। যে রাজলক্ষ্মীকে আমি আস্ত চার চারটা পর্ব বহন করিয়া বিরক্ত হইয়া তাড়াইবার পথ খুঁজিতেছিলাম তুমি এমন সহজে তাহার সমাধান করিয়া দিলে। প্রেম সমুদ্রে যে হলাহল ওঠে তুমি সত্যই তাহার

নীলকণ্ঠ। জীবনে এমন আনন্দ খুব অল্পই পাইয়াছি। সারা বাড়িময় দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। চাকরটা ভাবিল আমি রাজলক্ষ্মীর শোকে ক্ষেপিয়া গিয়াছি। আনন্দ যে কতখানি হইয়াছিল তাহা একটা ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে। রাজলক্ষ্মীর পত্রোক্ত সরের নাড়ু ও কুলের আচার সবগুলি খাইয়া ফেলিলাম। জীবনে এই প্রথম তাহার কথা রাখিলাম। আনন্দ একটু কমিলে প্রথমেই মনে হইল—বাড়ি ছাড়িতে হইবে! প্রয়োজন হইলে এ শহর ছাড়িতে হইবে! কেন না ইন্দ্রনাথই হও আর নীলকণ্ঠই হও—বাবা! রাজলক্ষ্মীকে হজম করিতে পারিবে না। ফিরিয়া আসিয়া আবার না আমার হৃদয়মন্দিরে সে রাহাজানি করিয়া ঢুকিয়া পড়ে।"[৩৩]

'শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব' গল্পে সমাপ্তি অংশটি চিত্তাকর্ষক। পাঠক এই অংশটি পড়ে মুচকি হাসি হাসে। এখানে গল্পটির সাফল্য ও সার্থকতা।

'উল্টাগাড়ি' ছোটগল্পে সমাপ্তি অংশটিতে এসেছে পূর্ণতার দৃষ্টি। "আমার উল্টোগাড়ির ঘন্টা ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া উঠিল। গল্পে শেষে এক করুণ সুরের ব্যঞ্জনা অশ্রুর শিশিরে ঝলমল হয়ে উঠেছে প্রবীণ নায়কের জীবনে। ট্রেন এল ট্রেনে করে চলে গেল প্রথম যৌবনের হরিণের মতো চাহনিযুক্ত মঞ্জুলা কিন্তু শুধুমাত্র নায়কের মনে জাগিয়ে দিয়ে গেল প্রেমের সুরভি।"[৩৪]

প্রমথনাথ গল্পের বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে কোনোটি ছোট, কোনোটি মাঝারি, কোনোটি বড় আয়তনের গল্প লিখেছেন। তাঁর বড় আকারের গল্প 'মহামতি রাম ফাঁসুড়ে', 'ডাকিনী' প্রভৃতি। ছোট আকারের গল্পে অটোগ্রাফ, ভাঁড়ু দত্ত, টিউশন, আর্ট ফর আর্ট সেক প্রভৃতি। অটোগ্রাফ ও টিউশন এক পাতার ছোটগল্প। আমরা জানি একমুখি গতি হল ছোটগল্পের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর কলমে ছোট, মাঝারি ও বড় আয়তনের ছোটগল্পগুলির গতি একমুখিন হয়ে শিল্প সার্থক গল্পে পরিণত হতে পেরেছে।

গল্পের রীতি প্রকরণ গত বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে প্রমথনাথের মুন্সিয়ানার অভাব ঘটেনি। তাঁর সতীন স্বপ্নাদ্য কাহিনী প্রভৃতি গল্প পত্রাকারে লেখা। ভৌতিক কমেডি ছোটগল্পটি সংলাপ মুখ্য। ইতিহাস প্রসিদ্ধ সিরাজদৌল্লা ও ক্লাইভ এই দুই চরিত্রের সংলাপে গল্প কাহিনী শেষ হয়েছে। চরিত্রদ্বয়ের ব্যক্তিত্ব এর মধ্যে নিহিত। নাট্যলক্ষণ নিহিত আছে মহামতি রাম ফাঁসুড়ে, ডাকিনী, বিপত্নীক, কালোপাখি, দ্বিতীয় পক্ষ প্রভৃতি ছোটগল্পে। পাঠকমনে বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টির জন্য উত্তম পুরুষের আত্মকথন ভঙ্গিতে প্রমথনাথের যে গল্পগুলি লিখেছেন তাঁর আবেদন অসাধারণ। বিশেষ করে অতিপ্রাকৃত বিষয়ক ছোটগল্পগুলিতে উত্তম পুরুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। আবার সর্বজ্ঞ লেখকের প্রথম পুরুষের কথন রীতিতে লেখা প্রমথনাথের ছোটগল্পগুলি শিল্প সফল এই ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ ভাবে স্থায়ী আসন অধিকার করেছে এতে সন্দেহ নেই।

একজন সার্থক ছোটগল্পকার ভাষার মাধ্যমে গল্প কাহিনি চরিত্র ও পরিবেশকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে নির্মাণ করেন সৃষ্টির তাজমহল। অর্থবহ শব্দের সাহায্যে ছোটগল্পে গীতিকাব্যের ব্যঞ্জনা, চিত্রকল্প সৃষ্টি হয়। সেই সঙ্গে গল্পকারের জীবন

দর্শন আত্মপ্রকাশ করে ছোটগল্পের মাধ্যমে। প্রকাশ রীতি বা ভাষা বিন্যাসের দ্বারা লেখকের স্টাইল আমাদের চিনে নিতে কষ্ট হয় না। ভাষার সঙ্গে ভাবের ঐক্যের ফলে একটা গল্পের শিল্পরূপ প্রকাশিত হয়। প্রমথনাথ রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পী। রথীন্দ্রনাথ রায় প্রমথনাথের বহু বর্ণ বিলসিত গদ্য শৈলীর প্রশংসা করতে গিয়ে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন—

"কৌতুক কটাক্ষ ও বিদ্রূপ বজ্রাগ্নি থেকে স্বপ্নমধুর তন্ময়তা পর্যন্ত ভাবের বিচিত্র লোকে তার গতি। কোথাও ভাষায় তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের নির্মম কাঠিন্য। কোথাও বুদ্ধিদীপ্ত বাগ্‌বিভূতির স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি, কোথাও বর্ণাঢ্য ভাষার প্রধান দীপ্তি। আবার কোথাও বা লতানমনীয় ভাষার পুষ্পিত মহিমা।"[৩৫]

প্রমথনাথের ভাষায় রয়েছে গভীরতা, বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি, বর্ণ সুষমা ও আলংকারিক কারুকার্য। তাঁর পরিচয় ছড়িয়ে আছে ছোটগল্পের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে। গদ্যরীতির স্বচ্ছ সাবলীল আভিজাত্য ও রাজকীয় মহিমা রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে বিরল। তাঁর ছোটগল্পের ভাষা স্বচ্ছ, দীপ্ত, ঋজু, ওজোগম্ভীর এবং গতিবেগ সম্পন্ন। প্রণবরঞ্জন ঘোষ প্রমথনাথের ভাষা রীতি সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন—"বাংলাগদ্যের সাধুরীতির তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উত্তরসূরী। এযুগে এক মোহিতলাল ছাড়া সাধু গদ্যের এহেন সিদ্ধি আর কারও রচনায় নেই। এদিক থেকে বিদ্যাসাগর—বঙ্কিম—রবীন্দ্রনাথ প্রমথনাথের পূর্বসূরী। পূর্বপুরুষের অভিজাত রুচিই তাঁকে সাধুগদ্যের রাজপথে আহ্বান করেছে। চলিত গদ্যের চেয়ে সাধুগদ্যেই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার। হয়তো অনেক ক্ষেত্রে তথাকথিত চলিত গদ্য কৃত্রিমতায় সাধুগদ্যকেও হার মানায় বলেই তাঁর এই পক্ষপাত। সেদিক থেকে বিবেকানন্দের গদ্যরীতিকেই তিনি চলিত গদ্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ মনে করেন। স্বামীজীর বাঙলা স্টাইল শুধু অপূর্ব নয় তাঁহার ব্যক্তিত্বের একটি বাহন। বাঙলা কথ্য স্টাইলের ইহাই যথার্থ আদর্শ। তাঁহার স্টাইলের তুলনায় হুতোম ও আলোল Vulgar, আর পরবর্তীদের কথ্য স্টাইল সাধুভাষার মতোই, সাধুভাষার চেয়েও অনেক বেশি কৃত্রিম।"[৩৬]

তাঁর ভাষার বিবর্তন বৈচিত্র্যময় সরল ঘরোয়া ভাষা তিনি যেমন ব্যবহার করেছেন তাঁর পাশাপাশি মননধর্মী অলংকৃত ভাষার সার্থক পরীক্ষা করেছেন। সাধু ও চলিত এই দুই রীতিতেই তাঁর ছোটগল্পে লেখা হয়েছে। বিভিন্ন মৃত্যু দৃশ্যের বর্ণনা প্রকৃতি দৃশ্য বর্ণনায় নানা রস সমৃদ্ধ ভাষার সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে।

প্রমথনাথের ছোটগল্পে অনুভূতির বহিঃরঙ্গ দৈহিক প্রতিক্রিয়ায় আবেগ রসাশ্রিত ভাষার অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে। মূলত কারুণ্যের অভিব্যক্তি কতটা শিল্প সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তাঁর দৃষ্টান্তের অভাব নেই বিভিন্ন ছোটগল্পেঃ

(১) 'সেই শীতের রাতেও দুইজনের কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমিতে লাগিল।'

(২) 'বৈজু গাধাটি বিক্রয়ের প্রস্তাব উত্থাপনের পর কথাটি শুনিয়া গাধাটি ও মোতিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল।'

(৩) 'ঐ যে চোখের দৃষ্টি ও শুধু আলোমাত্র নয় ও যেন হিংসার রশ্মি, বিচ্ছুরিত

হচ্ছে কোনো অজ্ঞেয় চৈতন্য কেন্দ্র থেকে, নিক্ষিপ্ত হয়েছে আমার মুখের উপরে।'

(৪) 'মা, তুমি যে এমন করে ফাঁকি দিয়ে যাবে ভাবিনি।'

(৫) 'এবার আমাকে বিদায় দাও মা, ছোট মুখে তোমাদের নিন্দে আর শুনতে পারিনে।'

(৬) 'বাবা আমাকে বাঁচাও' প্রভৃতি।

প্রমথনাথের গল্পে ক্লাইমেক্স ও এ্যান্টিক্লাইমেক্স আছে। দ্বিতীয় পক্ষ ছোটগল্পের ক্লাইমেক্স এসেছে যখন নীলিমা ঘুম থেকে উঠে দেখল তাঁর হাতে একখানা ছবি—রক্তাম্বরা, ফুলসজ্জায় সজ্জিতা, বধূবেশিনী, সেই স্বপ্নে দেখা মেয়েটির ফটোগ্রাফ। এক মুহূর্ত মাত্র, তার পরেই চিৎকার করে উঠিয়া মূর্চ্ছিত হয়ে মেঝের উপরে পরে গেল। আবার গল্পের এ্যান্টিক্লাইমেক্স এসেছে যখন অন্নদাপ্রসাদ তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কথা শুনে নীলিমা বুঝল সেই তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এছাড়া সেই সন্ন্যাসীটির কি হইল, চিত্রগুপ্তের রিপোর্ট, ডাকিনী, অসমাপ্ত কাব্য, নানাসাহেব, গোলাপ সিং-এর পিস্তল প্রভৃতি ছোটগল্পের চরম মুহূর্ত ও হঠাৎ এ্যান্টিক্লাইমেক্স সৃষ্টিতে তিনি মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

ছোটগল্পকে অনেকটা সমৃদ্ধ করতে পারে সার্থক পরিবেশের বর্ণনা। যখন পরিবেশের ভূমিকা অর্থবহ হয় তখন সেই পরিবেশ এনে দেয় বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ। পরিবেশের খন্ড খন্ড চিত্র গল্পকে কাব্যিক সুষমায় মন্ডিত করে। প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে ছোটগল্পকার ল্যান্ডস্কেপ বা চিত্রপট জাগিয়ে দিয়ে এক নিটোল সৌন্দর্য জগৎ সৃষ্টি করেন। প্রমথনাথ তাঁর ছোটগল্পে যে প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা করেছেন তা অনেক সময় অলংকরণের জন্য, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার জন্য কিংবা বিশেষ প্রয়োজনে প্রকৃতির বর্ণনা এসেছে। নিসর্গপ্রীতি রোমান্টিক কবি সত্তার সংযত প্রকাশ এজন্য প্রমথনাথের ছোটগল্প পাঠ করে পাঠক কাব্য সৌন্দর্য অনুভব করে। গীতি কবিতার সুর সেখানে মূর্ত হয়ে ওঠে। 'সাগরিকা', 'ডাকিনী', 'সুতপা', 'আরোগ্য স্নান' প্রভৃতি গল্পে প্রকৃতি প্রেমের সার্থক পরিচয় মেলে। পদ্মাবিধৌত রাজশাহী, পর্বতবেষ্টিত বিহারের ছোটনাগপুর, সিংভূম, মানভূম, দেওঘর এবং কবিতীর্থ শান্তিনিকেতনের রুক্ষ্ম কোমল প্রকৃতি প্রমথনাথের মনে জাগিয়ে তুলেছে এক সৌন্দর্যের জগৎ। ভাষার ইন্দ্রজালে প্রকৃতি প্রেম সার্থক ভাবে তাঁর গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রমথনাথ প্রকৃতিপ্রেম ও মানবপ্রেমের হর পার্বতীর মিলন ঘটিয়ে গীতি কবিতার সুর ও ঝংকার আমাদের শুনিয়েছে। আরোগ্য স্নান গল্পে রামতনু প্রথম দিকের প্রকৃতির প্রতি জেহাদ ঘোষণা করলেও একদিন রামতনুর মধ্যে প্রকৃতি প্রেমিক কবি সত্ত্বার পরিচয় আমরা খুঁজে পাই "সে এক লাফ দিয়া যেন ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িল....তাঁর জ্বরের জ্বালা, অসুখের সন্তাপ যেন অমৃত স্নানে জুড়াইয়া গেল।....রামতনু ভোর পর্যন্ত পাগলের মতো মাঠে, ধান ক্ষেতে, কাশবনে, নদীর তীরে, শিউলি তলায় ঘুরিয়া বেড়াইল। মুক্তির স্বাদ সে পেয়েছে।"[৩৭] এখানে প্রমথনাথের জীবন শিল্পী প্রকৃতি প্রেমিক রোমান্টিক কবি স্বত্ত্বার প্রকাশ ঘটেছে। অতিপ্রাকৃত শ্রেণিভুক্ত 'ফাঁসি গাছ', 'দ্বিতীয় পক্ষ', 'পুরন্দরের

পুঁথি', নিশীথিনী, 'কপালকুন্ডলার দেশে', 'অশরীরী' ছোটগল্পে প্রকৃতি এসেছে গল্পের ভৌতিক পরিমন্ডল গড়ে তোলার প্রয়োজনে। 'অশরীরী গল্পে' লেখক নিসর্গের বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে—"সম্মুখে পাহাড় গড়াইয়া নামিয়াছে, গায়ে গায়ে ছোট বড় বাড়ি, বাগানে বাগানে শীতের মরসুমি ফুল। নিম্নে উপত্যকা, ধানের মাঠ; তখন ধান কাটা হইয়া গিয়াছে, একদিকে শীর্ণ নদী, এখানে ওখানে দেহাতি লোকের ছোট ছোট গ্রাম, উপত্যকার শেষে বন, বনের মাথার উপর দিয়া দিগন্ত ঘেরিয়া অর্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়—মাথায় শাল ও বাঁশের ঘন বন।"[৩৮] এই গল্পে প্রাকৃতিক দৃশ্যময় বর্ণনা গল্পের প্রয়োজনেই এসেছে এখানেই প্রকৃতি প্রেমিক লেখকের মুন্সিয়ানা।

প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পে উপন্যাসের মতো দুই প্রকার রীতির সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে। একটি চিত্ররীতি অপরটি নাট্য রীতি। চিত্ররীতিতে লেখক নিজস্ব অনুভূতির প্রকাশ ঘটাতে পারেন। পাঠকের সঙ্গে লেখকের অনেকটা অন্তরঙ্গতা এই রীতিতে গড়ে ওঠে। আবার নাট্য রীতিতে উপস্থাপন করেন দৃশ্যের পর দৃশ্য। প্রমথনাথের ছোটগল্পের বর্ণনায় এসেছে চিত্র রূপময়তা। সেই সঙ্গে দৃশ্য, ঘ্রাণ এবং বর্ণের সমাহার। এমনি একাধিক দৃশ্যানুগ বর্ণনার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। পরী গল্পে পরীরা আর কেউ নয় তাঁরা হল অবক্ষয়িত মুঘল সাম্রাজ্যের সম্রাটের অন্তঃপুরের তরুণী। ক্ষুধার তাড়ণায় এই তরুণীরা রাতের বেলায় বেরিয়ে পড়ত ভিক্ষা করতে। পরীরূপী বেগম ও তরুণীরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় গোস্ত রান্নার ঘ্রাণ শুনে রান্না শেষে সুযোগ বুঝে কড়াই নিয়ে পালিয়ে যায়। তাঁর এক দৃশ্য লেখক বর্ণনা করেছেন নিম্নোক্তভাবে—

"পরীরদল মুহূর্ত কাল বাহিরে দাঁড়িয়ে থেকে ঢুকে পড়ল ঘরে, আর তারপরে ঘরের লোকজনকে অগ্রাহ্য করে মাংসের হাড়িটা ধরাধরি করে তুলে নিয়ে যেমন নিঃশব্দে ঢুকেছিল তেমনি নিঃশব্দে বেড়িয়ে গেল, আগমন ও নির্গমন দুই ভূমিকা বর্জিত।"

এই দৃশ্যের একপ্রান্তে আছে দর্শক অন্যপ্রান্তে পরী। এর মধ্যে দর্শক ও পাঠকের অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছে। ফলে দৃশ্যটি জটিল হলেও এর চিত্রময়তা গুণ লেখকের কলমে অনবদ্য হয়ে উঠেছেঃ

(ক) দর্শক + বড়েমিএগ্রা

(খ) পরী (আটজন তরুণী) + দর্শক

(গ) বড়ে মিএগ্রা + দর্শক + পরী (আটজন তরুণী) + দৃশ্যটি

(ঘ) পরী (আটজন তরুণী) + দৃশ্যটি + বড়েমিএগ্রা + দর্শক

আলোচ্য দৃশ্যানুগ বর্ণনাটি লেখকের কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এমনি আরেকটি বিচিত্র দৃশ্য প্রদত্ত হল—"তাহাদের মুখে ধইন্যা পাতা ধইন্যাপাতা ধ্বনি; তাহাদের উত্তরীয়, বাবরী, কোচা বাতাসে লটপট করিয়া উড়িতে লাগিল, ময়ুরপঙ্খী জুতো আর্তনাদ তুলিল—সবসুদ্ধ মিলিয়া এক বিচিত্র দৃশ্য।"[৩৯]

গৌড়দেশের ব্যক্তিটির দৃশ্যানুগ বর্ণনা চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে।

ভাব অনুসারে শব্দ নির্বাচন ও বিশেষণ পদের সার্থক ব্যবহারে প্রমথনাথের ছোটগল্পগুলি

শিল্পসৌন্দর্যমন্ডিত সন্দেহ নেই। আলোর রূপ অঙ্কনে প্রমথনাথ যেমন সিদ্ধহস্ত তেমনি অন্ধকারের রূপকেও তিনি কতটা শিল্পমন্ডিত করে উপস্থাপন করেছেন তার একটি সার্থক দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হল—

"দেখলাম শ্রাবণের রাত্রি তেমনি ঘনান্ধকার দুর্যোগময়ী। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ডালপালা মেলায় যে আলোকটুকু হচ্ছিল তাতে করে সে রাত্রিকে নিরবচ্ছিন্ন ভয়ের বলে তার মনে হল না, মনে হল এর মধ্যেও কোথায় যেন একটুখানি মাধুর্য, কোথায় যেন একটুখানি সৌন্দর্য আছে, সদ্য মৃতের ওষ্ঠাধারে সহজ প্রসন্ন হাসির রেখাটির মতো।"[৪০]

অন্ধকার রাত্রির সৌন্দর্যের বর্ণনায় প্রমথনাথের মুন্সিয়ানা নিঃসন্দেহে প্রশংসাতীত। সদ্যমৃতের ঠোঁটের সহজ প্রসন্ন হাসির সঙ্গে অন্ধকারে সৌন্দর্যের তুলনাটি অনবদ্য।

মৃত্যু দার্শনিক চিন্তার অভিব্যক্তি প্রকাশে কল্পনাতীত সৌন্দর্যের প্রতিফলন ঘটেছে। "হে বিধাতা আমাকে মারিয়া ফেল। এই চিরন্তন জগৎ কারাগার হইতে, এই নিরানন্দের মরুভূমি হইতে, এই বার্ধক্যের মেরুপ্রদেশ হইতে রক্ষা কর। জীবনের জগদ্দলভারের চেয়ে ভয়াবহ মৃত্যুও অনেক বেশি বাঞ্ছনীয়।"[৪১]

কল্পনার মনোহারিত্বে, বর্ণনার গভীরতায় প্রমথনাথের গদ্যভাষায় কতটা গীতিকবিতার সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার উদাহরণ—

"এত রং আছে ফুলের, এত ঢঙও আছে প্রজাপতির পাখার। আর যখন দুয়ে মেলে; মরি মরি, হেন কবি নেই, হেন চিত্রী নেই, যাদের তুলি-কলম সে সৌন্দর্য ধরে রাখতে পারে। কখনো ফুলগুলোকে মনে হয় প্রজাপতির ঝাঁক, কখনো প্রজাপতির ঝাঁককে মনে হয় ফুলের স্তবক।"[৪২]

বিশেষণ পদের প্রয়োগ প্রমথনাথের ছোটগল্পের বাক্যের এক একটি চিত্র যেন উজ্জ্বল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত ঃ

"তখন সব সুষমা, সব সৌন্দর্য, সমস্ত মহিমা একটি মুখে কেন্দ্রীভূত হইয়া প্রেমের আতস কাঁচের মধ্যে ঘনীভূত সূর্যালোকের মতো হৃদয়ে আগুন ধরাইয়া দেয়।"[৪৩]

এখানে প্রেমের আতস কাঁচ, ঘনীভূত সূর্যালোক প্রভৃতি বিশেষণ পদ প্রমথনাথের ছোটগল্পের রচনারীতির চরমোৎকর্ষ সৃষ্টি করেছে।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু প্রমথনাথের সাধু গদ্যরীতির উচ্চ প্রশংসা করে লিখেছেন—

"শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী সাধুক্রিয়ার গদ্যে শ্রেষ্ঠ জীবিত বাঙালি লেখক; এবং তা হওয়া সম্ভব হয়েছে রসরসিকতা, বুদ্ধি ও ভাবগভীরতা, অলঙ্কার ও কল্পনার ঐশ্বর্য্যের সজীব বিচিত্র মিশ্রণের জন্য।"[৪৪]

প্রমথনাথ মাঝে মাঝে নিজস্ব টীকা টিপ্পনী ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ সরস মন্তব্য করে ছোটগল্পের গৌরবকে বাড়িয়ে তুলেছেন। এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্য পূর্বে আলোচিত হয়েছে তবুও কিছু নতুন প্রবাদ বাক্য কয়েকটির উদাহরণ তুলে ধরছি—

(১) 'ব্যবসায়ে সৎপন্থা বলিয়া কিছু নাই।'[৪৫]

(২) 'কপালে যাদের দুঃখ সাপেও তাদের স্পর্শ করে না।'[৪৬]

(৩) 'দুঃখ অন্ধকার নৈরাশ্য কুয়াশা।'[৪৭]

(৪) 'ম্লান জ্যোৎস্নার আলোয় আকাশ ও পৃথিবী রহস্যময়।'[৪৮]

(৫) 'রাধা 'থিসিস্' কৃষ্ণ 'এন্টিথিসিস' আর এই দুইয়ের সিন্থেসিস হইতেছে হৃদি বৃন্দাবন।'[৪৯]

(৬) 'রূপের মোহ যখন ভাঙে, অবশিষ্ট থাকে মাংসপিন্ড, তার বীভৎস চেহারা মানুষকে ক্ষিপ্ত করে তোলে।'[৫০]

(৭) 'হিন্দু সংসারে স্ত্রীর মূল্য শূন্য, কিন্তু স্বামীর পাশে অধিষ্ঠিত হবার ফলে তার মূল্য যায় বেড়ে।'[৫১]

(৮) 'অলঙ্কারের মধ্যে মেয়েদের ইতিহাস নিহিত তাহাদের সৌভাগ্যের দুর্ভাগ্যের ও পতনের।'[৫২]

(৯) 'বৃদ্ধ হইলেই পণ্ডিত হয় না আবার নূতন হইলেই কাব্য হয় না।'[৫৩]

একজন সাহিত্য স্রষ্টার শৈল্পিক মূল্য নিরূপিত হয় তিনি কতটা বাস্তব ও সত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে পারেন। বলা বাহুল্য বাস্তব জীবনের সত্য এবং সাহিত্যের সত্য সমধর্মী নয়। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় ছোটগল্পে স্থান পেতে পারে। কিন্তু সেই ঘটনার যথাযথ চিত্র উপস্থাপন বাস্তব হলেও সেই বাস্তবের কোনো শৈল্পিক মূল্য নেই। একজন গল্পকার আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে জীবনকে শিল্প সুষমায় মন্ডিত করতে পারেন। জয়ন্তকুমার ঘোষাল বাস্তবতা সম্পর্কে যে মন্তব্যটি করেছেন তা এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—"জীবনের সত্যকে প্রকাশ করে জীবনকে এক অনন্ত সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে দেওয়াই বাস্তবতার প্রকাশ তাই শিল্পের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।"[৫৪]

আবার প্রমথনাথ বিশী শনিবারের চিঠিতে প্র.না.বি ছদ্মনামে লেখেন 'স্বপ্নবাদ বনাম বাস্তববাদ' নামক প্রবন্ধ। আধুনিক লেখকদের বাস্তবতামনস্কতাকে তিনি এ- প্রবন্ধে স্বপ্নবিলাস ও বস্তুবিলাস বলে অভিহিত করেন। তিনি রিয়ালিজম বা বাস্তবতাবাদের পরিভাষা করেন বাস্তববাদ। তাঁর মতে—"আধুনিক সাহিত্যের বাস্তবতা উপস্থাপনার প্রবণতা বিদেশ থেকে ধার করা, এ প্রবণতা বাঙালির নিজস্ব নয়, কখনো এ-প্রবণতা এ-জাতির মধ্যে ছিলও না। এ-বাস্তবমনস্কতা লেখকদের বস্তুবিলাস মাত্র।"[৫৫] তাঁর মতে— "আধুনিকদের আগমনে স্বপ্নবিলাসী বাঙালি চরিত্রের কোনোই পরিবর্তন ঘটে নাই। বাঙালির পুরাতন স্বপ্নবিলাসই সম্প্রতি বস্তুবাদ নাম ধরিয়া আসিয়াছে, বাস্তবিকপক্ষে ইহা বস্তুবিলাস। আধুনিক লেখকদের এই বস্তুবিলাসকে তিনি বিকৃত বাস্তববাদ বলেও আখ্যা দেন। এই বাস্তববাদ শুধু কলুষ ও বিকারের উপস্থাপনাতেই উৎসাহী বলে তিনি এই অভিধা প্রয়োগ করেন। সাহিত্য কাম—কলুষ—বিকারের উপস্থাপনের এই প্রবণতার মধ্যে বাঙালি তরুণ শ্রেণির নৈতিক অধঃপতনেরই পরিচয় মুদ্রিত হয়ে আছে বলে তিনি মনে করেন।"[৫৬]

রবীন্দ্রনাথ উদ্দেশ্যমূলক লোকশিক্ষাকে বাস্তব বলে মেনে নেননি। তাঁর মতে— "কবির সৃষ্টি নৈপুণ্যে জীবনের যে নব রূপায়ণ হয় তাই বাস্তব। সাহিত্য বাস্তবের অনুকরণ নয়, বরং জীবনের নব-বিন্যাস। বাস্তব হল স্বরূপের প্রকাশ।"[৫৭]

সাহিত্যের প্রকাশ ভঙ্গি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিম্নোক্তভাবে—

"সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় নিজের মনের ভাবে সহজে পাঠককে বোঝাতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। শিল্প বা সাহিত্যের মাধ্যমে ভাব এক মন অন্য মনে সঞ্চারিত হয়। শিল্পী তাঁর অভিজ্ঞতাকে অন্যের মনে সঞ্চারিত করেন।"[৫৮]

রক্ষণশীল সমালোচক বিজয়চন্দ্র মজুমদার বাস্তব জীবনকে অসম্পূর্ণ, অমার্জিত ও অসুন্দর বলে মনে করে বলেন—যে সাহিত্যে যে জীবন অনন্তের দৃষ্টি ফোঁটে না, তাহা ধন্য জীবন নয়, স্থায়ী সাহিত্য নয়।

সুধীরচন্দ্র কর, 'আধুনিক বাস্তব সাহিত্য' প্রবন্ধে বাস্তবতা সম্পর্কে বলেন—

"পঙ্কজকেই লোকে চায়—চায় না কেউ পঙ্ককে। তবু পঙ্কজের কথার সময়ে পঙ্কের কথাও এসে পড়ে বটে। পঙ্কজের আবশ্যিক মূল্যবৃদ্ধির কারণ হিসাবেই ঐ পঙ্কের কথা হয় আলোচিত এবং তাও মাত্রা রেখেই। তেমনি মাত্রা রেখে শুধু গৌণভাবেই নোংরামির কথা বর্ণনীয়।"[৫৯]

প্রমথনাথের ছোটগল্পে বাস্তব রসের অভাব নেই। তাঁর বাস্তবধর্মী ছোটগল্পে সামাজিক অর্থনৈতিক, নৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় সুন্দর ও যথাযথ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজ সচেতন, শিল্পী মনের পরিচয় নিহিত আছে বিভিন্ন ছোটগল্পে। 'অথকৃষ্ণার্জুন সংবাদ', 'মোটর গাড়ি', 'ঘোগ', 'আধ্যাত্মিক ধোপা', 'গদাধর পণ্ডিত', 'গণক', 'পরিস্থিতি', 'রাজকবি', 'সাহিত্যে তেজি মন্দি', 'গঙ্গার ইলিশ', 'পেশকার বাবু' প্রভৃতি ছোটগল্পে প্রমথনাথ যুগানুগ যে সাহিত্যগুলি রচনা করেছেন তা বাস্তববাদী ও কালজয়ী হয়ে উঠেছে। তাঁর কলমে ছোটগল্পগুলি যুগানুগ হয়েও যুগোত্তীর্ণ। শিল্পী মনের ভাব নিয়ে তিনি সত্যের দ্বারা বাস্তবতাকে প্রকাশ করেছেন। স্পষ্ট ও বোধগম্য ভাষায় তাঁর নিজস্ব উপলব্ধিকে উপজীব্য করে তিনি যে ছোটগল্পগুলি আমাদের উপহার দিয়েছেন বাস্তবতার নিরিখে তা বাংলা সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ সন্দেহ নেই। প্রমথনাথ সমকালীন সমস্যাকে তাঁর ছোটগল্পের বিষয় ভাবনায় স্থান দিয়েছেন, বিশেষ করে দুর্ভিক্ষ, বস্ত্র সংকট, উদ্বাস্তু সমস্যা, রাজনৈতিক দাঙ্গা এই সমস্ত ঘটনা এক সময় জ্বলন্ত বাস্তব সমস্যা ছিল কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্যাগুলো হয়তো বা অন্তর্হিত হয়ে স্মৃতি হিসাবে অবস্থান করছে। আজকের পাঠক চিত্তে সেই গল্পগুলো হয়তো তেমন ভাবে সাড়া জাগাতে পারে না তবু দেশ ও কালের ব্যাপক পরিবর্তন হলেও সেই গল্পগুলির প্রাসঙ্গিকতা, আকর্ষণ, উপভোগ্যতা ও রমণীয়তা কোনো অংশে কমেনি। প্রমথনাথের ছোটগল্পের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ অভিমত বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে।

একটি সার্থক ছোটগল্পে লেখকের জীবন জিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। জীবনের নিগূঢ় সত্য ছোটগল্পকার সচেতন ভাবে তুলে ধরেন। শুধুমাত্র একটি খন্ড কাহিনী, ক্লাইমেক্স ও আকস্মিক পরিসমাপ্তি সব মিলে জীবনের গভীর রহস্য যদি ব্যঞ্জিত না হয় সেই ছোটগল্পটি সার্থক ছোটগল্প হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। যেহেতু ছোটগল্পে থাকে

জীবনের ভাষ্য ও তাঁর ব্যাখ্যা যার মধ্যে শিল্পী ব্যক্তিত্ব সার্থক ভাবে ধরা পরে। জীবনের সম্ভাবনা অসীম এবং তা রহস্যময় সেই জীবনকে একজন ছোটগল্পকার তাঁর নিজস্ব ভাবনা ও ধারণা অনুসারে পরিণতি দিকে এগিয়ে নেন। কাহিনি, চরিত্র, ভাষা ও মাঝে মাঝে সারগর্ভ ও পান্ডিত্যপূর্ণ বাক্যে লেখকের জীবন দর্শন প্রকাশিত হয়।

প্রমথনাথ বিশী 'বিচিত্র উপল' প্রবন্ধ গ্রন্থের জীবন-দর্শন প্রবন্ধে লিখেছেন মহৎ শিল্পীরা জীবন সাধক, শিল্প তার একটা উপায় মাত্র, লক্ষ্য নয়।

প্রমথনাথের কিছু গল্পের ভূমিকায় তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শন প্রকাশিত হয়েছে—"এবারে আমার সঙ্গী একজন ইংরেজ। আমাদের দেখিয়া প্র.না.বি. হাসিয়া দাঁড়াইলেন। ইস্, লোকটা কি লম্বা—আর সেই অনুপাতে চওড়া। যেন এযুগের বাঙালি নয়—রামায়ণ, মহাভারতের আমলের কোনো বীর। মুখে পাতিয়ালার মহারাজার মতো ঘন চাপ দাড়ি।"[৬০] গল্পে প্রকাশিত হয়েছে ব্যক্তি পরিচয় এতে তাঁর জীবন দর্শন ব্যক্ত হয়েছে। উক্তিটির মধ্যে প্রমথনাথের শিল্পী মনের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। শুধু ভূমিকাতেই নয় অনেক গল্পের উপসংহারে শিল্পী মনের পরিচয় আমরা খুঁজে পাই। একজন শিল্পী তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি দিয়ে জীবনকে দেখেন। জীবনের ভালোমন্দ তাঁর মানসপটে উদ্ভাসিত হয়। তিনি তাঁর লেখনীতে সাধারণের মধ্যেও অসাধারণত্বের প্রকাশ করে সুগভীর জীবন সত্যকে উজ্জ্বল পাদ প্রদীপে নিয়ে আসেন। জগৎ জীবন সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি যেমন প্রতিফলিত হয় ঠিক তেমনি মৃত্যু সম্পর্কেও তাঁর ভাবনার প্রকাশ ঘটে। জীবনের শুভবোধ ও মূল্যবোধকে অন্তরঙ্গভাবে উপস্থাপিত করেন একজন মহৎ শিল্পী। একদিকে ছোটগল্পকার তাঁর সৃষ্টিতে জীবনের ছোটখাটো হাসি কান্না, মান অভিমান, মিলন বিরহকে সার্থক ভাবে তুলে ধরেন আবার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে রহস্য লোকের উদ্‌ঘাটন করেন।

একজন যথার্থ শিল্পী জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা গভীর উপলব্ধি ও মননশীল চিন্তার সাহায্যে জীবন সত্য সন্ধান করে বর্ণনা ও বিবরণের মাধ্যমে তা ব্যক্ত করেন। বিশেষ বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই মন্তব্যগুলি জীবনের একেকটি গূঢ় বিদ্যুৎ আলোকে প্রজ্জ্বলিত হয়।

প্রমথনাথের 'অদৃষ্টসুখী' গল্পে অদৃষ্টসুখীর জীবন যেভাবে বর্ণিত হয়েছে এর মধ্যে লেখকের জীবন দর্শন উচ্চারিত। 'গদাধর পণ্ডিত', 'পেশকারবাবু', 'ডাকিনী', 'বিপত্নীক', 'সুতপা', 'মাধবী মাসী', 'অতি সাধারণ ঘটনা', 'প্রত্যাবর্তন' প্রভৃতি গল্প লেখকের গভীর জীবন উপলব্ধির পরিচয় বহন করে। লেখকের অনুভূতি, জিজ্ঞাসা, মানবজীবনের প্রতি সহানুভূতি, ডুবুরির মতো গভীর জীবন সমুদ্রে ডুব দিয়ে আহরণ করেছেন হীরক খন্ড। অনবদ্য ভাষা, প্রকাশনার অভিনবত্ব সেই সঙ্গে প্রচুর মূল্যবান সংহত, সংক্ষিপ্ত, রসঘন প্রবাদ প্রবচন ও আপ্তপূর্ণ বাক্যগুলি ছোটগল্পের ঔজ্জ্বল্যে ও গভীরতা দান করেছে যার শিল্পমূল্য অসাধারণ সন্দেহ নেই।

প্রমথনাথ বিশী কলা কৈবল্যবাদী বা আর্ট ফর আর্ট সেক এই মতবাদ কিংবা জীবনের

জন্য কলা বা আর্ট ফর লাইফস্ সেক্ এ বিশ্বাসী কিনা তা বিচার করে দেখা যেতে পারে। আমরা জানি সাহিত্য সুন্দর আনন্দদায়ক। যাঁরা শিল্পের সৌন্দর্য ও বাইরের রূপকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন প্রকৃত পক্ষে তারাই কলা কৈবল্যবাদী সাহিত্যিক হিসাবে পরিচিত।

ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক অস্কার ওয়াইল্ড জীবন ও শিল্পের সম্পর্ক নিরূপণ করতে গিয়ে বললেন—"তিনিই যথার্থ শিল্পী যিনি তাঁর শিল্পকর্ম নির্দিষ্ট রূপাবয়বহীন জীবনকে করে তোলেন রূপবান। অতএব জীবন থেকে শিল্প নয়, শিল্পকে অনুকরণ করে জীবন।"[৬১]

অন্যদিকে Art for art sake বা শিল্পের সার্থকতা। বাংলা সাহিত্যে এর প্রবক্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছেন—"প্রয়োজনের বন্ধনমুক্ত হইলেই সাহিত্য নিত্যকালের আনন্দের সামগ্রী হইয়া উঠে।' কবির সাহিত্যধর্ম প্রবন্ধটি এককালে সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ বিতর্কের সৃষ্টি করে। ঐ প্রবন্ধে প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি যে সাহিত্য ক্ষেত্রে অপাংক্তেয় তা বুঝাতে গিয়ে কবি বলিয়াছেন "সজনে ফুলে সৌন্দর্যের অভাব নাই। তবু ঋতুরাজের রাজ্যভিষেকের মন্ত্র পাঠ করিয়া সজনে ফুলের নাম করেন না। ও যে আমাদের খাদ্য এই খর্বতায় কাছেও সজনে আপন ফুলের যথার্থতা হারাল। বকফুল, বেগুনের ফুল, কুমড়ো ফুল এই সব রইল কাব্যের বাহির দরজায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে; রান্নাঘর ওদের জাত মারিয়াছে।"[৬২]

"কবির কথাগুলির শ্লেষাত্মক সমালোচনা করিয়া শরৎচন্দ্র সাহিত্যে রীতি ও নীতি প্রবন্ধে লিখিলেন কবির হঠাৎ চোখে পড়িয়াছে যে, সজিনা, কুমড়া প্রভৃতি কয়েকটা ফুল কাব্যে স্থান পায় নাই। গোলাপ জাম ফুলও না, যদি সে শিরীষ ফুলের সর্ববিষয়েই সমতুল্য। কারণ? না, সেগুলো মানুষে খায়। রান্নাঘর তাহাদের জাত মারিয়াছে।"[৬৩]

প্রমথনাথ কলা কৈবল্যবাদের বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি কলা কৈবল্যবাদের মতো সৌন্দর্য সৃষ্টি ও আনন্দদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেননি। তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে মানব জীবন। মানব জীবনকে নিয়ে তিনি তাঁর সাহিত্য রচনা করেছেন একটি বারের জন্যও তিনি মানব জীবনের নৈতিক ও সামাজিক মূল্যকে অস্বীকার করেননি। প্রমথনাথের ছোটগল্পে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে আর্ট ফর লাইফ সেক বা জীবনের জন্য কলাকে। অত্যন্ত সচেতন ভাবে প্রমথনাথ তাঁর আর্ট ফর আর্ট সেক ছোটগল্পে সৌন্দর্যের চেয়ে বাস্তব জীবনকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন সেই বিষয়টি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নিম্নলিখিত অংশটি তাঁর উজ্জ্বল প্রমাণ—

"গান থামিল—মুগ্ধ শ্রোতা নীরবে প্রস্থান করিল, এতক্ষণ পরে আমি গায়কের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গান শুনিয়া বিশ্বাস হইয়াছিল—পোশাক ও চেহারা দেখিয়া তাহা দৃঢ়মূল হইল।

গেরুয়া আলখাল্লা, বিচিত্র বর্ণের তালি দেওয়া, মাথায় গেরুয়া পাগড়ি. হাতে একতারা, পায়ে ঘুঙুর; কাঁধে ঝুলি—মুখে অত্যন্ত উদাসীন ভাব। মনে পড়িল বাউলের ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে, পয়সার দরকার হয়। পকেট হইতে একটি পয়সা বাহির করিয়া তার ঝুলির মধ্যে

ফেলিয়া দিলাম। সে অমনি ঝুলি হইতে সাদা কাগজে মোড়া সরু একটি ঠোঙার মতো তুলিয়া আমার হাতে দিল—

জিজ্ঞাসা করিলাম, এতে কি?

সে বলিল—আজ্ঞে চানাচুর। বিস্মিত হইয়া শুধাইলাম—তুমি বাউল নও? বিস্মিততর হইয়া সে বলিল—আজ্ঞে না, আমি চানাচুরওয়ালা।"[৬৪]

আলোচ্য গল্পে প্রমথনাথ রূপের নেশায় রসকে অস্বীকার করেননি। রূপকে প্রাধান্য দিয়ে বিষয়কে গুরুত্বহীন মনে না করে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। গল্পটিতে বাউল ও চানাচুরওয়ালা যে অভিন্ন তাই দেখিয়েছেন।

Arts for Arts Sake-এ গল্পের গল্পত্বই অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়—পাঠকের চিত্তে জাগে না অনুভব এজন্য প্রমথনাথ বা জীবনের জন্য কলাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তিনি পরিচিত শব্দের সঙ্গে সৌন্দর্যময় অপরিচিত শব্দ প্রয়োগ করে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় ভাবের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় ভাব মিশিয়ে সাহিত্যকে সত্য ও সুন্দর করে তুলেছেন। প্রমথনাথ যথার্থ শিল্পী। কোনো শিল্পী কবি সাহিত্যিক সকলে সামাজিক সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন না, তিনি কিন্তু—তার শিল্পকর্মে উপস্থাপন করেন এবং সমাধানের ইঙ্গিত দিয়ে পাঠককে ভাবিয়ে তোলেন। প্রমথনাথ জীবনের জন্য কলাকে প্রাধান্য দিয়ে শিল্প সিদ্ধির স্তরে পৌঁছেছেন।

প্রমথনাথ তাঁর ছোটগল্পে রবীন্দ্রপ্রভাবকে অতিক্রম করতে পারেননি। রবীন্দ্রসাহিত্যে অনুরাগী পাঠক প্রমথনাথের ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন, সংলাপ ও উপন্যাসের খন্ড অংশ স্থান পেয়েছে। যার যেথা স্থান ছোটগল্পে—'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে'[৬৫] এই গানটি সংযোজিত হয়েছে। আবার গ্রাম সেবাই দেশ সেবা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের এই উপদেশকে প্রমথনাথ আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করেছেন। রামায়ণের নূতন ভাষ্য ছোটগল্পে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে আছে। অবচেতন গল্পে আছে শেষের কবিতার লাইন ঃ—

"প্রহর শেষে আলোয় রাঙা
সেদিন চৈত্র মাস
তোমার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্বনাশ।"[৬৬]

আসলে প্রমথনাথ রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ছোটগল্পে স্থান দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি জানিয়েছেন বিনম্র শ্রদ্ধা। প্রমথনাথের 'সেই শিশুটি', 'কমলার ফুলশয্যা', 'আরোগ্য স্নান' প্রভৃতি গল্প রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠের ফল। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকেও তিনি অসীম শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের দুই বনস্পতি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। প্রমথ প্রতিভার ধারা এই দুই গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বঙ্কিম শিষ্য ও রবীন্দ্রভক্ত প্রমথনাথের একদিকে ছিল ঐতিহ্য অনুসরণ ও রবীন্দ্র আকাশে আলোকিত। রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির গভীরতা, প্রকৃতিপ্রেম, রোমান্টিক কল্পনা, ছন্দলালিত্য, অলঙ্করণ মাধুর্য প্রমথনাথ আত্মস্থ করেছেন। তথাপি তিনি এই দুই সাহিত্যিকের প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েও স্বতন্ত্র পথের পথিক

হতে পেরেছেন। প্রমথনাথ বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের স্টাইলের সমন্বয় করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে দিয়েছেন।

প্রমথনাথের মৃত্যুর পর বিভিন্ন সাহিত্যিক তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। ১১ই জুন ২০০১ এ তাঁর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপিত হয়েছে। বিভিন্ন সাহিত্যিক তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ে অকুণ্ঠিত স্বীকৃতি জানিয়েছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিজিতকুমার দত্ত, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচক প্রমথপ্রতিভা সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রমথনাথ স্মৃতি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সৃষ্টির নৈবেদ্যর জন্য উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং গভীর অনুরাগের পরিচয় আমরা পাই। তিনি যে একজন জনপ্রিয় সাহিত্যিক ছিলেন বিভিন্ন লেখকের আলোচনা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি।

ইংরেজি সাহিত্যের বার্নাড শ'র সাহিত্যের সমাজচিন্তা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রমথনাথ বিশীর লেখনীও তেমনি পাঠকমনে বিশেষ সাড়া জাগাতে পেরেছিল। প্রমথনাথ হলেন বাংলা সাহিত্যের বার্নাড শ একথা বলাটা হয়তো অতিরঞ্জন নয়।

প্রমথনাথের ছোটগল্পের মূল্যায়নের শেষ পর্বে পৌঁছে আমরা বলতে পারি প্রমথনাথ বাংলা সাহিত্যের সুবিস্তীর্ণ রাজপথে যেভাবে পথ পরিক্রমা করে গেলেন তা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর লেখনীতে প্রচুর গভীর গম্ভীর জীবনভাবনাময় ছোটগল্প রচিত হয়েছে যার শিল্পগুণ অনন্যসাধারণ। সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিতে, কাহিনি বয়নে, মমত্ববোধে, প্রকাশভঙ্গিতে, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, কাব্যগুণ ও নাট্যগুণে, প্রকৃতির সঙ্গে মানব চরিত্রের যোগসূত্র স্থাপনে, গল্প কথন কৌশলে, ব্যঞ্জনা গল্প বর্ণনায়, সূচনা ও সমাপ্তিতে, গল্পের গতি ও পরিণতি বর্ণনায় এবং মৌলিক চিন্তার সাহায্যে কথাশিল্প ভুবনে তিনি যে নূতন সম্পদ রেখে গেছেন তার সাহিত্যমূল্য অপরিসীম এজন্য পাঠক মানসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন এবং উত্তরসূরী সাহিত্যিকরাও তাঁর কাছে থাকবে ঋণপাশে আবদ্ধ হয়ে এখানেই প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পের সাফল্য ও সার্থকতা।

উল্লেখপঞ্জী

(১) 'নানারকম' - প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২০৬-২০৭
(২) হাসির উপকরণ ঃ ম্যাজিক লণ্ঠন গ্রন্থ - পরিমল গোস্বামী—পৃঃ ৪৯৭
(৩) বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার - ভূদেব চৌধুরী—পৃঃ ৫১২
(৪) গল্প পঞ্চাশৎ - ভূমিকা অংশ - প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৩
(৫) কথা সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩৭৩ - সুবোধ ঘোষ—পৃঃ ১৪৯৭
(৬) শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব - প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ২১
(৭) সমুচিত শিক্ষা - প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১
(৮) তদেব—পৃঃ ২
(৯) প্রমথনাথ বিশীর গল্প সমগ্র ভূমিকা অংশ—পৃঃ ৯
(১০) তদেব—পৃঃ ৪০
(১১) 'খেলনা' - নীলবর্ণ শৃগাল - প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৬৫
(১২) 'চিলা রায়ের গড়', নীলবর্ণ শৃগাল—পৃঃ ১০৭
(১৩) প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত পরশুরাম গ্রন্থাবলী প্রথম খন্ডের ভূমিকা
(১৪) 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যানিং' ছোটগল্প সংগ্রহ ১ম খন্ড—পৃঃ ৪৭
(১৫) সিন্ধবাদের অষ্টম সমুদ্র যাত্রার কাহিনী - ছোটগল্প সংগ্রহ প্রথম খন্ড—পৃঃ ৬৯
(১৬) 'চিত্রগুপ্তের অ্যাড্‌ভেঞ্চার' ছোটগল্প সংগ্রহ - প্রথম খন্ড—পৃঃ ১৫৪-৫৫
(১৭) বাংলা ছোটগল্প - শিশির কুমার দাশ—পৃঃ ৪২
(১৮) প্রমথ চৌধুরী - জীবেন্দ্র নাথ সিংহ—পৃঃ ১৮৭
(১৯) জি.বি.এস. ও প্র.না.বি. - গালি ও গল্প—পৃঃ ৫৯
(২০) 'পরিস্থিতি' - নীরস গল্প 'সঞ্চয়ন' - প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১০৬
(২১) 'গন্ডার' - অমনোনীত গল্প - প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১২৪
(২২) 'শিখ' - নীরস গল্প সঞ্চয়ন - প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৮০
(২৩) অসমাপ্ত কাব্য - স্বনির্বাচিত গল্প - প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৮
(২৪) 'সেকেন্দার শার প্রত্যাবর্তন' - নীলবর্ণ শৃগাল—পৃঃ ২৫
(২৫) লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত ১৩২৬ সালের ১৭ই ভাদ্র তারিখের পত্র
(২৬) গল্প পঞ্চাশৎ - প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৪০৭
(২৭) তদেব
(২৮) নীলবর্ণ শৃগাল - অদৃষ্ট সুখী - প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১৭৯
(২৯) গল্প পঞ্চাশৎ - প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ১২৭
(৩০) প্র.না.বি. নীরস গল্প সঞ্চয়ন—পৃঃ ৭১
(৩১) গল্প পঞ্চাশৎ - খেলনা - প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৩৯৫
(৩২) তদেব—পৃঃ ১৩৮
(৩৩) শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব—পৃঃ ৮৮
(৩৪) স্বনির্বাচিত গল্প - প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৫৯
(৩৫) বিচিত্র সৃষ্টির উৎস সন্ধানে - রবীন্দ্রনাথ রায় কথাসাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩৭২—পৃঃ ২

(৩৬) প্রমথনাথ বিশী ঃ 'লক্ষ্য ভারততীর্থ' - প্রমথনাথ বিশী স্মারক গ্রন্থ—পৃঃ ১৮৫
(৩৭) গল্পের মতো - 'আরোগ্য স্নান'—পৃঃ ৯৯
(৩৮) অলৌকিক - প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৩৯
(৩৯) অনেক আগে অনেক দূরে - ধনেপাতা—পৃঃ ১৮১
(৪০) নীলবর্ণ শৃগাল - খেলনা - প্রমথনাথ বিশী—পৃঃ ৭০
(৪১) গল্প পঞ্চাশৎ - যমরাজের ছুটি - প্র.না.বি.—পৃঃ ১০৮
(৪২) নীলবর্ণ শৃগাল - অবচেতন - প্র.না.বি.—পৃঃ ৭
(৪৩) ছোটগল্প সংগ্রহ - ২য় খন্ড - অতি সাধারণ ঘটনা - প্র.না.বি.—পৃঃ ৩৪
(৪৪) প্রমথনাথ বিশী - স্মারক গ্রন্থ—পৃঃ ৪৭
(৪৫) ছোটগল্প সংগ্রহ - ৩য় খন্ড - খুল্ল বিহার - প্র.না.বি.—পৃঃ ১৪৫
(৪৬) অমনোনীত গল্প - চারজন মানুষ ও একখানা তক্তপোষ - প্র.না.বি.—পৃঃ ৪৭
(৪৭) গালি ও গল্প - বিপত্নীক - প্র.না.বি.—পৃঃ ৩০
(৪৮) প্র.না.বি.-র - স্বনির্বাচিত গল্প - সুতপা - প্র.না.বি.—পৃঃ ১০৫
(৪৯) প্র.না.বি.-র - নিকৃষ্ট গল্প - রক্তাতঙ্ক—পৃঃ ৩৭
(৫০) এলার্জি - কুন্দনন্দিনীর বিষপান - প্র.না.বি.—পৃঃ ৫০
(৫১) প্র.না.বি.-র স্বনির্বাচিত গল্প - অতিসাধারণ ঘটনা—পৃঃ ২১
(৫২) তদেব—পৃঃ ২২
(৫৩) ধনেপাতা - অসমাপ্ত কাব্য - প্র.না.বি.—পৃঃ ২৪
(৫৪) বাংলা উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতা - জয়ন্ত ঘোষাল—পৃঃ ২
(৫৫) শনিবারের চিঠি-প্র.না.বি.-র - 'স্বপ্নবাদ বনাম বাস্তববাদ'-১লা বৈশাখ, ১৩৪৬—পৃঃ২১
(৫৬) তদেব পৃঃ ১২
(৫৭) রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের পথে - বাস্তব প্রবন্ধ—পৃঃ ২১
(৫৮) প্রবন্ধ - বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাংলার নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন'—পৃঃ ২৪
(৫৯) আধুনিক বাস্তব সাহিত্য - সুধীরচন্দ্র কর —পৃঃ ২২৯
(৬০) প্র.না.বি.-র গল্পসঞ্চয়ন - ইংলন্ডকে স্বাধীনতা দানের চেষ্টা—পৃঃ ২৪১
(৬১) সাহিত্য বিবেক - বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়—পৃঃ ১৩৬
(৬২) রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য তত্ত্ব - ভবানীগোপাল সান্যাল —পৃঃ ১২৫
(৬৩) প্রবন্ধ - সাহিত্যের রীতি ও নীতি—পৃঃ ৩৯
(৬৪) গল্প সমগ্র - 'আর্ট ফর আর্ট সেক'—পৃঃ ৩৯
(৬৫) যা হলে হতে পারত - প্র.না.বি—পৃঃ ১৩০
(৬৬) নীলবর্ণ শৃগাল - অবচেতন - প্র.না.বি.—পৃঃ ৮

প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্প গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক সূচী ঃ—

১) **শ্রীকান্তের পঞ্চমপর্ব।**
কাত্যায়নী বুক স্টল।
২০৩ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা
তৃতীয় সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৫৭।

২) **শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব,**
কাত্যায়নী বুক স্টল,
২০৩ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা,
মাঘ ১৩৫১
আশ্বিন ১৩৬০।

৩) **গল্পের মতো,**
জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড,
মার্চ ১৯৭৫।

৪) **গালি ও গল্প,**
জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড,
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রিট, কলিকাতা,
শ্রীপঞ্চমী, ১৩৫২।

৫) **ডাকিনী**
বেঙ্গল পাবলিশার্স,
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা
অগ্রহায়ণ, ১৩৫২।

৬) **ব্রহ্মার হাসি**
মডার্ন বুক লিমিটেড,
১৬০/১-এ বৈঠকখানা রোড,
১লা বৈশাখ, ১৩৫৫।

৭) **অশরীরী**
পি. কে. বোস অ্যান্ড কোং, কলিকাতা

৮) **ধনেপাতা**
মিত্রালয়।
শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা -১২।

৯) **চাপাটি ও পদ্ম,**
ডি. এম. লাইব্রেরী,
৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা - ৬

১০) **নীলবর্ণ শৃগাল**
শ্রীগুরু লাইব্রেরী,
২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা - ৬
আশ্বিন, ১৩৬৩

১১) **অলৌকিক**
নতুন প্রকাশক,
২৪ সি, রামকমল সেন লেন,
কলিকাতা - ৭
বৈশাখ, ১৩৬৪

১২) **এলার্জি**
বিশ্ববাণী,
১১/এ, বারানসী ঘোষ স্ট্রিট,
কলিকাতা - ৭
ভাদ্র (জন্মাষ্টমী), ১৩৬৫

১৩) **অনেক আগে অনেক দূরে**
মিত্র ও ঘোষ,
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট,
কলিকাতা-১২

১৪) **যা হলে হতে পারত**
শ্রীগুরু লাইব্রেরী,
২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট,
কলিকাতা-১২
শ্রাবণ ১৩৬৯

১৫) **সমুচিত শিক্ষা**
এ. কে. সরকার অ্যান্ড কোং,
৬/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,
কলিকাতা

১৬) **প্র. না. বি-র নিকৃষ্ট গল্প**
মিত্র ও ঘোষ,
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট,
কলিকাতা-১২

১৭) **প্রমথনাথ বিশীর স্বনির্বাচিত গল্প**
ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড
পাবলিশিং কোং লিঃ,
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা -
৭ই মাঘ ১৩৬২

১৮) **অমনোনীত গল্প**
মহেন্দ্র পুস্তক ভবন,
২৮ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট,
কলিকাতা - ৬

১৯) **নীরস গল্পসঞ্চয়ন**
ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী,
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা - ১২, ১৯৫৭

২০) **গল্প-পঞ্চাশৎ**
মিত্র ও ঘোষ
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭

২১) **ছোটগল্প সংগ্রহ - ১ম খন্ড**
ডঃ অশোক কুন্ডু সম্পাদিত
রেখা দে, উত্তরা প্রকাশনী
১২২/৩, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট,
কলিকাতা - ৭০০ ০০৪
প্রথম প্রকাশ - মহালয়া ১৩৮৪

২২) **ছোটগল্প সংগ্রহ - ৩য় খন্ড**
ডঃ অশোক কুন্ডু সম্পাদিত
শ্রীমতি রেখা দে, উত্তরা প্রকাশনী,
১২২/৩, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট,
কলিকাতা - ৭০০ ০০৪
মহালয়া ১৩৮৭

২৩) **ছোটগল্প সংগ্রহ - ৪র্থ খন্ড**
ডঃ অশোক কুন্ডু সম্পাদিত
শ্রীমতি রেখা দে, উত্তরা প্রকাশনী,
১২২/৩, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট,
কলিকাতা - ৭০০ ০০৪
মহালয়া ১৩৮৯

২৪) **গল্প সমগ্র - প্রমথ বিশী**
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭৩
প্রথম প্রকাশ - পৌষ ১৪০৯

প্রমথনাথ বিশীর লেখা অন্যান্য গ্রন্থের তালিকা

	কাব্য	প্রকাশকাল	প্রকাশক
২৫।	দেয়ালি	১৯২৩	জগদানন্দ রায়, শান্তিনিকেতন
২৬।	বসন্তসেনা ও অন্যান্য কবিতা	১৯২৭	প্রমথনাথ বিশী, শান্তিনিকেতন
২৭।	প্রাচীন আসামী হইতে	১৯৩৪	রঞ্জন প্রকাশালয়
২৮।	বিদ্যাসুন্দর	১৩৩৫	রঞ্জন প্রকাশালয়
২৯।	প্রাচীন গীতিকা হইতে	১৯৩৭	কাত্যায়নী বুক স্টল
৩০।	অকুন্তলা ও অন্যান্য কবিতা	১৯৪৬	জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিঃ
৩১।	যুক্তবেণী	১৯৪৮	ঐ
৩২।	হংসমিথুন	১৯৫১	মিত্র ও ঘোষ
৩৩।	উত্তর মেঘ	১৯৫৪	মিত্রালয়
৩৪।	কিংশুক বহ্নি	১৯৫৯	এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স
৩৫।	শ্রেষ্ঠ কবিতা	১৯৬০	ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী
৩৬।	প্রাচীন পারসিক হইতে	১৯৬৮	মিত্র ও ঘোষ
৩৭।	কাব্য গ্রন্থাবলী (উত্তর পর্ব)	১৯৭৪	মিত্র ও ঘোষ
৩৮।	কাব্য গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয় খন্ড)	১৯৭৫	ঐ
৩৯।	কাব্য গ্রন্থাবলী (তৃতীয় খন্ড)	১৯৭৬	ঐ
৪০।	কাব্য গ্রন্থাবলী (চতুর্থ খন্ড)	১৯৭৭	ঐ
৪১।	কাব্য গ্রন্থাবলী (পঞ্চম খণ্ড)	১৯৮২	ঐ
৪২।	শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌ গীতার অনুবাদ	১৯৭৮	পঃ বঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি

	নাটক	প্রকাশকাল	প্রকাশক
৪৩।	ঘোষ যাত্রা	১৯২২	শান্তিনিকেতন
৪৪।	ঋণং কৃত্বা	১৯৩৫	রঞ্জন প্রকাশালয়
৪৫।	ঘৃতং পিবেৎ (সানিভিলা)	১৯৩৬	রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
৪৬।	মৌচাকে ঢিল	১৯৩৮	ঐ
৪৭।	ডিনামাইট ও অন্যান্য নাটক	১৯৪২	ঐ
৪৮।	গভর্ণমেন্ট ইন্‌সপেক্‌টর	১৯৪৪	ঐ
৪৯।	পরিহাস বিজল্পিতম্‌	প্রকাশকাল অমুদ্রিত	কাত্যায়নী বুক স্টল
৫০।	পারমিট	১৯৫৬ (২য় সং)	শ্রীগুরু লাইব্রেরী
৫১।	ভূতপূর্ব স্বামী	প্রকাশকাল অমুদ্রিত	মিত্র ও ঘোষ
৫২।	বেনিফিট অব ডাউট	১৯৭৪	ঐ

উপন্যাস	প্রকাশকাল	প্রকাশক
৫৩। দেশের শত্রু	১৯২৫	বাণীমন্দির, ঢাকা
৫৪। পদ্মা	১৯৩৫	রঞ্জন প্রকাশালয়
৫৫। জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার	১৯৩৮	কাত্যায়নী বুক স্টল
৫৬। কোপবতী	১৯৪১	ঐ
৫৭। চলনবিল	প্রকাশকাল অমুদ্রিত	মিত্রালয়
৫৮। অশ্বত্থের অভিশাপ	প্রকাশকাল অমুদ্রিত	ঐ
৫৯। মহামতি রামফাঁসুড়ে	ঐ	মিত্র ও ঘোষ
৬০। নীলমণির স্বর্গ	১৯৫৪	ডি. এম. লাইব্রেরী
৬১। সিন্ধুনদের প্রহরী	১৯৫৫	ঐ
৬২। কেরী সাহেবের মুন্সী	১৯৫৮	মিত্র ও ঘোষ
৬৩। লালকেল্লা	১৯৬৪	ঐ
৬৪। জোড়াদীঘির উদয়াস্ত	১৯৬৬	ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী
৬৫। বিপুল সুদূর তুমি যে	১৯৬৮	মিত্র ও ঘোষ
৬৬। মুক্তবেণী	১৯৭১	ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী
৬৭। হিন্দী উইদাউট টীয়ার্স	১৯৭১	মিত্র ও ঘোষ
৬৮। পূর্ণাবতার	১৯৭২	ঐ
৬৯। শাহী শিরোপা	১৯৭০	ঐ
৭০। বঙ্গভঙ্গ	১৯৭৭	ঐ

কাব্য	প্রকাশকাল	প্রকাশক
৭১। পনেরোই আগস্ট	১৯৭৮	ঐ
৭২। ধুলোউড়ির কুঠি	১৯৮৫	অরুণা প্রকাশনী

জীবনী-প্রবন্ধ-সমালোচনা-রসরচনা		
৭৩। রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ	১৯৩৯	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৭৪। রবীন্দ্রকাব্য নির্ঝর	১৯৪৬	জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
৭৫। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন	১৯৪৪	বিশ্বভারতী
৭৬। রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ (১ম খন্ড)	১৯৪৮	এ. মুখার্জ্জী
৭৭। ঐ (২য় খন্ড)	১৯৫১	মিত্রালয়

৭৮। ঐ (পূর্ণাঙ্গ)	১৯৬৬	ওরিয়েন্ট বুক কোং
৭৯। রবীন্দ্র বিচিত্রা	১৯৫৪	ঐ
৮০। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প	১৯৫৪	মিত্র ও ঘোষ
৮১। মহারাষ্ট্র ও রবীন্দ্রনাথ	১৯৬১	নিখিলভারত বঙ্গ সাহিত্যসম্মেলন, বোম্বাই
৮২। রবীন্দ্রসরণী	১৯৬২	মিত্র ও ঘোষ
৮৩। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ	১৯৭২	ঐ
৮৪। মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ	১৯৭৪	করুণা প্রকাশনী
৮৫। পুরানো সেই দিনের কথা	১৯৮৫	মিত্র ও ঘোষ
৮৬। রবীন্দ্র কাব্যে রস বিচার	১৯৮৫	টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট
৮৭। বঙ্কিম সরণী	১৯৬৭	মিত্র ও ঘোষ
৮৮। বঙ্কিম সাহিত্য বিচার	১৯৭১	ঐ
৮৯। বঙ্কিমচন্দ্র ও উত্তরকাল	১৯৭৭	পুস্তক বিপণি
৯০। মাইকেল মধুসূদন (জীবনভাষ্য)	১৯৪১	রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
৯১। বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য	১৯৪৫	বেঙ্গল পাবলিশার্স
৯২। বাঙালীর জীবন সন্ধ্যা	প্রকাশকাল অমুদ্রিত	মিত্রালয়
৯৩। চিত্র চরিত্র	১৯৪৯	বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়
৯৪। বাংলার লেখক	১৯৫০	বিশ্বভারতী
৯৫। জওহরলাল নেহেরু ঃ	১৯৫১	ঐ

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

৯৬। বিচিত্র উপল	১৯৫২	বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়
৯৭। বাংলা সাহিত্যের নরনারী	১৯৫৩	বিশ্বভারতী
৯৮। কমলাকান্তের আসর	১৯৫৫	সোয়ান বুকস
৯৯। নানারকম	১৯৫৮	ওরিয়েন্ট বুক কোং
১০০। বিচিত্র সংলাপ	১৯৫৮	নর্দান বুক ক্লাব
১০১। বাংলার কবি	১৯৫৯	শ্রীগুরু লাইব্রেরী
১০২। কমলাকান্তের জল্পনা	১৯৬২	গ্রন্থপ্রকাশ
১০৩। গান্ধী জীবন ভাষ্য	১৯৭৬	মিত্র ও ঘোষ
১০৪। শুভাকাঙক্ষী রবীন্দ্রনাথ	১৯৭৯	টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট

সম্পাদিত গ্রন্থ

১০৫। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের	১৯৫৭	মিত্র ও ঘোষ

১০৬। কাব্যবিতান	১৯৫৭	বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০৭। ভূদেব রচনাসম্ভার	১৯৫৭	মিত্র ও ঘোষ
১০৮। বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার	১৯৫৭	ঐ
১০৯। রমেশ রচনাসম্ভার	১৯৫৭	ঐ
১১০। সাহিত্য সম্পুট	১৯৬০	বিশ্বভারতী
১১১। মাইকেল রচনাসম্ভার	১৯৫৯	মিত্র ও ঘোষ
১১২। বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক	১৯৬১	ঐ
১১৩। বিহারীলাল রচনাসম্ভার	১৯৬২	ঐ
১১৪। কান্তকবি রচনাসম্ভার	১৯৬২	ঐ
১১৫। গিরিশ রচনাসম্ভার	১৯৬৩	ঐ
১১৬। বঙ্কিম রচনাসম্ভার	১৯৬৫	ঐ
১১৭। দ্বিজেন্দ্রলাল রচনাসম্ভার	১৯৬৫	ঐ
১১৮। ত্রৈলোক্যনাথ রচনাসম্ভার	১৩৭৪	ঐ
১১৯। সাহিত্যচিন্তা (বঙ্কিমচন্দ্র)	১৩৭৫	অমর সাহিত্য প্রকাশন
১২০। দীনবন্ধু রচনাসম্ভার	১৩৭৮	
১২১। হেমচন্দ্র রচনাসম্ভার	১৩৭৮	
১২২। গল্প বিতান		
১২৩। স্বর্ণলতা		
১২৪। নীলদর্পণ		
১২৫। কমলাকান্তের দপ্তর		
১২৬। পলাশীর যুদ্ধ		

নির্বাচিত সমালোচনামূলক গ্রন্থপঞ্জী

(SELECT BIBLIOGRAPHY)

১) **অর্জুন রায়, ভাঙা কাঁচের শিল্প**
বাংলা ছোটগল্পের শিল্পীদল, প্রথম পর্ব
প্রথম প্রকাশ ঃ ৩ - ১২ - ১৯৯৪
প্রকাশিকা ঃ সবিতা রায়
প্রয়াস প্রকাশণী

২) **অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, প্রণয়কুমার কুণ্ডু**
প্রমথনাথ বিশী স্মারকগ্রন্থ
মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩
প্রথম প্রকাশ -- ৩০শে আগস্ট ২০০২

৩) **অমল শঙ্কর রায়, মনীষা ও মন ঃ সমীক্ষণ**
প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪
প্রকাশক ঃ অমর শঙ্কর রায়
পুস্তক বিপণি

৪) **অপূর্ব কুণ্ডু - বাংলা ও বাঙালীর দিনপঞ্জী (১৪৮৬ - ১৯৯৮)**
প্রথম প্রকাশ - ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৯৮
প্রকাশক - অসীমকুমার মন্ডল
প্রভা প্রকাশনী

৫) **অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা**
বাংলা উপন্যাসের ষাট বছর - ১৯২৩-১৯৮২
দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল - ১৯৯৯
প্রকাশক - সুধাংশু শেখর দে,
দে'জ পাবলিশিং

৬) **অন্নদাশঙ্কর রায় - অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী**
দ্বাদশ সংস্করণ,
প্রকাশক - বাণীশিল্প

৭) **অমল চট্টোপাধ্যায় - আধুনিকতা, উত্তর আধুনিকতা ও একটি বিকল্পের অনুসন্ধান**
প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, ১৯৯৫

৮) **অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর - অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খন্ড)**
দ্বিতীয় সংস্করণ - ১৯৯৯
প্রকাশ ভবন

৯) **অরুণ সান্যাল (সম্পাদক), প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস,**
প্রথম প্রকাশ - ১৯৯১
ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স ।

১০) **অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের**
একশ বছর / ১৮৯১ - ১৯৯০
দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ - ১৫ই আগস্ট, ১৯৮২

১১) **অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়**
মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস
প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই ১৯৯৪,
প্রকাশক ঃ সুধাংশু শেখর দে
দে'জ পাবলিশিং

১২) **অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় - শরৎচন্দ্রঃ পুনর্বিচার**
পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ ঃ
কলিকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ২০০১
প্রকাশক ঃ সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

১৩) **অজয়কুমার রায়, সাহিত্য জিজ্ঞাসা ঃ বস্তুবাদী বিচার**
প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ১৯৯৯
প্রকাশক ঃ স্বপনকুমার বিশ্বাস
ভাষা ও সাহিত্য

১৪) **অলোক রায়, সাহিত্য কোষ, কথা সাহিত্য**
দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩
প্রকাশক ঃ নেপাল চন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যলোক

১৬) **অশোক কুন্ডু, সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী ১৩৮২**
পঞ্চম বর্ষ/সপ্তম খন্ড-শরৎ জন্ম শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ
প্রকাশকাল - ১৩শে ভাদ্র, ১৩৮২
প্রকাশিকা - স্বপ্না কুন্ডু, পুস্তক বিপণি

১৭) **অশোক মুখোপাধ্যায়, সংসদ সমার্থ শব্দকোষ**
দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী, ১৯৮৭
প্রকাশক ঃ দেবজ্যোতি দত্ত, সাহিত্য সংসদ

১৮) **অশোককুমার দে - বাংলা উদ্ধৃতিকোষ**
প্রথম প্রকাশ ঃ বৈশাখ ১৪৫২
প্রকাশক ঃ সুজিতকুমার দাস
চন্ডীচরণ দাস এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ

১৯) **অশ্রুকুমার সিকদার, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস**
প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই ১৯৮৮
প্রকাশিকা ঃ অরুণা বাগচী
অরুণা প্রকাশনী

২০) **অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত - কল্লোলযুগ**
প্রথম প্রকাশ - ১৯৭১
প্রকাশক - এম. সি. সরকার

২১) অলোক রায় - তারাশঙ্কর ঃ দেশকাল
প্রথম সংস্করণ - ১৯৯৮
প্রকাশক - নিউলাইট

২২) অতুল সুর, ৩০০ বছরের কলকাতা ঃ পটভূমি ও ইতিকথা
প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৮১
প্রকাশিকা ঃ সুপ্রিয়া পাল

২৩) অশোক রুদ্র ঃ সমাজে নারী পুরুষ ও অন্যান্য প্রবন্ধ
প্রথম সংস্করণ - ১৯৯০
প্রকাশক - পিপলস বুক

২৪) অরুণ মিত্র ঃ সাহিত্যের নানা দিগন্ত
প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৭
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

২৫) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা
প্রকাশক - প্রোগ্রেসিভ

২৬) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত
মডার্ন বুক

২৭) ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ (অখন্ড)
প্রকাশক - বামাচরণ মুখোপাধ্যায়,
করুণা প্রকাশনী

২৮) অপূর্ব কুন্ডু - দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
জীবন ও সাহিত্য - প্রথম প্রকাশ ঃ ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৯৯
প্রকাশক ঃ অসীমকুমার মন্ডল, প্রভা প্রকাশনী
ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

২৯) অবিমুন রহমান - আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ
বাংলা অ্যাকাডেমী, ঢাকা
প্রথম প্রকাশ - আষাঢ় ১৪, ১৪০০
প্রকাশক - শ্যামসুজ্জামান খান

৩০) অতুল সুর, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ
প্রকাশিকা - সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির

৩১) আশিসকুমার দে, উপন্যাসের শৈলী ঃ তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশকাল - সেপ্টেম্বর ১৯৮৩
প্রকাশক - অরিজিৎ কুমার
প্যাপিরাস

৩২) আশাপূর্ণা দেবী ঃ নির্বাচিত গল্পগুচ্ছ
. সংস্করণ - ১৯৮৯
প্রকাশক - আনন্দম্

৩৩) আশিসকুমার দে, মানিকের ছোটগল্প ঃ শিল্পীর নবজন্ম

প্রথম প্রকাশ - সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩
প্রকাশক ঃ রুশো মিত্র
সাহিত্য প্রকাশ

৩৪) **আশিসকুমার দে, সাহিত্যালোচনা ও শৈলী বিজ্ঞান**
প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী ১৯৯২
সাহিত্য প্রকাশ

৩৫) **ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী - বাংলা ছোট গল্প রীতি - প্রকরণ ও নিবিড়পাঠ**
১ম খন্ড, আগস্ট ১৯৯৪
প্রকাশক - সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়
রত্নাবলী

৩৬) **উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, সাহিত্যের রূপরীতি,**
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ
কলিকাতা, ১৯৮০

৩৭) **কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, বাংলা উপন্যাসের মনোবিশ্লেষণ**
প্রকাশক, সেপ্টেম্বর ১৯৮৯
প্রকাশক কান্তিরঞ্জন ঘোষ, বর্ণালী

৩৮) **কৃষ্ণ ধর, ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বাংলা**
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ই আগস্ট, ১৯৯৭
প্রকাশক ঃ তরুণ ভট্টাচার্য
তথ্য অধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

৩৯) **কৃষ্ণপদ গোস্বামী, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস**
প্রকাশক ঃ অনিন্দিতা ঘোষ
ইন্ডিয়ান ইনিস্টিটিউট অব এডুকেশন

৪০) **কামিনীকুমার রায়, লোকদেবতা ও লোকাচার**
প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর, ১৯৮০
প্রকাশক ঃ অনিলকুমার ভৌমিক
বাসন্তী লাইব্রেরী

৪১) **গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য**
পুস্তক বিপণি

৪২) **গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, বাংলা কথা সাহিত্য প্রকরণ ও প্রবণতা**
প্রকাশক ঃ অনুপ কুমার, প্রথম প্রকাশ - নভেম্বর ১৯৯১
মহিন্দর পুস্তক বিপণি

৪৩) **গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, বিভুতিভূষণ মন ও শিল্প**
তৃতীয় সংস্করণ - এপ্রিল ১৯৯৬
প্রকাশক - সুধাংশু শেখর দে
দে'জ পাবলিশিং

৪৪) **গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,**
জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি
প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭
প্রকাশক ঃ আনন্দ ভট্টাচার্য
জি. এ. আই. পাবলিশার্স

৪৫) **গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঃ**
ছোটগল্পের প্রকরণ শিল্প
প্রথম সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর ১৯৯৭
প্রকাশক ঃ নেপালচন্দ্র ঘোষ, সাহিত্যলোক

৪৬) **গুণময় মান্না, গদ্যের সৌন্দর্য**
প্রকাশক ঃ অনিলকুমার সরকার
এ. কে. সরকার অ্যান্ড কোং

৪৭) **গুণময় মান্না, বাংলা উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিক**
প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর ১৯৯৫
প্রকাশক ঃ স্বপন কুমার বিশ্বাস, ভাষা সাহিত্য

৪৮) **গোপাল হালদার, সতীনাথ ভাদুড়ী ঃ সাহিত্য ও সাধনা**
প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী ১৯৭৮
প্রকাশক ঃ অমল গুপ্ত
অয়ন

৪৯) **গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও সুমথনাথ ঘোষ ঃ ঐতিহাসিক গল্প সঞ্চয়ন**
প্রথম প্রকাশ - ১৯৮৬
মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনী

৫১) **গৌরমোহন রায়, তারাশঙ্কর সাহিত্য সমীক্ষা**
প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর, ১৯৯৪
প্রকাশক ঃ তপনকুমার ঘোষ

৫২) **চন্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, অপরাজিত বিভূতিভূষণ**
প্রথম সংস্করণ - ১৯৯১ প্রকাশক - বিশ্ববিজ্ঞান

৫৩) **চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ প্রসঙ্গ**
প্রথম প্রকাশ, ১৯শে জুলাই ১৯৮৭
প্রকাশক ঃ নির্মলকুমার পাল, পুস্তক বিপণি

৫৪) **চৈতালী বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ উপন্যাসে আঙ্গিক বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর**
প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৫, পুস্তক বিপণি

৫৫) **জগদীশ গুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত গল্পসমগ্র (২য় খন্ড)**
গ্রন্থালয়

৫৬) **জয়ন্তকুমার ঘোষাল, বাংলা উপন্যাসের সমাজ বাস্তবতা**
প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী ১৯৯২
প্রকাশক ঃ জয়দীপ ঘোষাল, পুস্তক বিপণি

৫৭) **জীবন্দ্রে সিংহ রায়**

কল্লোলের কাল
কল্লোল কালিকলম প্রগতির দিন
দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩
প্রথম প্রকাশ - ১৯৭৩
প্রকাশক ঃ শ্রী সুধাংশু শেখর দে

৫৮) জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নির্বাচিত গল্প
প্রথম সংস্করণ ১৯৮৯, দে'জ পাবলিশার্স

৫৯) জয়ন্ত গোস্বামী, সাহিত্য গবেষণা পদ্ধতি ও প্রয়োগ ঃ ১ম সংস্করণ - ১৯৮৯
পুস্তক বিপণি

৬০) দিগ্বিজয় দে সরকার - রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ
চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ - জানুয়ারী ২০০৪
প্রকাশক ঃ শর্মিলা কুন্ডু
এন. ই. পাবলিশার্স
কলিকাতা - ৭০০ ০৩৫

৬১) দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়
বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন ঃ বাংলা উপন্যাস
প্রথম প্রকাশ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ২০০২
প্রকাশক ঃ সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

৬২) নিরুপম আচার্য
সাহিত্যে সমাজ ও ভাষা প্রসঙ্গ
১ম সংস্করণ ১৯৯৭
ভোলানাথ প্রকাশনী

৬৩) নারায়ণ চৌধুরী, আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন
প্রথম প্রকাশ - ভাদ্র, ১৩৬৫
প্রকাশক - শ্রীশ কুমার কুন্ডু

৬৪) নিতাই বসু, তারাশঙ্করের শিল্পী মানস
প্রথম প্রকাশ - ১৯৭৩
প্রকাশক - সুধাংশু শেখর দে
দে'জ পাবলিশিং

৬৫) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলা গল্প বিচিত্রা
প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ, ১৩৬৪
প্রকাশক ঃ শরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড

৬৬) নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ গল্পমালা (৩য় খন্ড) প্রথম সংস্করণ ১৯৯২
আনন্দ পাবলিশার্স

৬৭) **নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ঃ রবীন্দ্রনাথ ও সাম্যচিন্তা**
পুস্তক বিপণি, ২২৭ বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা - ৭০০ ০০৯
প্রকাশক - রুশো মিত্র
প্রকাশকাল নভেম্বর ১৯৮৪

৬৮) **নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী (৫ম)**
প্রথম সংস্করণ - ১৯৮৮
গ্রন্থালয়

৬৯) **নির্মল দাস, ভাষা পরিচ্ছেদ**
প্রথম প্রকাশ - ১৫ই এপ্রিল ১৯৯৫
প্রকাশক ঃ নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যলোক

৭০) **নারায়ণ চৌধুরী ঃ বরণীয় লেখক স্মরণীয় সৃষ্টি,**
প্রথম সংস্করণ ১৯৮২
অনন্যা প্রকাশনী

৭১) **নিশীথরঞ্জন রায় ও অশোক উপাধ্যায়, প্রাচীন কলিকাতা**
প্রথম প্রকাশ ঃ কার্তিক ১৩৯০
প্রকাশক ঃ নেপালচন্দ্র ঘোষ

৭২) **নাজমা জেসমিন চৌধুরী - বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি**
প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৮০ ঢাকা, বাংলাদেশ
প্রথম ভারতীয় সংস্করণ - ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩
প্রকাশক - শিবব্রত মুখোপাধ্যায়
চিরায়ত প্রকাশ প্রাঃ লিঃ

৭৩) **নারায়ণ চৌধুরী ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য মুল্যায়ন**
বেঙ্গল পাবলিশার্স

৭৪) **নিশীথ মুখোপাধ্যায়, কথা কোবিদ বনফুল**
প্রকাশকাল ঃ ২৫শে বৈশাখ, ১২৯৫
প্রকাশক ঃ কান্তিরঞ্জন ঘোষ

৭৫) **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প**
প্রথম সংস্করণ - ১৯৮৮

৭৬) **নীরদ চন্দ্র চৌধুরী - নির্বাচিত প্রবন্ধ**
১ম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭
প্রকাশক - ধ্রুব নারায়ণ চৌধুরী
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

৭৭) **নীরদ চন্দ্র চৌধুরী - বাঙালী জীবনে রমণী**
প্রকাশ কাল - ভাদ্র ১৪০৫
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

৭৮) নেপাল মজুমদার, ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ
প্রথম খন্ড ১৯৬৯
৭৯) ডঃ পরমেশ আচার্য - ছোটগল্পে মুসলমান সমাজ সমীক্ষা
প্রথম প্রকাশ কলকাতা পুস্তক মেলা - ২০০১
করুণা প্রকাশনী, কলকাতা - ৭০০ ০০৯
প্রকাশক - রামাচরণ মুখোপাধ্যায়
৮০) পার্থ প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব
প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী ১৯৯৪
প্রকাশক - অরুণকুমার দে
র‍্যাডিকেল ইম্প্রেশন
৮১) প্রফুল্ল সরকার ঃ গুরুদেবের শান্তিনিকেতন
প্রথম সংস্করণ - ১৯৯৯, বুকল্যান্ড
৮২) প্রতীপ মজুমদার ঃ পরিমল গোস্বামীর জীবন ও সাহিত্য ঃ ১ম সংস্করণ - ১৯৯৯
পুস্তক বিপণি।
৮৩) প্রদুম্ন ভট্টাচার্য - তারাশঙ্কর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য
প্রথম প্রকাশ ঃ ২০০১, সাহিত্য অকাদেমি
রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজশাহ রোড,
নতুন দিল্লি - ১১০ ০০১
৮৪) প্রমথ চৌধুরী ঃ গল্পসংগ্রহ ঃ প্রথম সংস্করণ - ১৯৭০
বিশ্বভারতী
৮৫) ডঃ প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় - কথাসাহিত্যিক জগদীশ গুপ্ত
এডুকেশন ফোরাম, ভবানী দত্ত লেন, কলেজ স্ট্রিট
কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩
প্রকাশক - আজিজুল হক
প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী ২০০১
৮৬) প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্তের কথাসাহিত্য
ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে
প্রথম প্রকাশ - আগস্ট ১৯৯২, বেস্ট বুকস
৮৭) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় - গল্পসমগ্র
প্রথম সংস্করণ ১৯৭২
প্রকাশক - পাত্রজ
৮৮) প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন
প্রকাশ আষাঢ় ১৩৫১
প্রকাশক - অশোক মুখোপাধ্যায়
বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ।
৮৯) প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক
প্রথম প্রকাশ - ১৯৬৯
৯০) প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৫১
প্রকাশক - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স

৯১) প্রমথনাথ বিশী, পুরানো সেই দিনের কথা
প্রথম প্রকাশ - ফাল্গুন ১৩৯১
প্রকাশক - এস. এন. রায়
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

৯২) পি. আচার্য - বাংলা বানান বিচিন্তা (১ম)
প্রথম সংস্করণ ১৯৯৭
বিকাশ গ্রন্থ ভবন

৯৩) প্রমথনাথ বিশী, বাংলা সাহিত্যের নরনারী
মৈত্রী, কলিকাতা ১৯৬৬

৯৪) প্রবোধ কুমার সান্যাল - প্রবোধ কুমার সান্যালের গল্পসমগ্র
সাহিত্য সংস্থা

৯৫) প্রশান্ত কুমার রায় - সাহিত্য দৃষ্টি
প্রথম সংস্করণ ১৯৬০
জিজ্ঞাসা

৯৬) প্রমথনাথ পাল - শরৎ সাহিত্যে নারী
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬৪
ক্যালকাটা পাবলিশার্স

৯৭) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় - শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী
বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ

৯৮) প্রণবরঞ্জন ঘোষ - উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য
লেখাপড়া, কলিকাতা
প্রথম সংস্করণ ১৩৭৫

৯৯) পূর্ণেন্দু পত্রী, ছড়ায় মোড়া কলকাতা
প্রথম প্রকাশ - ডিসেম্বর ১৯৭৩
প্রকাশক - ফণীভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১০০) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পসমগ্র
৭ম সংস্করণ ১৯৮৭
প্রকাশ ভবন

১০১) বিজিতকুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস
চতুর্থ সংস্করণ, মাঘ ১৪০২
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১০২) বিশ্বনাথ দে, মানিক বিচিত্রা
প্রথম প্রকাশ, মে দিবস, ১৯৭১
প্রকাশক - নির্মল কুমার সাহা
সাহিত্যম

১০৩) **বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ঃ যখন সম্পাদক ছিলাম - শশধর প্রকাশনী**
১০/২/বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০০৯
প্রকাশিকা - রমা বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রথম প্রকাশ - কলিকাতা পুস্তকমেলা ১৯৯১

১০৪) **বনফুল ঃ বনফুলের শ্রেষ্ঠগল্প**
প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯
বাণীশিল্প

১০৫) **বিপ্লব চক্রবর্তী ঃ তারাশঙ্কর ও ভারতীয় কথাসাহিত্য**
১ম সংস্করণ ১৯৯৯
পুস্তক বিপণি

১০৬) **বিনয়ভূষণ রায়, বাংলায় সতীদাহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন**
প্রথম প্রকাশ - জুলাই ১৯৮৬
প্রকাশক - তপন কুমার ঘোষ
সাহিত্যশ্রী

১০৭) **বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ**
প্রথম প্রকাশ - আগস্ট ১৯৮৫
প্রকাশক - শঙ্খনীল দাস
এস. পি. পাবলিশিং

১০৮) **বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, ছোটগল্পে ত্রয়ী**
তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রথম প্রকাশ - সেপ্টেম্বর ১৯৮০
প্রকাশক - সুনীলকুমার ঘোষ
পপুলার লাইব্রেরী

১০৯) **বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সজল বসু, পবিত্রকুমার গুপ্ত**
বাংলা আগস্ট বিপ্লব
সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন সমিতি
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৯৭
প্রকাশক ঃ দে বুক স্টোর

১১০) **বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য তত্ত্বের রূপরেখা**
প্রথম সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৭৯
প্রকাশক ঃ স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক সাহিত্য প্রাঃ লিঃ

১১১) **বিশ্বনাথ পাল, বিভূতিভূষণ রূপে ও অরূপে**
প্রথম প্রকাশ - ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩
নব চলন্তিকা

১১২) **বিজিত ঘোষ, বাংলা ছোটগল্পের প্রতিবাদী চেতনা**

১ম প্রকাশ বইমেলা ১৯৯৪
পুনশ্চ
১১৩) ভাস্বতী সমাদ্দার, বাংলা উপন্যাসের পালা বদল (১৯৬৬-৭৮)
প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী ১৯৯৪
প্রকাশ - শঙ্খনীল দাস
পুস্তক বিপণি
১১৪) ভাস্বতী চক্রবর্তী লাহিড়ী, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে
বাংলা ছোটগল্প (১৯৪০ - ১৯৫০)
প্রথম দে'জ সংস্করণ ঃ পুস্তক
কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারী - ২০০৩
দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩
১১৫) ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার
প্রথম প্রকাশ - ১৯৬২, প্রকাশক রবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ
১১৬) মানব গঙ্গোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় - আধুনিক মননে সাহিত্য ভাবনা
১ম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯৯, প্রকাশক - শ্যামল ঘোষ
ঘোষ পাবলিশিং কনসার্ন, সাহিত্যশ্রী
১১৭) ডঃ মঞ্জরী চৌধুরী, ছোটগল্পে নরেন্দ্র মিত্র
দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩
প্রথম প্রকাশ - ৭ই জানুয়ারী বইমেলা আগরতলা
১১৮) মোহিতলাল মজুমদার, সাহিত্য বিতান
প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৪
প্রকাশক - অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ
১১৯) মিহির আচার্য, বাঙালীর বুদ্ধিজীবী মানস ও সমাজ ভাবনা
দ্বিতীয় সংস্করণ জুলাই ১৯৮১
প্রকাশক - শান্তি আচার্য
লেখক সমাবেশ
১২০) মিহির আচার্য, সাহিত্যে প্রগতি ও পরাগতি
১ম প্রকাশ জুলাই ১৯৯০
প্রকাশক - শান্তি আচার্য
লেখক সমাবেশ
১২১) মধুসূদন বসু, রবীন্দ্র সাহিত্যে পল্লী ও শহর
১ম সংস্করণ ১৯৮৪
পুস্তক বিপণি
১২২) রামরঞ্জন রায়, প্রসঙ্গ প্রেমেন্দ্র মিত্র
প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা বৈশাখ ১৪০৪

প্রকাশক - অশোক মান্না
মান্না পাবলিকেশন
১২৩) ৺রথীন্দ্রনাথ রায়, বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী
প্রথম প্রকাশ - ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮
প্রকাশক ঃ শ্রীশকুমার কুন্ডু
জিজ্ঞাসা
১২৪) রবীন্দ্রনাথ রায়, ছোটগল্পের কথা
প্রথম প্রকাশ - সেপ্টেম্বর ১৯৫৯
প্রকাশক - অনুপকুমার মহিন্দর
পুস্তক বিপণি
১২৫) রামরঞ্জন রায়, ছোটগল্পের রূপশিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্র
প্রকাশকাল - আগস্ট ১৯৮৫
প্রকাশিকা - অঞ্জু রায়
তপন পুস্তকালয়
১২৬) রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, রবীন্দ্র প্রতিভায় নিসর্গ প্রকৃতি ও শিল্পকলা
প্রথম প্রকাশ - পৌষ ১৩৯৪
প্রকাশক - কান্তিরঞ্জন ঘোষ
বর্ণালী
১২৭) রফিক উল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ
প্রথম প্রকাশ - জুন ১৯৯৭
প্রকাশক - আশফাকউল আলম
বাংলা একাডেমী, ঢাকা
১২৮) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা
সপ্তম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ ১৯৮৪
প্রকাশক - রবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ
১২৯) ডঃ শিবশঙ্কর পাল, সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে মানবিক মূল্যবোধ
সুবর্ণা প্রকাশনী, ৬এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলিকাতা - ৭০০ ০১৩
প্রথম প্রকাশ - ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৯
১৩০) শিশিরকুমার দাস, বাংলা ছোটগল্প
প্রথম প্রকাশ - অক্টোবর ১৯৬৩
প্রকাশক - সুধাংশু শেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩১) শিবনারায়ণ রায়, বিবেক শিল্পী ঃ অন্নদাশঙ্কর
১ম সংস্করণ ১৯৯৮
মিত্র ও ঘোষ

১৩২) শীতল ঘোষ, ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস
প্রথম প্রকাশ - সেপ্টেম্বর ১৯৮৪
প্রকাশক - কান্তিরঞ্জন ঘোষ
বর্ণালী
১৩৩) শশিভূষণ দাসগুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের নবযুগ
১ম সংস্করণ ১৯৯৭
ভারতী প্রকাশনী
১৩৪) শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ
প্রথম সংস্করণ ঃ আশ্বিন ১৩৯০
প্রকাশক ঃ ব্রজকিশোর মন্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
১৩৫) শিবানী রায় ঃ শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসের চরিত্রসূচী
১ম সংস্করণ ১৯৮৪
পুস্তক বিপণি
১৩৬) শিবরাম চক্রবর্তী ঃ শ্রেষ্ঠগল্প
১ম সংস্করণ ১৯৯০
নন্দিশ পাবলিশার্স
১৩৭) শ্যামল সেনগুপ্ত ঃ বাংলা উপন্যাসে নায়কের বিবর্তন
দ্বিতীয় সংস্করণ - ২০০১
প্রকাশক ঃ শ্রী প্রশান্তকুমার আদিত্য
ম্যানস্ক্রিপ্ট ইন্ডিয়া
১৬৬/৩ শাস্ত্রী নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী রোড
সাঁতরাগাছি, রামরাজাতলা
হাওড়া - ৭১১১০৪
১৩৮) সত্যেন্দ্রনাথ রায় ঃ বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা
প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী ২০০০
প্রকাশক ঃ দে'জ পাবলিশিং
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩
১৩৯) সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খন্ড
প্রথম প্রকাশ - ১৯৫৮
সংস্করণ ১৯৬৩, প্রকাশক - যতীন্দ্রনাথ রায়
ইস্টার্ন পাবলিশার্স
১৪০) সুদক্ষিণা ঘোষ ঃ স্বর্ণকুমারী দেবী
প্রথম প্রকাশ - ২০০১
সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন,
৩৫, ফিরোজশাহ রোড, নতুন দিল্লি - ১১০ ০০১
১৪১) সুষমা সেন, হিন্দুনারী
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৭৩

প্রকাশক ঃ সুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্যকুটির প্রাঃ লিঃ

১৪২) সফিকুন্নবী সাযাদি - কথাসাহিত্যে বাস্তবতা ও প্রেমচন্দ
বাংলা একাডেমী ঢাকা
প্রথম প্রকাশ - জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪
প্রকাশক - আশফাকউল আলম

১৪৩) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর
তৃতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৯৫
প্রকাশক - সুধাংশু শেখর দে
দে'জ পাবলিশিং

১৪৪) সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খন্ড (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
পঞ্চম সংস্করণ ১৩৮৮
প্রথম আনন্দ সংস্করণ ১৯৯৬
প্রকাশক - সুভদ্রকুমার সেন
আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড

১৪৫) সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যে গদ্য
ইষ্টার্ন পাবলিশার্স, কলিকাতা ১৯৮৩

১৪৬) সমরেশ মজুমদার, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ বিশ্লেষণী পাঠ - রত্নাবলী
১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯
প্রথম প্রকাশ - অগ্রহায়ণ ১৪০৫
প্রকাশক - সুমন চট্টোপাধ্যায়

১৪৭) সমরেশ মজুমদার, বাংলা সাহিত্যের পঁচিশ বছর, (১৯২৩-১৯৪৭)
প্রথম প্রকাশ - নভেম্বর ২৮, ১৯৮৬
প্রকাশক - সুমন চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী

১৪৮) সমরেশ মজুমদার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যক
প্রথম প্রকাশ - আগস্ট ১৯৯৪
প্রকাশক - সুমন চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী - ১১

১৪৯) সমরেশ মজুমদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় - পদ্মানদীর মাঝি
প্রথম প্রকাশ - আগস্ট ১৯৯৪
প্রকাশক - সুমন চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী - ১১

১৫০) সুকুমার সেন, বিচিত্র সাহিত্য (দ্বিতীয় খন্ড)
প্রকাশক - অম্বিকাপদ বিশ্বাস
ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী

১৫১) সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান
প্রথম প্রকাশ আষাঢ়, ১৩৮৪
প্রকাশক - মানবেন্দ্রকুমার সেন
ক্যালকাটা পাবলিকেশন

১৫২) সুখেন্দু ভট্টাচার্য, আন্তর্জাতিক ছোটগল্প ও সমাজ জিজ্ঞাসা

প্রথম সংস্করণ ১৯৯৭
প্রকাশনী - প্রতিভাস
১৫৩) সুবোধ চক্রবর্তী, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র
প্রথম সংস্করণ ১৯৯১
প্রকাশনী - আদিত্য
১৫৪) ডঃ সুজল আচার্য - প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও শিল্পাঙ্গিক
প্রভা প্রকাশনী
ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা - ৭৩
প্রথম প্রকাশ ১৭ই মে ২০০৩
প্রকাশক - অসীমকুমার মন্ডল
১৫৫) ডঃ সুজল আচার্য - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাসঃ মূল্যায়ন
প্রভা প্রকাশনী
ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা - ৭৩
প্রথম প্রকাশ - ৮ই মে ২০০৩
প্রকাশক - অসীমকুমার মন্ডল
১৫৬) সুধীর কর ও সাধনা কর, শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ
প্রথম সংস্করণ ১৯৬৬
ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী
১৫৭) সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরী, শিল্পীর দায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্বিতীয় প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯৯
প্রকাশক - গৌতম চৌধুরী
উবুদশ, কলিকাতা - ১২
১৫৮) সমরেশ মজুমদার, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের বিশ্লেষণী পাঠ
১ম খন্ড প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৮
প্রকাশক - সুনীল চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী
১৫৯) সিরাজুল ইসলাম, রবীন্দ্র ছোটগল্পে পারিবারিক পটভূমিকা
প্রকাশক - সুমন চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী
১৬০) সমরেশ মজুমদার, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কবি
দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯৬
প্রকাশক - সুমন চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী
১৬১) সমরেশ মজুমদার, পথের পাঁচালী জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরূপ
প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৯
প্রকাশক - সুমন চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী
১৬২) সিন্‌হা চন্দ্রা ঘোষ - বিংশ শতাব্দীর বাংলা ছোটগল্পে সমাজ বিদ্রোহ (১৯০১-১৯৮০)
১ম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯৩, প্রকাশক - দিলীপকুমার সিন্‌হা
রত্নাবলী
১৬৩) সনৎকুমার নস্কর - মুঘলযুগের বাংলা সাহিত্য
রত্নাবলী

৫৯ এ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রিট,
কলকাতা - ৯
প্রথম প্রকাশ বইমেলা - ১৯৯৫
প্রকাশক - সুমন চট্টোপাধ্যায়

১৬৪) সতীনাথ ভাদুড়ী - গল্পসমগ্র (২য় খণ্ড)
প্রথম সংস্করণ ১৯৯৫
প্রকাশক - গ্রন্থালয়

১৬৫) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ গল্পসমগ্র (২য় খণ্ড)
তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৮
প্রকাশক - মিত্র ও ঘোষ

১৬৬) সুবোধ ঘোষ (৩য় খণ্ড)
প্রথম সংস্করণ ১৯৯৪
প্রকাশক - আনন্দ পাবলিশার্স

১৬৭) সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ তারাশঙ্কর ও সমকালীন সাহিত্যসমাজ
প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯
প্রকাশক - মিত্র ও ঘোষ

১৬৮) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মনীষী স্মরণে
প্রকাশক ঃ শ্রীশকুমার কুণ্ডু
জিজ্ঞাসা

১৬৯) সুবল সামন্ত, বাংলা গল্প ও গল্পকার (১ম খণ্ড)
প্রথম সংস্করণ ১৯৯৮
প্রকাশক - মুশায়েরা

১৭০) সুপ্তি মিত্র, শান্তিনিকেতন সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ
প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৩৩
বিশ্বভারতী, গ্রন্থন বিভাগ

১৭১) ডঃ সুবোধ চৌধুরী ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক পর্যায়)
প্রথম সংস্করণ ১৯৯২
প্রকাশক - ভারতী বুক এজেন্সী

১৭২) সরোজকুমার বসু, রবীন্দ্র রঙ্গ
প্রথম সংস্করণ বৈশাখ, ১৩৮০
প্রকাশক - সুনন্দ ভট্টাচার্য, জি.ই. পাবলিশার্স

১৭৩) সরোজ দত্ত ঃ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যসাধনা
প্রথম সংস্করণ ১৯৮৫, প্রকাশক - পুস্তক বিপণি

১৭৪) সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, পুনর্মূল্যায়নে শরৎচন্দ্র
প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬
প্রকাশক - বিহঙ্গভূষণ কুণ্ডু, বুক সেন্টার

১৭৫) সৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ ঃ সাহিত্যসেবক অন্বেষা (২য় খণ্ড)
প্রথম সংস্করণ ১৯৮৫, প্রকাশক - সাহিত্যলোক

১৭৬) সরোজ দত্ত, উপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রথম প্রকাশ ১৯শে মে, ১৯৯৩
প্রকাশক - সুমন চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী

১৭৭) সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
দ্বিতীয় খন্ড ঊনবিংশ শতাব্দী
সপ্তম সংস্করণ ১৩৮৬
প্রকাশ - শেফালিকা রায়, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স

১৭৮) সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমালোচনা ধারা
দ্বিতীয় সংস্করণ ১লা আগস্ট ১৯৭৭
প্রকাশক - সূর্যকুমার ব্যানার্জী, ব্যানার্জী পাবলিশার্স

১৭৯) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাঙালীর সংস্কৃতি
চতুর্থ সংস্করণ ঃ ৩১শে জানুয়ারী ১৯৯৬
প্রকাশক - পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী

১৮০) সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র সমালোচনা সাহিত্য
ষষ্ঠাদশ সংস্করণ আশ্বিন ১৪০৪
প্রকাশক - রাজীব নিয়োগী
এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ

১৮১) হরপ্রসাদ মিত্র, সাহিত্যের নানা কথা
প্রথম প্রকাশ মহালয়া ১৩৬৩
প্রকাশক - সমীরকুমার নাথ, নাথ সাহিত্য

১৮২) হীরেন চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য প্রকরণ
প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ ১৪০২, প্রকাশক ঃ দেবাশিস ভট্টাচার্য্য
বামা পুস্তকালয়

১৮৩) হীরেন চট্টোপাধ্যায়, মৃত্যুর শিল্প ঃ শিল্পের মৃত্যু
প্রথম প্রকাশ - কলিকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী - ২০০০
প্রকাশিকা ঃ অন্তরা চট্টোপাধ্যায় - তমসুক
১৮৭, রবীন্দ্র নগর, কোচবিহার - ৭৩৬১০১

১৮৪) ক্ষেত্র গুপ্ত—বাংলা উপন্যাসের ইতহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)
প্রথম সংস্করণ-২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪
প্রকাশক ঃ চিন্ময় মজুমদার, গ্রন্থ নিলয়।

১৮৫) ক্ষেত্র গুপ্ত - বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (প্রথম খন্ড)
নতুন দ্বিতীয় সংস্করণ - আগস্ট ১৯৯৫
প্রকাশক ঃ চিন্ময় মজুমদার
গ্রন্থ নিলয়

পত্র ও পত্রিকা

১) আনন্দবাজার পত্রিকা রবিবাসরীয় ২৮.০৬.৮১
২) শনিবারের চিঠি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা ২২শে শ্রাবণ ১৪০৫
৩) কথা সাহিত্য সংখ্যা মাঘ ১৪০২, ৪৭ বর্ষ বইমেলা সংখ্যা
৪) প্রবাসী ১লা আশ্বিন ১৩৮৫ সংখ্যা
৫) শান্তিনিকেতন পত্রিকা শ্রাবণ সংখ্যা ১৩২৬, ১ম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা
৬) অমৃত পত্রিকা ১লা বৈশাখ, ১৩৯২
৭) আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৮২
৮) দেবেশচন্দ্র রায়, রাজসাহীতে দু'বছর প্রবন্ধ কথাসাহিত্য ঃ প্রমথনাথ বিশী সংবর্ধনা সংখ্যা শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৭৩
৯) চিঠি, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে
১০) কালি কলম, কয়েক প্রহরের স্মৃতি - গৌরাঙ্গ ভৌমিক
১১) কথাসাহিত্য বৈশাখ ১৩৫৯
১২) নতুন সাহিত্য - সপ্তম বর্ষ, মাঘ, ১৩৬৩
১৩) রবীন্দ্রনাথের পত্র - ৩১শে আশ্বিন ১৩৩৫
১৪) শনিবারের চিঠি বৈশাখ ১৩৪৬
১৫) ভারতবর্ষ ৩১শে আষাঢ় ১৩৫০
১৬) রবিবারের প্রতিদিন ১০ই জুন ২০০১
১৭) শিক্ষা ও সাহিত্য নভেম্বর ২০০১
১৮) দেশ পত্রিকা সাহিত্য সংখ্যা ১৩৬
১৯) প্রবাসী - পৌষ ১৩৩০
২০) কথাসাহিত্য - বৈশাখ ১৩৮২
২১) সাহিত্য ও সংস্কৃতি - কার্তিক - পৌষ ১৩৮২
২২) শান্তিনিকেতন - বৈশাখ ১৩৩০
২৩) পত্র স্মৃতি ১৯৭১ - পরিমল গোস্বামী
২৪) আনন্দবাজার পত্রিকা ২১.০৪.৫৫ কমলাকান্তের আসর
২৫) কথাসাহিত্য আশ্বিন ১৩৮৯
২৬) প্রমথনাথ বিশী জন্মশতবর্ষ স্মরণিকা, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮
২৭) শিবরামকে লেখা প্রমথ চৌধুরীর চিঠি
২৮) জগদীশ গুপ্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি
২৯) প্রভাতকুমারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি
৩০) অপ্রকাশিত দিনলিপি
৩১) ভারতী পত্রিকা

পরিশিষ্ট (ক)

প্রমথনাথের ব্যক্তি জীবনের মুখ্য ঘটনাপুঞ্জ ও সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ঘটনাসমূহের কালানুক্রমিক বিবরণ।

১৯০১ - জুন ১১ (বঙ্গাব্দ ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮) জন্মস্থান - বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমার জোয়াড়ি গ্রাম।
পিতার নাম ঃ নলিনীনাথ বিশী মাতার নাম ঃ সরোজবাসিনী দেবী

১৯১০ - শান্তিনিকেতনে আসেন শিক্ষালাভের জন্য।

১৯১১ - শান্তিনিকেতনের শিশুসমিতির হাতে লেখা পত্রিকা 'শিশু' প্রকাশ।

১৯১৯ - ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন।

১৯২১ - বিশ্বভারতীর গোড়াপত্তন - দুজন ছাত্র প্রমথনাথ এবং অন্ধ্রের ছাত্র চলমায়। ফরাসি ও ইতালিয় ভাষা শিক্ষা।

১৩২৩ ভাদ্র সংখ্যা 'প্রভাত' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কুলহারা' ছোটগল্প ও 'পাঠান শাসনে ভারতবর্ষ' প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ।

১৯২২ - শান্তিনিকেতনে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা - প্রমথনাথ এবং বিভূতি গুপ্ত বুধবার নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

১৯২৮-৩২ - হাতে লেখা 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

১৯৩০-৩২ - শান্তিনিকেতন পত্রিকা সম্পাদন করেন।

১৯২৩ - প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দেয়ালি' প্রকাশিত। নামকরণ করেন রবীন্দ্রনাথ।

১৯২৫ - প্রথম উপন্যাস 'দেশের শত্রু' প্রকাশিত হয়।

১৯২৩-২৬ - শান্তিনিকেতন আশ্রমে শিক্ষকতা।

১৯২৭ - প্রাইভেটে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাশ করেন। এই বছর রাজশাহী কলেজে ইংরেজি অনার্স নিয়ে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হন।

১৯২৯ - ইংরেজি অনার্স সহ বি.এ. পাশ করেন।

১৯২৯ - সুরুচিদেবীর সঙ্গে বিবাহ।

১৯৩০ - স্বদেশী আন্দোলনে জড়িত হওয়ার অপরাধে পিতা নলিনীনাথ বিশীর কারাবরণ।

১৯৩২ - প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষায় এম.এ. পাশ করেন। প্রথম শ্রেণিতে প্রথম।

১৯৩৩-৩৬ - মাসিক ৭৫ টাকা রামতনু লাহিড়ী বৃত্তি নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা।

১৯৩৫-৩৬ - কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পরিভাষা কমিটির' সম্পাদক।

১৯৩৬-৪৬ - রিপন কলেজে (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপনা।

১৯৪৪-৪৫ - 'দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকার আংশিক সময়ের সম্পাদক।

১৩৫০-৬০	- 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক। সম্পাদক - রবীন্দ্রনাথ।
১৯৪৬ জানুয়ারী ১	আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান।
১৯৪৯	- ষষ্ঠ ভ্রাতা কালিদাস বিশীর বোমার আঘাতে মৃত্যু।
১৯৫০ ফেব্রুয়ারী	
১৭ থেকে	- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক।
১৯৫১	- লেকচারার থেকে রীডার, রীডার থেকে অধ্যাপক।
১৯৫২	- জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি।
১৯৬২-৬৬	- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক।
১৯৬২-৬৮	- পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের মনোনীত সদস্য।
১৯৬৩-৬৬	- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান।
১৯৬৬-৭১	- ইউ.জি.সি. অধ্যাপক।
১৩৬৬	- 'কেরী সাহেবের মুন্সী' লিখে রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হন।
১৯৭১	- 'পদ্মশ্রী' উপাধি পেয়ে সম্মানিত হন।
১৯৭২-৭৮	
এপ্রিল ২	- দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে আংশিক সময়ের অধ্যাপক। রাজ্যসভার সদস্য।
১৯৮৫ মে ১০	- রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।